দীয় ১৪০১
পরিচয়

আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শিল্পাঞ্চল আসানসোলের গুরুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ —

শতাব্দী প্রাচীন আসানসোল পৌরসভা আজ কর্পোরেশনের মর্যাদার আসনে উন্নীত।

বিগত বৎসরগুলিতে পৌরসভার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পৌরজনের সক্রিয় সহযোগ এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

শহর উন্নয়নের ধারাবাহিকতার সঙ্গে শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশ রচনায় আসানসোল পৌরসভা যথাসাধ্য প্রয়াসী হয়েছে।

নবাগত দিনগুলিতে ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্রে নগর উন্নয়নের সার্বিক পরিকল্পনায় সকলের সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য একান্ত কাম্য।

শ্রীবামাপদ মুখোপাধ্যায়
মেয়র
আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

প্রত্যেক নবসাক্ষর জাতির গর্ব

756·3
O17/3

বামফ্রন্ট সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রামই সাক্ষর হয়েছে বা হতে চলেছে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রতি মানুষের অক্ষরজ্ঞান প্রয়োজন। আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রতিটি ঘরে সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলি।

১০৪

সাক্ষরতা প্রসারে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ২৮৬৭/৯৪

শারদোৎসব
হয়ে উঠুক
সার্থক ও সমৃদ্ধ

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

naa

‘আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি…’

বেজে উঠেছে বোধনের ঢাক। আকাশে শরতের মেঘ। শিশির ভেজা শিউলি। মাঠের পথে সাদা কাশ। আনন্দময়ীর আগমনে দেশ গিয়েছে ছেয়ে। সেই আনন্দের রেশটুকু গায়ে মেখে পিয়ারলেস তার সমস্ত সার্টিফিকেট হোল্ডার, ফিল্ডকর্মী, অফিসকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাচ্ছে শুভ শারদ অভিনন্দন।

সর্বাঙ্গীন সুখ, শান্তি ও বৈভবের ফসলে ভরে উঠুক সবার জীবন।

সর্বজনীন শারদ শুভেচ্ছাসহ

পিয়ারলেস গ্রুপ

আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থ :

Communalism In Contemporary India **100.00**

এতে লিখেছেন হীরেণ মুখার্জী, অন্নদাশঙ্কর রায়, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, মুলুকরাজ আনন্দ, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বদরুদ্দিন ওমর, অমলেন্দু দে এবং প্রচ্ছদ এঁকেছেন পরিতোষ সেন।

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী :

দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবনী ও কাব্যবিচার—অধীশচন্দ্র সাহা ৬০-০০

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি ও কাব্য—কেকা ঘটক ৭০-০০

আঞ্চলিক দেবতা : লোক সংস্কৃতি—মিহির চৌধুরীকামিল্যা ৮০-০০

উপনিষদ প্রসঙ্গ (কৌষিতকী পর্ব)—শ্রীমৎ অনির্বাণ ৪০-০০

কাব্য সাহিত্যে গ্রামবাংলা—চিন্ময়ী ভট্টাচার্য ১১০-০০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন শাখা, বর্ধমান-৭১৩১০৪

ডাকঘর
মাসিক আয় প্রকল্প

প্রয়োজনে ১ বছর পর থেকে টাকা তোলা যায়।
৩ বছর পর তুললে, টাকা তোলার দিন পর্যন্ত
১৩% সুদ সমেত পুরো জমা টাকা ফেরৎ।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়ম—গুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ফেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করে যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতার লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে, আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৮৬৭ আই. সি. এ/৯৪

এসেছে শরৎ……

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার পরে……।
এই মুহূর্তে আবৃত্তি করে পড়েছে হয়ত
কোনও এক সদ্য সাক্ষর পড়ুয়া। আর
সেখানেই আমরা আন্তরিকভাবে বিদ্যুৎ
পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। পড়ুয়া
এবং আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর
করার জন্য চাই জনগণের সার্বিক সহযোগিতা।
শারদ উৎসব উপলক্ষে এই শুভেচ্ছা সবাইকে
জানাই।

প্রত্যাশার প্রতীক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

With best compliments from :

M/s EASTERN MINERALS & TRADING AGENCY

(Engineers & Governments Contractors)

Head Office :

G. T. Road (East) MURGASOL

P. O. Asansol—713303 * Dist—Burdwan (West Bengal)

Phones : ASL (PBX) 20-3588, 20-3599, 20-4358

Gram : EASTMINE

Telex : 0204221 EMTA IN, Telefax : 91 0341 2076

City Office :

29, Ganesh Chandra Avenue (2nd Floor)

Calcutta—700 013

Phones : 26-2581, 26-4043, 26-5184, 26-7580

Telefax : 91-033 26-6606

Expert in Opencast Project, Various Project & Construction Works, Canal & Levelling jobs with Modern Machineries & Equipments

COLLECTIONS OF SHORT STORIES IN ENGLISH / ENGLISH TRANSLATION

Contemporary Indian Short Stories (Series I-III)
per set Rs. 105

Contemporary Indian Short Stories in English
Compiled by Shiv K. Kumar — Rs. 65

Anthology of Hindi Short Stories
Compiled by Bhisham Sahni — Rs. 150

Selected Kannada Short Stories
Edited by G. S. Amur — Rs. 75

The Drought and other Stories by Saratchandra Chatterjee tr. Sasadhar Sinha (2nd edn) — Rs. 30

Anandibai and Other Stories by Parashuram tr. Swapna Dutta — Rs. 50

Krishan Chander : Selected Short Stories
Compiled by Gopi Chand Narang tr. Jai Ratan — Rs. 80

Rajinder Singh Bedi : Selected Short Stories
Compiled by Gopi Chand Narang tr. Jai Ratan — Rs. 80

The Prayer Room and other Stories
Kishori Charan Das — Rs. 80

The Night of the Full Moon
Kartar Singh Duggal — Rs. 75

The Bird of Gold and other Stories
by OM Goswami — Rs. 30

SAHITYA AKADEMI

RABINDRA BHAVAN
35 Ferozeshah Road
New Delhi—110 001

JEEVAN TARA BHAVAN
23A/44X, D. H. Road
Calcutta—700 053
Phone—478-1806

With Best Compliments From :

W. C. Shaw Pvt. Ltd.

HUTTON ROAD
HAWKERS MARKET
Asansol

With Best Compliments From :

Reme Private Limited

REME FEELS PROUD IN COMING UP WITH ITS LEAD PLANT AT BISHNUPUR (BANKURA) WITH SUPPORT FROM WBIDC AND IRBI

Registered Office :

72, Okhla Industrial Estate
NEW DELHI-110 020
Telephone No. 68-30214
Telex No : 031 75407 REME IN

Fax No. 011 64 31821

Corporate Office :

'VASUNDHARA'
Suite No. 5. 7th floor
2/7, Sarat Bose Road
Calcutta 700 020

Telephone No. 748290/91
Telex No. 021-7056 HAMC IN
GRAM : HINDALLOY

WORKS

Industrial Growth Centre, Bishnupur
Plot No. L-35 & L-36,
Bishnupur, Dist : B A N K U R A (W. B)

পশ্চিমবঙ্গ—এক নতুন শক্তির উৎস

এবারে চৈত্র ও বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে পশ্চিমবঙ্গ এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহে রেকর্ড করেছে। প্ল্যান্ট লোড্ ফ্যাক্টর (পি: এল. এফ) বেড়েছে। এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যোগান সম্ভব হয়েছে।

এই সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গ নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন প্রভাবিত হয়েছে শিল্পোদ্যোগগুলি। শিল্পদ্রব্য নির্মাণের প্ল্যান্টগুলি পূর্ণশক্তিতে উৎপাদন করছে এবং ক্ষমতাও বেড়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য উন্নততর সেচেরও সম্ভব হয়েছে। এই নবোদ্যম পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে নতুন ভবিষ্যতের রূপরেখা রচনা করছে।

লোডশেডিং অতি কমমাত্রায় হওয়ায় জনসাধারণের কষ্ট লাঘব হয়েছে। গত ২৪শে মার্চ '৯৪ পর্যন্ত চাহিদা ছিল ২২৩১ মেগাওয়াট যা মেটাতে সক্ষম হওয়ায় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

এই সার্থক প্রচেষ্টা কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়।

বামফ্রন্ট সরকারের অনমনীয় সংকল্প বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিশ্চিত করেছে বিদ্যুতের সর্বাপেক্ষা অনুকূল উৎপাদন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান প্ল্যান্টগুলির আধুনিকীকরণে ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন প্ল্যান্টগুলির সর্বোচ্চ উৎপাদন এবং নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহে এই সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে। আজ তাই দূর-দূরান্তরে গ্রামেও বিদ্যুতের ছোঁয়ায় অন্ধকার দূর হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন শক্তির উৎস হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ৩২৯৮/৯৪

With Best Compliments From :

STD—035292 Phone—2672

M/s P. K. DUTTA & BROTHERS

Regd. Contractor of Railway C. P. W. D.
Govt. of West Bengal & W. B. S. E. B.

SUDARSHANPUR
Raiganj (Pin. 733134)
Uttar Dinajpur

PRODYOT KR. DUTTA	SHAKTI SHEKHAR DUTTA
Govt. Civil & Electrical Contractors Transport owner	Govt. Regd Contractor

সুধাংশু গুপ্তের

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

'জন্ম জন্মান্তর'

মূল্য বারো টাকা

প্রাপ্তিস্থান

(১) প্রাইমা পাবলিকেশন
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৭

গ্রন্থকার
ফ্ল্যাট নম্বর ৬, তিনতলা
৪-আর, নাকতলা রোড
কলকাতা-৮০০০৪৭

'এই কাব্যগ্রন্থ পড়ে নির্মল আনন্দ পেলাম।'
অসিতবরণ ভরদ্বাজ, আজকাল

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত পুস্তক

বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ :

বাঙালীর সংস্কৃতি	: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫
ভারতের কৃষি প্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ	: গৌতমকুমার সরকার	১৫
বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত	: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮
সহজপাঠ অর্থনীতি	: ধীরেশ ভট্টাচার্য	১২
প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫
বাংলার ইতিহাস সাধনা	: প্রবোধচন্দ্র সেন	১৫
বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে	: ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫
পরমাণুর অভ্যন্তরে	: কুঞ্জবিহারী পাল	১৫
মুদ্রণচর্চা	: দীপঙ্কর সেন	১৫
বাংলা উপন্যাস দ্বান্দ্বিক দর্পণ	: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫

জীবনী গ্রন্থমালা :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	: বিজিতকুমার দত্ত	২
সুকুমার	: লীলা মজুমদার	১৪
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	: বিজিতকুমার দত্ত	৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	: নেপাল মজুমদার	৫
সুশীলকুমার দে	: ভবতোষ দত্ত	৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	: সরোজ দত্ত	১৫
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	: স্বস্তি মণ্ডল	১০

পরিভাষা সংকলন :

সংকলন গ্রন্থ প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা		
বানান বিতর্ক	: নেপাল মজুমদার সম্পাদিত	২৫
সুকুমার পরিক্রমা	: পবিত্র সরকার সম্পাদিত	৩০
প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ		৪৫
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ		৫০

মুখপত্র :

আকাদেমি পত্রিকা ১, ৩, ৪	: অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০
আকাদেমি পত্রিকা ৫	: ,,	২৫

বিক্রয়কেন্দ্র :

আকাদেমি দপ্তর, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০; আকাদেমি ভাণ্ডার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০; কলকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, ৭ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ মনীষা গ্রন্থালয়, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ; বুক স্টোর, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

আই. সি. এ ৩২৯৮/৯৪

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য
একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৪র্থ তল) কলিকাতা–৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয় :—

ক) এইচ, এম, টি, / মহিন্দর / এসকর্টস মিৎসুবিশি ট্রাক্টরস।
খ) কুবোটা / মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।
গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।
ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।
ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের, তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং ২২০–২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস

২৪–পরগণা (দক্ষিণ)	:	১৪, নিউ তারাতলা রোড, কলিকাতা–৮৮
,, (উত্তর)	:	২৭নং যশোর রোড, বারাসাত
হুগলী	:	সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, চুঁচুড়া/পুরশুরা
বর্ধমান	:	৫নং রামলাল বোস লেন, রাধানগর পাড়া, ষ্টেশন রোড মেমারি, বর্ধমান
বাঁকুড়া	:	লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট)	:	সুভাষ নগর, মেদিনীপুর
মেদিনীপুর (ইষ্ট)	:	পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া
বীরভূম	:	সিউড়ি, বড়বাগান
মালদা	:	মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ	:	১৬, শহীদ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি	:	'সবরি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি
দার্জিলিং	:	বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি
কোচবিহার	:	এন, এন, রোড, কোচবিহার
পুরুলিয়া	:	নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া
নদীয়া	:	১/১ এম, এম, ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ১৪নং আর. এন. টেগর রোড, নদীয়া
উত্তর দিনাজপুর	:	সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স
পশ্চিম দিনাজপুর	:	বালুর ঘাট

পঞ্চায়েত

গ্রামের মানুষদের নতুন জীবন দিয়েছে

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য তৃণমূলস্তরে প্রশাসনের বিকেন্দ্রী-করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমিসংস্কারের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতায় ভূমিসংস্কারের নানাবিধ পরিকল্পনা সাফল্যের সাথে রূপায়িত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিশাল অব্যবহৃত মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার আনাই পঞ্চায়েতের লক্ষ্য।—পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বড় রকমের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের শিল্প বিকাশেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম।

পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা গ্রামীণ জনসাধারণের নতুন জীবনের প্রতীকস্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৮৬৭ আই. সি. এ/৯৪

"হাওড়া শহরে খেলাধূলার প্রসারে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্টেডিয়াম হাওড়াবাসীর বর্তমান গর্ব। হাওড়া বাসীর ভবিষ্যৎ গর্ব ইনডোর গেমসের প্রসারে ডুমুরজলা স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং সংস্কৃতি বিকাশে শরৎ সদনের নির্মাণ কাজও সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। পুরসভার টেলারিং স্কুলগুলি দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে। শুধু নাগরিক সুখ সুবিধা নয়—হাওড়াবাসীর সার্বিক বিকাশই আমাদের লক্ষ্য।"

স্বদেশ চক্রবর্তী
(মেয়র)

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪৮(৫)/৯৪-৯৫

সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য ও শিল্প সৌকর্যে অনন্য

তাঁতের কাপড় এবং হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরী করার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আজও বাংলার ঘরে ঘরে বিদ্যমান। এগুলি সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, বর্ণসুষমা ও শৈল্পিক সৌন্দর্যে অনন্য। আধুনিকতার ধাক্কায় হারিয়ে তো যায়ইনি বরং নতুন ডিজাইন ও রংয়ের সমন্বয়ে অতি আধুনিকতারও নজর কেড়েছে।

বাংলার তাঁতের কাপড় হস্তশিল্পজাত সামগ্রী ও চামড়ার তৈরী জিনিস কিনুন। বাংলার সামগ্রীতেই ঘর সাজান ও নিজেকে সাজিয়ে তুলুন।

তাঁতের কাপড়ের জন্য 'তন্তুজ' অথবা 'তন্তুশ্রী' হস্তশিল্প সামগ্রীর জন্য 'মঞ্জুষা' এবং 'গ্রামীণ' ও চর্মজাত সামগ্রীর জন্য 'চর্মজ' আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA/3298/94

With Best Compliments From—

SHAKTIGARH TEXTILE & INDUSTRIES LTD.

Manufacturers of :—
High Quality Yarn of Cotton, Viscose, Acrylic and
Blended Polyester / Viscose of various
counts / descripions in Dyed and Grey

Regd. Office & H. O
4, Government Place North
Calcutta—700 001
Gram : 'SHAXTILE'
Dial : 248 2002
248 9066
248 7735
Telex : 021 4666 Stil in
Fax : (91) (33) 2480836

Mills
P. O.—BARSUL
Rly. Stn.—Shaktigarh
District—Burdwan
(West Bengal)
Dial : Shaktigarh : 86353
86323
Burdwan : 4038

EASTERN COALFIELDS LIMITED
(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
Office of the Chairman-cum-Managing Director.
MAN IS THE MEASURE OF ALL THINGS

There is nothing higher than man. For it is man who builds-A Family-a Community-a Nation...........Our Concern is community welfare. We believe in a happy worker-working at his best for higher production. That's why-priority is given to the basic necessities for him like Housing, Water supply, Education, Health cover, Banking and Social up-liftment.

Top priority to welfare jobs is our prime objective to expand workers colonies, start new hospitals and dispensaries, arrange for potable water and set up recreational and educational centres.

In general, improvement of ecological and social balance is what we are promoting.

Afforestation, Voluntary saving schemes, road building Co-Operative movement and Banking facilities are few more from our long list. We are geared to have better standard of living for our men, for better performance of the Company.

আপনার উপলব্ধিই
আমাদের প্রেরণা—

* জননী জঠর থেকে শ্মশান ঘাট পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ধাপে রয়েছে পৌরসেবার প্রত্যক্ষ ছাপ। জন্ম ও শৈশব কৈশোর ও যৌবন, ব্যাধি ও বার্ধক্য পেরিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পালন করে চলেছে নিবিড় সেবাব্রত।

ঃ মাতৃমঙ্গল ও সূতিকাগারে সন্তানসম্ভবা, প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যা

ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশু ও কিশোরদের জন্য সাক্ষরতা ও শিক্ষাদান এবং বয়স্ক শিক্ষার জন্য নৈশ স্কুল চালনা।

ঃ দাতব্য বা নামমাত্র মূল্যে হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে আর্ত পীড়িত ও জরাগ্রস্তের জন্য ব্যাধির উপশম ও রোগীদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর ব্যবস্থা।

ঃ শহরকে সবুজ রাখতে বর্ষাকালে বৃক্ষরোপণ ও সারা বছর ধরে পার্ক ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ

ঃ সুস্থ জীবন যাপনের জন্য জলদান ও জঞ্জাল সাফাই পথের পরিচর্যা ও আলো জ্বালা—

'পুরশ্রী বিবর্ধন' বাক্যাংশটি আমরা প্রতীক হিসাবে নিয়েছি—সুষমা, সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার পূর্ণ অভিব্যক্তি হিসাবে।

•

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা পুরসভা

রায়গঞ্জ পৌরসভার সৌজন্যে

"এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* সাক্ষরতা আন্দোলনে সামিল হোন *

দীনদয়াল কল্যাণী
উপ-পৌরপতি
রায়গঞ্জ পৌরসভা

মোহিত সেনগুপ্ত
পৌরপতি
রায়গঞ্জ পৌরসভা

বাঙালি পাঠকের অহংকার আমাদের বই

বিলুপ্ত জনপদ ঃ প্রচলিত কাহিনী

দীপংকর লাহিড়ী

দাম ঃ ৭৫ টাকা

নথিভুক্ত ইতিহাসের আগে বিক্ষিপ্ত প্রত্নিদর্শন ও প্রচলিত কাহিনীতে কি সভ্যতার কোনও প্রস্তুতিপর্ব ছিল? তারই বিশ্লেষণী আলোচনা।

*

স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

দাম ঃ ৫০ টাকা

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীকালের মধ্যে সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালিভাষাজ্ঞ ও পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ববিদদের একশতজনের জীবনী।

*

সাহিত্য সংসদ ॥ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলকাতা-৯
ফোন ঃ ৩৫০৭৬৬৯/৩১১৫

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও

সার্বিক গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে

অঙ্গীকারবদ্ধ

১২নং বরুয়া গ্রামপঞ্চায়েত

রায়গঞ্জ ॥ উত্তর দিনাজপুর

কয়েকটি গল্প সংকলন

ম্যাক্সিম গোর্কি

শ্রেষ্ঠ গল্প ৩৬·০০

লেভ তলস্তয়

গল্প সংকলন ৩৫·০০

সোমনাথ লাহিড়ী

কলিযুগের গল্প ২৫·০০

বিমল মিত্র

হলুদ ফুল ৪২·০০

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

পরিচয়

জুলাই–অক্টোবর ১৯৯৪, শ্রাবণ–আশ্বিন ১৪০১
৬৪ বর্ষ ১–৪ সংখ্যা

কবিতাগুচ্ছ—২

সিদ্ধেশ্বর সেন কৃষ্ণ ধর সুনীলকুমার নন্দী পূর্ণেন্দু পত্রী তরুণ সান্যাল শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মণিভূষণ ভট্টাচার্য পবিত্র মুখোপাধ্যায় কমলেশ সেন ভাস্কর চক্রবর্তী রত্নেশ্বর হাজরা গণেশ বসু অমিতাভ দাশগুপ্ত ২০৯—২২৬

কবিতাগুচ্ছ—৩

বাসুদেব দেব প্রকাশ কর্মকার প্রণব চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দ ভট্টাচার্য তুলসী মুখোপাধ্যায় শুভ বসু জিয়াদ আলি সুরজিৎ ঘোষ কালীকৃষ্ণ গুহ নারায়ণ ভট্টাচার্য রাণা চট্টোপাধ্যায় অনন্ত দাশ নন্দদুলাল আচার্য নীরদ রায় ব্রত চক্রবর্তী কৃষ্ণা বসু অমরেশ বিশ্বাস শ্যামল সেন চৈতালী চট্টোপাধ্যায় অসিত চক্রবর্তী নমিতা চৌধুরী প্রদীপচন্দ্র বসু বিকাশ গায়েন সুব্রত রুদ্র বাহারউদ্দীন নন্দিতা চৌধুরী ঋজুরেখ চক্রবর্তী সুজিত সরকার জীবেশ দাস সলিল ভট্টাচার্য শ্যামল জানা নাসের হোসেন তাপস রায় সুমন গুণ তুষার চৌধুরী সব্যসাচী সরকার—২৬০—২৮৩

প্রচ্ছদ : দীপ্ত দাশগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

P,5574

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শুভ বসু অমিয় ধর (আমন্ত্রিত সদস্য)

উপদেশকমণ্ডলী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

আশীর্বাদ

শ্রীমান কিশোরবাবু

নবীন আগন্তুক

নব-যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক;
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি।
জীবন-রঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নর দেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমর লোকের কী গান এসেছ শুনে।
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামতরে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
রক্ত-প্লাবনে পঙ্কিল পথে বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ শান্তির বাঁধ বেঁধে।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম আমরা বেড়াই খুঁজি
আগামী প্রাতের শুকতারা সম নেপথ্যে আছে বুঝি,
মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো এই বুঝি দিল আনি॥

৩০/৭/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

([illegible] দেবীর দৌহিত্র ও [illegible] সৌজন্যে [illegible]॥)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি হেমন্তবালা দেবী

শ্রীশ্রীহরি

শনিবার মধ্যাহ্ন

শ্রীচরণেষু— আমার মনের দুঃখ দূরে করবার জন্যে ভগবান ঐ জানালাটি দিয়েছেন। ঐ কোনায় মুক্তোর রংএর উজ্জ্বল একখণ্ড মেঘ হিমালয়ের মত আকৃতি, সবুজ গাছগুলির মাথার ওপর শুভ্রদীপ্ত মুকুটের মত। তার মাথায় এক খণ্ড আকাশ, যেন নীলা পাথরের টুকরো। ঐ গাছেতে, মেঘেতে, আকাশেতে মিলে কি এক সুন্দর দেশের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে—দার্জ্জিলিং দেখতে ইচ্ছে করছে। ....আপনি অভিযোগ এনেছেন, আমার লেখায় প্রাদেশিকতা সংস্কার, ইত্যাদি। আপনাকে ক্ষেপাতে আমার ভারি মজা লাগে, ওটা আমার স্বভাবদোষ। আপনি কিছুতেই তো ক্ষেপেন না। আমার মা হ'লে কেঁদে কেটে অনর্থ করতেন। আসল কথা, আমি বন্য। জঙ্গলে বাস করি। আমার আশপাশে যদি কিছু পাই, কুড়িয়ে বাড়িয়ে এনে দিই, বেছে দেওয়া আমার কাজ নয়। আপনি ঘাস আগাছা বেছে ফেলে খাদ্য শাকপাতা তুলে নেবেন। আমি খনি থেকে মণি এনে দিই, মাটি পাথর-মেশানো, আপনি তাকে যেমন করে পারেন, বেছে নেবেন, নির্ম্মল করে নেবেন, ঘসেমেজে, খোদাই করে, পালিশ করে নেবেন। আমি এনে দিয়েই খালাস। আমরা বুনো, ঐ ঘাসপাতা শাক সবই খাই, ঐ যেমন তেমন পাথরই পরি, সাফ সুতরো করে নিতে জানি না। আপনি প্রাদেশিক পদার্থকে সর্ব্বদেশের করে নিন না কেন? আর দেবতার নামগুলি কি, বলুন দেখি? এক একটা বিশেষণ। আপনার নাম রাখবার সময় মাতাপিতা নিশ্চয়ই জানতেন না যে এই পুরুষসূর্য্য পৃথিবীর ইন্দ্র হয়ে একে শাসনপোষণ করবেন, ঠাকুর হয়ে এর পুজো নেবেন। কিন্তু, একদিক দিয়ে হ'ল তো তাই। কিন্তু দেবতাদের নামকরণের সময় জ্যোতিষীরা অগেই জানতেন যে, এ'দের কে কিজন্যে এসেছেন, কাজেই সেই ভাবেই সব নামকরণ করা হয়েছিল। বিশেষণগুলির অনুবাদ সব ভাষাতেই হয়। মানবাকৃতি সকল দেশেই এক। যীশুখৃষ্ট, রবীন্দ্রনাথ, পরমহংসদেব, এ'দের আকৃতি এক না হ'লেও কেমন যেন একটু সাদৃশ্য আসে। যাক গে, আফিমের মাত্রা চড়লো নাকি?—এইখানেই ইতি।

প্রণাম নেবেন।

সেবিকা

পত্র-পরিচিতি

রবীন্দ্র-জীবনের প্রথম পর্বে ছিন্নপত্রাবলীর পাতায় পাতায় ধরা পড়েছে তরুণ রবির অন্তরঙ্গ মানসিকতার প্রতিবিম্ব। নিজের মনকে অত্যন্ত আগ্রহে আবেগে তিনি খুলে ধরেছিলেন ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রাবলীতে। দীর্ঘ জীবনের পরিক্রমণ শেষে প্রবীণ কবি বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্মনের নানা সংঘাত ক্ষুব্ধ বাস্তবতায় যখন হলেন গভীরভাবে অন্তর্মুখী নির্জন এক মানুষ, তখন আকস্মিকভাবে রক্ষণশীল অন্তঃপুরের অভিজাত এক মহিলা অসীম সাহসে আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে চিঠির পর চিঠি লিখে, নিজের সরল ভক্তি, বিশ্বাস ও কৌতূহলপূর্ণ অনুসন্ধানে তাঁকে ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। ফলে ঠিক প্রথম পর্বের ছিন্নপত্রাবলীর কাব্যময় জীবন দর্শনের যেন সম্পূরক গ্রন্থ রূপে আমরা পেলাম গভীর জীবন বোধ নিজস্ব ধর্মভাবনা ও অন্তরঙ্গ আলাপ সমৃদ্ধ চিঠিপত্র নবম খণ্ডটি। দীর্ঘ দশবছরে অসংখ্য পত্রের আদান প্রদানে হেমন্তবালাদেবী চৌধুরানী কবির সঙ্গে নিজের বৈষম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও যেন এক সমতলে স্থান পেয়ে তাঁর পত্রবান্ধবীর মর্যাদা আদায় করতে পেরে ছিলেন। কবিকে চিঠি ছাড়াও তিনি কবিতা, গান, প্রবন্ধ, ছড়া, ও রূপকথা লিখে পাঠাতেন। কবিকে চিঠি লিখতেন 'জোনাকী' ছদ্মনামে, অবশ্যই কিছুদিন পরই নিজের পরিচয় দান করেছিলেন। তাঁর লেখা কবিতা 'ব্যর্থ' বিচিত্রায় 'জোনাকী' ছদ্মনামেই প্রকাশ করেন কবি স্বয়ং। হেমন্তবালা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে কবি লিখেছিলেন 'অপূর্ণ' কবিতাটি। দিয়েছিলেন 'নীহারিকা' কবিতা এবং দৌহিত্রের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ জানিয়ে লিখছিলেন 'নবজাতক' কবিতা। শ্রদ্ধেয় মনীন্দ্র রায়ের আগ্রহে 'নবজাতক' ও কবিকে লেখা হেমন্তবালা দেবীর একটি পত্র প্রকাশিত হ'ল। ১৪০১ সালের ২৪ কার্তিক তাঁর জন্মশত বর্ষ পূর্তিতে আমার সেই প্রাণবন্ত হৃদয়বতী ও বুদ্ধিমতী মাতামহীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মণীন্দ্র রায় ও পরিচয় সম্পাদককে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কবির লেখা কবিতাটি বাসন্তী বাগচীর সৌজন্যে এবং হেমন্তবালাদেবীর লেখা পত্র প্রকাশের জন্য শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনের প্রয়াত সনৎ বাগচীর সহায়তার কথা স্মরণ করি।

জয়ন্তী সান্যাল

রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরচনার কলাপদ্ধতিতে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের প্রভাব কোথাও কোথাও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় বলে অনেকে এমন মত প্রকাশ করেন যে রবীন্দ্রনাথের যে গান গুলি বর্তমানে 'উচ্চাঙ্গের গান'—এই মত নামকরণে পরিচিতি লাভ করেছে, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের কয়েকটি অবশিষ্ট এবং সুবিদিত হিন্দী গানকে বাংলায় অনুকৃত করা মাত্র। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের বহু গানেই, বিশেষতঃ তাঁর ব্রহ্ম সঙ্গীত পর্যায়ভুক্ত গানগুলিতে এবং অন্যান্য ধারার গানের মধ্যেও বহু হিন্দী ক্ল্যাসিক্যাল গানের সুর ও ছন্দ যে পরিলক্ষিত হয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার ঐতিহাসিক তথ্য যাঁরা অবগত আছেন, তাঁরা জানেন যে বাল্যবয়স হতেই তাঁদের বাড়ি ছিল তৎকালীন বড় বড় ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়েদের মিলনের স্থান। তাঁর অসাধারণ অনুভূতি প্রবণ ও রসপিপাসু মন এই অবিরত এবং বিপুল সঙ্গীতচর্চার আবহাওয়ায় আপনার উন্মেষকালীন প্রতিভাকে রূপ পরিগ্রহ করতে দেখছিল। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় যে তাঁর প্রথম অধ্যায়ের গানগুলির সুরতাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মার্গ-সঙ্গীতানুসারী। কোথাও কোথাও বাংলার তৎকালীন প্রচলিত গানের প্রভাবও পাওয়া যায়। কিন্তু কি তাঁর প্রথম বয়সের রচিত গানগুলি, কি পরবর্তী অধ্যায়ের গানগুলি—সর্বক্ষেত্রেই যে বিষয়টি সন্দেহাতীত রূপে ধরা পড়ে তা 'হল' রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঐতিহ্য ভাণ্ডার থেকে রাগ রাগিণী ছন্দ ও তালের মাল মশলা নিয়ে সেগুলিকে আশ্চর্যভাবে এক সম্পূর্ণ নবীনরসের নবসৃষ্টির প্রয়োজনে গেঁথেছেন। এ যেন পুরনো বাড়ির ভিতের বুনিয়াদকে ব্যবহার করে এমন এক নূতন গৃহ রচনা, যার ভঙ্গী অবয়বের দিকে চেয়ে কারোই মনে পড়ে না যে ভিতটি তার সহস্র বছরের ঐতিহ্য জড়িত।

এখন কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি আমার মতামতটি পরিস্ফুট করতে। প্রথম গানটির কথাগুলি হল 'সুধাসাগর তীরে এসেছে নরনারী'। —এই গানখানি একটি হিন্দী গানের প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

উক্ত গানের গায়কী কানাড়া রাগ ও ধামার তালে রচনা করলেও রসের প্রকাশ রূপ ফুটেছে সম্পূর্ণ অন্যতর। এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটি শ্রবণে যে হৃদয়ভাব জাগে তা শান্ত এবং সমাহিত আনন্দের। এর মধ্যে মূল হিন্দী গানের (বিষয়-বস্তুর) উচ্ছ্বল প্রাণরস ততটা নেই, যতটা। আছে এক গম্ভীর সংযত সুষমা। এই গানের একটি স্বকীয়তা আছে যা সুর তাল ও ভাষার পরস্পরের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে মিলে মিশে একটি অখণ্ড সৃষ্টি হয়ে ফুটে উঠেছে। মার্গ সঙ্গীতের প্রধান রাগ প্রকাশ পায় সুরে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং কাব্যকে তিনি সঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। সঙ্গীতে তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে হৃদয়মনের এক অর্ধনারীশ্বর দেবতা। সমগ্র সত্তাকে তা অধিকার করে থাকে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার বিচারে প্রবৃত্ত হলে একটি নির্ভুল নির্দেশ আবিষ্কার করা সম্ভব।

ধামার—মূল হিন্দী গান—'আয়ো ফাগুনে'—বসন্তের হোরিতে রং খেলার গান। হোরিগানও ধ্রুপদের অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসবের গান, ধ্রুপদের রাগে ও কেবল ধামার তালেই গীত হয়, সুতরাং এটি ধ্রুপদাঙ্গীয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীত—'সুধাসাগর তীরে'—আনুষ্ঠানিক সংগীত, ধর্ম বা বিবাহ বাসরে গীতোপযোগী।

ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ—এই 'ধ্রুবপদ' বা 'ধ্রুপদ' কথাটির মধ্যেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্য নিহিত আছে। ধ্রুপদ শব্দটির ভাষাগত অর্থ হল ধ্রু অর্থে ধ্রুব বা সত্য আর পদ অর্থে চরণ বা সঙ্গীতের পরিভাষায় যাকে বলে 'তুক' বা কলি। এর অর্থ ধ্রুপদে সুরের রচনাবলীও রাগরূপের প্রতিটি পদক্ষেপ সংগীত সাধনায় পরম সত্যের সন্ধান দেয়। এই সঙ্গীতের অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিতের উত্থান পতন মুনি ঋষিদের ভাবগম্ভীর মন্ত্রধ্বনির ন্যায় উচ্চারিত হয়ে পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। তাঁরা এই সংগীতকে ঈশ্বর আরাধনার অবলম্বনরূপে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে এই বিশিষ্ট সংগীত বিভিন্ন ধারার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এর মূল বা আদি চরিত্র রক্ষা করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

......'আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ—পদ্ধতির রাগ-রাগিনীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ সহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাকবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে

আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে। সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি —একথা যারা জানে না, তারাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত জানে না।······

'আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত। তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি —একদিকে তার বিস্তীর্ণ বিপুল গভীরতা আর একদিকে তার আত্মদমন। সু-সংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করে সে চলে। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আরও বিস্তীর্ণ হোক, আরও বহুকক্ষ বিশিষ্ট হোক। তার ভিত্তি সীমার মধ্যে বহুবৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা দিগ্বিজয়ী হবে।"

খেয়াল—এটি পারসীক শব্দ, এর অর্থ দুর্বাসনা বা যথেচ্ছাচার। রবীন্দ্র-সংগীতে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত সুর ব্যবহারই কবির নির্দেশ বা মত। তাই এক্ষেত্রে যেহেতু শিল্পীর স্বাধীনতা বা যথোচ্ছাচারের সুযোগ নেই, সেই জন্য শুধু মূল খেয়াল গানের মূল কথার অংশের, অর্থাৎ শুধু অস্থায়ী এবং অন্তরার সুরে কবি তাঁর গান রচনা করেছেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আরও দুটি তুক্, সঞ্চার ও আভোগ যোগ করে সেই গানকে ধ্রুপদাঙ্গে পরিণত করেছেন। যেমন মালকোষের 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'

টপ্পা—এটি হিন্দী শব্দ, এর আদি অর্থ লম্ফ। সেই থেকে এর রূঢ়ার্থ সংক্ষেপ। গানের ক্ষেত্রে এই সংক্ষেপ অর্থই ব্যবহার হয়েছে, যেহেতু ইহা ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা সংক্ষেপতর। এতেও মাত্র দুটি তুক্ প্রচলিত। বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই টপ্পা গানের প্রচলন। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ অপেক্ষা খাঁটি টপ্পা গান সংখ্যায় যদিও কম রচনা করেছেন, তবুও টপ্পার অলঙ্করণ তাঁর বহু গানে ব্যবহার করেছেন।

তান ও আলাপ—প্রতিটি রবীন্দ্র সংগীত কবির স্বয়ং সংযোজিত সুরে ও তালে এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সৃষ্টি। এগুলি মার্গ সংগীতের অনুকরণে রাগ-রাগিনী-সর্বস্ব নয়। এগুলির প্রত্যেকটি কথা, সুর ও ছন্দে বিবৃত এক একটি স্থাপত্য। এখানে গানই প্রধান, রাগরাগিনী নয়। এ গুলির অবয়বে যতটুকু আলাপ বা তানের প্রয়োগ তা কবি নিজেই গানের আঙ্গিকে যোগ করেছেন। সাধারণভাবে শিল্পীর নিজস্ব তানালাপ যোগ করার স্বাধীনতা নেই। কবি তাঁর যে গানে যতটুকু তান বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলাপের আশ্রয় নিয়েছেন, সেটা নিছক ভাব-বিন্যাসের উদ্দেশ্যে। মার্গ সংগীত-প্রচলিত রাগ-রাগিনীর আলাপ বা তানের জন্যে নয়। শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি,

বলেছেন—"তুমি বলবে আমাদের দেশের গানের বৈশিষ্টই তাই—গায়কের রুচি ও শক্তিকে সে দরাজ জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সর্বত্র একথা খাটে না। খাটে কোথায়? যেখানে গানের চেয়ে রাগিনীই প্রধান।''—"তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে গাইবে? আমিও নিজের রচনাকে সে-রকমভাবে খণ্ড বিখণ্ড করতে অনুমতি দিই নি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপসৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই, তার অন্য নিয়ম। হিন্দুস্থানী সংগীতকার তাদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে—এটা চেয়েছিলেন। তাই দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা গেয়ে গেলে সেটা নেড়া নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ দবরারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদা মাটা ভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখিনি, যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।" (সংগীত ও কবিতা)

কীর্ত্তন—আখর—হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীতে গায়ক যেমন সুরের পর সুরে বিস্তারে, মিড়ের পর মিড় টেনে ছাড়া পান তেমনি কীর্ত্তনে কীর্ত্তনীয়া সৃষ্টির সুযোগ পান আখরে। এ পদ্ধতি জগতের অন্য কোথাও নেই। হিন্দুস্থানী সংগীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই। সংগীতের সুর বৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে। সেটাই উপভোগ করি। কিন্তু কীর্ত্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই নানা আখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আখর অর্থাৎ বাক্যের তান অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মত কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে। এই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সংগীত—সম্মিলিত কাব্য। সংগীতই তাকে সেই আবেগ-বেগের তীব্রতা দিয়েছে। যাতে করে নূতন আখর তার থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে। গীতহীন কাব্য স্তব্ধ। এই আখরকে কবিগুরু বলেছেন 'কথার তান'। সুরের পর সুর দিয়ে যেমন শিল্পী রাগ রাগিনীর রূপ ফোটান, তেমনি কথার পর কথা যোগ করে কীর্ত্তনী গানের ভাব ফুটিয়ে তোলেন। (স্মরণীয় 'আমি শ্রাবন আকাশে' ঐ গানের কবিকৃত আখর)

বাউল—বাউলদের গানে কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু ভাবের গভীরতায় সুরের দরদে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরমধ্যে যেমন একদিকে জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা তেমনি আছে ভক্তিরস। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় না বলে সাহিত্য ভাণ্ডারে এ এক মহামূল্যবান সম্পদ।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরপরিকল্পনার বিশেষ দিক ॥

এইবারে সত্যিকারের রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে আসা গেল। আমার খুবই সৌভাগ্য যে কবি যখন তাঁর জীবনসন্ধ্যায় শেষ পরিণতিতে পৌঁছে তাঁর উৎকৃষ্টতম এবং সুন্দরতম গানগুলির—যে গানগুলিকে আমি বলব সত্যিকার বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-সংগীত, এবং যেগুলিকে কবি নিজেও এক সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর 'আধুনিক সংগীত' নামকরণের প্রস্তাব করেছিলেন—সেই গানগুলি রচনায় প্রবৃত্ত—তখন একই কালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে কবি ও সুরকার রূপে খুব ঘনিষ্টভাবে দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। তখন তাঁর সংগীত রচনার পদ্ধতি দেখতে দেখতে লক্ষ্য করতাম কত দরদ দিয়ে তিনি গান রচনায় কতই আনন্দ পেতেন। গানের পর গান রচনা করেছেন একই দিনে, আর ঐ রচনায় কত পরীক্ষা কত গ্রহণ বর্জন—প্রতিটি সংগীতের ভাব বিকাশের জন্য।

রবীন্দ্রসংগীত বাঙালীর হৃদয়মন্থন করা অমৃত। এই সংগীতসুধা যাতে প্রত্যেকটি হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে, তারজন্য গানের বিষয়বৈচিত্র্য এনেছেন। গানে বিভিন্ন Mood এর প্রকাশ। উৎসব অনুষ্ঠানের গান, দিনের বিভিন্ন সময়ের উপযোগী গান, তিনি বিভিন্ন ঋতুর গান সৃষ্টি করেছেন। গান রচনা করতে গিয়ে তিনি গানকে শাস্ত্রানুগ সংগীতের শৃঙ্খল মোচন করে তাকে ভাবলোকে মুক্তি দিয়েছেন। গানের কথার ভাব সুরে প্রকাশ করতে গিয়ে কবি ভাবপ্রকাশের গভীরতার প্রয়োজনে একই গানে একাধিক বিপরীত রাগ ব্যবহার করেছেন অতি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে। যেমন—আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, এই ছোট গানটিতে অতি আশ্চর্যরূপে চারটি রাগিনী আত্মগোপন করে আছে। ললিত, বিভাস, রামকেলী ও আশাবরী। গাইবার কালে এতগুলি রাগ যে এই গানটিতে লুকিয়ে আছে তা একেবারেই মনে হয় না। এটি একটি সার্থক সৃষ্টি। যিনি চিরকাল ধ্রুপদ রীতিবদ্ধ গানে অভ্যস্ত তিনি ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে চারটি তুকের সুর পরিকল্পনায় চিরাচরিত নিয়ম ভাঙতেও কুণ্ঠিত হন নি। যেমন, চিনিলে না আমারে কি—এই গানটির সঞ্চারী অংশের সুর পরিকল্পনায় সুর তার সপ্তকে ছড়িয়ে ভাবপ্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নূতন ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন, তারজন্য তাঁর পাঠকরা তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে ওস্তাদ মহলে ঠিক তার বিপরীত প্রতি-ক্রিয়া হওয়াতে একই সঙ্গে দুঃখ ও বিস্ময়বোধ করেছেন। 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা পাই—"…ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও

দ্রুত বা বিলম্বিত করা আবশ্যক। সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নহে।··ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর ও তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া রাখা আবশ্যক—নইলে তাহারা ভাবকে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া রাখে।” —কাব্যে ছন্দের যে কাজ গানে তালের সেই কাজ, অতএব ছন্দ যে নিয়মে সংযোজনা—খেয়াল—লাগি মোরে ঠুমক, ভেঙ্গে কবি সৃষ্টি করেছেন আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। মামুলী আলাপ ও তান যা খেয়ালের বৈশিষ্ট্য এ গানে কবি তা বর্জন করেছেন। উপরন্তু অস্থায়ী ও অন্তরার পরও আরও দুটি তুক্ (সঞ্চারী ও আভোগ) যোগ করে স্বকীয়তা আনয়ন করেছেন। টপ্পা—হিন্দুস্থানী টপ্পা গানের জমজমা তান আরও সরলীকৃত হয়েছে বাঙালী গায়কদের কণ্ঠে। 'রবীন্দ্রনাথের টপ্পারীতির' গানে তারচেয়েও বিশিষ্ট তর / তম রূপ ফুটেছে। যেমন ও মিঞারে জানোয়ালে, তারপর বাংলা টপ্পা যে যাতনা যতনে এবং 'এ পরবাসে রবে কে' রবীন্দ্রসঙ্গীত, এই তিনরূপ লক্ষ্য করলেই এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ব্যবহারের স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায় 'কোথাও যে উধাও হল' গানটিতে। 'দিকে দিগন্তে জলধারা'—ও 'অশান্ত' এই অংশের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তান প্রয়োগের যথার্থ নিদর্শন এই দুটি। উধাও হয়ে যাওয়া মনের ব্যাকুলতা ও জলধারার চঞ্চল বিস্তার তানের প্রয়োগে যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা অপূর্ব্ব। এই প্রসঙ্গে শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে উদিল গানটির কথা বলা যায়। 'পূর্ব্ব গগনে' ও 'শুকতারা' এই দুটি কথা নিয়ে তান বিস্তারে ভাবেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। রাতের পালা শেষ হবে দিনের পালা শুরু। জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মীড় তুলে এখনই যেন অশান্ত সুরের ঝঙ্কারে বেজে উঠবে। কবির নিজস্ব রসানুভূতির দ্বারা সৃষ্ট তান ও বিস্তার মামুলী ছকে বাঁধা নয়, তাই সার্থক রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে গানটির স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ নিজেই। বর্তমানে বহু ব্যবহৃত এই গানটির গীতরূপটির প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এই গানটিতে প্রায় সবক্ষেত্রে সুরের টানে গানের কথাগুলি এমনিভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে তাতে (বাক্ছন্দের) কথায় স্বাভাবিক গতিই বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে কথার অর্থ গ্রহণই কঠিন হয়ে পড়েছে। অধুনা জনপ্রিয়—'আমার পরাণ যাহা চায়' গানটি দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে রেকর্ডে ধৃত—তা শুনলেই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

[১৯৬৮ সালেই খুব সম্ভব, শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয় গীতবিতান সঙ্গীতায়নে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাঙ্গা গান সম্পর্কে একটি বিশেষ

অনুষ্ঠান করেছিলেন। উদাহরণ সহযোগে বিশদভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি দিনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গীতকটি রেকর্ড করে নিয়েছিলেন আমাদের সংগ্রহ থেকে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের বিশেষ গায়ন পদ্ধতিটি শিষ্য সমাজে পরিচিত করানো। ঘরোয়া সেই অনুষ্ঠানে সু-বিশ্লেষিত গ্রন্থনার সাহায্যে আশীষ ভট্টাচার্য, এনাক্ষী মুখোপাধ্যায় চট্টো (.?), ঊর্মিলা ঘোষ প্রভৃতি ছাত্র ছাত্রীরা তাঁর বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করেছিলেন সঙ্গীত পরিবেশন করে। রবীন্দ্রনাথের হিন্দী ভাঙা গান বিষয়ে তাঁর লেখা এই রচনাটি শৈলজাদা সেই সময়ে দিয়েছিলেন আমাকে। ঐ সঙ্গে আরও দুটি লেখাও দিয়েছিলেন। যার একটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'রক্ত করবী' পত্রিকায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি কবির কাছে যেমনভাবে শুনেছেন, শিখেছেন, সেই ভাবেই, বিশুদ্ধ রীতিতে প্রচার করাই ছিল শৈলজাদার ধ্যানজ্ঞান। দুঃখ করতেন এই বলে আমার পিছনে তো কোন বড় পত্রিকাগোষ্ঠী নেই—আমার অভিজ্ঞতা আমার যা বলবার আছে, তার প্রচার তাই সম্ভব হবে না কোনোদিন। তোমরা যদি চেষ্টা কর তো হয়তো সম্ভব হবে। শিল্পীমহলে আজ যে অহং সর্ব্বস্বতা শিল্পবোধকেই ধ্বংস করছে, সেই যুগে শৈলজারঞ্জন তাঁর স্বার্থবোধ ও 'আমিত্বকে' বিসর্জন দিয়ে শুধু কবির সান্নিধ্যের স্মৃতি, সঙ্গীত শিক্ষাদান ও চর্চায় দিন কাটাতেন অনেকের মতই এ আমি দেখেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মতামত সুগ্রথিত করার ভার তিনি দিয়েছিলেন আমার ওপর—যা সঙ্কলিত হয়েছে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাবনা' গ্রন্থে (প্রকাশক-রবিরঞ্জনী, পরিবেশক দে বুক স্টোরস্)। এটা আমার পরম সৌভাগ্য।

এই রচনাটিও সাধ্যমত সম্পাদন করেছি প্রয়োজনানুসারেই।]

জয়ন্তী সান্যাল

চিত্তপ্রসাদের চিঠি ও ছড়া

১

৩০ মে '৫২

আন্ধেরি

ভাই মুরারি-দা,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে criminally দেরি করে ফেললাম এবারও। কিন্তু তুমিই বা কেমন ছেলে বাপু, আমার দেরি হোলে তুমিও চুপটি করে থাকবে?

প্রথম খবর—CR-এ আবার কাজ শুরু করেছি মাস দেড়েক হতে চলল। গোবিন্দ একদিন কাঁচুমাচু মুখ করে ঢোক গিলে বললে, CR-এর ওরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ইত্যাদি। আমিও দেখলাম যে বাইরের লোকের ধারণা আমি নাকি পার্টি-বিরোধী প্রকারান্তরে, তাই নাকি CR-এ কাজ করি না, এটা ঘোচানো দরকার। তা ছাড়া কাগজটি এখন Officially পার্টির মুখপত্র। আমার মতামতের ওপর কেউ "হস্তক্ষেপ" করবেন না, তথা কথিত unity রক্ষার জন্যে—এটাই অকথিত বাণী হিসেবে এখনকার পার্টি নেতৃত্বের "নীতি আর সেই অনুসারে আমায় অপরের এবং অপরের আমার কেঁচো খুঁড়তে হবে না"—অন্তত অপরে সেই ভরসায় আছে। আমি জানি CR-এ কাজ করলে আমার যে 'অধিকার' বর্তাবে তা নিয়ে আমার সমালোচনার 'দাম' হবে। তারপর শত্রু হাসিয়ে তো লাভ নেই। বন্ধুদের confuse করেও বহু ক্ষতি। বিদেশেও নাকি কথা হয়েছে CR-এ কাজ করি না বলে। BTR-এর অনুচরদের কল্যাণে রটেছে যে আমার CR ছাড়ার মধ্যে Joshite দলাদলির প্রমাণ স্পষ্ট। এবং এই সূত্র ধরে বহু বন্ধুজনের ধারণা আমি পার্টি থেকে বেরিয়ে গেছি। —এসব মিলিয়ে CR-এ ফিরে যাওয়ায় হিত আছে বলা যায়। নিজের মতামত নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা যদি করি কর্মক্ষেত্রে তবেই opportunism হবে না। স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করবার সুযোগ বেড়ে গেল তাই আমার পক্ষে বড়ো লাভ বলে আমি জানি।

টাকা পয়সার দিক থেকে যা জুটবে তাতে সুখ বা স্বস্তি কোনোটাই জোটানো যাবে না। নেতারা ঠিক করেছেন মাসে ৭৫ টাকা এর বেশি দেবেন না। এ প্রস্তাব আমার কাছে তুলতেও CR-এর সহকর্মীদের লজ্জা করছিল। দাবী

করেছি ১৫০৲, আগে পেতাম ২০০৲। মেরে কেটে বোধহয় ১০০৲ অবধি উঠবে। খাটুনী যাবে হপ্তায় অন্তত ৪টে দিন। এর মধ্যে যে অবিচার আছে তার মূলে দলাদলি নয়, কৃষক-নেতাদের স্বাভাবিক গেঁয়ো চরিত্র। বুঝিয়ে বলছি।

CR এবার থেকে মাদ্রাজ থেকে বেরুবে শুনেছ কিনা জানি না। দক্ষিণ ভারতে পার্টির অসামান্য জনপ্রিয়তার জন্যেই শুধু CR নয় PHQ-ও মাদ্রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় নেতাদের দাবীতে। এখন এর মধ্যে যেটা স্পষ্ট সেটা এই যে দক্ষিণ ভারতের পার্টি চাষী প্রধান এবং সেখানকার নেতারাও শ্রমিক আন্দোলনের চেয়ে কৃষক আন্দোলনেরই বড়ো নেতা। যদিও সারা ভারতেরই মূল সমস্যা কৃষি সমস্যা তবুও সব সমস্যা সমাধানেরই নেতৃত্ব শ্রমিক নেতৃত্বেই সফল হ'তে পারে- এই হোলো পার্টির শিক্ষা এবং মূল নীতি। কিন্তু BTR-এর পর থেকেই নেতৃত্বের মগজে কৃষক নেতৃত্বকেই এদেশের মুক্তি আন্দোলনের চরম ভার দেবার ভ্রান্ত যুক্তি চেপে বসেছে, সেই যুক্তিই আজ জেঁকে বসল। এটা যে কতোদূরে অন্ধ তা বুঝতে পারবে এই থেকে যে, বম্বের মতো শ্রমিক প্রধান —মানে এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র আজ পার্টি নেতৃত্বের কাছে অবহেলার বস্তু হয়ে গেছে। বম্বেকে এখন ডাঙ্গে—বিটি'র র দলাদলির হাতে সমর্পণ করে দেওয়া হল। এমনকি একখানা পার্টি মুখপত্র অবধি রইলো না। কংগ্রেস তথা সোশ্যালিস্টদের পোয়া বারো তেরো। আর অন্য দিকে প্রতি মুহূর্তে এখন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান শিল্প কেন্দ্র আমেরিকান রাহু-গ্রাসে হু হু করে ডুবছে। ওদিকে এদেশের শ্রমিক-তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সেরা ঐতিহ্য এই বম্বের তার মূল্য রইলো না আমাদের নেতৃত্বে। অবাক হবে শুনলে যে CR-এর জন্যে আজো কোনো corres···

২

২৮ আগস্ট '৫২
আন্ধেরি

'ভাই মুরারিদা'

তোমার পোস্টকার্ড পেয়েছি তাও হপ্তাখানেক হতে চলল তার আগের চিঠি-খানির কথা না হয় নাই তুললাম। কি হয় আমার জানো, মুরারিদা? ভালো করে অনেক কথা লিখবো এই আশায় অবসরের অপেক্ষা করতে থাকি, আর তাতেই দেরি হতে থাকে। তোমার কথা, মানে, তোমায় চিঠি দিতে দেরি করে ফেলছি এই

কথা বলছিলাম সমরদাকে আর তারই দুদিনের মধ্যে তোমার পোস্টকার্ড এলো এবার। আগে আরো দুচারবার এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, টেলিপ্যাথি বলে ব্যাপারটাকে গাঁজা বলে উড়িয়ে দিতে চাও ?

শোনো মুরারিদা, সেপ্টেম্বরে যে ছুটি নিচ্ছ তার দেড় মাসের মধ্যে একটা মাসই যদি কলকাতায় কাটিয়ে আসো আগে তো এখানে কি শুধু এক হপ্তার জন্যে আসবে ? পথে যাতায়াতে কলকাতা যাওয়া ইত্যাদি ধরে হপ্তাখানেক যাবে, কাজেই এখানে হপ্তা দেড়েকের বেশি কাটাবে না। ও চলবেনা, কলকাতায় দিন দশেকের বেশি কী করবে ? আমরা এখানেই থাকবো। ওসময় মানে Sept, Oct খুকুদের সব কী সব "গুরুতর" পরীক্ষাদি থাকে কাজেই বৌদি ঐ দুরন্ত গরম আর পরে বর্ষা মাথায় করে চাটগাঁ ঘুরে এলেন। তুমি এখানে মাসখানেক অন্তত কাটাবে এই হিসেব করে এসো। তুমি এলে চেষ্টা করা যাবে দুএকদিনের মেয়াদে কাছাকাছি কোথাও—কার্লা কেভ্‌স্‌ (দেখেছ ?) বা এইরকম কোথাও ছবি আঁকা cum পিক্‌নিক্‌ করতে যাওয়া যাবে। জানোইতো বর্ষার পর এসব অঞ্চল কী চমৎকার আর pleasant হয়। মোদ্দা কথা ওসব "Oct-র 3rd week-এ" শুধু দুবেলার জন্যে plan করে আসলে চলবে না। মুরারিদা, অন্তত Oct-র 1st week-এ এখানে তোমার পৌঁছন চাইই চাই, বুঝলে ?

তোমার আগের চিঠির উত্তর এবারও গুছিয়ে লিখতে পারবো না হয়তো। CR-এর কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছি, দেড়শো মাসে পগার পাচ্ছি। খাটুনী তেমন কিছুই নয় তবে সময় বা মন আর কোনো কাজে দেবার পক্ষে এখনো সামলে উঠতে পারিনি। লিনো-কাটের মস্ত মস্ত সব প্ল্যান মাথায় আছে কিন্তু তার জন্যে একটানা study ইত্যাদি যা একান্ত দরকার তার কিছুই করে উঠতে পারিনি আজো। ওদিকে WFTU-র পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক আমার কাজ চেয়ে পাঠিয়েছেন দুমাস হয়ে গেল, তোমায় সেখবর লিখেছিলাম কি ? আজো সেখানে কিছুই পাঠাতে পারিনি, মানে তৈরি করে উঠতেই পারিনি। তারপর পিকিং-এ কিছু লাল-সেলামী বা শান্তি-সেলামী পাঠাবার সাধ ছিলো তাও হয়ে উঠছে না। —এক হপ্তার CR-এর কাজ পাঠানোর পর দম নিতে না নিতেই আরেক হপ্তা এসে পড়ে। যতো তাড়াহুড়োই করি না কেন, নিজের মতঃপুত না হলে পাঠানো যায় না। বেশির ভাগ ছবিই শেষ অবধি রাত জেগে তবে খাড়া করতে পারি।

এতো করেও—মানে আমার কাজটুকু নিষ্ঠা দিয়ে করেও, আশাভরসা কূল-কিনারা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ভস্মে ঘি ঢালছি বললে নিশ্চয় খুব সত্যি

বলা হবে না, তা না হয় মানছি, মুরারিদা, কিন্তু আগুনে ঢালছি এমনও তে আঁচ পাচ্ছি না কোনো চুলো থেকেই। CR-যে কে পড়ে তা জানি না। অনেক অনেক অনেক PMই পড়ে না তা অনেক অনেক অনেক-কেই কবুল করতে শুনেছি। এমনকি দরদীরাও ছোঁয় না, দরদীদের উর্ধতন ধরছি এই জন্যে যে তাঁরা তো actional-নন। সেদিন ইকবাল সিং বলেছিলেন যে নানান পত্রিকা তাঁকে তার পেশার তাগিদে পড়তেই হয় নানান ধারার সঙ্গে পরিচয় রাখার জন্যে, কিন্তু তিনি বলছিলেন CR পড়া ছেড়ে দিয়েছেন প্রায়, কারণ ও থেকে তিনি কোনো রকমের এদেশীয় পরিস্থিতির স্পষ্ট হিসেব পান না। ওতে যা কিছু চিন্তার খোরাক বেরোয় তা বেশির ভাগই বিদেশীর লেখা। বহু পরিমাণে শুধু গরম-গরম কথা, এখনো প্রচুর পরিমাণে left sectarian তত্ত্ব এবং তথ্য, আর অত্যুক্তি আর দীর্ঘসূত্রতা তো আছেই। এর ওপর মাদ্রাজ যাওয়ার পর কাগজের ছাপা আর get up যা কদর্য হয়েছে—একটা ভালো প্রেস অবধি নেই সাম্ভারামদের দেশে। গোবিন্দ প্রমুখদের সেসব করুণ বিলাপের চিঠি সব তুমি এলে নিজে পড়ে দেখো।

Latest খবর পেলাম, আমাদের নেতারা নাকি এখন বুঝতে পারছেন যে PHQ আর CR এখান থেকে নিয়ে যাওয়ায় যতো খরচ হয়েছে ততোটাই লোক-সান; সন্দেহ হচ্ছে এরপর দিল্লী চলো আওয়াজ উঠবে এবার।

তবু P. Congress-এর কথা লিখেছিলে। আমিও এবং গোবিন্দের দল আরো অনেকেই সে কথা বহুকাল থেকে তুলেছি যখনি অসন্তোষের দেখা পেয়েছি কারো মধ্যে এ অসন্তোষ আজ বহু দিন থেকেই শুধু (তোমার ভাষায়) 'চুনোপুটির' দলেই দেখিনি, অনেক massfront-এর মাঝারি নেতাদের মধ্যে দেখেছি। কিন্তু নেতৃত্ব আজ বহু কাল থেকেই আপন গন্ধে আপনি মাতোয়ারা হয়ে আছেন—দেখে শুনে শেখা তো দূরের কথা থেকে মার খেয়েও শিখতে ভুলে গেছেন। বোধ হয় পড়াশুনোও কেউ করেন না। নইলে CPGB যেভাবে General Election-এর মার খাওয়ার পর গা ঝেড়ে—মানে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা সমালোচনাইত্যাদি করে রোগ-দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আজ হু হু শব্দে এগিয়ে যাচ্ছে তা থেকে আমাদের নেতাদের শিখবার ছিল প্রচুর। তারপর এই গত এক বছরের মধ্যে পার্টির মূল সমস্যার সমাধানের ওপর লিউ সাও চি'র, অন্ততঃ তিনখানা মহামূল্যবান বই আমাদের হাতে এসে গেছে। সেদিন World News and Views-এর এক সংখ্যায় পড়ছিলাম ফরাসী পার্টির নির্মম আত্ম-সমালোচনা—নেতৃত্বের oppor-

tunism এবং lef-sectariatism-কে তীব্র ভাষায় খোলাখুলি কশাঘাত। এরকম উদাহরণ হাজারা দেওয়া যায়। কিন্তু কে শুনছে rank and file-এর কথা কিম্বা বইয়ে কাগজে লেখাকথা ? যা চলছে তা এক কথায় হে'লো opportunism, থিওরি বাদ দিয়ে practice। আলোচনা সমালোচনা চুলোয় যাক মতামত ধামা চাপা থাক। হিসেব-নিকেশ একেকজনের জমিদারীতে একেক রকমের চলুক, দরকার পড়লে-মানে টাকার দরকার পড়লে জমিদারে জমিদারে রফা অর্থাৎ patch up চলুক, আর rank & file দিশেহারা হয়ে চ্যাচালে চেক্ড়ালে day to day work-এর রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে নিজেদের গদি বাঁচানো চলুক—এই হোলো আমাদের বর্তমান নেতৃত্ব। রামকৃষ্ণ আশ্রম বা গৌড়ীয় মঠ কি দোষ করেছে, তাঁরাও তো কর্মের মধ্যেই মোক্ষ পেয়ে থাকেন। যাক এ মহাভারত কতো আর লিখবো বলো। যে সময় নষ্ট হচ্ছে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই মেধা-প্রতিভার যে অসীম অপচয় অবহেলায় চলেছে তার জন্যে দঃখ ক্ষোভ শুধু কথায় কতোটুকু জানানো যায় বলো ? অথচ শুধু emotionally ব্যাকুল হওয়ার বেশি আমার মতো ক্ষুদে প্রাণীর পক্ষে কীই বা সম্ভব ?

মজা শোনো। কাল থেকে এখানে এখানকার Peace Conference শুরু হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় নানান ভাষায় ছাপা পোস্টার পড়েছে সকাল থেকে দেখছি আজ। আর আজ সকালে committee থেকে নেমতন্নর চিঠি পেয়েছি—তাও এক বিশেষ বন্ধু লোক পাঠিয়েছেন। আমি কিছু কাজ contribute করতে পারতাম যদি—"নেতারা" দয়া করে খবর দিতেন—তা তাঁরা দেননি। এতে শধু আমার ক্ষতি হ'লে না হয় Joshi-ite হওয়ার অপরাধ হিসেবে ক্ষতি শিরোধার্য করতাম। যে মতি গতির হিসেবে আমি বাদ পড়েছি তাতে আমা হেন বহু ইতর জনই বাদ পড়েছেন—সমরদার কথাই ধরো না কেন conference-এর কর্ম-কাণ্ড থেকে। যে নেতারা নিজের ঘরের লোকের শক্তি সামর্থ্যের পুরো ব্যবহার করতে পারে না তারা বাইরের লোককে জাগাবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে, দেশজোড়া movement গড়ে তুলবে কোন যোগ্যতায় ? কিন্তু এ কথা তাঁদের বোঝাবে কি করে আর কেই বা বোঝাবে বলো ? নেতা হ'লে—এই সমাজের organisational tradition হিসেবে—দশজনকে ডেকে শলা পরামর্শ করে দশজনের বিশ হাতে কাজ ওঠাতে নেই। গান্ধী থেকে পুঁচকে জমিদার জোতদার বা আশ্রম—মঠের সোয়ামীজী অবধি সবাই বাণী ছেড়ে বা ফতোয়া-ফরমান বা হুকুম ঝেড়ে 'কর্ম—কাণ্ড' উদ্ধার করেন। Ideologyর কথা এসব ক্ষেত্রেই ওঠে। আর এই ideologyর ব্যাপারেই

আমরা গোমুর্খ। আমাদের নেতাদের রোগের নাম হোলো contempt for the rank & file —যাক্ যাক্—যে ঐতিহাসিক তাগিদে এদেশে পার্টির জন্ম হয়েছে সেই তাগিদেই একদা পার্টির সুযোগ্য নেতৃত্ব এদেশের আমরাও পাবো—এই রকমের একটা নয়া fatalism এর আশ্রয় নিয়ে টিকে থাকতে পারলেই বাঁচি।

শোনো এবার একটা বড়ো শোকের খবর দিই। আমাদের পাগলা মোড়গিল মিস্টার train accident এ মারা গেছে আজ প্রায় দু হপ্তা হ'তে চলল। আজ মাস চারেক আগে পাঞ্জাব থেকে এখানে এসেছিল কিছু কাজ নিয়ে। কাজ শেষ হয়ে গেছিল। সমরদার ওখান থেকে সেদিন চলেও গেছিল বেডিং পত্তর নিয়ে। বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাই কালার কাছে পড়ে যায়। হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায়ই মারা যায়। সমরদা খবর পেয়েছেন মারা যাওয়ার তিনদিন পরে। মর্গ থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পকেটে চিঠি থেকে ঠিকানা পেয়ে পুলিশ সমরদাকে খবর দিয়েছিল। আমি খবর পেয়েছি প্রায় দিন সাতেক পরে ও মারা যাওয়ার। ক'দিন অবধি মন কী যে খারাপ গেছে কি বলা। মানুষটা যে কীভাবে কখন আমার মন এতোটা জুড়ে ছিলো তা আগে বুঝতে পারিনি। এখন মনে হয় ও যেন আমারই এক পাগলা ভাই ছিল। ও কখনো কারো ভালো বই মন্দ করেনি। আর যার জন্যে যা কিছু করেছে মনপ্রাণ ঢেলে করেছে, তার জন্যে ওর দাবি দাওয়া যা কিছু ছিলো তা শুধু একটু মমতা ভালো বাসা, আর কিছুই নয়। চারদিকে আজকাল যে বিকৃত রুচি প্রবৃত্তি দেখি তার তুলনায় মানুষটা অত্যন্ত সৎ সভ্য ছিল। অত্যন্ত emotional ছিল কিন্তু নোঙরামী বা ঔদ্ধত্য ছিল না—আসলে ওর ছেলেমানুষী বয়েসটা অতো বয়েসেও কাটেনি। নিজের জীবনের উপযুক্ত ব্যবহারও জানতে শেখেনি—এ' সমাজে যা হয়—সফল সার্থক কাজের ক্ষেত্র পায়নি—তাই বোধহয় ওর চরিত্রের সেই শুদ্ধ সততা সংবৃত্তিগুলি emotionally শুধু মাথাকুটে মরেছে আমাদের জীবনের চারপাশে। নিজের জীবনের মূল্য বোঝার সুযোগ এসমাজে নেই, ও তো নিজের চেষ্টায় বুঝে নিতে পারে নি। ক'জনই বা পারে বলো। তবু সুস্থ সৎজনের মতোই ওর আত্ম—মর্যাদা বোধ, যা নাকি আদৌ অহংকার নয়,—তা ছিল। তাই মাতাল গুন্ডা চোরা কারবারী ঘোড়েল চালিয়াৎ এসবের ছায়া পর্যন্ত সইতে পারতো না। আঁকড়ে থাকতে চাইতো সমরদাকে। গোলাম বনে থাকতো চিকু খুকু মুন্নির, তৃপ্তি পেতে চাইতো সৎ মানুষের কোনো কাজে লেগে। এসব মানুষ ওপর থেকে অনেকটা ভবঘুরের মতো দেখতে বটে কিন্তু আসলে অত্যন্ত রকমের আশ্রয়

প্রত্যাশী। আর সেই আশ্রয় কখন যে কীভাবে জয় করে নেয় মানুষের কাছ থেকে মানুষ তা টের পায় না। যখন অমন করে হঠাৎ হারিয়ে যায় একদিন তখন বোঝা যায় কতো অসংখ্য এবং মধুময় সরল ভালোবাসার দানের ঋণ ওরা রেখে যায় আমাদের জীবনে। কথা বলে দু দণ্ড সময় অবধি দিতে কুণ্ঠিত হয়েছি কতোবার মোডগিলকে। অথচ মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে জামা কাপড় ওষুধ এনে দিয়েছে ছুটোছুটি করে। কি না, ওর ভালো লেগেছিল এই মানুষটাকে ওর সঙ্গে শেষ দেখা আমার এক রবিবার সন্ধ্যেবেলা। এ'ক মাসই ও কেমন মন মরা হ'য়ে থাকতো—ওর চরিত্রের সেই উগ্র পাগলামী এবার আদৌ ছিল না। যে দিন সন্ধ্যেবেলা সমরদা কাছে ছিলেন না, মাঝের কামরার ঘরে আমি রুমু আর মোডাগিল। আমিও একটু ক্লান্ত ছিলাম—অলস ভাবে বসে গুণগুণ করে এলোমেলো সুর ভাঁজছিলাম অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ রুমুর সঙ্গে খেলতে খেলতে গুণগুণ বন্ধ করেছি, মোডগিল বলে উঠলো থামলে কেন, সুর ভাঁজছিলে খুব ভালো লাগছিল। চেয়ে দেখি ওর মুখখানা কান্নায় ভরা যদিও চোখে জল ছিলো না। সাধারণত ওর মুখের ভাবে বিচলিত আমি বড়ো হইনি কখনো কিন্তু সেদিন কেন জানিনা খুব মন খারাপ হ'য়ে গেল মুখ দেখে। আমি আবার সুর ভেঙে চললাম—যদি self conscious হ'য়ে যাওয়াতে নিজের মজা লাগছিল না—তবু ওর জন্যেই প্রায় ঘণ্টা খানেকের ওপর একটানা চালিয়ে গেলাম। দু' একবার বললাম, যে এ আবোল তাবোল কি তোমার ভালো লাগছে? বললে সম্পূর্ণ উচ্ছাসবিহীনভাবেই —it is so free—what else does matter—free-free thats why it is sublime, it is truely free, so it is truely beautiful, ওর সেই ধরা ধরা গলায় এ কথাগুলো আজো আমার কানে লেগে আছে। যদিও জানি ও যা পাচ্ছিল সেই মুহূর্তে তার নাম treedom নয়—ওটা escapaism, তবু ওর পক্ষে সেই মুহূর্তে ওটা বেঁচে থাকার—শ্বাস-টানার পক্ষে—প্রাণ-শক্তি দিয়েছে! সেইটেই আসল কথা। ও যে ইদানিং কোনো মর্মান্তিক যাতনায় ভুগছিল আপন মনে তা সমরদা'র নজরও এড়ায় নি। কিন্তু কিসের দুঃখ লেগেছিল ওর মনে তা কেউ জানে না। শুধু সেদিনের সন্ধ্যে বেলার কথাই নয়। সমরদা বললেন ওকে তিনি একা কাঁদতেও দেখেছেন দুবার। তা ছাড়া মারা যাবার দু তিনদিন আগে চৌপাটির সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল একদিন। জিজ্ঞেস করাতে পরে, বলেছিল ও নিজে টের পায় নি কখন কিভাবে জলে গিয়ে পড়েছিল। হাসপাতালে জ্ঞান হওয়ার পর নিজেই অবাক হয়েছিল। অথচ ট্রেন থেকে পড়াটা ওর আত্মহত্যা যে

নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ঘা লেগেছিল ঘাড়ের দিকে, মানে মাথার পেছন দিকে। আত্মহত্যা হলে গাড়ির লোক হৈ চৈ বাধাতো নিশ্চয়। accident-এর ঘণ্টা খানেক আগেও সমরদার সঙ্গে কথা করে গেছিল। না, সেদিক থেকে মনের অবস্থা ওর সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ছিল। Accident আর ওর এদানিংকার depressed মনের অবস্থা concide করেছে এই যা।— যাক্—এসব মিলে আমাদের মনের ওপর কতোটা চোট যে গেছে তা বুঝতেই পারো।

এবার চিঠি শেষ করি এবারের মতো। তুমি কিন্তু ভুলো না, সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকেই তোমার পথ চাইবো। তুমি এসে আমার এখানে উঠবে নিশ্চয়। তারপর দুজনে মিলে সমরদার ওখানে যাওয়া আসা চলবে। যদি না অবশ্যি সমরদা তোমায় ও'দের ওখানেই পাকড়াও করে বসেন। সে-দেখা যাবে, আগে এসো তো।

এখানে বর্ষা প্রায় কেটে এলো। হাওয়ায় কেমন পুজো পুজো গন্ধ-ছোঁয়া পাচ্ছি আজ দুদিন থেকে। দিনে যদিও মাঝে মাঝে দু এক পশলা হচ্ছে তবু রোদ ওঠে আর শরতের সাদা মেঘ আসতে শুরু করেছে। সন্ধ্যে সকালে শিউলী ফুলের গন্ধর জন্যে মন উসখুস করে। আমি যদিও ঠিক পুজোর মজা কখনো পাই নি—তবু এসময়টায় গাছ পালায় ঘাসে, ঝিঁঝির ডাকে, মেঘ ভাঙা রোদে, রাত্তিরের মৃদু শিশিরে এমন একটা পার্বণী আবহাওয়া মনে লাগে যা মনটাকে ছেলেবেলাকার বাংলাদেশের জন্যে টানে, দূরে ঢাকের আওয়াজ শুনবার জন্যে মনের কান দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে। সারা ছেলেবেলাটা এই শরতে আমি মাঠে ঘাটে বনে পাহাড়ে সমুদ্দুরের তীরে নির্জনে ঘুরে কাটিয়েছি, দূর থেকে দূর থেকে গাঁয়ে শহরে পুজো বাড়ির ঢাকের আওয়াজ শুনেছি ঘাসের ওপর পাহাড়ের গায়ে শুয়ে। শিউলী ফুলের গন্ধের মাঝ দিয়ে চুপি চুপি এক পহর রাতে বেড়িয়ে ঘরে ফিরেছি। মনটা সেই সব স্মৃতির বোঝায় ভারি হয়ে আছে সকাল থেকে।

জীবনের এই একটা মজার দিক আছে, মুরারীদা নিতান্ত অবান্তর সব সুখের—নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রায় প্রাকৃতিক আনন্দের দিক—সে আনন্দ স্মৃতি হয়ে যায় যখন তা সবই কেমন গভীর বেদনার রূপ নেয়, আর সে বেদনাও কেমন যেন মধুর। জানি না কি ভাবছো এ কথা শুনে। দিনের পর দিন একেবারে একান্ত একা দিন কেটে যায় আমার তাই বোধহয় এটা আমার জীবনের "একটা দিক" বিশেষ বনে গেছে। বাইরের সময়টা মন দখল করে বসে, মনটা নিজের দখলে থাকে না।

P. 5574

যাক রাত হলো, এবার সটোভ ধুঙ্গাতে হবে, চার আনা দারুল কড়াই শুঁটি এখন এখানে, খুব বানাচ্ছি দুবেলা।

এবার কিন্তু আমার ওপর রাগ করে দেরি কোরোনা ভাই মুরারিদা, তাড়াতাড়ি চিঠি দিও।

আমার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো।

ইতি
তোমার স্নেহের
চিত্ত

৩

* মেদিনীপুর থেকে ?

এতো বড়ো কাজ এতো দিন ধরে একটানা করতে করতে থকে যাচ্ছি। সব সময় আঁকছি তা নয়। মগজের ৪/৫ ভাগ ক্ষেত্র জুড়ে অনবরত idea চষ্তে চষ্তে ভালো কাজের ওপর মুহব্বতটার মুখে ফেনা গেঁজিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে এ কাজ এক হাতের কম নয়। দুচার ছ মাসেরও নয়। আমার মতো অন্তত আরো দুজোড়া হন্দ যদি বছর খানেক ভর-পেট-দানা-পানি-Rum আর বিদ্যের রসদ পেতো আর খাটতো তবেই RPD-র মান রাখতে পারতো। আমি যা করছি ছেলে ভোলানো ছবি ছবি খেলা, ভাগ্যিস ছেলেদের হাতে দেবার জন্যেই বইটা হবে। ওদিকে প্রশান্তর শেষ চিঠি পেয়েছি গত মাসের ২য় হপ্তায়—time বোমার মতো গুম হয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে সেদিন গাড়ী ভাড়া পাঠাতে লিখেছি। দেখি কি উত্তর আসে।

ফিরে গিয়ে বোম্বায়ে কি অবস্থায় পড়বো তা মনশ্চক্ষে আড়চোখেও যখন দেখি তখন গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে ভাই মুরারিদা'। প্রথমেই তো আন্ধেরির এতো দিনের এতো প্রিয় ঘরটি ছেড়ে দিতে হবে। কোথায় ঠাঁই পাবো জানি না, যদ্দুর আঁচে বুঝতে পারিছি হয় Red-flag 'Hell-এ কিম্বা Raj-Bhawan-এর haunted house-এ তুলবে প্রশান্ত।

ইচ্ছে হচ্ছে খুবই কলকাতায় এসে উঠতে। কিন্তু ঘর দেবে কে ? ভাত আর ভাড়া!

তারা ফিরে গেছে, আর ফিরে আসবে না। কেন ? সে-মহাভারত কোনো দিন সন্ধ্যেবেলা যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় আর যদি একটা ঝাঁঝালো বোতোল

খুলে বসতে পারো তবে চাট হিসেবে দুজনে মিলে চিবুবো। আপাততো আমার harpooned কলজেটা থেকে সুখ-দুঃখ-বোধ সব একাকার করে দিয়ে রক্ত মাখা যে ইচ্ছেটা ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে তা আমার যদি তিমি মাছের মতো ল্যাজ থাকতো তবে তার আখেরি ঝাপটায় জীবনের বিচার বিবেকহীন নির্লজ্জ মুখটার ওপর দেগে দিয়ে যেতাম। কিন্তু যেখানে জন্মেছি, মরবোও পরমায়ু শেষ হ'লে, সেটা কলোনির এক গণ্ডূষ ডাঙানি। এ দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে পৌঁছেও দেখি জোয়ার নেই শুধু ভাঁটা, আকণ্ঠ পাঁক। মধ্যবিত্ত ঘর থেকে বুক ঘষটে এসে যদিই বা কোনো রকমে এসে পৌঁছলাম-শেষ পর্যন্ত দেখছি প্যাকাল বনে গেছি, রোমান্টিক আত্মতুষ্টির নেশায় ক্ষুদে কলজের অতৃপ্তি পিপাসাকে harpoon বলছি বটে কিন্তু বেশ জানি এখানে বিপুলে সুখ বোধও নেই অগাধ আকাশ ছোঁয়া দুঃখও নেই। অত্যন্ত দীন অসহায় পঙ্গু খাবি খাওয়া আর কাদায় নিজের চোখ খোলা করে দিন রাত্রির তফাৎ ভুলে থাকা।

তুমি ভাবছো আমার ওপর দিয়ে খুব বড় ঝাপটা যাচ্ছে, তাই এতো রাগ। না ভাই, ঝড়-ঝাপটাই তো কায়-মনোবাক্যে চেয়েছিলাম। ঝড়-ঝাপটায় পাল তুলে দিতে পারলে তবেই তো হিম্মৎ ভোগ করা যায়, ঝড়-ঝাপটা এলো কই? এদেশে সূর্য ওঠে, আকাশ ঢেকে মেঘ করে তুফান ছোটে সবই শুধু গাছপালাদের জন্যে। মানুষের জন্যে না আছে মানুষের জীবন না মানুষের মরণ। পূর্বপুরুষ আর এংরেজ মিলে এদেশের জন্যে একটি মাত্র ঐশ্বর্য বাকি রেখেছে তার নাম ভয়। বাঁচতে ভয় মরতে ভয় খেতে-শুতে-প্রেম করতে ভয় হাগতে-মুততে অবধি ভয়। ভয়টাই পাঁক, ভয়টাই আমাদের খাদ্য-পানীয় ভয়টাই আমাদের "সভ্যতা" ভয়টাই আমাদের অলঙ্কার মায় অহংকার, ভয়টাই আমাদের রসবোধ ভয়টাই বিবেক-বিচারের মাপকাঠি। সুস্থ মেরুদণ্ডে ভর করে হাত বাড়িয়ে দাও বলেছ কি আঁৎকে উঠবে সারা পাড়া সারা দেশ, নাও বললেও তাই।

মোদ্দা কথা ক্ষোভটাই একমাত্র ইন্ধন বা মূলধন হিসেবে মেনে নিতে হ'ল শেষ অবধি—ওটুকুই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে বেঁচে আছি। বোধহয় সমস্ত দেশের হাতেও ঐ ক্ষোভই আজ একমাত্র আশার আলো বাঁচার পাথেয়। রাগে ফেটে পড়ুক সমস্ত দেশ, এই এক কামনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না আপাতত। Volcanic and dogged wrath,—বঞ্চনা-প্রবঞ্চনার রক্তবীজ-বংশ নিশ্চিহ্ন শেষ করে দেবার আগে আর কিছু শুরু হবার আশা করা বৃথা—দুঃখ-অপমান বারবার জনে-জনে ঘা দিয়ে দিয়ে এই সত্যই বলে যাচ্ছে। কলোনি জীবনের

বিরুদ্ধে কলোনিস্ট ইম্পিরিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদেই আমাদের সব স্বপ্ন সব সখ-সাধ সব কোমলতা সব মহত্ত্বকে পাওয়ার অধিকার পাবো। যুদ্ধক্ষেত্রই আমাদের জীবন-যৌবন-পূর্ণতার ক্ষেত্র—এটা আবিষ্কার করেছে বলেই CPI-এর আজকের Programme পবিত্র।

কিন্তু কবে সে জং শুরু হবে? People's War এদেশের চৌদিকের কতো অসহায় শিশু-প্রমাণ দেশ আর মানুষকে সংঘবদ্ধ করে শান-দেয়া ইস্পাৎ করে দিয়ে গেল—এদেশের আমরা tantalus-এর মতো বা সিন্দবাদের মতো আত্মধিক্কার ঘাড়ে করে আর লক্ষ অপূর্ণ বাসনার cactus কলজেতে নিয়ে বাঁচা আর মরার মাঝখানে ঝুলছি।

মনখোলা চিঠি চেয়েছো লিখলাম ভাই মুরারিদা. কেতাবের আকারও দাঁড়ালো কিন্তু মানুষের ভাষার অপমান করলাম বোধ হচ্ছে—চাবুক খাওয়া পেডি কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করে পাড়া মাৎ করা তো ভাষার সম্মান করা নয়। আজ নিজের মনুষ্যত্বের যেটুকু টের পাই তা তোমাদের মতো কটি মানুষের কাছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতাবোধে। তোমরা আমায় বাঁচিয়ে রেখেচো, তোমরা আমার চোখের সামনে আকাশ আছে তা ভুলতে দাওনি, তোমরা আমার নিঃশ্বাস-বায়ু নির্মাল্যে ভরে দাও বারবার. আমার আপন সৌন্দর্য দেখতে পাই তোমাদের ভালোবাসায়। তার বদলে দেবার সময় যেটুকু আমি আমাকে নিংড়ে পাই তাকে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কি নাম দোবো জানি না। তোমরা যখন সেটুকু নিতেও কুণ্ঠা করো. বোবা হয়ে যাই। তোমরা বলো আরো অনেক কিছু পাও আমার কাছ থেকে.—আমি জানি সেতো তোমাদেরই হৃদয় মনের ঐশ্বর্য। যাদের সে ঐশ্বর্য নেই তারা তো কৈ কিছুই পায়না আমার কাছ থেকে। ঋণী করেছ আমায় বললে দুঃখ পাও, বলব না। কৃতজ্ঞ করেছ বললে জেনো আমি নিজেকেই সম্মান করছি, ঐ বোধটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি আর সব খুইয়ে।

এবার নিজের সাত-কাহন থামানো যাক। সমরদার চিঠি পেয়েছি প্রায় হপ্তা তিনেক আগে। কাজের মানুষ ব্যস্ত আছেন, কিন্তু আসল কাজে ফাঁকি—Bombay Art Society annual Exhibition-এ এবছর ছবি দেননি। প্রগতিশীল বাঙালীদের নিয়ে খুব মেতে উঠেছেন—বিজনের নবান্ন মঞ্চস্থ করবার তোড়জোড় চলেছে। সমিতির এক বুলেটিন বার করেছেন। এই সব।

একটু আগে গৌরী এসে হাজির, তোমায় চিঠি লিখছি শুনে সেও লিখছে তোমায়। ওর কলকাতায় থাকা নিয়ে দুর্ভাবনায় আছে। মা-বাবা ঘাড় ধরে

টেনে নিয়ে গিয়ে বে দিয়ে ফেলতে আদা-জল খেয়ে লেগেছেন, বেচারি হা ঘরে দাদার আশ্রয়টুকু আঁকড়ে আছে। ওর থাকার জন্যে ঘরের ব্যবস্থা করে যদি যেতে পারি যাবার আগে বেচারি বহু লাঞ্ছনা থেকে বাঁচবে। অসীম সাহস আছে মেয়েটার তাই ওকে ভাসিয়ে যেতে প্রাণে লাগছে। একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই যদি পায় এসহরে তবে লাঞ্ছনা আত্মঅপমান থেকে বেঁচে যাবে। আমার বরাতে কিছু হবার নয়, দেখি ওর নিজের বরাৎজোর কতো।

আজ এই অবধি রইলো। তাড়াতাড়ি চিঠি দিও। জানিয়ো আমার black & white ছবি না সুনীলের Second Creature কোনটা চাও।

আমার বুকভরা ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা নিয়ো। ইতি

চিত্ত

চিত্তপ্রসাদের ছড়া

পাশের বাড়ির ওরা পুষেচে যে মুর্গী
কি মিষ্টি গলা তার ভাবে-ভরা সুর, গা।
নিশ্চই ভালো ঘরে ও পাখীর জম্মো,
প্রাণ-কাড়া ডাক্ নয় যার-তার কম্মো।
জানলায় এসে দ্যাখো, খান্দানি চেহারা।
বয়েস কী মনে হয়? তবু দ্যাখো, দোহারা।
গোটাছয় মুর্গীকে সারাদিন সামলায়,
ঘাড় তুলে চেয়ে থকে আমাদেরই জানলায়।
অতোগুলো মুর্গী তো? তবু বড়ো শান্তো,
ঝগড়া ঝামেলা নেই, নেই অভিমান তো।
—কি বললে?—মনে মনে খেতে চাই মুর্গী?
—কী পাপ তোমার মনে!—দুর্গা, দুর্গা! ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯

* * *

আঁতোড় পাঁতোড় কুম্ভে কাঁতোড়
চলল আঁতোড় ঘাঁতে।
সন্ধ্যেবেলা ফিরে আঁতোড়
খাবে আমড়া ভাতে॥

ঠোঁদোড়

ঠোঁদোড় দেখেচো ভাই ?
আমি, ঠোঁদোড়ের গান গাই।
আমি—ঠোঁদোড়ের হাসি শুনেচি
শুনে—বুকে ধড়ফড়ি ভুগেছি।
মাঝ রাত্তিরে গাধার রাগিনী শুনেচ ?
ঠোঁদোড়ের হাসি, বিশ্বাস করো।
ঠিক তাই।
ওরে—ঠোঁদোড় কখনো কাঁদে না
দিদি—মাছ বা মুর্গী রাঁধে না
শুধু—ভোর বেলা ছোলা গুড় খায় শুনেচি।
(তবে—গোপনে মাটনে অন্য খ্যাটনে বাধা নাই।)
আহা—গেঞ্জি কাচে না কখনো
শুধু—রোদে মেলে দেয় কখনো
তখনো কেবল নারকোল তেল মাখে সে।
(তাই—পাড়াতে মাছি বা মশা বা আরশোলা—আদি কিছু নাই।)
ওসে—পলিটিক্স করে পাড়াতে
মানে—ক্ষীণদেহীদের তাড়াতে
ভোটের সময় খদ্দর পরে দেখেচি
সেই ক'টা দিন ঘরে চুপচাপ একলাটি বসে থাকি তাই।
তার—গুরুতে পরম ভক্তি
তার—গুরুই চরম শক্তি
ওসে—গুরুর দয়ায় গাঁ ছেড়ে শহরে এসেচে
ওসে—দেশের ডাকেতে দেবে একদিন দেহটাই।
এবে—তুমিও আমিও জানি তো ঃ
অথ—টাকা জীবনের অর্থো।
ফির—লিডারী যুগের পরমোধম্মো—মোক্ষো
ঠোঁদোড়ের গুরু মন্ত্র ঠোঁদোড় পেলো তাই।
গুরুজীর জয়। ভাগ্যে—

তাঁর—ফিরে গেছে। ক্রমে মাণ্গি
দেশে—সায়েণ্টিফিক্ তুলসীপাতার মাদুলী।
আর—তারই ব্যবসায় ঠোঁদোড়ের ঘরে
(সিলোন রেডিয়ো
শোনো ভাই—)
দাদা—বেশি কথা-টথা কয় না।
তার—গিন্নীটি পোষা ময়না
ছেলেদের পায় জুতো মোজা কভু দেখিনি।
বাপু,—হাফ-প্যাণ্ট শুধু ইন্কম-ট্যাক্স বাঁচাতে।
ভাবো কি লক্ষ্মী গডরেজ ছেড়ে
চড়েন লাউয়ের মাচাতে ?
তার—সাঁচ্চা স্বদেশী কালচার,—
পরের প্রিয়ার চিঠি পড়া, আর
সন্ধ্যেবেলায় কেওন-পাটি উঠোনে
এ পাড়ার লোক ভয়ে ভক্তিতে
নত তাই।
তবু—হয় না কেউ যে ভোঁদোড়ের
বাপু—কিবকুষা—বাপু ঠোঁদোড়ের
ঘুম থেকে উঠে ভাম্বেল ভাঁজে দেখেচি
তাই—বুকে হাঁপি নিয়ে কাছে যাই নেকো
ভয়ে ভাই।
শুধু—এক কোনে বসে' ঠোঁদোড়-মহিমা
দেখে যাই।

শিল্পী চিত্তপ্রসাদ প্রসঙ্গে

চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট ও চিত্রকর। তাঁর ছবি তাঁর রাজনীতির ভাষা। তিনি ছিলেন 'আমজনতার চিত্রদাস'। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে ১৯১৫ সালে, সেখানেই স্কুল কলেজে লেখা পড়া। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগও সেখানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে যুদ্ধের বিভৎসার মুখোমুখি হন চট্টগ্রামেই। ১৯৪০ সালে পার্টি সদস্য পদ লাভ করে তিনি হয়ে পড়েন সংস্কৃতি ফ্রন্টে সর্বক্ষণের কর্মী। গান লেখা, গানের স্কোয়াডে যোগ দেওয়া, স্বশিক্ষিত শিল্পী হিসাবে পার্টির নীতি অনুযায়ী পোস্টার, কার্টুন আঁকা তাঁর নিয়মিত কাজের অংশ ছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর চিত্তপ্রসাদের শিল্পী জীবনে দিক্‌দর্শনের কাজ করে। দুর্ভিক্ষ কবলিত জেলা গুলিতে ঘুরে ঘুরে তিনি মন্বন্তরের যে চিত্ররূপ তুলে ধরেন, তার সঙ্গে রিপোর্টাজ ধর্মী লেখাগুলি নিয়ে ১৯৪৩ সালের শেষে বোম্বাই থেকে প্রকাশ করেন, 'হাংরি বেঙ্গল' নামে এক অসাধারণ দলিল চিত্র। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এ-দেশে রিপোর্টাজ ধর্মী লেখার পথিকৃৎ এই কমিউনিস্ট কর্মি ও চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ।[১]

পরিচয় পত্রিকার এই সংখ্যায় চিত্তপ্রসাদের কয়েকটি চিঠি, কয়েকটি ছড়া প্রকাশ করা হচ্ছে। এগুলি সবই লেখা ও পাঠানো হয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীমুরারি গুপ্তকে। চিত্তপ্রসাদের মতো শ্রীগুপ্ত হলেন পরিচয় পত্রিকার অকৃত্রিম বন্ধু। তিনিই সেগুলি প্রকাশের জন্য আমাদের দিয়েছেন। এরই সঙ্গে দেওয়া হলো আমাদের অনুরোধে পরিচয়ের পাঠকদের জন্য লেখা চিত্তপ্রসাদ প্রসঙ্গে শ্রীমুরারি গুপ্তর একটি ছোট নোট। চিত্তপ্রসাদ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকদের জানাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত সেদিনের শিল্পীদের আঁকা ছবির শ্রীপান্থ সম্পাদিত সংকলন "দায়" গ্রন্থের মনোজ্ঞ ভূমিকা থেকে তাঁরা মানুষ চিত্তপ্রসাদ সম্পর্কে একটা মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন পেতে পারেন। প্রকাশিত পত্রগুলির পটভূমি বুঝতেও এই সংকলন গ্রন্থ প্রভূত সাহায্য করবে। শ্রীগুপ্ত লিখেছেন :

চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হবার মূলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (বটুকদা)। বোম্বাই-এর কাছে ১৯৪৬ সালে একটি বড় কারখানায় কাজ করতাম। এতেই

আর এক কর্মীর ভগ্নিপতি ছিলেন বটুকদা। তিনি ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসতেন, মিশতেও ভালবাসতেন, এই দুটিতেই তাঁর কোন বিশেষ বাদবিচার ছিল না। তিনি অনেক দিক থেকেই প্রকৃত গুণী ছিলেন তা ঐ জায়গার বাঙ্গালীদেরও অনেকেই জানতো না? আমিও না। তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই তিনি বেড়াতে এসেছিলেন। কবি গীতিকার এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে আগেই বোম্বাই সঙ্গে তাঁর খুব যোগাযোগ ছিল এবং প্রায় সেখানে যেতেন।

আমার নিজের কোন সংসার ছিল না। আজও নেই। নতুন জায়গায় এসে নিঃসঙ্গ অর্থাৎ আমার মনের মত কিছুটা কাছাকাছি মানুষের খোঁজ পাইনি। বিশেষ কারণে সতর্ক ভাবেই মিলতে মিশতে হতো।

বটুকদার কথা কলকাতায় থাকা কালীন কিছু কিছু শুনেছিলাম তাই নির্ভয়ে একদিন আমার ঐ বিশেষ প্রকার নিঃসঙ্গতার কথা তাকে জানাই। তিনি বলেন চলো, বোম্বাইতে দু জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে যাই তোমাকে। তোমার খুব ভাল লাগবে তোমার অসুবিধার অবসান হবে। চিত্ত যদি প্রথম হয় তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন শ্রীসমর দাশগুপ্ত। আমার বিচারে তিনি খুবেই উদার মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। বম্বে স্কুল অফ আর্ট সের সেরা ছাত্র। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। খুব ভাল ছবি আকতেন কিন্তু বহুবার তাঁকে বলতে শুনেছি শিল্পের নানা বৈশিষ্ট্যের বিচারে তিনি চিত্তর ধারে কাছে যেতে পারেন নি।

এরকমেই এক ভাগ্যচক্রে আমাদের আলাপ এবং চিত্তপ্রসাদের পরবর্তী জীবনের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সংযোগ বজায় ছিল, যদিও তাতে যেমন কর্মস্থল থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে চিত্তপ্রসাদের বা সমর বাবুর বাড়ীতে যেখানে চিত্তপ্রসাদও খুবেই আসতো ও থাকতো সেই সময়ের ঘনিষ্ঠতার জোয়ার যতটা জোরদার ছিল, বদলী হয়ে যাবার পরে সেটা বেশীর ভাগই পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে আটকে গেল। এরই ফলশ্রুতি ঐ বিপুল চিঠির গোছা যার খানিক অংশ "পরিচয়" কয়েক বৎসর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাকী অংশ খুঁজে পেতে যা পেয়েছিলাম আবার "পরিচয়" এর কর্তৃপক্ষের হাতেই দিয়েছিলাম এই আশায় যে তাঁরা এ কাজ সানন্দে ও আগ্রহে সম্পন্ন করবেন। সে আশা আমার হয়তো বহু বিলম্বে পূর্ণ হতে চলেছে।

আমার দেখা জয়নুল আবেদিন

বিজন চৌধুরী

এক

জয়নুল আবেদিন সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে। তখন দেশ ভাগ হয়নি। ১৯৪৫ সালে আমি প্রথম বর্ষে আর্ট স্কুলে ভর্তি হই এবং শিক্ষক হিসাবে তাঁকে পাই। আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার আগেও আমরা অনেকে তাঁকে নামে চিনতাম। ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের বাস্তব রূপ চিত্রিত করে তিনি কলকাতা শহরে তখন আলোচিত ব্যক্তিত্ব। শহরের রাস্তায় অন্নের খোঁজে কঙ্কালসার মানুষের মিছিল, তাঁদের হাহাকার মৃত্যুর ভয়াবহতা, তাঁর সপাট রেখা নির্ভর সৃষ্টিগুলোতে বিশিষ্ট রূপে পড়েছিল। জয়নুল আবেদিনের মতো একজন খ্যাতিমান শিল্পীকে শিক্ষক হিসাবে পাওয়া আমাদের অনেকের কাছেই ছিল কল্পনাতীত।

দ্বিতীয়বার জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসি ১৯৫০ সালে ঢাকায় সরকারী আর্ট ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করে। তিনি সে সময় আর্ট ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ।

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভাগের ফলে জয়নুল আবেদিন সাহেব সহ অন্যান্য মুসলমান শিল্পীরা যেমন, সাফিউদ্দিন আহমদ, আনোয়ার উল হক, সফিকুল আমিন, কামরুল হাসান কলকাতা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা শহরে বদলি হয়ে যান। এই শিল্পীদের প্রথমে ঢাকায় বিভিন্ন সরকারী স্কুলে চাকরী করতে হয়েছিল। সে এক বিড়ম্বনার ইতিহাস। পরে ঢাকায় আর্ট ইনিষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা হলে, এ'রা সকলে সেখানে যোগদান করেন। এবং জয়নুল আবেদিনের প্রযত্নে গড়ে ওঠে বাংলাদেশে চিত্রকলা শিক্ষার এক নতুন পরিবেশ ও উৎসাহ।

আমার ঢাকায় আর্ট ইনিষ্টিটিউটে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় জয়নুল আবেদিনর বদান্যতায়। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৪৯-এর শেষ দিকে আরও কয়েকটি ছাত্রর সাথে আমাকেও ছাত্র রাজনীতি করার—অভিযোগে কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। এখানে বিভিন্ন আর্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। আমার পৈত্রিক ভিটা ও দেশ ছিল পূর্ব বাংলায়।
এ অবস্থায় আমি মনস্থ করি ঢাকায় যাবার ও ওখান থেকে শিক্ষা নেবার।

ঢাকায় পেঁছে অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে দেখা করি। কলকাতায় আর্ট স্কুলের পরীক্ষা দিতে না পারা ও অন্যান্য ঘটনা তাঁকে জানাই। সহৃদয়তার সাথেই তিনি আমায় ভর্তির এবং শিল্প কলা শিক্ষার সুযোগ করে দেন। ছাত্র হিড়াবে তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই আমরা পেয়েছিলাম। আমি পঞ্চম বর্ষের শেষ পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়েছিলাম তাঁর অধীনে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেই। পরীক্ষার পর আমি ঢাকায় থেকে যাই ও ওখানকার শিল্পকলা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি।

দুই

একজন শিল্পীর শিল্প কর্ম অধ্যয়ন করতে হলে সেই শিল্পীর বিভিন্ন পর্বের সৃষ্টি সমূহকে যেমন গণ্য করতে হয়, তারই পাশাপাশি সেই শিল্পীর সময়কালের পরিবেশ, সমাজ সম্বন্ধকেও জানতে হয়।

জয়নুল আবেদিন পূর্ববাংলার ময়মনসিংহের মানুষ, শিল্প-কলা শিক্ষার জন্য এসেছিলেন কলকাতায়, ভর্তি হয়েছিলেন সরকারী আর্ট স্কুলে। আর্ট স্কুলে তখন একাডেমিক পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষার প্রচলন ছিল। আবেদিন সাহেব খুবই পরিশ্রমী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রকৃতির নানান বর্ণময় দৃশ্য রচনায়, প্রতিকৃতি বা মুখাবয়ব চিত্রণে, নারী পুরুষের দেহরূপের স্পর্শগ্রাহ্য অঙ্কনশৈলী উপস্থাপনায়, আলো আঁধারের পরিবেশ সৃষ্টির এবং ড্রইং বা রেখাচিত্রের দক্ষতায় তিনি খুবই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এ-ছাড়াও সে সময়কার একাডেমিক পাশ্চাত্য অঙ্কন রীতির ধারক, যেমন হেমেন্দ্র মজুমদার, অতুলচন্দ্র বসু, প্রহ্লাদ কর্মকার প্রমুখ দেশ-বিদেশ খ্যাত শিল্পীদের প্রভাবও তাঁর উপরে বর্তায়। এর কারণেই ছাত্রোত্তর ও প্রথম পর্বের সৃষ্টিতে শুধু নয়, উত্তর কালের সৃষ্টি সমূহেও বাস্তবতা, আকারগত ও ড্রইং এর ধ্রুপদী বিন্যাস তাঁর সৃষ্টিতে বিশিষ্টতা নিয়ে আমাদের কাছে আসে।

জয়নুল আবেদিন নিজেকে অবশ্যই একাডেমিক শিল্প রীতিতে আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর জল রংএ আঁকা নদীমাতৃক বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্র সমূহ, সাঁওতাল পরগনার দুমকার জীবন চিত্রমালা, প্রথাগত অঙ্কনরীতির বাইরে অন্য মাত্রা সংযোজন করেছিল। সৃষ্টিতে দেশজ চরিত্র আরোপের প্রচেষ্টা, লোকায়ত

ঐতিহ্য ও রূপসমূহের ব্যবহারের প্রশ্ন, এবং সমসাময়িক আধুনিক শিল্প জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান এবং প্রতিবাদী ও সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে সঙ্গত সৃষ্টির প্রয়াস সমূহের সম্বন্ধেও তিনি সজাগ ছিলেন। কারণ, ৩০ দশকের শেষ পর্ব থেকে ৪০ দশকের শেষ পর্ব পর্যন্ত, বাংলাদেশে যে সকল শিল্পকলা সম্বন্ধীয় চিন্তা ভাবনা, আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার প্রভাব সমূহকে সে সময়কার কোন সৎ শিল্পীই এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। সমভাবে সব সময়ই পরিবর্তিত অবস্থান এবং গভীর সামাজিক ও মানবিক অনুষঙ্গ কাজ করেছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা যেমন তার ছবিতে নতুন মাত্রা ও সার্থক প্রকাশ ভঙ্গী অর্জন করেছে, আবার মাঠে গরু লাঙ্গল নিয়ে এবং মই দিয়ে মাঠে চাষ কাজে কর্মরত চাষী, মাছ ধরা, নৌকা বাইচ, গ্রাম্য মেলা, সাঁওতাল পল্লী জীবনের রূপ এসবও বিশিষ্টতা নিয়ে, অপ্রচলিত ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে বার বার।

তিন

জয়নুল আবেদিন যে সময়কালে কলকাতায় শিল্পকলা চর্চা এবং সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিলেন, সে সময়ে বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্প কলা জগৎ নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। পূর্বে বাংলায় দুটি প্রধান ধারা প্রাধান্যে ছিল। একটি পাশ্চাত্য একাডেমিক, যার উল্লেখ পূর্বে করেছি। অন্যটি অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত দেশীয় নব্যবঙ্গীয় কলা শৈলী, যার লক্ষ্য ছিল সৃষ্টির স্বদেশীকরণ, এবং ভঙ্গীমায় ও কাঠামোয় এক নিজস্ব স্বদেশী চিত্র ভাষা গড়ে তোলা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, ঈশ্বরী প্রসাদ, সুনয়নী দেবী এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নব্যবঙ্গীয় ধারার শিল্পীর তখন খ্যাতির মধ্যগগনে বিরাজ করছেন।

এ দুটি ধারার বিপরীতে তিরিশের দশকেই ভিন্ন ধরণের শিল্পকলা মতামত ও ধারণার-শিল্পীরা বিভিন্ন গ্রুপ বা দল গঠন করেন এবং নতুন ধরনের আন্দোলন শুরু করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ইয়ং আর্টিস্ট ইউনিয়ন, আর্ট রিবেল সেণ্টার ও পরবর্তীকালে ক্যালকাটা গ্রুপ এই সকল নব্য পন্থী (avant grade) প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে নতুন ধারা প্রবর্তনের আহ্বান জানান, এরা ঘোষনা করেন রক্ষণশীল একাডেমিক ধারার এবং নব্যবঙ্গীয় স্বদেশী, ভাবপ্রবন ধারায়, এ যুগের শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। এদের কাছে ইয়োরোপের ইম্প্রেশনিষ্ট, কিউবিষ্ট এবং

অন্যান্য শিল্পকলা মতবাদের, সৃষ্টির খবর পৌঁছে গিয়েছিল, এবং অনুপ্রেরণার স্থল হয়ে উঠেছিল।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, গোবর্ধন আশ, অবনী সেন যেমন এই নব্য ধারার প্রবর্তক তেমনই প্রায় সমসাময়িক কালেই ক্যালকাটা গ্রুপের প্রদোষ দাশগুপ্ত, নীরোদ মজুমদার, রথীন মৈত্র প্রাণকৃষ্ণ পাল, শুভো ঠাকুর গোপাল ঘোষ প্রমুখরাও ছিলেন প্রতিবাদী, প্রগতিশীল শিল্পকলা মতবাদের অনুগামী।

এই গোষ্ঠীগুলোর বাইরেও একজন প্রতিভাবান শিল্পী প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে নিজের মতই করে বাংলার লোকায়ত রূপ অবলম্বনে অভিনব চিত্র সম্ভার সৃষ্টি করে চলেছিলেন তিনি যামিনী রায়। এ সকল শিল্প ধারা মতবাদ ও আন্দোলন সমূহের অভিঘাত থেকে জয়নুল আবেদিনের দূরে থাকা সম্ভব ছিল না।

আমরা একথা জানি যে তিরিশ ও চল্লিশ দশক ভীষণ ভাবে পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের কাল। তিরিশ দশকের শেষদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল, আমাদের দেশেও তার অভিঘাত প্রচণ্ড ছিল। বিশ্বজোড়া মন্দার সঙ্গে, ধ্বংস ও বিপর্যয় এ দেশের জন জীবনে আছড়ে পড়ল। একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা, দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রসার। ফ্যাসীবাদী আগ্রাসী আক্রমণ, বিপক্ষে সাম্যবাদী যুদ্ধ বিরোধী মানবতাবাদী আন্দোলন এবং অভিযান এ সবও এদেশের সমাজের স্থায়ীত্বকে আন্দোলিত করছিল।

এই সময়কালে মানবতার সপক্ষে, যুদ্ধের ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে অধিকাংশ বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। এর কারণেই ঐ সময়কার শিল্পকলা, সাহিত্যে, নাটকে এর প্রতিফলন আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আর শিল্পী জয়নুল আবেদিন সাহেবের পক্ষেও চল্লিশ দশকের পরিবর্তনকামী স্পন্দিত অবস্থান এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যেমন পারেন নি সে সময়ের চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অবনী সেন, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা।

চার

১৯৪৭-এর দেশভাগের পর জয়নুল আবেদিন সাহেবের কর্মস্থল পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এই সময়কার রাজনৈতিক ও অবস্থানগত পরিবর্তন প্রথম কয়েকবছর তাঁকে খুবই বিব্রত করেছিল। চাকুরী

ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্রে শিল্পকলা বিভাগে সাধারণ শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে হয়েছিল, এছাড়া ছিল নতুন পরিবেশে ছবি আঁকার অনেক অসুবিধা। এসকল তাঁর নিয়মিত কলাচর্চাকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এই প্রথম দিকের সময়ে শিল্পকলার সপক্ষে ঢাকা শহরে কোন পরিবেশই গড়ে ওঠেনি। আর এ কারণেই আবেদিন সাহেবকে, নিজের উদ্যোগকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছিল একটি শিল্পকলা শিক্ষাকেন্দ্র, আর্ট স্কুল গড়ে তুলতে। ঐসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রতি সন্ধ্যায় কিছু শিল্পী সাহিত্যিক কবি মিলিত হয়ে আড্ডা দিতেন, শিল্পী কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, কবি ফারুক আহমেদ ও আব্দুল লতিফ, এবং এদের সাথে থাকতেন জয়নুল আবেদিন সাহেবও। আমাদের জানা আছে যে নানান আলোচনার মধ্যেও ঢাকায় আর্ট স্কুল সম্পর্কেও শলাপরামর্শ চলত।

ঐ আড্ডা থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সংগঠিতভাবে আর্ট স্কুল স্থাপনের জন্য কিছু করতে হবে। এরপর এরা ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন, জনমত সংগ্রহ করেছেন, সরকারের কাছে দেখা করে চাপ সৃষ্টি করেছেন, এবং আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবীকে প্রায় আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে। এইভাবে একটি আটকোটি মানুষের বসবাসকারী দেশে প্রথম, ঢাকা আর্ট ইনষ্টিটিউট নামে শিল্পকলার শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমে রায়সাহেব বাজারের ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজের ভবনে, পরে সেগুন বাগানে ঢাকা আর্ট ইনষ্টিটিউটের সম্প্রসারণ ঘটে। অধ্যক্ষ হিসাবে জয়নুল আবেদিনকেই সকলে স্বীকার করে নেয়।

জয়নুল আবেদিনের শিক্ষাদানও ছিল খুব উচ্চমানের। তার ছাত্রদরদী মনের, অনুশীলন ও চর্চার ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশ দান যেমন উল্লেখ্য তেমনি প্রচলিত শিক্ষার কার্যক্রম; এবং গতানুগতিক পথের বাইরে, ছাত্র শিল্পীদের কাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রাধান্যে রেখে তাঁদের নিজস্বতা অর্জনে সাহায্য করতেন। সেটিও লক্ষণীয়। এর ফল স্বরূপই ঢাকা আর্ট ইনষ্টিটিউট থেকে পরবর্তীকালে অনেক প্রতিভাধর শিল্পী উঠে এসেছেন। শিল্পী আমিনুল ইসলাম, রসীদ চৌধুরী, আবদুর রোজ্জাক, মুর্তজা বসীর, দেবদাস চক্রবর্তী, প্রভৃতি শিল্পীরা আবেদিন সাহেবেরই ছাত্র। অধুনা বাংলা দেশের এই প্রখ্যাত শিল্পীদের পাবার জন্য আবেদিন সাহেবের কাছেই ঋণ স্বীকার করতে হয়।

পাঁচ

জয়নুল আবেদিনের সৃষ্টি সমূহকে তিনটি পর্বে পরিস্কার ভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের ছবিতে প্রচলিত একাডেমিক চাক্ষুষ বাস্তবতার অনুসরণ না করে, কিছুটা পোস্ট-ইম্প্রেসনিষ্ট ধরণের কাজের আভাস আমাদের লক্ষ্যে আসে। এই সব কাজের আর একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে রেখার বন্ধনীকে দ্রুত ছন্দে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা। এ সময়কার বেশীর ভাগ ছবিই জল রং-এ তিনি এঁকেছিলেন। কিছু এঁকেছিলেন তেল রং-এ।

ঐ সকল জলরংয়ের ছবির বৈশিষ্ট্য ছিল, কাগজের প্রয়োজনীয় সাদা অংশ ছেড়ে, অন্য অংশে পাতলা হালকা রং চাপিয়ে আলোর ব্যবহার করা। রংএর উজ্জ্বলতায় ও ব্যবহারের স্বচ্ছতায় ঐ ছবিগুলি খুবই উচ্চমান অর্জন করেছিল ও আকর্ষনীয় হয়েছিল।

আমার দেখা ঐ পর্বের সাঁওতাল পরগনার ছবিগুলি, গ্রাম বাংলার বিভিন্ন দৃশ্যাবলী, যাতে প্রকাশ পেয়েছিল গ্রাম্য, মাটির মানুষের জীবনচিত্র, আজও সেসবের স্মৃতি আমাকে আবেগপ্রবণ করে তোলে।

এই সময়কারই সৃষ্টি, ড্রইং বা রেখাচিত্রমালা তেরোশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলো শিল্পরসিক সমাজে আজও, তীব্রতায় এবং অসহায়তার সব থেকে সার্থক রূপ প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। জয়নুল আবেদিনের দ্বিতীয় পর্বের ছবিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দেশজ লোকায়ত উপাদানকে প্রাধান্যে এনে, শিল্প শৈলীতে রূপকের জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস করা। অবশ্যই দেশ কাল বাস্তবতা-বর্জিত। রূপক নয়। এ সব চিত্রে তাই অবচেতনা অবস্থানে গ্রামের কাঠের রঙীন পুতুল, ঘোড়া, হাতি, কাঠপুতুলী, মনসার ঘট বাইচের নৌকার রঙীন নক্সা ব্যবহৃত হয়েছে অভিনব ভাবে নিজস্ব ভঙ্গিতে।

অনেক ছবিতেই তাঁর পূর্বের স্বচ্ছ রং ব্যবহারের পরিবর্তে দ্বি-মাত্রিক অবস্থানে অ-স্বচ্ছ (ওপেইক) রং এর ব্যবহার ও বলিষ্ঠ গতিময় রেখার পরিবর্তে সংযমী রেখা বন্ধনীর প্রয়োগ ঘটিয়ে ঐ সময়কার সৃষ্টি গুলিকে এক ভিন্ন চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। ঐ সময়কার সৃষ্টির আর একটি বিষয়েও উল্লেখ করার প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যে, সংস্থাপনে কিছুটা জ্যামিতিক বিভাজন প্রবিষ্ট করার প্রচেষ্টা এবং ছবির তল (স্পেস্) কে গুরুত্ব সহকারে ব্যবহারের ইচ্ছা। যা তিনি আধুনিক মননে সচেতন ভাবেই শুরু করে দিয়ে ছিলেন।

উনিশ শ একান্ন, বাহান্নতে আবেদিন সাহেব রফকেলার বৃত্তি পেয়েছিলেন

ও ঐ সূত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশে পর্যটন ও ঐ সব দেশের আর্ট গ্যালারী, ও চিত্রকলাসমূহ—সংগ্রহশালা পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ ছাড়াও ঐ সব দেশের বেশ কিছু কর্মরত প্রখ্যাত শিল্পীদের সংস্পর্শেও ঐ সময় তিনি আসেন। এবং বলা যায় স্বাভাবিকভাবেই এই দেখা ও অভিজ্ঞতা উত্তরকালে তাঁর সৃষ্টিতে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই বৃত্তি নিয়ে ভ্রমণ কালেই লণ্ডনে তিনি প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী করেন। এ সব চিত্রগুলি ছিল বেশীর ভাগ জল রং-এ আঁকা, এবং অল্প কিছু রেখাচিত্র। বিলাতের প্রখ্যাত শিল্প কলা সমালোচক হার্বার্ট রিড উল্লেখিত প্রদর্শনীর সচিত্র ক্যাটালগে এ নিয়ে একটি সুন্দর লেখা লিখেছিলেন। তাঁর লেখনীতে ছিল জয়নুল আবেদিনের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত। এখানে সেটির উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি লিখেছিলেন যে কথা তার সারাংশ এই রকম, জয়নুল আবেদিনের চিত্রমালায় প্রাচ্য দেশীয় গ্রামীণ মানুষের বিচিত্রমুখী রূপটি প্রকটিত হয়। মানুষ ও সমাজ কাঠামোর এই রূপ ও পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার করার সক্ষমতা জয়নুল আবেদিনের এক মৌলিক অবদান হিসাবে স্বীকার হবার যোগ্য।

আমরা ঐ প্রদর্শনীর তালিকা বইটি দেখলেই বুঝতে পারব এ বক্তব্যের যথার্থতা অবেদিন সাহেব ঐ প্রদর্শনীর ছবির বিষয় বস্তু হিসাবে নিয়েছিলেন নদী মাতৃক বাংলাদেশের চির পরিচিত রূপটিকে। এ কারণেই নৌকাঘাট, গুনটানা মাঝি, জেলেদের মাছ ধরা পাল্কী চড়ে নববধূর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা, মাঠে দড়ি-ছেড়া বলদের দৌড় ঝাঁপ এক একটি ছবির বিষয় হয়ে উপস্থিত ছিল।

ছয়

ইউরোপ থেকে ফিরে এসে জয়নুল আবেদিনকে বেশ কিছুদিন আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। ঐ সময়টিতে অবশ্যই তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। তা ছাড়া রাজনৈতিক পরিবেশও তখন ছিল খুবই অগ্নিগর্ভ। সে সময়ে বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনও আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন পূর্ববাংলাকে আলোড়িত করে তুলেছিল, তার থেকেও তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। আমরা দেখেছি যে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ মহল থেকে যখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে উর্দু সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে, সমস্ত দেশের মানুষের সাথে জয়নুল

আবেদিনসাহেবও সেই আতঙ্কের ভাগীদার হয়েছিলেন। তাই দেখি ঐ রকম দুর্দিনে সাহিত্যিক নাসিরউদ্দিন সাহেবকে কেন্দ্র করে, হাসান হাফিজুর রহমানের প্রযত্নে, প্রগতিশীল শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের যে সাহিত্য সংসদ সংগঠন গড়ে উঠেছিল শিল্পাচার্য জয়নুল সেখানে বেগম সুফিয়া কামাল, কামরুল হাসান, কাজী মোতাহের হোসেন, মুনীর চৌধুরী, অজিতকুমার গুহ আবদুল গণি হাজারী প্রমুখদের সাথে সহযোগী ও সহমর্মী হিসাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম যুক্ত ফ্রন্টও তার পতন এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের অবলুপ্তি ও বাংলাদেশ সরকার গঠন সময়কালে আবেদিন সাহেবের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি আমাদের এ কারণেই গোচরে আসে না। একমাত্র ১৯৭০ সালের বাংলাদেশের সর্বগ্রাসী বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের বিষয় নিয়ে জয়নুল আবেদিনের "মনপুরা" পর্বের ছবিগুলোতেই আবার তাকে উত্থিত অবস্থানে দেখতে পাই। আবার তাঁর সৃষ্টিক্ষমতাকে চিনিয়ে দেয়।

শব্দের তুফানে

অরুণ মিত্র

আমার চার পাশে চারটে দেয়াল,
খুবই হাস্যকর,
যেই সমুদ্রের হাওয়া ওঠে
অমনি তারা দেখতে দেখতে উধাও
আর আমি তোলপাড় শব্দের তুফানে।
রঙিন শব্দ জলন্ত শব্দ
ভাঙার শব্দ গড়ার শব্দ ওঠা ওড়ার শব্দ,
এত শব্দে আমার পৃথিবী ঘোরে।
কারা তোমরা এই সব শব্দ ছড়াও ?
আমি ঠাওর করার জন্যে চোখ কান মেলে ধরি,
কুয়াশার ভেতর থেকে তোমাদের স্বর
ক্রমে তোমাদের মুখ।
আমি দুই হাতে আদর করি
কখনো-বা দুই হাতে ঠেলে দিই,
শব্দের পৃথিবীতে শুরু হয় আমার বাছাই।

যাচ্ছি নয়, বলো আসছি

মনীন্দ্র রায়

এত রক্ত কেন ?   কেন এত রক্ত ?

ওগো মেয়ে, বাঁচা সে জরুরী সেই জ্ঞান
দিয়েছেন বুদ্ধ, কনফিউশাস যিশু—
সমস্ত বিখ্যাত, মহান মানব।
তবু রক্তের বন্যায় ক্রুসেডের মরুভূমি, ইন্‌কাদের মরুভূমি
গেছে ভেসে,
থকথকে রক্তে এক সবুজ সারগোসা সাগর হয়ে শেষে
মুখোমুখি দাঁড়ায় এখনো।

শোনো
ছলোচ্ছল ধ্বনি তার গোলাপের সুষমায় আজও
ফুটে উঠতে গিয়ে আজও এখনও
কীট দষ্ট ঝরে যায় কান্নার মাটিতে।

॥ ২ ॥

হে কল্পনা রঙ্গময়ি অয়ি শুচিস্মিতে
তবু কুমারের ঘূর্ণ্যমান চাকের গড়ন–ও
নয় ততো কলসির কোমর, নয়
চাকবাজা আরতির ধুলোর চামর নয়
নিতান্তই মানবিক আদিবাসী মেয়ে।

আজও সেই পরিচ্ছন্ন ঘর-গেরস্থালি আমি দেখি চেয়ে চেয়ে,
আর ভাবি, জীবনেরও চেয়ে নাকি দামি
শিল্প আর শিল্পের চেতনা ?

॥ ৩ ॥

ব্যাঙ্গমী ঃ এখানে মানুষ নেই কেন ?
ব্যাঙ্গমা ঃ মানুষ ফেলেছে বোমা,
কিরিচে করেছে বিদ্ধ দোলনার শিশুকে,
বফোত হয়ে গেছে এ–অঞ্চল।
ব্যাঙ্গমী ঃ শুনেই তো চোখে আসে জল,
মানুষ কি এতই নিষ্ঠুর !
ব্যাঙ্গমা ঃ আরও বহুদূর যেতে পারে
মানুষের লোভ আর প্রভুত্ব-কামনা।
ব্যাঙ্গমী ঃ তবে কি মানুষ আর
ফুলের বাগান আজ ভুলেও গড়ে না ?
ব্যাঙ্গমা ঃ না, না, গড়ে, গড়ে। কিন্তু মালীর ওপর ভার পড়ে
পরিচর্যা তার।
ব্যাঙ্গমী ঃ চমৎকার। দ্যাখ নীচে চেয়ে
মানুষ চলেছে দলে দলে
কার মুণ্ড ছিঁড়ে নেবে কলে

ব্যাঙ্গমা ঃ দূরে ছাই, এবার তুই কাছে সরে এসে
গলার কাছটা চুলকে দেনা···আয়, উঁ···

ব্যাঙ্গমী ঃ পারবো না। রাত কতো হল? পেয়েছে বেজায় ঘুম

সেলাইয়ের উল্টো পিঠ

১। চাবুক চাবুক চাবুক
অশ্রু জলে ভেসে যায় বুক।
তুলো ক্ষেতে কালো মানুষেরা
দেখা যায় না—এরকম এক কাঁটাতারে ঘেরা
ফেলে দীর্ঘশ্বাস

২। এখানে তো চিত্রকল্প নেই। সে চিন্তায় যেন পরিহাস,
সেলাইয়ের উল্টো পিঠে
উব্‌রো খাব্‌রা কিছু সুতো ঝোলে
গাছের কোটর থেকে কেউটের মত ফণা দোলে।
এদের শহর দ্যাখো, আকাশ-আঁচড়ানো ঘাট তলা
খোপে খোপে ডলারের শব্দে কালা পালা
যেন সে জ্যান্ত টাকা আজ রক্তের সুরঙ্গে ঢুকে
যেন সে বাদামি চিনি···ডলার ডলার···

কাকতাড়ুয়ার মত নিষ্প্রাণ মানুষ—টাকার মানুষ
কাঠিতে পরানো জামা, নকল ফানুস,
তা দেখে পাখির মত পাকা ধান না খেয়েই উড়ে যা—হুস্‌
পৃথিবী দাবড়ে চলে
বাঘধরা খাঁচাকল নয়, ইঁদুরে মারার জাঁতিকল

•

আহা, কি বীরত্ব, ওরা আগেই তো মরে আছে
পচনে আক্রান্ত, সেই মর্গের স্তূপে।
মৃত মানুষেরা রাগে, গোঁসা করে, সব অভিনয়,
এক ফোঁটা রক্ত নেই, এতো অ্যানিমিয়া, জয় ডলারের জয়,
মানুষ সোমথ বীর, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের অগ্নিতে

অজেয় যে, তেমন মানুষ
আবার কি দেখা দেবে ?

৩। নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শুধু কালো অমানিশা যেন যবনিকা,
এক, দুই, পঞ্চাশ বছর কিংবা কয়েক শতাব্দী
প্রেইরি কি সাবানা ঘাসের স্তেপিতে
কেউ নেই কুলে বাতি দিতে।

৪। একদিন (শঙ্খধ্বনি দাও)
আজকাল পরশু নয়, কোনো একদিন
আকাশে আকাশে দেখবে
দণ্ডমার অরণ্য থেকে পশ্চিম আকাশে
একপাল হস্তিবর্ণ মেঘ নেমে
ঘন প্রাবৃটের ধারে বাসর বধূর মত পৃথিবীকে আলুথালু করে
পরিতৃপ্ত ষোড়শীকে শয্যার ওপরে রেখে
জলকাদা ছিটিয়ে আবার চলে যাবে।

৫। তার ও পরে আরও জানা চাই ?
(কবিতাটা জমছে বলুন ?
জমবে না আবার ? নিজের ধমনী ছিঁড়ে
মিশিয়ে দিয়েছি কিছু নুন।)

শোনো পার্থ, তুমি সত্যসন্ধ।
বাজা শতাব্দীর নীচে, গভীরে গভীরে
ছিল কিছু কন্দ। বৃষ্টি পেয়ে মাটি ছেড়ে একদিন তারা
শিশুর ওষ্ঠের মত মেলে দুটি পাতা
সূর্যালোকে ক্রমে মধুবাতা,
দিনে দিনে শালপ্রাংশু মানুষ রতন
কাঁধের জোয়াল ফেলে প্রশ্ন করে—কেন এ রকম ?

৬। হয়তো একদিন হবে।
আমি তো ত্রিকালদর্শী টাইরেসিয়াস নই,
বৃদ্ধ, ন্যুব্জ কবি এক, জীবনের দায় আজও বই
প্রায় আধা-যাজ্ঞবল্ক্য,

ঈশ্বরে, আত্মায় অবিশ্বাস,
শুধু এক সত্য জানি, মানুষ। রেখেছি দ্যাখো আমার কম্পাস
মানুষেরই দিকে,
তাদেরই জন্য যমোদয়ী, আজও চলি লিখে,
জানি আমি জানি
একটাই জীবন, আমি এক উদ্যান পালক
আর্তিকে বানাই ফুল চাঁপা ও পারুল,
হেমন্ত-আকাশ-লাল রঙ্গন স্তবক।

দূর দূরান্তর দূর নিরন্তর

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আমি রয়ে গেছি দূরে দূরান্তর দূরে নিরন্তর এক যাত্রায়
কই-সে দূর? কত দূরে? বাইরে দূর? ভেতর-দূরে?—
প্রশ্ন নিজেকে আঁচড়ায়
ছিচকাঁদুনের ঘ্যানরঘ্যানর সে কি জন্মজন্মান্তর-কাবার দূরত্ব
সবজান্তার দুই-দুই-চার মাপাজোকার গোষ্পদ, গর্ত
আমি চলেছি। চলেছি। চলেইছি
খামার খেত আর প্লাবনের সোঁত ভেঙে
চলেছি। চলেছি। চলেইছি। খামচিয়ে খাবলিয়ে নিতে-নিতে
আপনাকে আপন মনের ঠেঁয়ে
নদী আমার আদির আদি স্মৃতি।
বেগবতীর বাঁক ফিরলে আমজামবাঁশবেতের সমাজ
ঘাটলা ছেড়ে গাছগাছালির পায়ে-পায়ে চলাপথের পায়েল ঝুমঝুম নাচ
শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে লেপটে জাপটে
পিছুডাক ভালোবাসার রেশমি উশখুশ
বাঁধিয়ে রাখে ভুলকালাম নিজের সঙ্গে:
ফেরা-না-ফেরার হুঁশ আর বেহুঁশ
আকাঙ্খার লকলকে মশাল বেরিয়ে পড়লুম
স্বপ্নাদ্য মাদুলি ভোরের শেকড়ের খোঁজে

চাওয়া-পাওয়া-না পাওয়ার ঠোক্করে ঠেকে চমক ভাঙল :
নিশির ডাকের বিপথ ও-যে
বুকের মধ্যে কেবল সে-ই ভালোবাসার সির্‌সির
অবুঝ গান সির্‌সির সবুজ গান
বীজ বুনব চারা রুইব তার
কই কোথায় কাদামাটির বুক ব্যথায় আন্‌চান
গাঁয়ের-পর-গাঁ উজাড়, হাটকে মাঠগঞ্জহাট
নেই কোত্থাও মনকাড়া চিল্‌তে মাটি
মন-বস্তুটাই কেমন যেন নেই মনে
চারদিক ঘুরঘুরে ঘুণপোকার মাটি
এ-যে দেখি উষর পাথর চাঙড় জমি কাঁটাঝোপে ফিনিক্ দ্যায় রক্ত রোদ্দুর
জল না-পেয়ে শুকনো কাঠ গানের গলা
সুরকানা মুখফেরানো পথ আর কন্দরে
ভালোবাসার ভাবনা বেয়ে যতই এসে পড়তে চাই
জঙ্গলসাফ সবুজ সোঁদা মাঠে
ইচ্ছে থেকে ঠিকরে পড়ি অনিচ্ছেয়
অরুচির 'লে-লে-বাবু-ছে-ছে-আনা' হাটে
যাচ্ছি। যাচ্ছি। দিনের মেজাজ খুনখারাপি
যাচ্ছি। যাচ্ছি। রাতের মুখ আবলুশ-কঠোর
দিনদুপুরে কোমলতার শ্লীলতা কেড়ে গণধর্ষণ দ্যাখায়
রাতব্যাবসার দোর
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সারা—
গায়ে এবার অগ্নিপরীক্ষার লজ্জাটুকু জড়াই
নিজের মধ্যে রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরাটাকে
নখে টিপে শ্মশানচিতায় চড়াই
তারপর চারিদিককার একলব্যেড়ের
নির্বিকার নিস্পৃহার কুশপুত্তলিটাকে
বিসর্জনের কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়াই
হেনস্থার চালকলাটার ফাঁকে

মনে হচ্ছে এবার পথ। এ সে-ই পথ? পথের হদিশ?—
সামনে দেখি ছড়িয়ে ধু-ধু একসমুদ্র দুরন্ত
নৌকো গলুই গাঙচিল আর মাল্লার গান
বাসনার দুই-বাহুর বেড়ে দুরন্ত দূর শান্ত, স্বচ্ছ
এতক্ষণে শেকড় বুঝি নামছে
নামি জলেকাদায় মাটির মনে ধানের ছড়ায়
হয়ে উঠছি গ্রীষ্মবর্ষাশীতবসন্ত শাঁখের আওয়াজ আকাশপিদিম জলের ছড়ায়
সম্ভাবনা এতেক পরে ভরে উঠছে উর্বরতায়
উর্বরতা দশমাস গর্ভের বশ
সৃষ্টির উৎসবে উঠছে মেতে আমার ভালোবাসার ঔরস :
আর অমনি কোথায় কোন অন্ধকার আকাশলতায়
তারা-ছিটছিট হাসির জুঁই
হাসনুহানার দেহসৌরভে জানান দিচ্ছে গর্ভিনী ভুঁই
রঙের মূর্তি ফুটিফুটি ভোরের কোরক গোলাপকে আজ
সৃষ্টির কোন তুলিতে ছুঁই!

ভালোবাসার কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সুজন, তুমি আসতে পারলে না শেষ পর্যন্ত।
আজকাল এরকমই হয়,
আসতে চাইলেও সময় পেরিয়ে যায়,
রাত গভীর হয়ে আসে।

দুপুরের দিকে আকাশ কালো হয়ে বৃষ্টি,
মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরণ,
প্রবল জলধারার ধ্বনি,
সুজন, তুমি কেন এলে না?

জীবনে অনেক অস্থিরতা ঘটে যায়।
কাছে দূরে যেখানেই যাও

কখন কোন্ দিক থেকে বর্শাবিদ্ধ হবে
তোমার ভালোবাসা, তুমি জাননা।
ঠোঁটে, বুকের সবচেয়ে নরম জায়গাটায়,
যে আকাঙ্খাগুলি গোপন যাদুতে আচ্ছন্ন
তা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়।

মাঠ পাহাড় নদী অরণ্য কি তোমার পথে ছিল,
কেন আসতে পারলে না সুজন ?

এই স্বপ্ন

চিত্ত ঘোষ

অথচ সময়-দণ্ড এই স্বপ্ন। আশ্রয়ের যতুগৃহ। গুহা
অনেক সিঁড়ির ধাপ। কাঠামোর বিন্যাস ও গঠন
বিভিন্ন অধ্যায়, স্তর। বহুবর্ণ যৌবনের স্পৃহা
জটিল গ্রন্থি ও স্নায়ু। শিলাশিল্প নির্মানের নানা প্রকরণ
প্রস্তর রূপসী আজ অনুজ্জ্বল লোল অবক্ষয়ে
আছে তবু বহমান মানসিক পর্যায়ের অফুরন্ত নদী।
আছে সেই উদ্ধারের হেম নৌকা তরঙ্গ বলয়ে
তীব্রতম তাড়নার জলোচ্ছ্বাস অবিচল দিগন্ত অবধি।

পরিধি ছাড়িয়ে যায় বৃত্ত মাঝে মাঝে
রেখাগুলো লেগে থাকে নিরুপায় ত্বকে
চোখের মণির আলো সমর্পিত কুয়াশার কাছে
উই-এর দংশন বিষ শৈশবের কৈশোরের নখে।
তবু এক অতিক্রম, অবিরাম যেন এক আত্ম অভিযান
তবু এই অস্থিরতা, অস্থিরতা, অলৌকিক শব্দের সন্ধান।

বিবর্ণ গন্ধ

রাম বসু

সেই সব মণীষা মুহূর্তে অভ্র-ম্লান আচ্ছন্ন আলোয়
ঢেউগুলো আকাশের মুখ ধরে আলতো চুমা দেয়
মানব—কল্পনা নিয়ে মানব হৃদয় রীতিহীন অতীতে দাঁড়ায়
সমুদ্র প্রেমের মতো অন্তহীন ইতিহাস হয়ে
গূঢ়তম গোপনের ঝাঁপি খোলে দুঃখের গৌরবে।

বিধাতা নির্লিপ্ত। স্রষ্টার জনক সৃষ্টি। বৈপরীত্য গতি।
না, আমি ভাসবো না এই আবাদের গন্ধময় মাটির যাদুতে
আমি শুধু একা একা সাজাতে থাকবো সুরাকুন্ড রাত্রির শরীর।
ঢেউ, সর্বনাশী আদিম রূপসী, কি দিবি কি দিবি তুই
জানি, তুই কাঁকড়ার মত ব্যস্ত হিশেবীর ক্লিষ্ট পদরেখা
হাসতে হাসতে মুছে দিয়ে হয়ে যাবি অনন্তের স্তব।

ক্যাকটাস বুক দিয়ে আঁকড়ে রাখে বালি শাক নিস্তব্ধ ঝিনুকে
শীর্ণ ঝাউ বনে, শুনি গথিক গির্জার অর্গানের প্রর্থনার সুর
পুরাণ কাঠের গুঁড়ি হয়ে আছে কবেকার কালের সাক্ষর
সুন্দরী বনের স্মৃতি ধরা থাকে শাশ্বতের ধুলোর হীরায়
শুকনো কাদার দাগ প্রস্তররাজি, শিলালিপি
পাঠোদ্ধার করতে পারতো যারা—তারা কেউ নেই।

জীবনে কত কী দেখলাম। পদচিহ্ন খুঁজি না কখনো
আমার চেয়েও আরও সহজ ভাষায় কথা বলে বাঁচার তাৎপর্য
জীবন্ত এমন কিছু বিশৃঙ্খল স্রোতে থেকে যায়, যার ফলশ্রুতি
মানবিক ফলন্ত স্তবক। সেই বিন্দু আমি। আমাকেও শূন্য হতে হবে।
ফণী মনসার ঝোপ ঝাড় সাজগোজ করে আছে নায়িকার মতো
সে আমাকে টানছে জোরে আলেয়ার মতো তার চোখের আবর্তে
শিখায়িত বিগত যৌবন, তুই কি বুঝবি নে
কখনো পাদি না খুঁজে জীবনের স্বাদু উচ্চারণ

আলের ওপর দিয়ে হাঁটবি নে কখনো মানুষের মর্মমূল হয়ে
থাকবে শুধু সমুদ্রের প্রেম, কাকদ্বীপ, মুহূর্তের মালা।

এক টুকরো নীলিমায় সমর্পিত হলে
সাদা ফেনা ঋতুমতী পাখিদের মতো আত্মমগ্ন হয়
বিদায় তখন আর বিচ্ছেদ হয় না
অসম্ভবের পায়ে মাথা কোটা জীবনের ধর্ম বলে
অন্তর্বাস খুলে দিয়ে মৃত্যু হয় সুগন্ধি প্রেমিকা।

শান্তি প্রস্তাব

মধু গোস্বামী

ফণা তুললে
ফলা শানাবো
তা না হোলে নয়,
—এই শর্তে
রাজি আছি
সন্ধি যদি হয়।

খবরদারির
ফর্দ বাড়ার
নজরদারির নাক,
শুঁড়ির সাক্ষী
মাতালগুলো
বাজাচ্ছে জয় ঢাক,
গাঁয়ে মানেনা
'আপনি মোড়ল'
সেই আনন্দে নাচে।
(বীর হনুমান
গিলবে কলা
চুটিয়ে পরের গাছে)।

স্বাধীনতার পাট্টা বিলি
নতুন করে হবে।
আগে দাসখত
পরে লিস্টে
নাম উঠবে তবে ?

ফলা নামিয়ে
ফণার শাসন
মান্‌তে নয়কো রাজি,
ফণা দোলালে
ফলা শানাবো
জীবন রেখে বাজি।

মগজ

প্রতিমা রায়

ঐ দেখো ছুটে চলে যায় করোটি
ধরখানি ফেলে রেখে
যেনো লম্বমান কিছুটা কুয়াশা
কিছু জল ;
তারার বোতাম দেয়া অদৃশ্য কালো গহ্বর পোশাক।

খাঁ খাঁ শূন্যে হাড়ের গোলক ভাসতে ভাসতে
ছিটিয়ে দিয়েছে তার সমবেত অনভূতি
বোধ অন্ধকারে
সময়কে হৃদয়কে,
নতুন করে কোনো অলীক কুহকে ফুটে উঠবে বলে।

বিষ্ণুপুরি শাঁখা

শুভময় মান্না

১

ব্যাণ্ডরাল গাঁয়ের ফকির দিন্ডা ভ্রাম্যমাণ ফিরিওয়ালা—নানা রকমের সওদা, তার মধ্যে শাঁখারি হিসেবে তার খ্যাতি আছে। বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ, পাতলা চিড়চিড়ে চেহারা, রঙ কালো, চোখমুখের তেমন ছিরিছাঁদ নেই, তার ওপর চোখের রঙ একটু লালচে—সেটা সে একটু নেশা-টেশা করে সেজন্য নয়, এমনিই ও রকম। সুতরাং তার চেহারা চোখে পড়ার মতো একেবারেই নয়। কিন্তু কিনা ফকির বেশ ছিমছাম, তার ফুলপ্যান্ট এবং হাওয়াই শার্ট একেবারে নিভাঁজ না হলেও ময়লা-টয়লা থাকে না, পায়ে হাওয়াই বটে তবে বেশ মোটা আর সোলের আর রঙের বুটি দেওয়া, নিয়মিত চুল কাটে দাড়ি কামায়। কিন্তু তার থেকেও ওর আর একটা বড় জিনিস আছে—ভাল কথা বলতে পারে, তখন ওর চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ফিরিওলার পক্ষে এটা বড় গুণ—কেন না কথায় খদ্দেরকে বশ করতে না পারলে মাল বিক্রি হবে না, বিশেষ করে তার মতো চোখ ভোলানো ঠুনকো মনোহারি জিনিসের পশারির পক্ষে।

সেদিন সকাল আটটা নাগাদ ফকির তার ঘরের মেঝেয় একটা তোরঙ্গ এবং দুটো বড়সড় সিনথেটিকের ঝোলা থেকে মালপত্র সব আজাড় করে ফেলেছিল—এখন সেগুলোকে আবার গুছিয়ে তুলতে হবে। তার কারণ, কোনো একটা মেলা থেকে ফিরবার সময় বিক্রি না হওয়া জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে নিয়ে আসে বটে, কিন্তু তাড়াহুড়োতে গুছিয়ে নিতে পারে না। এটা প্রতিবারই হয়—তবে এই কয়েকদিন আগে সে যে তমলুকের এক মেলা থেকে ফিরে এসেছে, এবারে ওলট-পালট হয়েছে খুব বেশি; কারণ মেলার শেষ দিকে তড়তড়িয়ে বৃষ্টি নেমেছিল, তাই যেমন-তেমন জড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে হয়েছিল।

ফকিরের স্ত্রী মায়া রান্নাঘর থেকে খর পায়ে এঘরে এসে ঢুকল—'ওমা, তুমি এখনো বসে আছ? বাজারে যেতে বলে গেছি কখন···'

ফকির বলল, 'আমি কি বসে আছি? আজই ঘাটালের যুব মেলায় যেতে হবে, তাই গুছোচ্ছি; তাছাড়া চিন্তাও আছে···'

'তোমার আবার চিন্তা কী··· ?'

'সুদেবকে তোমার মনে আছে? ওই যে··পিসির ছেলে, ঘাটালের পাশে কুলপাতায় ঘর··তাকে সেদিন বলে এসেছি আমার সঙ্গে মেলায় কাজ করতে। তো চিন্তা হচ্ছে, সে যদি না জুটে ?···'

মায়া স্বামীকে ভাল করেই চেনে, বুঝল সে কাটান দিচ্ছে। বলল, 'উসব ছুতনা রাখতো। মেলায় যাবে, সে তো তুমি যাবে উবেলা, তার এখনো অনেক দেরি। শুন, আমি রান্না চড়াতে পারছি নি, কুটুমকে খেতে দিব কত বেলায় ? বোন আর তার বর শান্ত এসে আছে, মনে আছে তো, নাকি ভুলে বসে আছ···'

এইবার চোখ তুলল ফকির, রাগত ভাবে বলল, 'উসব কুটুমের যোগান দিতে আমি পারবনি। তোমার বোন যে বরকে নিয়ে সাত দিন ধরে বসে বসে খাচ্ছে··'

'চুপ চুপ, ওরা শুনতে পাবে··আর সাত দিন কোথা ? আজ নিয়ে তিন দিন হল···'

'আমি স্পষ্ট কথা বলব, অত কুটুম্বিতের ধুম কেন। এই সেদিন আমি তমলুক গেলাম, তোমার বোনের শ্বশুর আসেনি তার ছোট বেটাকে নিয়ে ? আজ বাপ বেটা, কাল বেটা বউ··তুমি বলে দিতে পারনি ?···'

মেঝের ওপর ফকিরের পাশে ব্যস্ত হয়ে বসে পড়ল মায়া, তার হাত ধরে অনুনয় করে বলল—'আমি বুঝি সব, কিন্তু কী করব বল, কুটুম এলে তাদের মুখের উপর কিছু বলা যায় ? তুমিই বল··শুন, চিল্লামিল্লি ক'রনি, একটু গা তুল দিকি··'

স্ত্রীর একান্ত অনুনয়ে চুপ করল ফকির, মায়াও বাইরের ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেল। কিন্তু তখনই উঠে পড়ল না ফকির, যা করছিল তাই করতে লাগল।

ফকিরের আজাড় করা জিনিসগুলো রকমারি—তোয়ালে দিয়ে মুছে সেই রকম অনায়াসে থাক থাক করে সাজিয়ে রাখছিল। সাবান, স্নো, লিপস্টিক, মাথার তেল, নকল গহনার মধ্যে গলার হার, হাতের চুড়ি, কানের মাকড়ি, কপালের টিপ, রকমারি ফিতে, স্নো, ক্রিম, শ্যাম্পু—সর্বোপরি আছে শাঁখা ; সবই মেয়েদের জিনিস। এই শাঁখাও আকার দু'রকম—প্ল্যাস্টিকের নকল আর বিষ্ণুপুরের আমদানি আসল। প্ল্যাস্টিকের শাঁখার দাম খুব কম চটপট বিক্রি হয়ে যায় ; আর আসল ? কোনো মেয়ে যদি বিষ্ণুপুরিতে হাত দেয়—ফকির যতই বলুক, সত্তর টাকা কি আশি টাকা জোড়া, প্ল্যাস্টিকের মতো না হলেও পড়ে থাকে না।

এই বিষ্ণুপুরি শাঁখা আবার ফকিরের প্রেস্টিজের ব্যাপার। যদিও মেলায় খদ্দেরেরা নানা রকমের জিনিস কিনে থাকে, ফকিরও চটপট এটা-ওটা বিক্রি করে ফেলে—তবু সে যেখানেই থাক না কেন, মেলা দু' একদিন চলতে না চলতে শাঁখারি হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেটা এই বিষ্ণুপুরি শাঁখা নিয়েই। শাখা তো কেবল বেচে দিয়েই দোকানি খালাস হয় না, শাঁখা পরিয়ে দিতে হয়। মেয়েদের একটা অদ্ভুত ঝোঁক আছে ছোট শাঁখা পরবে—কেন না, কাজের হাত, সব সময়েই বাসনকোসনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগছে, শাঁখা ঢিলঢিল করলে ভেঙে যাবার ভয়। আর ফকির মেয়েদের যেমনই হাত পাক না কেন—তা সে তুলতুলে, কড়া-পড়া বা হাড়-ওঠা যাই হোক, ছোট শাঁখা সে সহজেই তুলে দিতে পারে। তাই তার এত নাম।

তমলুকের মেলায় ফকির পচিশ জোড়া বিষ্ণুপুরি নিয়ে গিয়েছিল—এখন গুণে-গুণে দেখল যে মাত্র চার জোড়া বাকি আছে—না, এই নিয়ে ঘাটালের মেলায় দোকান দেওয়া চলে না। ঘাটাল খুব বেচা-কেনার জায়গা, যে মেলাই বসুক না কেন খুব রমরমা। ফকির ভেবে ফেলল মেলায় ঢোকার আগে অন্য মালের সঙ্গে অন্তত চল্লিশ জোড়া বিষ্ণুপুরি ঘাটাল বাজারের মহাজনের কাছ থেকে গস্ত করে নেবে—তার আগে সুদেবের মাথায় মালপত্র পাঠিয়ে দেবে। এই মনে করে সে ওই চার জোড়া শাঁখা একটা ক্যারি-ব্যাগের মধ্যে আলাদা করে মুড়ল এবং একটা রবার-বন্ধনী খুঁজতে লাগল সেই মোড়কে বাঁধন দেবার জন্য।

'ফরিদা···',

একমুখ হেসে তার শ্যালিকা ছায়া ঘরে ঢুকল—ষোল-সতের বছরের শামলা মেয়ে, এমনিতেই সে খুব প্রাণবন্ত, তারপর সম্প্রতি ওরা যাকে বলে মাথায় জল পড়েছে তাই, এখন সে খুব আহ্লাদী হয়ে উঠেছে।

'ফরিদা, কী করছে··ওমা, একী'··· বলতে বলতে সে হাঁটু মুড়ে মেঝের ওপর বসে পড়েছে। শুধু কি তাই, অত সব ছড়ানো জিনিসপত্রের মধ্যে একটা তুলেও নিয়েছে, 'এটা কী গো, হার? বাঃ, বেশ সুন্দর তো··ও ফকিরদা, ওটা কী··· বালা?'

ফকির ততক্ষণে হাতের মোড়কটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে—কারণ, সে অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ছায়া মেয়েটি মোটেই সুবিধে নয়, তার এত সব মনোহারি জিনিসপত্র সে এই রকম খোলা অবস্থায় দেখলে সব ঘুনেঘেঁটে তো দেখবেই, এক-আধটা না গাপিয়েও ছাড়বে না। আগেই ওই স্বভাব ছিল, আর এখন

আবার বিয়ে হয়েছে—মেলার থেকে ফকির জানে, নতুন বিয়ে-হওয়া মেয়েদের গয়না বল প্রসাধন বল জিনিসপত্র কেনার রাহুর ক্ষুধা—এখন কি ও কিছু আর না নিয়ে ছাড়বে! ওই নকল সোনালি হারটা গেলেও বাঁচা যায়, কিন্তু যদি বিষ্ণুপুরি শাঁখার ওপরই চোখ পড়ে? তাহলে হয়েছে আর কি।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। ছায়া হাত বাড়িয়ে—কিছু শাঁখায় কাল রঙের ফুটকিও ছিল—নকল শাঁখার গোছাটা তুলে নিল, 'ফকিরদা, এসব কী গো···আচ্ছা, আজকাল বুঝি পেলাস্টিকের শাঁখায় এ রকম রঙ হয়··ইসব ত জানিনি··'

'কেন, ঠাকুরকে যে শাঁখা দেয়, তা বুঝি লাল রঙের হয়নি, এ্যাঁ? সেই রকম···'

'হ্যাঁ, ফকিরদা, তোমার আসল শাঁখা নাই?'···

ফকিরের বুকের ভেতর থামচে ধরল, এই রে! কিন্তু সে হেসে, অতি মোলায়েম স্বরে বলল, 'আর, দিদি, আসল শাঁখা! মূলধন কোথা যে উসব রাখব···' ফকির চোখের কোণে নিজের প্যান্টের পকেটটা একটু দেখে নিল—যে রকম উঁচু হয়ে আছে, ছায়ার চোখে না পড়ে গেলে হয়। আবার এও ভয় হল' পকেটের মধ্যে ওই ঠুনকো জিনিসগুলো যে গুঁজে রেখেছে, চাপে না ভেঙে যায়। বলল, 'হ্যাঁ, দিদি, তোর হাত খালি দেখছি, ওই রঙিন শাঁখা পরিয়ে দিব?··'

'আমি পেলাস্টিক শাঁখা পরব! তাহলেই হয়েছে। এমনিতে শাশুড়ি দিনের মধ্যে পাঁচবার অলুক্ষুণী বলছে হাতে শাঁখা নাই বলে·· তাই বলে নকল শাঁখা পরে যাব, তাহলে রক্ষে থাকবেনি। হ্যাঁ, ফকিরদা, দিদির কাছে শুনলাম তুমি ঘাটালের মেলায় যাচ্ছ দোকান দিতে···সেখেনে তুমি বিষ্টুপুরি শাঁখা রাখবে নি?···

ফকির তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল, 'ধুর্, উসব শাঁখার আবার খদ্দের হয় নাকি, যা দাম···'

'না, খদ্দের আবার হয়নি! তোমার ও শাঁখা পরানোর অত নাম হয়েছে, সে কি নকল শাঁখা পরিয়ে? আমার সঙ্গে মস্করা ক'রনি··শুন, আমি ঘাটালে যাব, মেলা দেখতে। জানু, আমি কখনো ঘাটালের মেলা দেখিনি, শুনেই আসছি '

সর্বনাশ, ছায়া কি ঘাটাল পর্যন্ত ধাওয়া করবে নাকি? তাহলেই হয়েছে—এখন না হয় শাঁখাগুলো লুকোল, মেলায় পশরা সাজিয়ে লুকোবে কী করে? এখন সে শতমুখে বোঝাতে লাগল—তুই ঘাটালের মেলায় যাবি? বেশ তো··ঠাকুরের মেলায় যাস, চড়কমেলা কি মকর মেলা, সেই তো আসল মেলা। আর এখন যে ···কী যুবমেলা হচ্ছে উ আমি নিজেই বুঝিনি, তবে গোলমাল হবে খুব···'

'কেনে, গোলমাল হবে কেনে ?···

'বুঝলি নি, যেখেনে রাজনীতি সেখানেই গোলমাল···তাছাড়া মেলার মন্ত্রী আসবে, কত সব গণ্ডগোল মারদাঙ্গা হয় সে জানিস···' তারপর ফকির কণ্ঠস্বরে মধু ঝরিয়ে বলল, 'তাছাড়া তুই এক রত্তি মেয়ে, ওই উদ্ভট্টি ভিড়ের মধ্যে গেলে নির্ঘাৎ পিষে মরবি···'

'তুমি কী যে বল, ফকিরদা, মন্ত্রী এলে মেলা ত ভাল হয়, খারাপ হবে কেনে···'

ফকির আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ, ভাল হয়, আবার খারাপও হয়। কেনে, উল্টা দল আছে তুই শুনিসনি ? ··

'থাক উল্টা দল। ভিড়ের কথা বলছ, ত আমি কি একলা যাব ? তোমার ভাইকে বলব, যদি লিযায়, তাহলে যাব···'

'ও, তাই বল, তাহলে ভাবনা নাই···তাহলে যাস' অগত্যা বলল ফকির।

কিন্তু দেখলে যে ছায়া তবু ওঠে না, এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে থাকে। বলে, 'ফকিরদা, তুমি গুছাচ্ছিলে গুছাও না···আমি শুদ্ধ লাগব ? ···'

'তাহলে তো ভাল হয়' ··মুখে তেতো লাগছে, তবু গিলতে হয়।—'কিন্তু তুই কি পারবি ?'

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ফকির বলল, 'তুই বরঞ্চ আমার একটা কাজ করে দে না, ভাই···তোর দিদি বলছিল, কী সব তেল-মশলা আনাজপাতি বাড়ন্ত, রান্না চড়াতে পারছেনি···এখন এইসব ছেড়ে আমি কী করে যাই বল দতা···তুই যাবি একবার গোবিন্দমুদির দোকানে ? ওই তো মোড়ের মাথায়, শিরিষ গাছের নিচে ···'

'আমি যাব ? আমি সওদা করতে পারব ? '

ফকির বুক পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ছায়ার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'খুব পারবি, চট করে যা দেখি···'

ছায়া চলে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফকির। পকেট থেকে মোড়কটা বের করে ট্রাঙ্কের কোণে রেখে অন্যান্য জিনিস দিয়ে ঢেকে দিল।

স্ত্রী মায়া আবার ঢুকল ঘরে, 'হ্যাঁ গা, তুমি যে বোনকে দোকানে পাঠালে '

'হ্যাঁ, পাঠালাম। এগুলো না গুছিয়ে আমি উঠি কী করে, তুমিই বল···'

'আচ্ছা, তোমার কী কাণ্ডজ্ঞান নাই !' কুটুমকে আবার দোকান করতে পাঠায়···শাস্তু কী মনে করবে, ওর শাশুড়ি শুনলে কী বলবে···'

ফকিরের ভুরু কুঁচকোন—'উ আবার কুটুম হল কী করে। কেনে, এর আগেও তো উ সওদা করেছে··'

'সে তখন। এখন ওর বিয়ে হয়েছে, বরের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে···দেখো, এ নিয়ে ঠিক কথা উঠবে'

ফকির ভাবল কথা উঠবে তো বয়ে গেছে। কী জন্যে লোভী মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়েছে মায়া তা জানে না। সে হেসে বলল, 'দেখ, তোমার বোন আমারও বোন। সেইভাবেই ওকে বলেছি, ভাল মনে জিনিসটা নিলেই হয়···।'

'আমি উসব জানি নি। যদি কথা শুনতে হয়, তাহলে আমি কিন্তু অনর্থ বাধাব' বলে মায়া চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ দেখ, তুমি নাকি ছায়াকে মেলায় যেতে বলেছ। সেখানে ওদের সামনে বেচাল কিছু করনি যেন ওরা তোমার কীর্তি কিছু জানে না···'

'না-না, তাই কি হয়···' ফকির জিভ কাটল, 'এই দেখ না, এই ক'দিন যে ওরা দু'জন এখেনে এসে আছে, আমি এক ফোঁটাও গলায় ঢেলেছি, এ্যাঁ···'

'আচ্ছা, মনে থাকে যেন ··' বলে মায়া চলে গেল। ফকিরও নিশ্চিত মনে চটপট কাজ সারতে লাগল। মনে মনে বলল, 'ধুর্, উ আবার কথা। দু' এক ঢোক না গিললে, শালা আমার মুখে কথাই ছুটবে নি। একটু মাল না টানলে মাল বিক্রি হয়?'

২

আধ ঘণ্টার মধ্যে ফকিরের গোছাগুছি শেষ হল—তোরঙ্গটা, আর দু'টোর জায়গায় একটা ঝোলা। ন'টা বাজতে না বাজতে গামছা টেনে নিয়ে সে স্ত্রীকে বলল, 'আমি পুকুর থেকে চান করে আসছি, ভাত দাও দিকি·'

'ওমা, তোমাকে এখন কী দিয়ে খেতে দিব, শুধু ডাল-ভাত নেমেছে···'

'বাস বাস, ওতেই হবে···পার তো পোস্ত দিও একটু। পোস্ত আছে ত, না কি বলবে তাও নাই'

'কেনে বল দিকি, তুমি যে বললে উ বেলা যাবে, তাহলে এত তাড়া কেনে? এরা সব ঘরে নাই, আমার গঙ্গাজল বলে গেছল, তাদের ঘরকে বেড়াতে গেছে'

ফকির মুখ মুড়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল, 'গেছে আপদ গেছে। তোমার বোনটি কম মেয়ে নয়, এটা ছাড়ে তো ওটা ওটা টানে···'

'হ্যাঁ, বোনের আমার কাজ নাই, খালি-খালি তোমার জিনিস ধরে টানবে; ওদের ভাবনা কিসের···'

ফকির স্ত্রীর কথা গ্রাহ্যই করল না ; উপরন্তু গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'দেখ, তোমাকে একটা কথা বলছি ··ছায়া মতলব করছে বরকে নিয়ে মেলায় যাবে, তা তুমি একটা ভুলান দিয়ে দিও, যেন না যায়···'

এ কথায় রেগে উঠল মায়া, 'হ্যাঁ গা তোমার সন্দ-বাতি কেনে। ওরা ত বলছিল কালকেই ঘর চলে যাবে···এখন বলেছে বলে তার বরও যে লি'যাবে এমন ত শুনিনি ··'

'তুমি শুননি, আমি শুনেছি ··' এইখানে ফকির একটু ভেবে বলল, 'শুন, তক্কাতর্কি নয়। না গেলে ভাল আর যদি যায়ও আমরা জোর করে আটকাবার কে, মেলা সবার···তবে এইটে বলে দিও, আমার দোকানে যেন না যায়। পাঁচটা খদ্দের নিয়ে আমাদের কারবার, সেখানে বউ কি শালী যাওয়া ভাল নয়, হ্যাঁ ·'

'বউ-এর বয়ে গেছে তোমার দোকানে যেতে। তোমার পুঁতির মালা, কি পেলাস্টিকের বালার আমার কুনু দরকার নাই···দু' ছেলের মা আমি, আমার সেই বয়েস আছে ? ' বলে ওখান থেকে ধরধর করে চলে গেল মায়া। রান্নাঘর থেকে হেঁকে বলল, 'আর বোনকে আমি কিছু বলতে পারব নি, যা বলার তুমি বলে যেও·· '

'না, ফকিরের ওসব বলা-টলা হয়নি। বেলা দশটা নাগাদ সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। একটু আগে হল বটে—ওর মনটাই অমনি। যেদিন কোথাও যেতে হবে—সময়টা যত এগিয়ে আসতে থাকে, ওর মনটাও তত আনচান করে ওঠে। অন্য কারণটাও ছিল, মাল স্টক কম, মেলায় ঢোকার আগে ঘাটাল বাজার থেকে কিছু মাল 'গস্ত' করে নিতে হবে।

মাথায় ট্রাঙ্ক চাপিয়ে আর ডান হাতে ঢাউস ঝোলাটা ঝুলিয়ে ফকির যখন ঘর থেকে বেরোল, এখন তাকে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছিল। অনেক লোক আছে বোঝা মাথায় নিলে হাঁটতে পারে না, থপথপ করে ; ফকিরের উল্টো—তার পায়ের গতি বেড়ে যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে বরদা চৌকানের বাস স্টপ পর্যন্ত এই দু' মাইল রাস্তা সে আধ ঘণ্টার আগেই মেরে দিল। মনের মধ্যে ছিল যে সেখানে তোরঙ্গটা নামাবে, কিন্তু দেখল যে তখনই দূরে একটা বাসের মাথা দেখা দিয়েছে—ভালই ; সে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বরদা চৌকানের বাস-স্টপ সব সময়ই লোকে গিজগিজ করছে—আপ-ডাউন যাত্রী তো আছেই, ফকির যেদিন থেকে এসেছে, তার উল্টো দিকেও খড়ার বীরসিং পর্যন্ত ; যার যেদিকে ছুটতেই আছে। ফকির ছুটল না কিন্তু খর পায়ে এগিয়ে

গেল—ঘাটালগামী বাসটা এসে দাঁড়িয়েছে, ভেতরে আর ছাদের ওপর অগুনতি যাত্রী বোঝাই করে। এই মালঝাল নিয়ে বাসের ভেতরে ঢোকার কথা ভাবাই যায় না—দুই দরজার মুখেই তো পিঁপড়ের চাকের মতো লোক লেগেছে। ফকির সোজা চলে এল বাসের পিছনে, সেখানেও লোক ছুটেছে ছাদে উঠবে বলে। ফকির ডান হাতটা সেই ঝোলা সম্ভব উঁচু করে ধরল—ছাদের ওপর যে লোকটা ধারের দিকে বসে আছে তাকে বলল—'ও দাদা, এই যে, একটু ধরে দিন না, প্লীজ '

লোকটা প্রথম কটমট করে তাকাল, তারপর ফকিরের ইংরেজি বুলির জন্যেই হোক, বা তার অনুনয়ের ভঙ্গিতেই হোক, ঝোলাটা তুলে নিল। তখন ট্রাঙ্ক মাথায় রডের সিঁড়ি বেয়ে ফকিরের ছাদে উঠে যেতে অসুবিধে হল না, আর উঠতে যখন পেরেছিল ট্রাঙ্কটা রাখতেও পারল।

ঘাটালের উপকণ্ঠে ময়রাপুকুর স্টপ। আর একটু গেলেই ঘাটাল বাজার; ডান দিকের সড়কে গেলে শিলাই পেরিয়ে স্কুল ময়দান, সেখানেই মেলা বসবে। ফকির প্রথমে বাজারে যাবে। তাই বসেই ছিল—যখন লোকজন ভিড় ভিড় করে নেমে যাচ্ছে, এখানেই বাসটা প্রায় খালি হয়ে যায়—তার চোখ ছিল রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত বসানো বিরাট তোরণটার দিকে; তাকে হঠাৎ ডাকল—'ফকিরদা, ও ফকিরদা…'

চোখ নামিয়ে ইতি-উতি তাকিয়ে তারপর রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে সুদেবকে দেখল, সে হাত উঁচু করে তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, ফকিরদা, নেমে এস '

সুদেব বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের ছোকরা, দোহারা গড়ন, রঙ ফর্সা—দিন দুই আগে ফকির যে ঘাটালে এসে মেলায় প্রবেশমূল্য দিয়ে টিকিট কিনেছিল, তখনই তাকে সাময়িক কর্মচারী নিযুক্ত করে ফেলেছিল। এর আগেকার মকর মেলাতেও নিয়েছিল তাকে। বড় মেলায় একজনের পক্ষে দোকান দেওয়া সম্ভব হয় না—কত রকম মালপত্র ছড়িয়ে পশরা দিতে হয়, লোকজন এটা তুলে নিয়ে দেখে, তো ওটার দিকে হাত বাড়ায়—সব চোখেচোখে রাখতে হয় কিনা।

সেই সুদেব উদ্বিগ্ন হয়ে ওকে ডাকছে, 'এখানে নেমে পড়, কারণ আছে …'

ফকিরও শঙ্কিত হয়ে উঠল, সুদেবের সাহায্যে মালপত্র নামিয়ে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, আমাকে নামালি কেন। তাছাড়া, তুই এখন এখেনে যে, তোর তো বাজারে বেলা একটার সময় আমার সঙ্গে জুটবার কথা ছিল …'

'মেলায় আগে চল দিকি, পরে বাজারে যাবে। আগে দোকান পেতে দিয়ে বসি, তা না হলে জায়গা বেদখল হয়ে যাবে; গতিক ভাল নয়…'

সুদেব যা খবর দিল, সেটা সুবিধের নয় বটে। মেলার কর্তৃপক্ষ টাকা জমা নিয়ে দোকানের জায়গা বিলি করেছিল বটে, সব বিলিও হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু প্রার্থী অনেক, অনেকেই দোকান দিতে চায়। যারা পায়নি, তারা উল্টো পার্টির লোককে ধরেছে—আজ সকাল থেকেই নানা রকম লোকজন ঘোরাফেরা করছে। উটকো লোককে জোর করে বসিয়ে দিলে তখন জোর করে ওঠাতে হবে। এবং একবার গণ্ডগোল লেগে গেলেই হল, হাতাহাতি ইঁট-পাটকেল কি বাকি থাকবে!'

তার মানে, সকালে ফকির শালীকে হটাবার জন্য তামাশা করে যে গণ্ডগোলের কথা বলেছিল, সেটা তাহলে সত্যি হতে চলেছে! সর্বনাশ!

'তাইতো রে, এ রকম তো কখনো শুনিনে। আচ্ছা, তাই চল' ফকির ঢোক গিলে বলল।

মালপত্র তুলে নিল দু'জনে—ট্রাঙ্কটা সুদেবের মাথায় ; ফকিরের কাঁধে ঝোলা।

ওরা এগোতে গিয়ে দেখল, রিক্শর ওপর মাইক চড়িয়ে মেলার ঘোষণা করতে করতে চলেছে। বেলা চারটেয় উদ্বোধন করবেন মাননীয় মন্ত্রী (এখানে দপ্তর এবং নাম বলল)—দলে দলে যোগদান করুন। চার দিনে মেলায় কী কী হবে, তার ছাপানো ইস্তাহারও বিলি করছে, একটা কাগজ ফকিরের হাতেও গুঁজে দিল। মূল মঞ্চে বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিচিত্রানুষ্ঠান বসে আঁকো যোগ ব্যায়াম যাদুবিদ্যা আতসবাজি যাত্রাভিনয়—

সুদেব তাড়া দিল—'তুমি যে আবার পড়তে শুরু করে দিলে? চল'

ফকির নিঃশ্বাস চেপে বলল, 'এ যে বিরাট ব্যাপার, এতটা ভাবিনি'

'কেনে, তুমি যেমন বিশ দফা মাল সাজিয়ে দিবে, ওরাও তেমনি পর পর মাল দিয়ে যাবে, কোনটা নেবে নাও'

ফকির ওই অবস্থাতেই একটু হাসল—'তুই তো বেশ কথা শিখেছিস আগে তো খুব মুখচোরা ছিলি। আমরা মাল সাজাব, আমাদের ধান্দা দু'টো পয়সা রোজগার, ওদের কী?···'

'সবারই ধান্দা আছে মন্ত্রীর নাই? উল্টো পার্টির নাই? শুন, আমার মন বলছে এই মেলায় গণ্ডগোল বাধবেই, সব বুঝছি···'

'কেনে একথা বলছিস তুই?···'

'শুন ঘাটাল বাজারে তো দু'বেলা যাচ্ছি, আঁচে আঁচে বুঝছি সব। দোকানদার ফড়ে মহাজন সব রাগে ফুঁসছে, অথচ কিছু বলতে পারছে নি, তারা কি সব চুপ

করে মেনে নেবে বলতে চাও? কেনে, তুমি তো দু'দিন আগে এসেছিলে, কিছু বুঝতে পারনি? সব ব্যবসায়ীকে এসব মেলার জন্যে চাঁদা দিতে হয়, তারা দিতেও চায়···কিন্তু ছোট-বড় আছে, যার দশ টাকা দেবার ক্ষমতা, তার থেকে পঞ্চাশ টাকা খিঁচে নিলে মন-মেজাজ কী রকম হয়, তুমিই বল। তখন যদি সে উল্টো পার্টির লোককে ধরে · আবার মেলার জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি, সেটা ব্যবসায়ীর লোভও বলতে পার, আর ওই সব অসন্তুষ্ট লোকদের কারচুপি, তাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফকিরদা, তুমি সামলে কেনে? · '

হাঁটতে হাঁটতে ওরা শিলাই নদীর পুলের ওপর এসে পড়েছিল। ফকির বলল, 'আমি ভাবছি দোকান দিব কি দিব নি। আগে ঠাকুরদেবতার মেলায় এসেছি, কুনু গণ্ডগোল হয়নি · ছাপোষা ফিরিআলা, রাজনীতি পার্টিবাজি উৎসব বুঝিনি···ধর, যদি ভাঙচুর লুটপাট আরম্ভ হয়ে গেল, মালঝাল পেতে বসব···'

মনে হল সুদেবও ভাবিত হয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা ঝেড়ে ফেলে দিল—'না, দাদা, দোকান দিতে এসেছ, দাও। টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছ, ভয় পেয়ে ফিরে গেলে ত চলবে নি। আর তেমন তেমন যদি দেখি, তাহলে তুমি মাল গুছাবে আর আমি লাঠি ধরব, হ্যাঁ '

৩.

সুদেব এবং ফকির যতটা ভয় পাচ্ছিল সে রকম কিছু হয়নি। তবে হয়রান এবং গণ্ডগোল হয়েছিল অন্য দিক থেকে।

বিরাট স্কুল-ময়দানের অনেকখানি জুড়ে মূল-মঞ্চ, প্রদর্শনী কক্ষ, সমাবেশ-স্থল ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট ছিল ; খুব সামান্য অংশে দোকান-পাট বসাবার জায়গা। এর মধ্যেও আবার দুটো ভাগ আছে। যারা উচ্চ মূল্য দিয়ে স্টল ভাড়া করেছিল, তাদের নাম নম্বর নির্দিষ্ট ছিল—কিন্তু যারা জমির ওপর দোকান দেবে তাদের বসাবার কোনো সুশৃংখল ব্যবস্থা ছিল না।

সুদেব এবং ফকির উভয়েই ঘাড়ে মোট নিয়ে এত সব লোকজনের মধ্যে খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। যাদের মেলা-কর্মী বলে মনে হচ্ছে, তাদেরই জিজ্ঞেস করতে লাগল। দুই ব্যাজ-পরা স্বেচ্ছাসেবক উত্তেজিত ভাবে তর্ক করতে করতে ওদের নাকের ওপর দিয়েই চলে যাচ্ছে দেখে সুদেব বলে উঠল, 'ও দাদা শুনেছেন, আমরা কোথায় বসব বলতে পারেন? এই দেখুন আমাদের টিকিট ···'

বাধা পাওয়াতে বিরক্ত হল ওরা—কে না হয় ? বয়স্ক লোকটি বলল, 'কোথায় বসবেন ? এই আমার মাথায়…'

বাবাঃ, কী কথার কী উত্তর ! সুদেবের মাথাতেও রক্ত চড়ল—'তাই বসছি, তখন ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না…

আশ্চর্য এই, গাল খেয়েও তারা উত্তর দিল না, চলে গেল সেই রকম তর্ক করতে করতে। এরপরে ব্যাজ না-পরা তিনজন লোক এল, 'দেখি আপনাদের টিকিট… এ-তেইশ, এদিকে না, ওই দিকে যান, ওই প্রান্তে…'

সেই প্রান্তটা যে কোথায় তা ফকিরদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। দেখল যে অন্য দোকানিরাও একই অবস্থায় পড়েছে, এবং কেউ কেউ যেখানে পারছে ব'সে পড়ছে।

'ফকিরদা, চল, আমরাও বসে পড়ি, তা না হলে আর জায়গা পাবে না বলেছিলাম না তোমাকে গন্ডগোল হবে .'

ওরা বসেও পড়েছিল, কিন্তু তাতে কোনো সুবিধে হয়নি। দু'বার মেলা-কর্মীরা ওদের উঠিয়ে দিয়েছিল, একবার অন্য এক দোকানিই ওঠাল ওদের। শেষ পর্যন্ত যখন ওরা মালঝাল পেতে বসতে পারল, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল, ওদিকে মন্ত্রীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছিল।—

লোকে কথায় বলে, যার শুরু ভাল তার শেষও ভাল। ফকিরের হয়েছিল উল্টো—প্রথম দিন গোলমাল হয়রানি, বিক্রি হয়নি বললেই হয় ; কিন্তু বাকি তিন দিনে অজস্র লোক-সমাগম আর প্রচুর বিক্রি হয়েছিল। বিকেল হতে না হতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোক বাড়ত।

দোকানিদের একদিকে যেমন বিক্রি করতে হয়, তেমনি অন্য দিকে করতে হয় কিনবার ব্যবস্থাও। এই যুব-মেলায় ফকিরের একটা সুবিধেও হয়েছিল—ঘাটালের বাজার খুচরা আর পাইকারি মালের জন্য খুব প্রসিদ্ধ, যখন যে মাল কিনতে চাও সেই মালই পাওয়া যাবে। ফকির মেলায় দুপুরের পর দোকান দেয়, কাজেই সকালের দিকে শিলাইএর ওপারে বাজারে গিয়ে মাল খরিদ করে আনতে তার কোনো সমস্যাই হয়নি।

মেলার প্রথম দিককার অসুবিধে কেটে গেছে, খুব কেনাবেচা হচ্ছে—এতে কোন ব্যবসায়ী আর খুশি না হয় ; ফকিরও হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ দুটো কারণে তার খুশিটা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

সুদেব, তার পিস্তুতো ভাই—গেল মকর মেলাতেও ছিল বটে কিন্তু তখন

কেমন ছিল ম্যাদা-মারা। এই ছ'মাসের মধ্যে ছেলেটার খোল-নলচে যেন বদলে গেছে। খদ্দের হাত করা, মাল গছানোর কায়দা, সব ব্যাপারে সে তুখোড় হয়েছে কী রকম। আর খুব বিশ্বাসী। ফকিরকে যখন মাল গস্ত করতে বা অন্য কারণে বাইরে যেতে হয়; তখন সুদেবের হাতেই দোকান থেকে। কোনো দিন সন্দেহের কারণ ঘটেনি।

দ্বিতীয় কারণ বিষ্ণুপুরি শাঁখা নিয়ে। যতবার সে মেলায় যায়, ততবারই তার মনে এইটে উসখুস করতে থাকে, এবারে তার নাম ছড়াবে তো? মেয়েদের শাঁখা পরিয়ে খুশি করতে পারবে কিনা। অন্য মাল যতই বিক্রি হোক, তাতে তার মন ভরে না। দিনের প্রথম শাঁখাটি কোনো মেয়ের হাতে তুলে দিতে পারলে তবেই তার তৃপ্তি। এ ক্ষেত্রেও এবারে তার মনে খুশির জোয়ার লেগেছিল।

প্রথম দিনের কথাই ধরা যাক। সেদিন তো গোলমালেই কাটল, বেচাকেনা এক রকম হলই না। এখন ওদিকে মূল মঞ্চে মেলার উদ্বোধন হয়ে গেছে, মন্ত্রী তাঁর মোটর-বাহিনী নিয়ে ফিরে গেছেন সেটাও ফকির তার দোকানে বসেই দেখেছে। মেলায় লোকজন কম, যা আছে সেটা ওই মূল মঞ্চের দিকে। প্রদর্শনী এদিকে স্টলগুলোতে দু'এক জন মেয়ে ঢুকতে দেখা যায়, তবে ফকির বুঝতে পারে ওরা কিনবে না কিছু, কৌতূহলে দেখে বেড়াচ্ছে আর কি। ফকির সুদেবকে দু-কাপ চা আনতে পাঠিয়ে বিমর্ষ মুখে বসেছিল—সারাদিনের ছোটাছুটিতে পরিশ্রমে তার ঝিমুনি ধরে গিয়েছিল।

'ও বাবা, ফকির, তুমি এখানে দোকান দিয়েছ?'

চমকে মুখ তুলে তাকাল ফকির—তার সামনেই দু'তিন জন মেয়ে। তার মধ্যে বর্ষীয়সী মহিলাই কথা বলেছে।

ফকির একটু অনিশ্চিত বোধ করল, 'আপনি আমাকে চেনেন'···

'তা তুমি কি বাবা আমাকে চিনতে পারলে নি? এখেনেই আমাদের বাড়ি ·· সেই যে গেল মকর সংক্রান্তির মেলায় তুমি আমাকে শাঁখা পরিয়ে দিয়েছিলে ··এই দেখ' বলে বৃদ্ধা তার দু'হাত তুলে দেখাল।

ফকিরের চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হল, 'মা, সে শাঁখা এখনো আছে আপনার?'···

'হ্যাঁ, আছে বই কি, বাবা। তোমার হাত খুব পয়মন্ত··তাই মেলায় এসে ইদিকটায় এলাম··এই এরা সব মন্ত্রীর মিটিংএ যেতে চাইল, তাই নিয়ে গেলাম, নইলে উসব আমরা কী বুঝি··তারপর ইদিকে এসে চোখ বোলাচ্ছি, ভাবছি

ফকিরকে যদি দেখতে পাই তাহলে বউমাকে শাঁখা পরিয়ে নেব। তা হ্যাঁ বাবা, তোমার বিষ্টুপুরি শাঁখা আছে ত, ভাল ?'···

ফকিরের চকিতে মনে পড়ল, ট্রাঙ্কের কোণে চার জোড়া শাঁখা রেখেছে; তাড়াতাড়ি বের করল সেগুলো। মোড়কটা খুলে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই দেখুন, মা···'

বৃদ্ধা তার নতুন বউমাকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, বউমা, পছন্দ কর···' কিন্তু বউমা হাত দেবার আগে সে নিজেই এগুলো তুলে নিল, 'হ্যা, বাবা, তোমার কাছে আর নাই ? ই ত তেমন ভাল নয়···গেলবার যে এক ডালা ভর্তি শাঁখা দেখেছিলাম ···'

বৃদ্ধা বাবা-বাছা করছিল বটে, কিন্তু খুঁতখুঁতুনি'ত কম ছিল না। বুঝে নিয়ে ফকির হেসে বলল—হাসলে এবং কথা বললে তার কালো শ্রীহীন মুখ প্রাণবন্ত এবং আন্তরিক হয়ে ওঠে—'না মা, এ আসল শাঁখা, আমি নিজে বিষ্টুপুরে যেয়ে নি এসেছি··বাছাই শাঁখা, দেখলেন না তোরঙ্গের কোণে রিজার্ভ করে রেখে দিছিলাম (এটা ঠিক নয়), যদি আপানার মত চিনা-জানা লোক পাইত দিব (একটু আগে চিনতে পারছিল না)···দেখি, বোনটি, তোমার হাতখানা···বাঁ হাত আগে দাও, মেয়েদের বাঁ দিক আগে···'বাঃ, এ তো চমৎকার হাত, মা···' এটা সে বলল বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে—'এই দেখুন, মা, এই জোড়াটা দেখুন, কেমন মানিয়েছে। বলে দে শাঁখা জোড়া' (এইভাবেই বাঁধা থাকে) বউটির হাতের পাশে রেখে দেখাল। ইতিমধ্যে সে বউটির হাতটা নিজের বাম জানুর ওপর টেনে নিয়েছে—'বলুন, মা, তাহলে পরাই ?'···

বৃদ্ধা বলল, 'তুমি যখন বলছ, বাবা, তোমার কথায় পেত্যয় যাই··বউমা, ওই জোড়া পরবে তো ?'···

বউটি হাসি মুখে ঘাড় কাত করেছে। আর তারই মধ্যে ফকির হাত থেকে খুলে ফেলেছে ব্রোঞ্জের ওপর সোনার পাত বসানো চুড়িগুলো—এখন ক'টা মেয়ে আর পুরোটাই সোনার পরে ?—তারপর বাঁ হাতে শাঁখা তুলে দিল; এরপর ডান হাত—মেয়েদের ডান হাতটা কাজের বলে একটু শক্ত হয়েই থাকে, কিন্তু বাচ্চা বউএর হাত তখনও শক্ত হয় নি, ফকির অবহেলে সে হাতেও শাঁখা পরাল; আর চুড়িগুলো থাকার যথাস্থানে তুলেও দিল।

সঙ্গের তৃতীয় মেয়েটিও বউ, তবে একটু বয়স্ক, সে ইতস্তত করে বলল, 'তোমার কাছে হার নাই, গলার হার ?'···

'থাকবে না কেন, সোনার রুপোর সব আছে (মানে, নকল), কত ডিজাইনের দেখবেন ? কিন্তু দিদি, আপনার হাতে তো শাঁখা নাই, পরেন না কেন…আচ্ছা, না পরেন, দেখুন, না হয় পরের বার কিনবেন'…এতক্ষণে সেই মেয়েটির বাঁ হাত টেনে নিয়েছে ফকির, এবং যেন একটু নরম করে নিতে চায়, এইভাবে একটু টিপে-টুপে দিচ্ছে—'আরে, দিদি, হাতের আর কিছু বাকি রাখেন নি দেখছি…খুব মশলা বাটেন ? একটু বড় শাঁখা লাগবে, এই জোড়াটা দেখুন তো'…

ফকির ঠিক জানে, এই মেয়েটি প্রতিবেশিনী এবং তার শাঁখা পরার খুব ইচ্ছে, বিশেষ করে ছোট বউটি যখন পরেছে। এবং একটু পরেই ওর ভাবাটা সত্যি প্রমাণিত হল—মেয়েটি কাঁচুমাচু মুখে সে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুড়িমা, এক জোড়া কত দাম ? অত টাকা আমি নিয়ে আসিনি'…

বলে কী ?—ফকির প্রমাদ গুণল। খদ্দেরটা ফসকে যাবে ? এক্ষুণি মনঃস্থির করে ফেলল সে, এবং একমুখ হেসে বলল—'আরে, এই কথা ! আগে শাঁখা পরুন। আর টাকা ?…মা যখন সঙ্গে আছেন আমার ভয় নাই। আজ যা আছে দিন, কাল হোক পরশু হোক বাকিটা দিয়ে যাবেন'…

ফকির ভুলে গেল, এই মেলায় তার কী অসুবিধে হয়েছিল, কার কোন ধান্দার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাকে। তার মন খুশিতে ভরে উঠল—প্রথম দিন অন্তত দু' জোড়া শাঁখা সে বিক্রি করতে পেরেছে ; তাছাড়াও দুই মেয়েকে গছাতে পেরেছে একটা করে ইমিটেশন হার। আরো ভাল যে, তার ধরে রাখতে হয়নি, বুড়িমার কাছেই বাড়তি টাকা ছিল, সব মিটে গেছে।

এই যে বউনি হল, তারপর তিনটে দিন তার বেচা কেনা উপচে পড়তেই থাকল—ঘাটাল বাজার থেকে কেবল বিষ্ণুপুরি শাঁখাই তাকে আমদানি করতে হয়েছে প্রায় সত্তর জোড়া ! তৃতীয় দিন বেলা চারটে নাগাদ যখন লোক লোকারণ্য, ফকির আর সুদেব দু' জনেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তখন ফকির বলল, 'তুই একলা কিছুক্ষণ চালা, আমি একটু ঘুরে আসি' আর চোখ টিপে দিল।

সুদেব আকাশ থেকে পড়ল, একটু বিরক্তও হল—'তুমি এই সময় বাইরে যাবে ? সে তো তুমি সন্ধ্যার পর যাও। না, তুমি চলে গেলে আমি একা সামাল দিতে পারব নি'…

'খুব পারবি, এই যাব কি আসব, ধর দশ মিনিট লক্ষ্মী ভাইটি ঠিক জুত পাচ্ছিনি'…

দশ মিনিট নয়, তবে খুব দেরিও হয়নি—মিনিট কুড়ির মাথায় ফকির ফিরে

এসেছিল। সুদেব একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা, মেলার মাঝখানেই না নিলে কি হয় না? পরেও তো টানতে পার।'···উত্তরে ফকির একটু দার্শনিক বনে গিয়েছিল—'ধুর, মেলার সময় নেশা না করলে হয় শালা বেচাকেনা করতেই পারবনি। আর ধর কেনে. ইসব মেলা-টেলা সব নেশার ব্যাপার। যারা মেলা করছে, কি যারা যাত্রী, সব নেশার ঘোরে চলছে দেখিসনি···একটু নেশা না করলে হয়'···

সেই ফকির ফিরে এসেই—তখন সে বদলে গেছে বেশ—সুদেবের ওপর অর্ডার ঝাড়ল—'দিয়ে দে, উনি যা বলছেন'···

মানে, এক মেয়ের সঙ্গে সুদেব তখন একটা রুপালি চেন নিয়ে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটা খুব ঝুনো। সুদেব পাঁচ টাকার কম দেবে না, মেয়েটাও তিন টাকার বেশি উঠবে না। চেনটার কেনা দাম সুদেব জানে, তিন টাকা কয়েক পয়সা; ওই দামে দেওয়া সম্ভব নয়।—'তাহলে কিনবেন না, ছেড়ে দিন' না, মেয়েটি ছাড়বেও না। মেয়েটির যুক্তি অদ্ভুত—'এতক্ষণ ধরে যে আমি খেটে-খেটে পছন্দ করলাম, তার দাম নাই? যেই পছন্দ করলাম, অমনি তার দাম বেড়ে গেল! ওটার দাম দু'টাকার বেশি নয়···তোমরা দোকানদারেরা সব গলা-কাট···'

সেই কথার মুখেই ফকিরের হুকুম জারি হয়েছিল। সুদেব হাঁ হয়ে গেল—ফকির কি লোকসান করে বিক্রি করবে নাকি? কিন্তু মালিকের কথা, সে বলবার কে। ব্যাজার মুখে—এতগুলো লোকের সামনে সে অপ্রস্তুতও হয়েছিল—হারটা দিয়ে দিল।

তার কিছুক্ষণ পরেই একটা উল্টো পালা অভিনীত হল। একটি পনেরো-ষোলো বছরের শালোয়ার-কামিজ পরা চুল-ঝুলঝুল মেয়ে সেই একই রকম হার হাতে তুলে নিয়েছিল। সুদেব এবার হাতে রেখে দাম বলল, ছ'টাকা। এদিক থেকে ফকির হাঁ হাঁ করে উঠল, 'আরে, করিছিস কী? ওই চেন ছ' টাকায় দেওয়া যায়? অসম্ভব! সাত টাকার এক পয়সা কমে হবে নি···'

মেয়েটি থতমত খেয়ে গেল—সে মোটেই তুখোড় নয়, দরদাম করতে জানে না—খানিকটা কুণ্ঠিত স্বরে বলল, 'কেন, মিন্টুদি যে তিন টাকায় কিনেছে, আমাকে দেখাল, একই জিনিস '

সর্বনাশ, মিন্টুদি মানে সেই আধঘণ্টা-আগেকার মেয়েটি নয়তো? কিন্তু ফকিরকে থামায় কে? সে শাঁখা পরাচ্ছিল—ওই রকম কাজের ভাগ হয়ে গেছে,

ফকির প্রধানত শাঁখাই পরায়, অন্য মাল বিক্রি করে সুদেব—বলে উঠল, 'তিন টাকায় ওই চেন। হাসালে বোন·· হ্যাঁ, তাও আছে. দেখাচ্ছি—' বলে পাশের বাক্‌সটা থেকে একটা চেন তুলে নিল (একই জিনিস), বলল, 'এই মাল নেবে? ঠিক একই জিনিস মনে হচ্ছে তো?—' ফকির খিকখিক করে হেসে উঠল—'নিয়ে যাও, তিন টাকা কেন, আড়াই টাকায় দিয়ে দেব—(সুদেবের বুকে টিপ করে উঠল) এক মাস যাবে নি, রঙ উঠে লোহা বেরিয়ে যাবে। শুনে, বোন. তুমি ঠিক জিনিস পছন্দ করেছ, আসল একনম্বর মাল—সুদেব ভাই জানে না। তাই দাও. ছ'টাকাই দাও—বলেছে যখন—'

এর কিছুক্ষণ পরে আবার সুদেবের ওপর ফকিরের ফোকর দালালি করতে হল, এবার তার নিজের শ্যালিকা ছায়াকে নিয়ে। স্বামীর সঙ্গে সে ঠিক মেলায় চলে এসেছে, এবং খুঁজে খুঁজে ফকিরের দোকানও বের করেছে।

'ফকিরদা···'

একটু কথা আছে। মায়া বোধ হয় ফকিরের কথা মতো বোণকে 'বুঝতে' দেয়নি—কিন্তু এদিকে সতর্ক ফকির এক সময় সুদেবকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল, সে ভুলল না। সে ছায়াকে নিজের কাছে ডেকে নিল—'কী. ভাল আছ ত? দাদা, ভাল আছেন? এদিকে আসুন ·ফকিরদার নিঃশ্বাস ফেলার সময় আছে? ধুর ··'

সত্যি কথা বলতে কি, সুদেবেরও নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না, কিন্তু তারই মধ্যে ওদের আটকাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ছায়া ফকিরের ঘরের মধ্যে যত মুখরার মতো কথা বলুক না কেন, এই পরিবেশে ঠিক মুখ খুলতে পারল না। ফকিরের দিকে তাকিয়ে একটু সমীহও হল—সে এখন এক মনে একটি মেয়েকে শাঁখা পরিয়ে চলেছে, যেন এদের চেনেই না। সেটা অবশ্য ভাল নাও হতে পারে—কেন না, শাঁখা পরানো সত্যিই কঠিন কাজ, বিশেষ করে মেয়ের হাতে যদি সেটা তুলতে শুরু করে দিয়ে থাকে। একটুও অন্যমনস্ক হলে চলে না। ধরা যাক, পরাতে গিয়ে শাঁখা একটা ভেঙে গেল; সেটার দাম খদ্দের দেবে না—ফকিরের নিজের ক্ষতি। কিন্তু তার থেকে বড় কথা, শাঁখা পরাতে গিয়ে ভেঙে গেলে এয়োতি মেয়েরা সেটাকে অলক্ষণ বলে মনে করে। ফকির কিছুতেই কোনো মেয়ের মুখ চূণ করে দিতে চায় না।

ছায়ারা দাঁড়িয়েছিল দোকানের এ প্রান্তে সুদেবের কাছেই; সে ফকিরের সামনে ওই মেয়েকে শাঁখা পরতে দেখে করুণ স্বরে বলল, 'আমি এক জোড়া শাঁখা পরতাম

সুদেব যেন সে কথা শুনতেই পায়নি, একটা প্যাকেট সমেত আলতার শিশি ছায়ার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ছায়াদি, আলতা নেবে না? শ্রীমতী আলতা'

'হ্যাঁ, নিতাম তো…'

ছায়া শুধু শ্রীমতী আলতাই নিল না, শ্রীমতী সিঁদুরও এক কৌটো নিল। সুদেব শান্তুকে বলল, 'দাদা, ওদিকে এগজিবিশন দেখেছেন? ঘুরে আসুন, চমৎকার সব দেখার জিনিস আছে…'

'আগে আমি শাঁখা পরে নিই…' ছায়া ভয়ে ভয়ে বলল।

'শাঁখা পরবে?' সুদেব ফিসফিস করে বলল, ভাব যেন অন্য খদ্দের শুনতে না পায়—'কাল ভাল শাঁখা আমদানি হবে। কাল এসো আবার, আজ সব রদ্দি জিনিস'

'ও কিন্তু কাল আমাদের আসা হবে নি, সকালে চলে যাব আচ্ছা…' বলে হতাশ লুব্ধ চোখে ও দিকটায় তাকাল।

এসব ফকির নিশ্চয়ই শুনছিল, চোখের কোণেও দেখছিলও। এরপর সে বলে উঠল—যেন সে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে এবং শ্যালিকা আর ভায়রাকে এই প্রথম দেখছে—'আরো শান্তু ভাই না কি, সব ভাল ত? এখন কোত্থেকে…আমাদের ঘর থেকেই আসছ তো?'

'হ্যাঁ, দাদা, দিদি এই ক'দিন ছাড়ল নি। আপনি ত এই ক'দিন বাড়ি যান নি'

'যাব আর কী করে। দেখছ তো নিজের চোখে'

ইতিমধ্যে ছায়া সরে ফকিরের সামনে চলে গেছে—একটু সাহসও হয়েছে—যে মেয়েটি এইমাত্র শাঁখা পড়ে উঠে গেল, তার খালি জায়গায় বসেও পড়েছে—'ফকিরদা, শাঁখা খুব রদ্দি? সত্যি বল…'

সুদেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না—ফকির বলল, 'হ্যাঁ, রদ্দি মাল আছে, ভালও আছে। অনেক বিষ্ণুপুরি শাঁখা আছে। এ দেখ…কোন জোড়া পরবি পছন্দ কর'

তারপরেও একটু কথা আছে ফকিরের। ছায়ার শাঁখা পরা হয়ে গেলে শান্তু বুক পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বের করে ফকিরের দিকে বাড়াল, 'আমি তো দাম জানি না'

মাঝ পথেই ফকির ভায়রার হাত ধরে ফেলে ফিরিয়ে দিল—'রাম কহ, তোমরা কি পর? বোনটিকে এক জোড়া শাঁখা পরালাম ওর হাসিমুখ দেখ, আর দেখ কেমন মানিয়েছে।…' বলে ছায়ার হাত দু'খানি শান্তুর দেখার জন্য তুলে ধরে নিজেই খুশি হয়ে উঠল।

কেঁচে গণ্ডুষ

কার্তিক লাহিড়ী

অনেক অনেকদিন পর সুবল একটা গল্প লিখে ফেলল। লিখে উত্তেজিত খুব হয়েই কেমন নার্ভাস বোধ করতে থাকে। গল্পটা আদৌ কিছু হয়েছে কিনা জানার জন্য এমন উতলা হয়ে পড়ে যে সময় দূরত্ব ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে চলে আসে সটান ভূষণের কাছে। ভূষণ অবশ্য অবাক হয় না, সে জানে একটু উত্তেজিত হলে বা সমস্যায় পড়লে সুবল চলে আসে তার কাছে, আরও জানে যে আসার কারণ জিজ্ঞেস করার আগেই সুবল বলে চলবে তার সমস্যার কথা কি করা দরকার এখন ইত্যাদি। কিন্তু আজ এই সময়ে রাত প্রায় ন-টায় এসেও সুবল চোখে মুখে উত্তেজনায় চিহ্ন সব রেখে দিয়ে কেমন চুপ করে আছে, ভূষণ দেখছে—সুবলের চোখ মুখে উত্তেজনার ছাপ থাকলেও একটা লাজুক লাজুক ভাব ছড়িয়ে আছে। তাতে সামান্য অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় সুবলের দিকে।

সুবল সেই দৃষ্টির সামনে বিনত হয়ে পড়ছে তখন, কিছু বলার জন্য তার ঠোঁট নড়ে উঠছে, অথচ কথা স্ফুট হতে চাইছে না মোটে। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেই বোধহয় শেষমেশ লজ্জায় নুয়ে পড়ে বলে ওঠে, একটা গল্প লিখেছি।

গল্প? তুই? বিশ্বাস করতে পারছে না ভূষণ।

সুবল কিছু না বলে শুধু তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

এতক্ষণে ভূষণের চমক উধাও হয়েছে, সে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, এনেছিস? সুবল মাথা নাড়িয়ে জানায়—গল্পটা সে এনেছে।

পড় তবে।

পকেট থেকে গল্পটা বের করতে এখন কুণ্ঠা জাগছে আর লজ্জাও, ছি ছি, ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম, ভূষণ কি ভাবছে, কিন্তু ঐ কুণ্ঠা ও লজ্জার মধ্যেও গল্পটা-পকেট থেকে উঠে আসে, আর সে তাকায় ভূষণের দিকে তখন, পড়বে?

পড়্।

ভূষণ আবার বললে সে গল্পের ভাঁজ খুলে প্রথম পাতা চোখের সামনে মেলে ধরতে কোথা থেকে একটা লজ্জার ঝড় এসে শুইয়ে দিতে থাকে তাকে, পড়া শুরু করতে পারে না তাই।

আহ্ শুরু কর্ তো, ভূষণের বিরক্তি-লহমায় তার দ্বিধার জাল ছিঁড়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে পড়তে শুরু করে :—প্রায় কাক ডাকার আগেই তারা জমায়েত হয়েছিল। এসেছিল মিছিল করে শহরের নানা রাস্তা দিয়ে—নিঃশব্দে। মৌন মিছিলে সামিল হয়েছিল সকলে—পুরুষ নারী, বৃদ্ধ ও বালক। শহরে ঢোকার যতগুলো মুখ আছে সেই মুখ দিয়ে আশপাশ গ্রামেরই শুধু নয় তারপরের তারও পরের গাঁ থেকে এসেছিল তারা। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবে তেমন সংকল্প প্রতিরক্ষা কিছুই ছিল না তাদের। অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়েও দুর্ভেদ্য শরীরের এক বিশেষ অন্ধকারে একটা শূন্যতা পাক দিয়ে উঠছিল কেবল, গুলিয়ে দিচ্ছিলো সারা শরীর, সেই শূন্যতা ভরাট করার জন্য কে বা কারা বলেছিল ধ্বনি দিয়েছিল—বসে বসে মরার চেয়ে মার খাওয়ার চেয়ে চলো যাই শহরে একবার সেই কথা কানাকানি হতে হতে নিজের ভিতর সেই শূন্যতা মোড়ে দিয়ে উঠলেও তবু কেউ কেউ বুঝতে পারে না তখন, এভাবে ঘরে বসে থাকলে শুধু মরাই সার হবে, মরতে যখন হবেই তখন—

সেই সম্পূর্ণ বাক্য শেষে প্রচণ্ড হৈ চৈ তোলে আস্তে আস্তে, সে ওকে ও তাকে বলতে বলতে শহরে যাবার ইচ্ছেটা—একটা আকার পেতে থাকে যেন—হ্যাঁ, শহরে আছে অফিস কাছারি গুদাম, আছে হাকিম অফিসার, আমরা তাদের সামনে দাঁড়ালে বললে আশা যা চাড়া দিয়ে উঠে উধাও হতে চায় সঙ্গে সঙ্গে, বললেই কি দেবে তারা গুদাম খুলে ? যা চাইবে তাই ? তাহলে এতদিন···সংশয় থেকে প্রশ্ন, প্রশ্ন থেকে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। গরম হয়ে ওঠে চারপাশ। এ গ্রাম সে গ্রাম—সবখানেই যেন একই সঙ্গে চলতে থাকে যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব ঝামেলা। চারপাশের গাঁ গঞ্জ এখন জ্বলছে অনাবৃষ্টি খরায়, জমি ফুটি কাটা—কোথাও একটা দানা দূরের কথা-সবুজ পাতাটি অব্দি নেই, আর এর শুরু হয়েছে সেই কবে থেকে চৈত্রেরও আগে ফাল্গুনে, জল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে পুকুর নালায়। গরু মোষ মানুষ—বহু বিচার করা চলে না তবু। পদ্মের নাল থেকে শুরু করে কলমি, মাটির গভীরের কন্দ—কিছুই বাকি নেই আর। রন্দুরে আগুন ঝরছে চারদিকে, পেটের মধ্যেও তার আচ ধিকি ধিকি জ্বলে না, জ্বলছে সূর্য কুণ্ডের মতো।

কি করবে তারা তবে ? কোথাও কিছু নেই যখন, তখন—

ধ্বনি উঠল, শহর চলো শহর চলো।

হাঁ হাঁ শহর, প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনিতে ভাবনার হয়ে যায় চার চার, তখন দ্বিধা

থাকে না কারোর, শহর কথাটা কানে যেতেই আমার মশাল জ্বলে ওঠে চোখের সামনে মনের মধ্যে তখন···

পড়া থামিয়ে সুবল তাকায় ভূষণের দিকে, বোরিং লাগছে খুব ? পড়বো ? ভূষণ চোখ খুলে হাসে, পড়ে যা।

সুবল ভূষণের পড়ে যা–র মধ্যে তার মন পড়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই পড়তে শুরু করে আবার :—

আমরা যাবো, কে একজন বহুবচনে বলে উঠতে সকলেই সরব হয় তখন, হ্যাঁ যাবো, আর অবাক কাণ্ড গ্রামে গ্রামে সেই রোল একই সঙ্গে কল্লোলিত হয়ে হয়ে মিছিল রূপ নেয়। কাউকে কোনো ঘোষণা করতে হয় না, যেন সকলের মনের কথা যাবো যাবো সারিবন্ধ করে পুরুষ নারী বৃদ্ধ ও বালকদের। হাতে তাদের কোনো ফেস্টুন নেই কিংবা ঝাণ্ডা, তাদের হাড্ডিসার-অনাবৃত শরীর কোটরাগত চোখ চোখের নিচে পুরু কালির ছোপ কষ বেয়ে গ্যাঁজলা পেটের খোঁদল পিঠে সেঁটে যাওয়া বুকের ধুকপুকি স্পষ্ট নজরে আসা ইত্যাদি জানিয়ে দিচ্ছে—এরা কারা, কি হতে পারে আর—

একদল অনাহারী উপবাসী মানুষ।

যাদের মুখের কথা মূক হয়ে গেছে এখন গাঁ থেকে অবিরাম চলায়, ধ্বনি দেওয়া দূরের কথা, তারা নিজেদের মধ্যে একটি শব্দও বিনিময় করতে পারছে না, যেমন পারছে না নিজের কঙ্কাল টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে সেই অভীষ্ট জায়গার—শহরে।

তবু যেতে হবে, সেখানে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই আর।

কিন্তু শহরের কোথায় সেই জায়গা ? যে বা যারা জানে সে বা তারা কি মিছিলের আগে আছে কোথাও—যারা চলেছে তারা জানে না তেমন কেউ কিংবা কয়েকজন আছে কিনা ! তারা চলেছে মন্ত্রমুগ্ধের মত—শহরে গেলে ইচ্ছাপূরণ হয়ে, অন্তত বাঁচার জন্য দু-মুঠো চাল পাবেই পাবে···

মিছিল চলেছে নিঃশব্দে। শহরের সব মুখ দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে কঙ্কালের সার। শহরবাসীদের ঘুম ভেঙ্গে গেলে জেগে উঠে এদের দেখলে আতকে উঠত তারা—কার থেকে মৃতরা যেন উঠে এসেছে সার দিয়ে, আর তেমনি মনে হয় শহুরেদের যখন দেদার কাক ডেকে ওঠে, এবং চারদিক ঝলমলায় সকালের রন্দুরে। প্রাতঃভ্রমণকারী স্বাস্থ্য উদ্ধারকারীর দল এই মিছিল দেখে মাঠের দিকে যেতে সাহস পায় না আর, কে এরা ?

মাঠ ভরে যাচ্ছে—অগণিত প্রেতের মিছিল—কদমতলার মাঠ। এবার উপচে ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়, ততক্ষণ জমায়েতে শব্দ হয় না কোনো। তারা এসে জড়ো হয়েছে এইমাত্র। কিন্তু এখানে কেন তার উত্তর জানা নেই তাদের। কে তাদের এখানে নিয়ে এলো—তাও জানে না তারা। শহরে আসার ঝোঁকেই কি তারা চলতে চলতে এখানে জমে যাচ্ছে, নাকি শহরের মধ্যখানে বলে চারদিকের রাস্তার কদমতলার চৌমাথায় মিলেছে বলে আর তার গায়েই এই মাঠ বলে এখানে নেমে গেছে তারা বিশ্রাম নেবার জন্য এখন প্রচুর চলার পর ?

কাকে কে জিজ্ঞেস করবে, কে জানে উত্তর এসবের ? এইটুকু মাত্র জানে গ্রাম থেকে তারা বেরিয়ে পড়ে গভীর রাতে শহরের দিকে, জানে শহরে গেলে অভীষ্ট পূরণ হবে। তাদের চাওয়া-ও খুব সামান্য—বাঁচার জন্য খাবার শুধু, পেটের ভিতর একটা অগ্নিকুণ্ড দারুণ হয়ে উঠছে, সেই আগুন মারাত্মক হয়ে সব পুড়িয়ে খাক করে দেবে, খা-খা করছে উদর, একটা শূন্যতা মোচড় দিয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে দিতে চাইছে সবকিছু, তাই—

ততক্ষণে ভাদ্রের রোদ চড়চড়িয়ে উঠছে, আর এদের মাথার উপর ছাউনি নেই কোনো, মাঠের কিনারে বা মাঠ ছাড়িয়ে কোথাও ছায়াতরু, কেবল মাঠের গা ঘেঁষে পিচের যে বড় রাস্তা এদিক ওদিক চলে গেছে তার পশ্চিম দিকে আছে সারি সারি দোকানঘর যা এখন বন্ধ, অতএব ছায়া কোথাও নেই আর

আর মানুষ বলেই ঐ কঙ্কালসার শরীর বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে অবিরল এবং তাদের অস্থির করে তোলে। ততক্ষণে ঘুমন্ত শহর জেগে উঠছে আরও। রাস্তায় দু-চারজন পথচারীকে দেখা যায়, দু-একটি রিকশাও মধ্যে মধ্যে। কিন্তু তারা মানুষের ব্যূহ ভেদ করে চলতে পারে না ঠিকঠাক। তবে বুঝে ফেলে তারা—আজ ভুখ্ মিছিলের কল্যায় চলে যাচ্ছে চলে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। আর সে-কথা চাউর হয়ে যায় বেশ—ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়ার মুখে কিংবা তার ও পরে বাজারমুখী হতে গিয়ে কিংবা অফিসমুখী হলে—যাওয়া হয় না আর, ফিরে আসতে হয় নিজের নিজের ডেরায়

ততক্ষণে রাস্তায় রাস্তায় নিরন্ন জনতার ঢল নেমেছে, শহরের প্রধান সড়ক এখন মিছিলের মানুষে পরিপূর্ণ—অনাহারী নিরন্ন ছিন্নবস্ত্র উপবাসীরা অতর্কিতে কাবু করে ফেলেছে শহরকে—শহরের জীবন অচল হয়ে যাচ্ছে—এই কঙ্কালসার শরীরের শ্লথ মন্থর গতিতে

কদমতলার মাঠে সেই অগণিত ভিড়ের মধ্যে কে বা কারা—চিৎকার করে কিছু

বলে উঠেছিল, সেই চিৎকারকের কাছে যে মানুষজন ছিল তারা ঐ হঠাৎ চিৎকারের মর্ম বুঝেছিল কিনা তারাই জানে শুধু। তবু তাদের হাত আকাশমুখী হয়ে ওঠে, আর হাত যখন উর্ধ্বমুখী হয় তখন মুখও খুলে যায় তাদের একই সঙ্গে। সন্নিহিত মানুষজন তাদের ঐ আচরণে বিহ্বল হয় ঠিকই, তারা ধরতে পারে না ওদের হাত কেন আকাশে ওঠে মুখ দিয়ে কেন ধ্বনি নির্গত হয়। আর তার মীমাংসা হওয়ার আগেই তাদের হাতও মাথার উপরে ওঠে আর ঐ ধ্বনি অনুকরণ করে তাদের মুখ থেকে ধ্বনি নির্গত হয়—এইভাবে উপস্থিত জনতার হাত উর্ধ্বমুখী হয়, তাদের মুখ দিয়ে ধ্বনিও বেরিয়ে আসে আর ঐভাবে ধ্বনি শ্লোগান হয়ে যায়—আমাদের দাবী মানতে হবে—একক ও সম্মিলিত ধ্বনি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার। তবু আম জনতার কাছে সর্বদা স্পষ্ট হয় না তা, অনেকক্ষণ অব্দি তারা বিহ্বল অবস্থাতেই থাকে, আস্তে আস্তে বুঝতে পারে—এবার চলায় যেন প্রাণ এসেছে আর জানতে পারে কোন্ জায়গায় যাচ্ছে এবার সকলে—কোথায় যাবে তারা

মাঠে যতক্ষণ তারা দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণে সেই শূন্যতাটা খুবই মোচড় দিয়ে চলেছিল, যে কয়েকটা শিশু মা-র সঙ্গে এসেছিল তারাও কান্না জুড়ে দিয়েছিল, বুকে দুধ ছিল না অনেক মায়ের, যাও-বা ছিল তা দিয়ে আর কতক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারে শিশুকে, আর যত মা ছেলেকে দুধ দিতে পারছিল না তত অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে তারা, ফলে দুধের বদলে মারই জোটে তাদের। তাছাড়া ভাদ্রের রুদ্দুরে মাথার চারিদিকে গলিয়ে দেয় যেন, আর সেই গুমোট গরম ঘাম খিদে সব মিলে কারোর মায়ের মনে গ্রামে ফিরে যাবার ব্যাকুলতা জাগিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সেই ব্যাকুলতার মধ্যে হুঁশ জেগে থাকে বলে তারা গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা তখন তক্ষুনি ভাবতে পারছিল না আর, গ্রামে খিদে ছাড়া কি থাকতে পারে তবু, এরপরই সেই চিৎকার করে কেউ বা কারা

হাত উর্ধ্বমুখী হয়, মুখ আলগা হয়ে শব্দ বের হতে থাকে, আর দেখতে দেখতে তারা সারিবদ্ধ হয়ে চলতে শুরু করে, শহরের সব বড় রাস্তা মিছিলে মিছিলে উত্তাল হয়ে ওঠে, শহুরে জীবন তাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেও নিরন্নদের উর্ধ্বমুখী হাত ও মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ দাপাতে থাকে। শহরের মানুষ জন বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে যত, মিছিল তত এগিয়ে যায় জেলা শাসকের খাস দপ্তরের দিকে।

কে পরিচালিত করছে এই মিছিল, জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে কি হবে, কি

করবে—মিছিলে অংশ গ্রহণকারী নিরন্ন জনতা জানে না তা, এমন কি তাদের হাত কেন উপরে উঠছে মুখে কি বলছে—সে-বিষয়ে সমান অজ্ঞ তারা অথচ চলেছে একটি লক্ষ্যের দিকে। কে তাদের মনে আশা জাগিয়ে দেয় যে ওখানে গেলেই তারা বাঁচার খাদ্য পাবে, গাঁ থেকে বের হওয়ার সময় তো সেই আশা নাকের ডগায় কে ঝুলিয়ে দেয়, আর তারা বেরিয়ে পড়ে গাঁ ছেড়ে মেয়ে ছেলে শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী সব।

আমাদের দাবী, মানতে হবে বাঁচার খাদ্য দিতে হবে—মুহুর্মুহ ধ্বনি হতে থাকলে নানা দিকের নানা দূরত্বের ধ্বনির তীব্রতা ন্যূনতা মিলে মিশে কাটাকুটি করে এক শোরগোল পাকিয়ে তোলে, এবং ডি, সি অফিস (এখানে জেলা শাসক ডেপুটি কমিশনার নামে পরিচিত) যত মিছিলের নাগালের মধ্যে এসে পড়ে ঐ ধ্বনি চিৎকার হাত ওঠা-নামা যত বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে এমন এক আস্থা তৈরী হয় যে কে কি করছে বা বলছে বোঝা যায় না মোটে।

আর ডি সি-অফিসের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করার ফলে মিছিল ডি. সি অফিস থেকে প্রায় ফার্লং তিন চার দূরে এসে থেমে পড়ে হঠাৎ সেখানে পুলিশের ব্যারিকেড—রাস্তার দু-পাশে দু-টি বাঁশ পুঁতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে মাত্র, তার ওপাশে প্রচুর পুলিশ—সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আর এ-পাশে হাড্ডিসার হাড় জিরজিরে নিরন্ন মানুষ কত কত দিনের খিদে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিরস্ত্র। কিন্তু ঐ দড়ির কাছে থেমে যেতেই সব হিসেব একেবারে গরমিল যাচ্ছে কেমন।

লাঠি হাতে বন্দুক তাক করে তৈরী হচ্ছে পুলিশ, তাদের চোখমুখের রেখা টানটান খুব, পর পর এমন সংলগ্ন তারা যে একটা ছুঁচও তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়বে না ঐ এলাকায়, সেখানে নিয়মানুবর্তিতা স্থির হয়ে আছে কঠোরভাবে। সারাক্ষণ মাথায় শিরস্ত্রাণ, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ সুরক্ষিত আছে কিনা বর্ম বা তেমন আচ্ছাদনে তা খাঁকি উর্দির জন্য বোঝার উপায় নেই, কিন্তু তারা যে কোনও অবস্থার মোকাবিলার জন্য খাড়া তা তাদের নানাবিধ অস্ত্র যানবাহন ইত্যাদিতে স্পষ্ট।

আর এই নিরন্নের দল এই বাধার সামনে হঠাৎ-ই কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, উত্তেজিত নয় উৎসাহিত বলাই উচিত, কারণ তারা দারুণ আগ্রহে হাত যতদূর উপরে তোলা যায় তার চেষ্টা করে, আর গলায় যত জোর আছে তার চেয়েও তীক্ষ্ণতায় গলা উঁচিয়ে ধ্বনি দিতে থাকে, এতে প্রচণ্ড হৈচৈ গোলমাল হতে থাকলে কেউ কেউ লাফিয়ে লাফিয়ে হাত তোলে ও আকাশ কাঁপিয়ে ধ্বনি দিতে

চেষ্টা করে—কীর্তনে মাতোয়ারা হলে যেমন হয়ে থাকে তেমন, আরও আরও মেতে উঠলে খিদে শূন্যতা প্রচণ্ড মোচড় ঘাম রোদ্দুরের তাপ সামনে পুলিশের ব্যারিকেড লাঠি রাইফেল আরক্ষার ঢাল ইত্যাদি সব ভুলে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে, তারা দেখা করতে চায় প্রশাসনের সর্বময় কর্তা জেলা শাসক সমাহর্তা-র সঙ্গে

তখন হঠাৎ রব ওঠে, চলো সার্কিট হাউস

চলো সার্কিট হাউস···ধ্বনি উঠতে থাকে, জানা গেল—সার্কিট হাউসে মন্ত্রী অবস্থান করছেন, তখন জনস্রোতের তোড় আটকায় কোন শক্তি তবু, মিছিল পুলিশের বেড় ভাঙার আগেই জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আরক্ষা বাহিনী লাঠি নিয়ে আর কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটতে থাকে দুমদাম—

কোথাও জল নেই এক ফোঁটা। দুমদাম সেল ফাটছে আর লাঠির ঘা পড়ছে পিঠে বুকে মাথায় শরীরের যত্রতত্র। চোখের জ্বালা লাঠির আঘাত সহ্য করতে করতেও কেউ পড়ে যাচ্ছে মাটিতে মুখ থুবড়ে কেউ ছুটে যেতে চাইছে একটু জলের খোঁজে। যে পড়ে গেল মাটিতে তাকে হয়ত কেউ তুলতে চেষ্টা করছে, কেউ বা অন্যের পায়ের চাপে আরও থেঁতলে যাচ্ছে মাটিতে—কান্না চিৎকার গোঙানি জল জল···

মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আরক্ষার সশস্ত্র আক্রমণের তীব্র তীক্ষ্ণতায় তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়ে তার ঠিক ঠিকানা থাকে না তখন। গাঁ থেকে যারা সার বেঁধে এসেছিল শহরে, তারা ফিরছে এখন ছাড়া ছাড়া ভাবে, কেন না তাদের কেউ কেউ এখন হাসপাতালে, কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে, কেউ কেউ হয়ত শহরের অলিগলিতে খুঁজছে তার হারিয়ে যাওয়া সঙ্গী বা পরিবারের লোকজনকে।

আর শহরের আনাচে কানাচে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। স্তম্ভিত হয়ে গেছে সকলে পুলিশের এমন আচরণে। গ্রামে যারা ফিরে আসে, যারা তখনও ফেরার রাস্তা খুঁজছে, তারা জানতে পারে না—

পুলিশী হামলায় মৃতের সংখ্যা দশ আহত তিন' শ এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে বাইশ জন :

পড়তে পড়তে নিজেই আপ্লুত হচ্ছিল সুবল, পড়া শেষ হতে তাই সে আশা করছিল ভূষণ তাকে জড়িয়ে ধরবে, বলবে সুপার্ব। কিন্তু ভূষণ তখন চোখ বন্ধ করেই আছে, তবে কি অভিভূত হয়ে পড়েছে শুনতে শুনতে? ভাবনা শেষ হবার আগেই ভূষণের চোখ খুলে যায়, বাহ্ বেশ!

ভূষণের মন্তব্যটি শুনে সুবলের বুকের ভার হাল্‌কা হয় খুব, তাহলে ভূষণের

ভালো লেগেছে ? ততক্ষণে ভূষণ সুবলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যেন, তারপর সামান্য হেসে বলে, তুই বোধ হয় হাল আমলের আন্দোলন—আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ খবর রাখিস না ?

সুবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ভূষণের দিকে।

আজকাল কি গ্রামের লোক এইভাবে মিছিল করে শহরে আসে ? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই ভূষণ তার উত্তর শোনার অপেক্ষা করে না, আজকাল তারা আসে বাস লরি টেম্পো অটো চেপে, দল ভাড়া করে বাস লরি তাদের জন্য। তারপর শহরে এলে কোনো কোনো পার্টি তাদের জন্য রুটি গুড় চিড়ে মুড়ির ব্যবস্থা করে, কোনো দল টিফিন করার জন্য পয়সা ধরিয়ে দেয়। এছাড়া, সে একটু থামে, মিছিলে যোগ দেবার জন্য প্রত্যেক দলই টাকা দেয় এদের। তাই দেখা যায় একই লোক হয়ত দু-দলের বিক্ষোভে যোগ দিতে শহরে আসছে। শহরে এলে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় জমায়েত করা হয়, তারপর কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে দিয়ে আসে স্মারক-লিপি কর্তৃপক্ষের হাতে। ব্যাস্—হয়ে গেল বিক্ষোভ দেখানো। লাঠি বা গুলি চললে অবশ্য এর কিছু হেরফের হয়, তবু ওরা কিন্তু শহরে কেনাকাটি না করে গাঁয়ে ফেরে না. এই হচ্ছে আজকের ছবি, তবে—

ভূষণ তাকায় সুবলের দিকে, কিছু কিছু স্থানীয় বিক্ষোভ যে দেখানো হয় না এমন নয়। ধর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ—যে যার এলাকায় মিছিল করে ফেস্টুন ঝাণ্ডা নিয়ে, শ্লোগান দিয়ে ঘুরতে থাকে, তারপর রাস্তার মোড়ে চৌমাথায় বা ফাঁকা জায়গায় কোনো ঝটপট মঞ্চ করে এলাকার মাতব্বর নেতা লেকচার ঝাড়ে, আকাশ-ফাটানো শ্লোগান হয়, তারপর প্রস্তাব গ্রহণ করে চলে যায় যে যার বাড়ি। তাই বলছিলাম, তুই এসব আমলে আনলি না একেবারে, অথচ—আমি কিন্তু এখনকার কথা লিখি নি, আমি

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে ভূষণ বলে ওঠে, পঞ্চাশ-ষাটের খাদ্য-আন্দোলনের কথা তো, তাহলে সেই সময়টা স্পষ্ট করতে হবে অল্পে, তাছাড়া, ভূষণ একটু থামে, আমরা বিশ্বাস করি না আন্-অরগানাইজড মব ওরকম একটা জোরদার আন্দোলন করতে পারে। মুভমেণ্টটা হলো কাদের নেতৃত্বে তার ইঙ্গিত নেই তোর গল্পে। পড়ে মনে হবে গ্রাম-কে গ্রাম তৈরী হলো কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই, হুইচ্ ইজ্ অ্যাবসার্ড। আর শহরে এসে কে তাদের চলার লক্ষ্য ঠিক করল, কে সে কোন্ দলের নাকি কোনো দলেরই নয় ? তুই এটা কি লিখলি ? এমনি এমনি এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল ?

তার মানে গল্পটা কিছু হয় নি তবে ?

ভূষণ হেসে ওঠে, আরে না না প্রোজ্ ইজ্ অল্‌রাইট্, তবে, ভূষণ বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাস্টারি-সুলভ ভঙ্গিতে বলে, তুই কি গোর্কির গল্পটা পড়েছিস্ ? ঐ যে মানে এই মিছিল-টিছিল নিয়ে লেখা, আহ্ কি যেন নামটা গল্পের, সে মনে করতে চেষ্টা করে খুব, তারপর হঠাৎ উঠলে থেমে যায়, বোধহয় নাইনথ্ আগস্ট, বা ওমনি কিছু, পড়ে দেখিস, তাহলে বুঝতে পারবি গোলমালটা কোথায়, বলে সে থেমে পড়ে এবং কি যেন ভাবতে থাকে। তারপর সুবলের দিকে তাকায়, বুঝলি, এখন এ গল্প না লেখাই উচিত, বুঝলি মানে

সুবল একটু চমকে উঠতে সে হাসে একটু, নিজেদের গভর্মেণ্টতো, গল্পটা পড়ে মনে হবে গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলছে অথচ গভর্মেণ্ট কিছু করছে না আর পার্টিও ইন্‌অ্যাক্‌টিভ, নইলে—তাই বলছিলাম

ভূষণ বলে চলে অনেক কিছু, তার কিছুই কানে ঢোকে না সুবলের। সে অবাক হতে থাকে এই ভেবে যে, ভূষণ মিছিল বিক্ষোভ ইত্যাদি সম্পর্কে যে কথা বলল আগে তার সঙ্গে শেষের কথার কোনো সঙ্গতি নেই। প্রথমে সত্যি ছবিটা দিয়ে শেষে ভয় পেয়ে গেল গভর্মেণ্টের কথা ভেবে ? উচিত কথা বললে নিজের গভর্মেণ্টও কি রেয়াদ করে না তাকে ?

প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগেই পকেটের মধ্যে গল্পের পাণ্ডুলিপি তার হাতের মুঠোয় মুচড়ে মুচড়ে যেতে থাকে শুধু, আর সুবলের চোখের উপর ভাসতে থাকে—ঝাণ্ডা ফেস্টুনে ঝলমলে লরি

লরির খোঁদলে যুবক যুবতী পুরুষ ও নারী হাসি খুশি সতেজ সজীব হাসতে হাসতে হাসির মধ্যে শ্লোগান উঠছে আমাদের দাবী মানতে হবে গ্রামকে গ্রাম বাস লরি টেম্পো বোঝাই হয়ে ছুটে যাচ্ছে শহরে আন্দোলন করতে··· সুবল টের পাচ্ছে অতীত বা শুধু স্মৃতি সম্বল করে লেখা চলবে না আজকের গল্প, লিখতে হবে নতুন চোখ দিয়ে নতুন ভাবে, নইলে—

সুবল পুরোটা ভাবতে পারে না আর, সে জানে না নইলে-র পর কি আছে —বা থাকে তখন···

নদীর ধারে বাড়ি

অভিজিৎ সেন

ব্যাংকের কাউণ্টারের সামনে দাঁড়ানো লোকের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে সুমিত। শহরের বাইরের ব্রাঞ্চ। ঠাসাঠাসি ভিড় কখনোই থাকে না। ফলে মক্কেলরা প্রায় সবাই চেনা পরিচিত।

বসন্ত বিশ্বাস মাসে-দু মাসে ব্যাংকে আসে। কাউণ্টারের সামনে একটু বেশি সময় ধরেই দাঁড়িয়ে থাকে সে। পরের লোককে আগে ছেড়ে দিয়েও দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে গল্প করে সুমিতের সঙ্গে। সুখদুঃখের কথা বলে। কথাটা সে ভাবেই জানা যায়। বসন্ত বিশ্বাসের আশংকার কথা।

হাজার দশেক টাকার একটা অ্যাকাউণ্ট আছে বসন্তর। তার সারা জীবনের সঞ্চয়। পাঁচটাকা, দশটাকা করে সে ব্যাংকে জমিয়েছে। পঞ্চাশের সামান্য এদিক-ওদিক এখন বয়স তার। এর মধ্যে এক স্ত্রী মারা যেতে আরেকবার বিয়ে করেছে সে। প্রথম পক্ষের দুটি এবং দ্বিতীয় পক্ষের একটি মোট তিনটি সন্তান তার।

কাউণ্টারের সামনে একা হতেই সে জিজ্ঞাস করল, একটা কথা জিজ্ঞাস করব, কেশিয়ারবাবু ?

সুমিত বলল, একটা কেন, দশটা করুন।

বসন্ত হাসল। বলল, নয়, নয়, দশটা নয়। একটাই। বলছি কি, আমার এই যে টাকাটা আপনার এটি রাখিছি, আমি মরলে পরে কে পাবে ?

সুমিতের দৃষ্টি এবং শ্রবণ দুইই একটু তির্যক। সবকিছু একটু আড় থেকে দেখতে অভ্যস্ত সে ছোট বেলা থেকেই। সে একটু সজাগ হল। বসন্ত বিশ্বাসের এ চিন্তা কেন ?

—কাকে দিতে চান আপনি ?

—না, তাই ক'ছি।

—মরলে পরে বউ ছেলেমেয়ে পাবে।

—না, তাই ক'ছি। আমি যদি নিখে দিয়া যাই, তো যাক্ নিখে দেব, সে পাবে না ?

—কাকে লিখে দেবেন ?

—আমার ছোলপোলগুলো তো ছোট, তাই ক'ছি।

—তো ছোলপোলকে নমিনি করে দিয়ে যান।

—তালে তারা পাবে ?

সুমিত নমিনেশনের জটিলতা সম্পর্কে সতর্ক হয়। বিশ্বাসের কথার মধ্যে কি যেন আছে।

—এত তাড়াতাড়ি মরবেন কেন ?

—না, তাই ক'ছি। জীবনের কথা তো কিছু বলা যায় না, নমিনি করলে ছোলপোল ছাড়া আর কেউ পাবে না তো ?

খুব সতর্ক থেকেও বসন্ত সুমিতের তেরছা চোখের সামনে ধরা পড়ে যায়। সুমিত মনে মনে উত্তেজিত হয়। ও, তাহলে এই কেস।

—বউকে দিতে চান না ?

বসন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, তাই ক'ছি।

ব্যাপারটা তারপর আরো খানিকটা এগোল। বউয়ের ঘরসংসারে মন নেই। দিনের মধ্যে তিনবার শাড়ি পাল্টায়। স্নো-পাউডার মাখে। সিনেমা দেখতে যায়। বসন্তর ছোট দোকানে সারাদিনে দুশো টাকারও মাল বিক্রি হয় না। তার ভিতর দিয়েই তাকে সংসার চালাতে হয়। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হয়। এর মধ্য দিয়েই সময় অসময়ের মাল কিছু কিছু মজুত রাখে সে। অসময়ে সে সব বিক্রি করে দু'চার টাকা বাড়তি রোজগার।

সুমিত বলল, ঘুরিয়ে কাপড় পড়ে? ড্রেস দিয়ে? বয়স কত আপনার দ্বিতীয় পক্ষের ?

বসন্ত বলল, এই পঁচিশ-ছাব্বিশ।

—অ। সুমিত যেন নিশ্চিন্ত হল।

বসন্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলল, কি ক'মো স্যার, ফের বিয়া কারবার মন ছিল না। তো মামা ক'লেন বেটিটাক্ অ্যাটা গতি কর। আজ না হোক, কাল তা ফের সংসার করিবই—

—মামার বেটি নাকি ?

সুমিত আরো মনেযোগী হল।

—মামা মানে ওই মামা বাড়ির জ্ঞাতি সম্পর্কে হওয়া, নিজের মামা নয়। তাই ক'ছি

—বেশ, বেশ।

—তাই ক'ছিলাম, আমার জমা টাকা বলতে তো এই কটা—

সুমিত জানত তার সহকর্মীরা আলাপটা বেশ উপভোগ করছে। যেভাবে এগোচ্ছে তাতে তারা খুশি এবং সবাই বেশ চুপ করে থাকার একটাই অর্থ—চলুক, তাতে যদি আরো কিছু বের হয়। সুমিতের আত্মপ্রসাদ বেড়ে গেল।

—তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে, আপনার ভাল মন্দ একটা কিছু হয়ে গেলে, টাকাটা যেন আপনার দ্বিতীয় পক্ষ কিছুতেই না পায়, ছেলেমেয়েরাই পায়—এই তো ?

—আজ্ঞে।

রুগ্ন লোকটি বিষণ্ণ হাসল।

সুমিত বলল সে একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। আপনি তো আর কালই মরে যাচ্ছেন না। বসন্ত বিশ্বাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, তাই ক'ছি, স্যার। জীবনের কথা কি কেউ ক'বার পারে ?

অন্য লোকজন এসে যাওয়াতে সেদিনের মত আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। সুমিত বলল, সামনের দিন এ নিয়ে বলব আপনাকে। ব্যাংকের আইন-কানুন একটু কাগজ ঘেঁটে দেখে নি, কেমন ? বসন্ত বিশ্বাস দীর্ণতর হয়ে বলল, আচ্ছা, স্যার। একটু দেখফেন। আমার এই তো মাত্র সামান্য কটা টাকা তার বিষণ্ণ চোখ দুটি কেন ছলছল করে ওঠে—এরা ধরতে পারে না।

প্রায় মাস দুয়েক বাদে বসন্ত বিশ্বাস আবার এল।

—নমস্কার কেশিয়ারবাবু।

আরো যেন শীর্ণ, আরো বিষণ্ণ লোকটি।

—আরে বসন্ত বিশ্বাস যে ? কি ব্যাপার ? অনেকদিন দেখা নেই।

—হ্যাঁ, অনেকদিন আসা হয় নাই। একলা মানুষ, দোকান ছাইড়ে আসা হয় না।

—কেন, একা কেন ? আপনার পরিবারও তো দোকানে বসে বলে আগে যেন বলেছিলেন ?

—হাঁ, বসেতো !

—তবে কি অসুস্থ নাকি ? খবর আছে নাকি কিছু ?

—না, না, খবর কিছু নাই।

বসন্ত পঞ্চাশটি টাকা জমা দিল তার অ্যাকাউন্টে।

—আমার আরজির কথাটা মনে আছে কেশিয়ারবাবু ?

—ওহে, সেই নমিনির ব্যাপারটা ? আচ্ছা আপনি একটা কাজ করুন। আপনি একবার ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে কথা বলুন। অমিয় দা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলুন।

ম্যানেজার অমিয় বসে পাশের ঘরে। এক দেয়ালের আড়াল। এ ঘরের অনেকটাই তার চোখে পড়ে। কানে শোনে সবকিছুই। ক্যাশ কাউন্টার, লেজার কাউন্টারের রঙ্গরসিকতা সবই তার কানে আসে। মাসে মধ্যে উঠে এসে অংশ গ্রহণও করে।

পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সের লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বসন্ত বিশ্বাস আরো একটু যেন বেশি অসহায় হয়ে পড়ে। চোখে ধাতব ফ্রেমের চশমা, লোকটি টেবিলের কাগজপত্রে ব্যস্ততার ভাণ দেখায়। চোখ তুলে তাকালও না। সে ভাবেই বলল, কি চাই ?

বসন্ত ইতস্তত করে।

ম্যানেজার বলল, চেয়ারে বসুন।

এবার সে চোখ তুলে দেখলও।

বসন্ত বসল। বলল, ক'ছি কি, কেশিয়ারবাবুর কাছে বলিছিলাম—মানে আমার যে টাকাগুলো আপনার এটিতে আছে স্যার—আমি যদি আচমকা মইরে যাই চেংড়ারা পাবে ? নাকি সাত ভূতে লুটে খাবে ?

চোখ থেকে চশমা খুলে রুমালে কাঁচ মুছতে মুছতে অমিয় বলল, এই সাত ভূতটা কে ?

—ধরেন ক্যান্, আমার আত্মীয়স্বজন ?

—না, পাবে না। বউ ছেলেমেয়ে পাবে।

—বউ পাবে ?

—হ্যাঁ, স্বামীর অবর্তমানে তো বউ ওয়ারিশ।

—চেংড়ারা পাবে না ?

কাউন্টার ফাঁকা পেয়ে সুমিত বেরিয়ে এসে এ ঘরে এল।

—বসন্ত বিশ্বাস জানতে চায় বউকে বাদ দিয়ে ছেলেদের টাকাটা পাইয়ে দেওয়া যাবে কি না, কি তাইতো ?

—আজ্ঞে।

—না, তা হবে না।

—ছেলেদের নমিনি করলে ?

—কটি ছেলে ?

—তিনজন।

—তিনজনকে নমিনি করার অসুবিধা আছে। বয়স কত তাদের ?

—আজ্ঞে, দশ, আট আর দেড়।

—মাইনর। নমিনি করলেও ন্যাচারাল গার্ডিয়ান হিসেবে মা অর্থাৎ আপনার স্ত্রীই টাকাটা তুলতে পারবে।

বসন্ত বিশ্বাস খানিক্ষণ মুহ্যমানের মত তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, কোনও উপায়ই নাই, স্যার ?

অমিয় বলল, না, আর কোনও উপায় নেই। তা আপনি এই বয়সেই এত মরার কথা ভাবছেন কেন ? এত ভয় কিসের ?

সুমিত হেসে বলল, বিষ খাওয়ার ভয়। দ্বিতীয় পক্ষ বিষ খাওয়াতে পারে। বসন্তবাবুর সবসময় এরকম ভয়, কি তাই নয় ?

বসন্ত এবার সত্যিই হাসল। বলল, নয়, নয়, এমন নয়। কি যে বলেন কেশিয়ারবাবু। তবে কি, জীবন-মরণের কথা কে বইলতে পারে ? যে সন্তানদের জন্ম দিইছি, তাদের কথা তো ভাবতে হবে।

কাউন্টারের সামনে লোক দেখে সুমিত এঘরে এসে খাঁচায় ঢুকল। খাঁচার ওপাশের লোকটি রিকশা চালায়। ব্যাংকের ঋণে পাওয়া রিকশা। কিস্তির টাকা জমা দিতে এসেছে। বলল, বসন্ত বিশ্বাস না ?

সুমিত বলল, হ্যাঁ, তোমাদের গ্রামের নাকি ?

রিকশাওয়ালা হাসল। বলল, হ্যাঁ।

বসন্ত বেরিয়ে এসে রিকশাওয়ালা লোকটিকে দেখে আর দাঁড়াল না। কাউন্টার থেকে পাশ বইটা তুলে নমস্কার জানিয়ে বেরিরে গেল।

সুমিত সুযোগ ছাড়ল না। বলল, বিশ্বাসের কেসটা কি বলতো ?

রিকশাওয়ালা কোনওরকম রাখঢাক না রেখেই বলল, বউ পালিয়েছে।

—অ্যাঁঃ, কার সঙ্গে ?

—জিতেন সাধুর সঙ্গে।

—সাধু !

—হ্যাঁ, গান গায়। বাউল সাধু। এই নিয়ে দু-দুবার। ব্যাপারটা বোঝা গেল।

পরের বারে সুমিতদের রসিকতা আরো মর্মান্তিক হয়। ঢিলছোঁড়া, কাদা ছোঁড়ার মজা একবার পেতে শুরু করলে কেউ আর নিরপেক্ষ হয়ে দলের বাইরে থাকে কদাচিত।

মাসখানেক বাদে বসন্ত বিশ্বাস আবার এলে কাউন্টারের উঁচু চেয়ার থেকে সুমিত বলল, যাক্ বেঁচে আছেন তাহলে? আমরা তো ভাবলাম টাকাকটা বোধ হয় আমাদেরই দিয়ে গেলেন।

পাশের লেজার কাউন্টার থেকে বিনয় বলল, মরবে কি গো? বিশ্বাস কেমন চকচকে হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? ব্যাপার কি বিশ্বাস মশাই? অ্যাঁ?

—আরে তাইতো, তাইতো! ব্যাপার কি বসন্তবাবু? চুলে টেরি, জামাকাপড় ধোপদুরস্ত!

সুমিত তারপরে গলা নামিয়ে বলল, বর্গা খুলে নিয়েছেন নাকি জমির? জোতদার ছেড়ে দিল? এমন মর্মান্তিক রসিকতাতেও বসন্ত বিশ্বাস যেন উৎফুল্ল হয়েই হাসল। বলল, যা বলেন।

সুমিত গলা আরো নামিয়ে বলল, তাহলে চাষবাস এখন নিজ হাল-লাঙ্গলেই হচ্ছে, অ্যাঁ? ভাল ভাল। ফিরে এসেছে?

বসন্ত অসহায়ের মত বলল, হ্যাঁ, কি করব বলেন? বিয়ে করা বউ, ফেলে তো দিতে পারি না।

—বাস, আর তো মরার ভয় নেই?

সুমিত তারপরে নিচু গলায় তাকে বউ বশে রাখার জন্য কিছু পরামর্শ দিতে লাগল। তাতে তার সহকর্মীরা খুব মজা পেতে লাগল। বসন্ত বিশ্বাস সুমিতের কথা শুনে মৃদু মৃদু হেসেই যেতে লাগল। সে এত বোকা নয় যে প্রতিবাদ করে বা গম্ভীর হয়ে প্রতিপক্ষের উৎসাহ বাড়বে।

২

শেষরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বসন্ত। বড় রাস্তা আর নদীর মাঝামাঝি তার বাড়ি। বড় রাস্তার ধারে তার দোকান। দোকান সরকারি জায়গার উপর। অবশ্য সেই সরকারি জায়গা পার হলেই বসন্তর ভিটের সীমানা। প্রায় এক বিঘের মত ভিটে বসন্তর। তাতে তার মাটির বাড়ি, গোয়াল বাদ দিয়েও একটা বাঁশের ঝাড় এবং সবজি বাগান আছে। বিশ শতক মত ভিটেতে তার বেগুনের খেত। এই অঘ্রাণ মাসে সেই খেত ঘন মেঘের মত স্বাস্থ্যবান।

বসন্ত সেই খেতের দিকে এগোল। এখান থেকে দক্ষিণে আরো দশবারো বিঘে জমি পেরোলে তবে নদী। নদীর উপরের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গাটায় কোথাও বেশ পরিস্কার, কোথাও চাঁদোয়ার মত কুয়াশা ঝুলে আছে। শেষ রাতের মরা চাঁদের আলোয় বেশ দেখাচ্ছে নদী এবং তার উপরের এই কুয়াশায় ঢাকা। বসন্ত মনে মনে ভাবল বেশ দেখাচ্ছে। তার ভিটের পূর্বদিকে তার সীমানার বাইরে একটা পাকুর গাছ আছে। বেশ বড় আকারের পাকুর। মরা আলোয় গাছটা একেবারে ঝাপড়া দেখাচ্ছে। গাছটাকে দেখে তার বউয়ের মুখটা মনে পড়ল। তার বউয়ের মুখটা পাকুর পাতার মত। মামার কথায় যখন সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, তখন তো ভাল করে মেয়েটাকে দেখেইনি বসন্ত। ভেবেছিল ভাতডাল তো ফুটিয়ে দিতে পারবে, তাতেই হবে। ছেলেদুটোকে নিয়ে বড় কষ্ট হচ্ছিল তার। বিয়ের দিন দু একবার দেখেছিল বটে। রোগা ঢ্যাঙা একটা মেয়ে, চামসর্বস্ব মুখচোখ। সে ভাল করে দেখতেও চায়নি। সে ভেবেছিল মা-মরা ছেলে দুটোকে তো একটু দেখতে পারবে, তাতেই হবে।

কিন্তু তিনমাস যেতে না যেতে ভুল ভেঙে গেল বসন্তর। ভুল ভেঙে গেল পাড়া-প্রতিবেশীর। বউ যেন বিয়ের জলের অপেক্ষাতেই ছিল। ইউরিয়া ছেটানো ভাঁটার মত ফনফন করে উঠল বউ। ঝলমল করে উঠল সমস্ত শরীর অবিশ্বাস্য আয়োজন নিয়ে। চাম-সর্বস্ব মুখখানা ভরে পাকুর পাতার মত সুডৌল হল। তাতে গভীর একজোড়া চোখ। এবং সেই তিনমাস সময়ের মধ্যে বসন্তর জীর্ণ রুগ্ন শরীর একটিমাত্র সন্তানের বীজ রোপন করেই হাঁফিয়ে উঠল। হাঁফিয়ে উঠে যতই পিছিয়ে পড়তে লাগল, ততই ঈর্ষা বাড়তে লাগল তার। আর বসন্তর যত ঈর্ষা বাড়ে, বউয়ের ততই বাড়ে ছটফটানি। বউয়ের যতই ছটফটানি বাড়ে, বসন্তর ততই বাড়ে ঈর্ষা।

তারপরে বউ পেটেরটাকে নামিয়ে কিছুটা শান্ত হয়ে গেল। বসন্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভাবল বউ এখন ছেলে নিয়ে ভুলে থাকবে। কিন্তু সেসব ভুল। বসন্তর ধারণা সব ভুল প্রমাণিত হল। ছেলের বয়স ছমাস হতে না হতে বউ একদিন মেলা দেখতে গিয়ে আর ফিরল না। প্রতিবেশীর উৎসুক প্রশ্নের জবাবে বসন্ত বলল, বাপের বাড়ি গেছে। পনেরো বিশদিন বাদে খবর নিতে গিয়ে দেখা গেল, সত্যিই সে বাপের বাড়িতে আছে। কিন্তু মেলা আর বাপের বাড়িতে যাওয়ার মধ্যের ঐ দিন পনেরোর ফাড়াক বউ কিংবা বসন্ত কোনও কায়দাতেই ভরতে পারল না। ভরাবার জন্য বউয়ের তেমন আগ্রহও দেখতে পেল না বসন্ত।

আগ্রহ তো নেইই, নতুন উপসর্গ হল ছুতানাতায় হুটহাট্ ছেলে কাঁখে করে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠতে লাগল বউ। সব থেকে বিস্ময়কর হল এই যে, একদিন ফাঁকা বাড়িতে বসন্তকে বিস্মিত করে বসন্তর মন এই অবিশ্বাসী দ্বিতীয় পক্ষের জন্য হু হু করে কেঁদে উঠল। সে বেশ বুঝতে পারল, এই বউ ছাড়া তার বেঁচে থাকার আর কোনও অর্থই থাকবে না। তখন কবিরাজের কাছে গিয়ে সে নিজের জন্য কিছু ওষুধ বা অন্য কিছুর বন্দোবস্ত চাইল।

কিন্তু বসন্ত বিশ্বাস শুধু ভগবানের কাছে দয়া ভিক্ষাই করতে পারে। সে অনেক চেষ্টা করেও বউয়ের উপর রাগ করতে পারেনি। এতেও সে কম অবাক হয় নি। কারণ কি? বউকে সে শাসন করতে পারছে না কেন? এই অপার্থিব সময়ে কুয়াশা আর মরা জোছনায় বেগুন খেতের আলের উপরে বসে তার উপলব্ধি হল, ভগবান জোয়ান বয়সটাকে কখনো খাতির করে না। তার থেকে তার বউ আরো অসহায়। জানোয়ার কি যৌনতার নিবৃত্তিতে আনন্দ পায়? সে তো যন্ত্রণাই। যোয়ান বয়সে মানুষও যেন কতকটা তাই। আর যদি সে মানুষ ফাঁদে পড়ে যায়। কালরাতে সে—ঘুমের ভাণ করে রেহাই পেতে চেয়ে সত্যি-সত্যিই—একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন দুর্বল মানুস সে। মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে পাশে সে বউকে দেখেনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বউকে ফিরতে দেখেনি সে। তারপরে আরো অনেক্ষণ সে একাএকা অপেক্ষা না করেই শুয়েছিল।

একটা শিয়াল সামনের নয়নজুলিটা পেরিয়ে এপাশে এসে বসন্তকে দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থেকে সে ব্যস্ত হয়ে বারবার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে নদীর দিকে চলে গেল। একটু পরেই নদীর দিক থেকে শেষ প্রহরের ডাক ডাকল শিয়ালেরা। বসন্তের চাদরের ভিতরের হাতখানা হাতড়ে হাতড়ে পকেট থেকে প্লাস্টিকের বোতলটা খুঁজে পেল। দিনদশেক আগে বেগুন খেতের পোকামারার জন্য কিনে রাখা কীটনাশক। বোতলটা হাতে ধরে সে আরো জড়সর হয়, যতটা কম নড়াচড়া করা যায় সে ভাবে বসে থাকল।

৩

ম্যানেজার অমিয়র সামনে পঞ্চায়েতের সদস্য—গমসেদ। গমসেদের পাশে দশ-এগারো বছরের মাথা নেড়া একটা ছেলে। গমসেদের হাতে বসন্ত বিশ্বাসের পাশ বই।

অমিয় পাশ বইটার নাম পড়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল।

—বসন্ত বিশ্বাসের ছেলে!

গমসেদ বলল, হ্যাঁ।

—মারা গেছে?

গমসেদ মাথা নাড়ল।

—কি হয়েছিল?

গমসেদ বলল, বিষ খেয়েছে।

ক্যাশ এবং লেজার কাউণ্টারের সুমিত এবং বিনয় উঠে এসে দুঘরের মাঝখানের দরজায় দাঁড়াল। অমিয় চোখ তুলে তাদের দেখল। বলল, বসন্ত বিশ্বাসের ছেলে।

তারা কাউণ্টার পার করে ওপাশের বারান্দায় ঘুরে তাকাল। সাদা নতুন থান পড়া একটি স্ত্রীলোক মেঝেতে বসে। তার সামনে বছর দেড়েকের একটি শিশু মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। বছর আটেকের আর একটি বালক শিশুটিকে আগলে রেখে খেলা দিচ্ছে। স্ত্রীলোকটি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কোড়া আধময়লা থানের—নিচে তার শারীরিক আয়োজন বিনয় কিম্বা সুমিতের চোখ এড়াল না। অবিশ্বাস্য! বসন্ত বিশ্বাসের বউ।

বসন্ত বিশ্বাসের বিধবা বউ চকিতে এদিকে ঘুরে তাকাল, এদের চোখাচোখি। তার দৃষ্টির অন্বেষণ সে আড়াল করতে পারে না। ভগবান জোয়ান বয়সটাকে একেবারে খাতির করে না। বসন্ত বিশ্বাসের বউয়ের চোখের ভিতরে সার্চলাইট ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে ধীরে তার দৃষ্টি বাইরের দিকে সরিয়ে নিয়ে পরক্ষণেই ঘুরে ফের তাকাল। ফাঁদে পড়া জানোয়ারের মতও হয় মানুষ কখনো কখনো।

লড়াকু

কেশব দাশ

বাড়ির সীমানায় ঢোকে সনাতন। সনাতনের হাতে কাগজে মোড়া একটা বোতল। হাত দিয়ে সযত্নে বুকের কাছে চেপে ধরা। সনাতনের পরনে খাকি জামা আর হাফ প্যান্ট খাকি রঙের। লম্বা রোগা গড়ন সনাতনের। সাদায় কালোয় মেশানো মাথার চুল—ছোট ছোট, কোঁচকানো আর চকচকে। মুখের গঠন লম্বাটে। থ্যাবড়া গাল, উঁচিয়ে ওঠা চোয়াল। ছোট্ট ভ্রূ। ছোট গোঁফ। নাকের শিখরে একটা তিল, বড়, সেঁটে বসা একটা গুয়ে মাছির মতো। আদল আকৃতিতে সনাতন পুরো দস্তুর মিস্ত্রী ক্লাসের। মিস্ত্রীই ছিল সে চটকলের। এই যে পোশাকটা ওর গায়ে, খাকি রঙের, তাও চটকল মালিকের দেওয়া। সনাতনের চটকল ছ-মাস হল বন্ধ। চটকলে কাজ নেই, কিন্তু কোম্পানির উর্দিটা রয়ে গেছে ওর কাছে। উর্দি পরে সনাতন শালিমার রেল ইয়ার্ডে খালাসীর কাজ করতে যায় এখন।

বাড়ির সীমানা পার হয়ে সনাতন দোরগোড়ার সামনে আসে। পকেট থেকে চাবি বের করে। চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলে। কোথা থেকে পোষ-মানা মোরগটা ওর উপস্থিতি ঠাওর করে ছুটে আসে ওর কাছে। সনাতনের পায়ের কাছে এসে চক্কর খায় ফুর্তিতে। কলের মোরগের মতো লম্বা গলা-সমেত মাথাটা একবার নাবায় একবার ওঠায়। ডেকে ওঠে কোঁকোঁ-র—কোঁ—'।

সনাতনের পোষা এই মোরগটার নাম কালী। আসলে ওর এক বন্ধুর নাম ছিল,—কালিপদ। এক গ্লাসের বন্ধু বলতে যা, কালিপদ তাই ছিল। এক সঙ্গে চটকলে কাজ করত। মালখানায় বোতলের পর বোতল গলায় ঢেলে কত রাত ফোত করে দিয়েছে দুজনে। নেশা আর চটকলের অসম খাটুনি সহ্য হয়নি কালিপদর। পাটের ফেঁসো বুকের ভেতর সেঁধিয়ে ফুসফুস দুটো চুপসে দিয়েছিল। লোকটা অকালে টেঁসে গেল।

তারপর এই মোরগটা ক্রমশ ওর পোষ-মানা হয়ে উঠতে উঠতে ওর নাম হল কালী। সনাতনই নামটা দিয়েছিল ওর মৃত বন্ধুর নামে। কালী এখন ফুর্তিতে ওর পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছে। আগে এমন করলে, করতও কাজ থেকে

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলে, তখন, সনাতন মোরগটার গলায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে দিত। এখন করে না। মোরগটার ফূর্তির কারণ যে ওর হাতের বোতলটা, সনাতন তা বোঝে। কালীর মতলব বুঝতে পেরে সনাতনের ভেতরটা রাগে জ্বলে ওঠে। পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় মোরগটাকে।

সনাতন ঘরে ঢোকে। দেয়াল হাতড়ে সুইচটা খুঁজে নেয়। টিপে বাতি জ্বালায়। বাতিটা এমনিতেই কম পাওয়ারের। আলো ম্যাড়মেড়ে। তার ওপর মাকড়সার জাল, ঝুল আর ধুলো জমে জমে বাতিটার চারদিকে এমন একটা বলয় তৈরি হয়েছে যে, সেই বুনোনি ভেদ করে যেটুকু বা আলো আসছে তা আরো মেদুর মিটমিটে। ছোটই ঘরটা। মাথার ওপর টাঁচের সিলিং। এক পাশে একটা তক্তপোশ। তার ওপর একটা কাঁথা আর একটা বালিশ—কালো তেলচিটে ধরা। ঘরের আর এক পাশে রয়েছে কয়েকটা থালা বাটি গেলাস—হাঁড়ি একটা কুঁজো একটা, বালতি একটা। দড়িতে কয়েকটা ময়লা ছেঁড়া-ফাটা কামিজ লুঙি গেঞ্জি। দেয়ালে ঠেকনা দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে একটা সাইকেল। টায়ার ফাঁসা সাবেক লরঝরে। সনাতন মহাবীর জুট মিলে যখন কাজ করত, ছ'মাস আগে, তখন এই সাইকেল টেনে টেনে প্রতিদিন কাজে যেত। সাইকেলটা যেটুকু বা চলনসই ছিল তখন, এতদিন অব্যবহৃত পড়ে থেকে তা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।

সনাতন বোতলটা সযত্নে তাকে রাখে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে ঠোঙায় মোড়া ঝাল চানা। ঝাল চানার টাকনা দিয়ে বোতলটা ফিনিস করতে হবে আজ—সনাতন মনে মনে ভাবে। আর এমনতর ভাবনা ওর মনটাকে যুগপৎ তৃষ্ণার্ত ও পুলকিত করে তোলে। সনাতন ঘুরে দাঁড়ায়। দেখে, কালী তাকে রাখা বোতলটার দিকে লালজ ভরা চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সনাতনের মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। রাগে দাঁতে দাঁত চেপে 'শালা শয়তান!' বলে সপাটে পা চালায় মোরগটাকে লক্ষ্য করে। মোরগটাও এতদিন প্রভুর কাছে থাকতে থাকতে, প্রভুর মর্জি মেজাজ নিরিখ করতে শিখে গেছে। সহজে সে একটু পাশে সরে যায়, আর সহজেই সে নিজেকে সনাতনের লাথির আঘাত থেকে রক্ষা করে। সনাতনের লাথি ওর গায়ে লাগে না।

সনাতন মানুষটা যে খুব রাগী তা নয়। বরং ঠাণ্ডা মেজাজের। কিন্তু, আজকাল যে কি হয়, থেকে থেকেই মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে ওঠে। আসলে চলার পথে এতদিন, একটা বাঁধা সড়কে ছিল। আজ হঠাৎ সে সড়ক থেকে ছিটকে গেছে। তার সামনে কোনো পথ নেই এখন—গতি নেই। সে গতিহারা অনাশ্রিত।

তার চটকল ছ-মাস বন্ধ। শ্রমিকদের কাজ নেই। কারখানায় যারা কাজ করত, সেই না-খেতে পাওয়া ভুখা মানুষগুলো মেদার মতো মুখ বুজে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিচ্ছে। এই নিরুত্তেজ মৃত্যু সমাতনের ভালো লাগে না। এই প্রতিবাদহীনতা ওর বুকে আরো বেশি জ্বালা ধরায়।

আর সেই ইউনিয়ন বাবুগুলো, যারা কারখানার গেটে প্রতিদিন 'লড়াই করে বাঁচাতে হবে' বলে বাজ হাঁকতো, তারা এখন মুখে কুলুপ এঁটেছে। শ্রমিকদের দেওয়া টাকা দু-টাকা চাঁদায় যাদের পেট চলত, এখন তারা কেউ হিরো হোণ্ডা চড়ে, কারো মোজেক করা ঘর হয়েছে। অথচ শ্রমিকরা নিঃশব্দে মরে। কেউ জানতে পারে না। কোথাও কোনো হৈ হুল্লোড় হয় না। এমনটা হলে যা হওয়া উচিত তা হয় না, যা করা উচিত তা করতে কেউ ডাক দেয় না। এই বেমানান পিছু-হটা সনাতন মেনে নিতে পারে না। সনাতনের ভেতরটা ক্ষোভে জ্বলে।

দড়ি থেকে গমেছা টেনে নিয়ে সনাতন বাইরে আসে। নিচে উঠোন এক চিলতে। চার ধারে ঘর। খোলার ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট। সামনে চাঁচালি ঘেরা রান্নার ন্যূন পরিসর। সব ঘরে কাচ্চা বাচ্চা কিলবিল করে সব সময়। বাড়ির সমর্থ পুরুষরা কেউ রিক্সা টানে, আনাজ বেচে বাজারে, না হয় কাজ করে কাঁচকলে প্লাস্টিক কারখানায় কিংবা চটকলে। কোন্ সাবেক কালে কোনো ব্যক্তি এই ঘিঞ্জি ঘর তৈরি করেছিল ভাড়া খাটিয়ে দু-পয়সা রোজগারের আশায়। এ ভাবেই গড়ে উঠেছে এই বস্তি। তখন ভাড়া ছিল তিন টাকা চার আনা, চার টাকা বারো আনা বা পাঁচ টাকা। সে ভাড়াই এখনো চলছে। এই বস্তি তল্লাটে এমন অনেক বাড়ি আছে যে বাড়ির মালিক মারা যাওয়ার পর আইনসঙ্গত ওয়ারিশ নির্ধারিত হয় নি, বা নতুন ভাবে মালিকানার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে আসে নি কেউ —সে সব বাড়ির ভাড়াটিয়ারা ফোকটে বাড়ি ভোগ করছে।

সনাতন বাড়ির চৌহদ্দি পার হয়ে বাইরে আসে। রাস্তার ধারে পাইপ-কলের মুখ থেকে তোড়ে জল পড়ছে অনবরত। জল গড়িয়ে যাচ্ছে নর্দমায়। কলের নিচে সনাতন শরীর পেতে দেয়। ঠাণ্ডা জলে শরীর ধোয়। ঠাণ্ডা জলে শরীর জুড়োয়, ক্লান্তি, জুড়োয়—সারাদিন গতর খেঁতলানো পরিশ্রমের।

গা ধুয়ে ঘরে আসে সনাতন। দেখে, তার অপেক্ষায় চৌকাঠের সামনে বসে রয়েছে কালী। সনাতন ঘরে ঢুকে ভিজে লুঙি ছাড়ে। গায়ে একটা গেঞ্জি চড়ায়। শরীরটা এখন বেশ তাজা ঝরঝরে লাগে। এই সন্ধ্যায় গলা

ভিজিয়ে মৌজ করা যাবে—এমন ভাবনায় মনটাও খুশীতে বেশ ফুরফুরে।
সনাতন তাক থেকে বোতলটা পাড়ে। তাক থেকে ঝাল চানার ঠোঙা নেয়।
ঘরের কোণ কানাচ খুঁজে একটা চিনা মাটির পেয়ালা বের করে। ডাঁট
ভাঙা। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বসে মেঝেতে। হাল্কা কাগজের মোড়কটা
খুলতে বোতলটা বেরিয়ে পড়ে। চ্যাপটা এক পাইটের। সনাতনের কাছে এটুকু
কিছুই নয়। কতবার নেশার ঝোঁকে দেড় দু—পাইট ফাঁকা করে দিয়েছে। মা
কালীর লেবেল মারা বোতলের গায়ে। ভেতরে দিশি চোলাই জল রঙের। সনাতন
নখ দিয়ে খুটে খুটে বোতলের মুখ থেকে গালার প্রলেপ ওঠায়। নখের ডগা
ছিপির গায়ে ঢুকিয়ে চাপ দেয়। বোতলের মুখ থেকে ছিপিটা উঠে আসে।
বোতলটা নাকের সামনে নিয়ে আসে। জোরে নিঃশ্বাস নেয়। মদের ঘ্রাণ উগ্র
ও ঝাঁঝল, নাক গলা হয়ে ফুসফুসে সেঁধিয়ে যায়। মাথার ভেতর যেন বিদ্যুৎস্পর্শ
—চিড়িং করে ওঠে। বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া কুটি কুটি কাগজের মতো মনটা
খুশীতে নেচে ওঠে। আট-দশদিন মদ না খাওয়ায় বিবশ হয়ে ওঠা স্নায়ুগুলো
হঠাৎ উত্তেজক ঘ্রাণের স্পর্শে আড়মোড়া ভাঙা সাপের মতো কিলবিলিয়ে ওঠে।

সনাতন চোখ সরিয়ে দেখে, কালী এসে বসেছে ওর সামনে—দেড় দু-হাত
তফাতে। মোরগটার স্থির লালচ ভরা চোখ ওর হাতে বোতলের দিকে। সনাতন
কালীকে চোখ টেপে। ফিক করে হাসে। বোতলটা কালীর দিকে বাড়িয়ে বলে,
'খাবি এক চুমুক—খাবি ?'

কালী উদগ্রীব হয়ে ওঠে। গলা তুলে কক কক স্বরে বোতলের দিকে এগিয়ে
আসে। সনাতন তৎক্ষণাৎ হাতটা সরিয়ে নেয়। সনাতন কালীর সঙ্গে মজা
করে। ফের বোতলটা কালীর মাথার ওপর ধরে। বোতলটা কালীর মাথার ওপর
শূন্যে দোলায়। বলে 'খাবি খাবি…' এবং বোতলটা দোলায়। দোলায়িত
বোতলের গতি পথে লোভী কালীর মাথাটাও দোল খায় ডাইনে বাঁয়ে।

সনাতন ঠোঙা থেকে কয়েকটা চানা নিয়ে ছড়িয়ে দেয় কালীর সামনে। বলে
'খা খা'। কালী খায় না। ঘাড় নাবিয়ে ভূয়ে পড়ে থাকা চানাগুলো ঠোঁট দিয়ে
ছুঁয়েও দেখে না একবার। চানা খেতে ওর না-ইচ্ছা। ওর দৃষ্টি সাঁটা হয়ে
থাকে বোতলের দিকে।

সনাতন বাঁ হাতে কাপটা ধরে কাপের মুখে বোতলটা কাৎ করে। বোতলের
খানিকটা তরল কাপে ঢালে। কাপটা তুলে ঠোঁটে ঠেকায়। চুমুক দিয়ে খানিকটা
তরল টেনে নেয়। ঢোঁক গেলে। গলা বেয়ে তরল নাবে পেটে। গলা বুক পেটে

এক রকম ঝাঁঝাল স্পর্শ। স্পর্শটা নেবে গেলেও স্পর্শসুখ থেকে যায়। সনাতন চোখ বুজে নিজের মধ্যে একাত্ম হয়ে সেই স্পর্শসুখ অনুভব করে। গলা বুকে সুখকর জ্বলুনিটুকু থিতিয়ে গেলে ফের কাপটা ঠেকায় ঠোঁটে। কাপের অবশিষ্টাংশও গলায় ঢেলে দেয়।

বাইরে কাচাল লেগেছে। তুঙ্গ চিৎকারে এমন উপভোগ্য সন্ধ্যাটা গুলজার করে তুলছে যেন। উঠনে নেবে সবাই চিৎকার চেঁচামেচি জুড়েছে। মেয়ে মদ্দ কাচ্চা বাচ্চা কেউ বাদ নেই। যেন কাউয়াদের জলসা শুরু হয়েছে। কাউ কাউ। ছোটকুর মায়ের খ্যারখেরে গলা তুখোড় সবচেয়ে—'ওরে ছেনাল মাগী—তোর ভাতারের মাতা খা, পুতের মাতা খা—নিঃবংশ হোক সব—ওলাউঠো হোক—মর মর মর—খাওয়া যমে খেইয়ে নে যাক···'

সনাতনের যেটুকু বা ঝিম ধরা নেশা ধরতে শুরু করেছিল, এই হৈ-হল্লায় তা কেটে কেটে যায়। সুখের রঙ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় যেন। সনাতন বিরক্ত হয় মনে মনে। উঠে দরজার কাছে যায়। বোতলটা হাতে নিতে ভোলে না। মেঝেতে ফেলে রেখে উঠলে লুলিয়ে ওঠা মোরগটা নির্ঘাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিপি খোলা বোতলটা মেঝেয় ফেলে দেবে। দরজার কাছে গিয়ে সনাতন দরজাটা বন্ধ করে। শব্দের বিরক্তকর আঘাত খানিকটা কমে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সনাতন দেখে, ওর উঠে যাওয়া সামান্য ফুরসতে কালী কাপের ভেতর ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছে। কিছুই রাখেনি সনাতন, সামান্য তলানিটুকুও, এমন ভাবে পান করেছে কাপের তরলটুকু। তবু নেশার টানে, কালী, যদি কিছু পায় এমন আশায়, কাপের ভেতর মাথা সেঁধ করে দিয়েছে।

সনাতন দরজা গোড়া ছেড়ে কাছে এসে হাতের এক ঝটকায় কালীকে সরিয়ে দেয়। কালী ঘাড় তুলে গ-র-র স্বরে অবাধ্যতা প্রকাশ করে। সনাতন তার বোতলের এতটুকু ভাগও কালীকে দিতে চায় না। কালীর এই ব্যাকুলতার জন্য ওর মনে অনুকম্পা হয় না একটুও। একটু নেশার জন্য তারও তো বুক গলা কাঠ হতে থাকে দিনের পর দিন। মনটা ছটপট করতে থাকে। কিন্তু পয়সার অভাবে সে একটু গলা ভেজাতে পারে না। আজ একটা বোতল কিনে এনেছে সে একা খাবে বলে। খেয়ে বুকের পিপাসা জুড়োবে। এই বোতলের এক বিন্দু ভাগও সে কারোকে দেবে না। এই ঘরবন্ধনে তার দিন রাত্রির সঙ্গী এই মোরগটাকেও নয়।

অথচ কালীকে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছে সনাতনই।

বছর তিন আগে মোরগটাকে সনাতন বাজার থেকে কিনে এনেছিল কেটে মাংস করে খাবে বলে। ঘরের কোণে পায়ে দড়ি দিয়ে বে'ধে রেখেছিল। প্রতিদিনের মতো সেদিনও সন্ধ্যাবেলা সনাতন এই মেঝের এখানটাতেই বোতল নিয়ে বসেছিল নেশা করতে। বন্ধু কালিপদ মারা যাবার পর সে আর মালখানায় গিয়ে নেশা করত না। চটকলে ছুটির পর একটা বোতল নিয়ে আসত, আর সন্ধ্যায় একা একা ঘরে বসে গিলত। তো সেদিন মদ গিলছে। নেশাও হয়েছে বেশ। মনটা মেঘের মতো ব্যাপক আর নির্ভার। কি ভেবে ঘরের কোণে বাঁধা মোরগটার কাছে যায়। পেয়ালায় তখনো খানিকটা মদ। মোরগটার মুখের কাছে পেয়ালাটা ধরে বলে' 'খা খা—'

মোরগটা খায় না। মোরগটা ভয় পায়। দেয়ালের সঙ্গে শরীর সে'টে ভীত চনমনে দৃষ্টিতে তাকায়। কি খেয়াল হয় সনাতনের মোরগটাকে চেপে ধরে ওর ঠোঁট ডুবিয়ে দেয় পেয়ালায়। ছেড়ে দিতে মোরগটা মাথা নাড়ে। ঠোঁটে লেগে থাকা মদটুকু ঝেড়ে ফেলে দেয়।

পরদিন আবার পেয়ালাটা ধরে ওর সামনে। মোরগটা খায় না। সনাতন ফের জোর করে চেপে ধরে পেয়ালার সঙ্গে ওর ঠোঁট ভিজিয়ে দেয়। এবার কিন্তু ঠোঁট ঝেড়ে ঠোঁটে লেগে থাকা মদটুকু ফেলে দেয় না। বরং ঠোঁট ফাঁক করে জিব বের করে এবং জিব দিয়ে চেটে ঠোঁটে লেগে থাকা মদের স্বাদ নেয়।

তৃতীয় দিন পেয়ালাটা ওর সামনে ধরতে মোরগটা ভীত সতর্ক দৃষ্টিতে বারকয় দেখে সনাতনকে। পেয়ালার কাছে কয়েকবার ঘুরে ঘুরে করে। তারপর হঠাৎ গলা নাবিয়ে স্বেচ্ছায় ঠোঁট ডুবিয়ে দেয় পেয়ালাতে।

'খেয়েছে ব্যাটা খেয়েছে' বলে আনন্দে সেদিন সনাতন হাততালি দিয়ে উঠেছিল। এভাবে শুরু। যে জন্য মোরগটা এনেছিল সনাতন, কেটে খাবে বলে, তা আর হয় না। মোরগটা ক্রমশ পোষ মানা হয়ে ওঠে আর হয়ে ওঠে মদ্যপ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বোতল নিয়ে বসবে সনাতন, ও-ও থাকবে পাশে। সনাতন খাবে, ওকে দেবে একটু, মোরগটাও খাবে। চটকল বন্ধের আগে পর্যন্ত, এতদিন, প্রায় আড়াই বছর এ ভাবেই চলছিল। সনাতনের তো কেউ নেই আপন বলতে—না বাবা মা, না বৌ, না ছেলে পেলে। খাটে একা, খায় একা। তবু এতদিন একটা বন্ধু ছিল, কালিপদ, সেও চলে গেছে এই মানুষের দুনিয়া ছেড়ে। বন্ধুর নামে মোরগটার নাম রাখল কালী। কালী বলে ডাকলে মোরগটা কক কক স্বরে সাড়া দেয়। কালী বলে ডাকলে যেখানেই থাক ছুটে

আসে। দিনের বেলা সনাতনের এ'টো থালায় ভাতের দানা খুটে খায়। সন্ধ্যায় সনাতনের চুমুক দেওয়া পেয়ালায় ঠোঁট ডুবিয়ে নেশা করে। রাতে সনাতনের পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমোয়। বন্ধু বলো আপন জন বলো সবই হয়ে উঠল এই মোরগটা। কতদিন মদ গিলতে গিলতে দুজনেই বেহেড মাতাল হয়ে উঠেছে। সনাতন আবোল তাবল প্রলাপ বকছে অনবরত, কালী কক্ক কক্ক স্বরে সায় দিয়ে গেছে। তারপর দুজনেই নেশাগ্রস্ত বিবশ শরীরে গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। মেঝেয় শুয়ে দুজনে রাত কাবার করে দিয়েছে।

সনাতন বোতলটাকে এমন ভাবে বুকের কাছে আগলে ধরে থাকে যেন যক্ষের ধন। একটু একটু কাপে ঢালে, একটু একটু করে খায়। তারিয়ে তারিয়ে। জিব দিয়ে স্বাদ নেয়। অনুভূতি দিয়ে ঝাঁঝ নেয়। তরলের মাদকীয় প্রতিক্রিয়া শিরায় উপশিরায় কোষে কোষে, বিবশ করে দেওয়া বুদ করে দেওয়া— আঁচ নেয়। সনাতন বোঝে, তার নেশা ধরেছে বেশ। এ রকম উপলব্ধি ওর মনে খুশির পুলক এনে দেয়।

সনাতন আরো খানিকটা ঢালে কাপে। ঠোঁটে ঠেকিয়ে খায় এক ঢোঁক। মাথাটা নুয়ে আসে সামনের দিকে। চোখ দুটো বুজে আসে স্বত। মদহীন পেটে অনেক দিন পর মদ পড়ায় লকলকে আগুনের মতো মদের প্রভাব দ্রুত শরীরকে বেষ্টন করছে। চোখ খুলে তাকায় সনাতন। চোখের ঠুলি দুটো বেশ ভারি লাগে। তবু তাকায়। দেখে, কালী অধীর চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। ওর চোখদুটো হয়ে উঠেছে শিকারী পাখির মতো সুযোগ সন্ধানী শানানো এবং প্রতিহিংসু। মাথার ওপর লাল বাহারি ঝুঁটিটা টান টান এবং খাড়া। ঠোঁটের নিচে ফুলের কাছে গলটা ধক ধক করে কাঁপছে উত্তেজনায়। হলদেটে বাঁকানো শানিত ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁক। ফাঁক হওয়া ঠোঁটজোড়ার মাঝে সরু লাল লকলকে জিবটা নাচছে আগুন স্ফুলিঙ্গের মতো। মোরগটা গতরে বেশ তাগড়া হয়েছে। দাঁড়ালে মাথায় সনাতনের দাবনা ছাড়িয়ে যায়। অথচ তিন বছর আগে বাজার থেকে যখন কিনে এনেছিল, তখন কত ছোট ছিল। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে রোখা উদ্ধত ভাব এক রকম। হলুদ পা দুটোয় খোসা খোসা আঁশ, লম্বা আঙুল, ছুঁচলো লম্বা নখ আঙুলের ডগায়। সনাতন জানে, ও কাপে ঢেলে মদ খাবে আর কালী পিত্তোশী চোখে দাঁড়িয়ে থাকবে ঐ ভাবে। নড়বে না ঘরের বাইরে, ওর মদ খাওয়া শেষ না হওয়া ইস্তক।

সনাতন বোতলের এতটুকু ভাগও দিতে চায় না কালীকে। সে একা বোতলের সবটুকু উদরস্থ করতে চায়। সে এখন একলসেঁড়ে পুরোদস্তুর। আগে সে খেয়েছে, কালীও খেয়েছে। ইচ্ছা মতো। তবু অনেক সময় সনাতনের খাওয়ায় বাঁধন থাকলেও, কালী যেহেতু অবোধ অপরিনাণদর্শী জীব, তাই তার সেই বাঁধা-টুকুও থাকে নি। আর কালীর আকাঙ্ক্ষা মতো যোগান দিতেও সনাতন ইতস্তত করে নি কখনো। সে সব সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে। তখন চটকল খোলা ছিল। মাস গেলে বাঁধা মাইনে পেত সনাতন। এখন চটকল বন্ধ। ছ-মাস। এখন সনাতন শালিমার রেল ইয়ার্ডে খালাদির কাজ করে। গতরপাত করা কাজ। ওয়াগন থেকে চাল চিনি গম ভুসির বস্তা ঘাড়ে করে বহে নিয়ে যেতে হয় গো ডাউনে। কাজটা তাও ঠিকে-নো ওয়ার্ক নোপে। পঁচিশ টাকা রোজ। যে দিন ওয়াগন আসে না সেদিন কাজ নেই। মাস গেলে ছ-শ টাকাও কামাই হয় না মেরে কেটে। এই পয়সায় পেটে খাবে কি, আর বোতলের জন্যই বা ঢালবে কতটা। তাও নেশা জমে জমে মনটাকে যখন খ্যাপাটে করে তোলে, তখন সারা মাস কি খাবে না খাবে অতশত না ভেবে দুম করে কিনে ফেলে একটা বোতল। একা খায়। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া বুকটা একটু ভেজায়। তখন যত দোস্তিই থাক, কারোকে খয়রাতি করার মতো ইচ্ছা জাগে না সমাতনের একটুকুও।

লালসার হাতছানিতে কালীর ভেতরটা উদ্বাস্ত আত্মহারা হয়ে ওঠে ক্রমশ। আর তা হতে হতে এক সময় সংযমের শেষ মাত্রাটুকুও শিথিল হয়ে যায়। প্রভুর প্রতি ভয় ও বশ্যতার সমস্ত গিঁট-গেরোগুলো আলগা হয়ে যায় হঠাৎ। তার প্রভু তাকেও একটু আধটু ভাগ দেবে-এমন একটা আশায় এতক্ষণ বসেছিল তফাতে। দু-একবার কাছে ঘেঁষার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু ঘেঁষতে দেয় নি সনাতন! নির্দয় ভাবে খেদিয়ে দিয়েছে। মদ্যপ কালী বাতাসে মদের ঘ্রাণ আর চোখের সামনে ছিপি-খোলা বোতলের ইশারায় নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে না। সে তো মানুষ নয়! নেশাতাড়িত মানুষ যা পারে না, কালী, সেও তো নেশাতাড়িত-পারে কি করে! কালী হঠাৎ মাথা ঝাড়া দেয়। ক্ষীপ্র গতিতে ছুটে আসে সনাতনের কাছে। সনাতনের হাতে চেপে ধরা বোতলটার ওপর উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। সনাতন তৎক্ষণাৎ ডান হাতের এক ঝটকায় কালীকে দূরে সরিয়ে দেয়। সনাতনের শরীরে নেশা সংক্রমিত হলেও সে একেবারে বেহেড হয়ে তো পড়ে নি। কালীকে সে চেনে। নেশার উপকরণ সামনে থাকা সত্ত্বেও তা ছুঁতে না পারার যন্ত্রণা যে কত, বিশেষত একজন নেশাড়ীর পক্ষে, তা সনাতন ঠাওর করতে

পারে। সনাতন নিজেও তো একজন নেশাখোর। এমন সময় নেশাড়ী দিশেহারা ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কালীও তেমনটা হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। কিন্তু সনাতনের তৎপর বাধা কালীকে সরিয়ে দিয়েছে। সনাতনের হাতের ঝাপটায় কালীর গা থেকে দুটো পালক খসে পড়েছে। খসা পালক দুটো পড়ে রয়েছে ভুয়ে।

'শাল্‌লা হারামি—' খর শ্লেষাত্মক স্বরে বলে সনাতন। 'এবার খাবো শালাকে জবাই করে একদিন···'। সনাতন আগুন-জ্বলা চোখে তাকায় কালীর দিকে। রাগে গর গর করে সনাতন। ওর এখন কালীকে মনে হয়, বাস্তবিকই, একটা উটকো ভাগিদার। এমনতর ভাবনা ওকে আরো রাগী আর স্বার্থপর করে তোলে।

কালী কিছু বোঝে হয়ত বা। ক্রমশ থিতু হয় নিজের মধ্যে। তফাতে নিজের জায়গাটাতে ফের বসে স্থির হয়ে। প্রভুর দিকে, প্রভুর হাতে বোতলটার দিকে, পিয়াসী কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সনাতনের রাগ জুড়োলে বোতল উপুড় করে ফের ঢালে কাপে। মুখের কাছে নিয়ে আসে কাপটা। খায়? ঝাঁঝাল স্পর্শে ভেতরটা আবার তরঙ্গায়িত হয়। মিইয়ে আসা আগুনে যেন তেল পড়া। আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ভেতরটায়। বোতলে এখনো রয়েছে অনেকটা। অর্ধেকের খানিক কম হবে। যা আছে তাতে ভেতরে উত্তেজনার ধুনিটাকে জ্বালিয়ে রাখা যাবে অনেক্ষণ।

বাইরে এখন মেয়ে মদ্দর সমবেত কাউ কাউ কলহ বন্ধ হয়েছে! জগা শ্যামা-প্রসাদী গাইছে গলা ছেড়ে—'চাই না মাগো রাজা হতে···।' জগা চুল কাটে সেলুনে। কাজ থেকে ফিরে এমন গান গায় প্রতিদিন। গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে যায়। তখন ওর সময় জ্ঞান থাকে না। রাত অনেক হলে সকলে বলে, 'জগা থামো না হে! ঘুমোবার সময় হল।' জগা থামে তখন।

সনাতন ঘাড় তুলে পিট পিট চোখে তাকায় দেয়ালের গায়ে বাতিটার দিকে। বাতিটা যথার্থ যতটা দূরে রয়েছে, মনে হয় তার চেয়ে অনেক দূরে। আর বিচ্ছুরিত আলোটাও বেশ নিষ্প্রভ। যেন কোন স্বপ্নময় দূরত্বে মিটি মিটি জ্বলছে আলোটা। বাতির চারদিকে জমে থাকা ঝুল, সনাতনের মনে হয়, যেন ঘন কুয়াশার মোড়ক। আর সেই মোড়ক ভেদ করে আলোটা যখন আসছে, তখন ঝিকিয়ে উঠছে অসংখ্য স্ফটিকে। সেই স্ফটিকের রঙ লাল নীল হলুদ সবুজ—বর্ণময়। সে স্ফটিক কাঁপছে দুলছে ভাঙছে।

সনাতনের ধূমপানের ইচ্ছা জাগে। বিড়ি শলাই রয়েছে জামার পকেটে।

জামা তারে ঝুলছে। উঠে নিয়ে আসতে হবে জামার পকেট থেকে। সনাতন হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠে। তারে ঝোলা জামাটার কাছে যায়। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিড়ি বের করতে যাবে, দ্যাখে, ওর হাতে ডাণ্ডি ভাঙা কাপটা রয়েছে। অথচ বোতলটা থাকার কথা। বোতল গেল কোথা? সনাতনের মনে ধন্দ জাগে। হঠাৎ ঘাড় ক্যাৎ করে দেখে, বোতলটা ফেলে এসেছে ও মেঝেতে, এবং যা ভেবেছিল—কালী বোতলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খোলা মুখ বোতলটা উপুড় করে দিয়েছে মেঝেতে। সনাতন এক লাফে বোতলটার কাছে যায়। ভয়ে দূরে সরে যায় কালী। সনাতন বোতল হাতে তুলে নিয়ে দেখে, বোতলে আর একটুও মদ নেই। যা ছিল সবটা মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেছে। সনাতনের মাথায় রক্ত চলকে ওঠে। বিদ্যুৎলতার মতো রাগ ঝিলিক দেয় মাথায়। দাঁতে দাঁত ঘষে। বোতলসমেত হাতটা উপরে তুলে কালীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে বোতলটা। কালী হয়ত বা আগেই ঠাওর করতে পেরেছে, সনাতনের আক্রমণের ধারণ ধরন, যে কারণে, ছুটে আসা বোতল তাকে আঘাত করার আগেই, কালী অদ্ভুত কৌশলে দেহটাকে একটু সরিয়ে নেয় পাশে। এবং বোতলটা তার পায়ে লাগে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট বোতল ছুটে গিয়ে আঘাত করে দেয়ালে, আর ঝন ঝন শব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়।

এই বন্ধ ঘরে এখন ওরা দুটো প্রাণী, পরস্পর মুখোমুখী, আক্রমণোদ্যত—একটা মানুষ এবং একটা পাখি। দুজনে রাগে হিস হিস করে। একে অপরকে আঘাত হানার ফিকির খোঁজে ওরা। কালীর রক্তে জেগে উঠেছে স্বজাতীয় ক্রোধ আর লড়াকু স্পৃহা। ভঙ্গিতে বন্য হয়ে উঠেছে। গলাটা হয়ে উঠেছে খাড়া আর টান টান। গলার পালকগুলো কেশরের মতে ফুলে উঠেছে। ওদের মধ্যে প্রভু পোষ্যের সম্পর্ক—স্নেহের বশ্যতার—এই মুহূর্তে উবে গেছে ওদের মন থেকে। অবরুদ্ধ সময় খসে, নিঃশব্দে, শুকনো পাতার মতো, সেকেণ্ড অনু—সেকেণ্ডে।

তাক করতে করতে সনাতন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কালীর ওপর। চওড়া আগ্রাসী থাবার মুঠোয় ধরতে চায় কালীর দেহটা। কালী পিছিয়ে যায়। কালীর পাখনা ছেঁড়া কয়েকটা পালক শুধু ধরতে পারে মুঠোয় সনাতন। এবং কালী, সনাতনের আক্রমণের আওতা থেকে পিছলে গিয়ে পাখা ঝাপটিয়ে হাত দুই ওপরে ওঠে, তারপর চোখের পলকে গোঁত খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসে, আর তৎক্ষণাৎ পায়ের নখ দিয়ে সজোরে আঁচড়ে দেয় সনাতনের বাম গাল। সনাতনের মনে হয়, ওর গালে যেন চাকুর ফলা চালিয়ে দিল কেউ। তীক্ষ্ণ ছুঁচলো যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে শরীর। সনাতন আঁচড়ানো জায়গাটায় হাত বোলায়। হাতের চেটোয় রক্ত

লাগে। ছিট ছিট। হাতের স্পর্শে মুখের ক্ষত আরো জ্বলে ওঠে। ভেতরটাও জ্বলে অপমানে। সম্বিত সম্মানবোধে কেউ যেন চাবুক কষিয়েছে। জমে ওঠা নেশাটাও যেন ছেতরে যায় হঠাৎ। রাগে আরো ভয়াবহ প্রতিহিংসু হয়ে ওঠে। সনাতন ফের উঠে দাঁড়ায়।

কালী এখন আত্মরক্ষা আর আক্রমণের উপযুক্ত ঠাঁই হিসাবে ঘরের একটা কোণ বেছে নিয়েছে। ওর দু-পাশ দেয়ালে সুরক্ষিত। সামনে প্রতিপক্ষ—সনাতন। সনাতনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ও গলা ফোলায় ফণা-তোলা সাপের মতো।

সনাতন ফের এগিয়ে যায় কালীর দিকে। দৃষ্টি স্থির রেখে কালীর ফন্দি ফিকির অনুমান করতে করতে সে এগোয়। ওদের মধ্যে দূরত্ব ছোট হয়, আরো ছোট হয়. এবং এভাবে দূরত্ব ছোট হয়ে উঠতে উঠতে, ছোট হয়ে উঠতে উঠতে, সনাতন এক সময় কালীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কালী সম্ভবত, এবারও সনাতনের আক্রমণ হানার প্রকৃতি আগাম আঁচ করতে পেরেছে, যে কারণে সনাতন কালীকে ধরে ফেলায় আগেই সে সনাতনের হাতের তলা দিয়ে গলে তার পেছনে চলে আসে। সানাতন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়। দেয়ালে মাথা ঠুকে যায় তার।

সনাতন এখন বেশ বেসামাল বিধ্বস্ত। দ্বিতীয় দফার লড়াইতেও সে হেরে গেল, এই উপলব্ধি তাকে আরো দুর্বল হতাশ করে তোলে। সে কুতকুতে অবাক দৃষ্টিতে তাকায় মোরগটার দিকে। তার উচ্ছিষ্ঠ খাওয়া এই প্রাণীটা যে এত ধড়িবাজ তা যেন ও এই প্রথম ঠাওর করতে পারছে। কিন্তু সনাতন একটা মানুষ, তার একটা মাথা আছে বড়, মাথায় বুদ্ধি খাটানোর ঠাসা কলকব্জা আছে শরীরে আছে গতিশীল হাত পা এবং তাগত—সে তার পালিত পরজীবী একটা প্রাণীর কাছে হেরে যাবে? নিজের মধ্যে এরকম উস্কানি ওকে আবার চাঙ্গা করে তোলে। আবার ওঠে সনাতন। আবার ধেয়ে যায় কালীর দিকে।

সনাতন থব থব পায়ে এগুচ্ছে মারকুটে দৈত্যের মতো। ওর মাথার চুল এলোমেলো বিশ্রস্ত। মদো চোখ লাল ভয়ঙ্কর। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে সামান্য ঝোঁকা। থাবা সহ দু-হাত দু-দিকে প্রসারিত। নাক মুখ দিয়ে হিস হিস স্বরে নিঃশ্বাস পড়ছে। এবার ও মারবেই কালীকে। সনাতন এগুচ্ছে কালীকে তাক করে, কালীর দিকে।

কালী আত্মরক্ষার জন্য পালাতেও পারে না ঘর ছেড়ে, যেহেতু ঘরের দরজা বন্ধ। সে তার প্রভুর হন্তারক মূর্তি চিনতে পেরেছে। সে বোঝে, প্রভু তাকে

ছাড়বে না। এবং যদি বাঁচতে হয় তো প্রভুকে পরাস্ত করেই তাকে বাঁচতে হবে। পালিয়ে বাঁচার কোনো পথ নেই তার সামনে। কালী আবার তৈরি হয়।

আবার সনাতন তার প্রসারিত দেহে কালীর পালানোর পথ আগলে কালীর দিকে এগোয়। জাল গুটিয়ে আনার মতো সে কালী আর তার মধ্যে ব্যবধান গুটিয়ে আনে। দূরত্ব খাটো হয়। দুই থাবার আওতার মধ্যে চলে আসে কালী। ঝাঁপ দেয়। ফসকায়, এবারও। তখন কালী প্রথম বারের কায়দায় সামান্য ওপরে উঠে পালাতে যাবে, সনাতন পাল্টা আক্রমণে এক ঝটকায় ওকে ফেলে দেয় মেঝেতে। তারপর জাপটে ধরে। দু-জনেই মেঝেতে পড়ে যায়। কালী ডানা ঝাপটায়। সনাতন তাকে ঠেসে ধরে। কালীকে বুকের কাছে নিয়ে আসে সনাতন। ওর একটা হাত উঠে আসে কালীর গলায়। পাঁচ আঙুলের মুঠিতে টুঁটিটা চেপে ধরে। সনাতন চাপ দেয়। শরীরের সমস্ত শক্তি মুঠোয় সংহত করে চাপ দেয়।

কালী যন্ত্রণায় ছটফট করে। কালী পাখার বাড়ি মারে সনাতনকে। কালীর নখরযুক্ত পা শেষ ছোবল হানার জন্য উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ; এবং হানেও। কখন তার পাদুটো সনাতনের গলার কাছে চলে এসেছে, সনাতন তা খেয়াল করে নি। কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো শক্ত পায়ের আঙুলগুলো দিয়ে কামড়ে ধরে সনাতনের গলাটা। ছুঁচলো বাঁকা নখ আঙুলগুলো সেঁধ করিয়ে দেয় সনাতনের কণ্ঠনালির ভেতর। ছটফট করতে করতে করতে দুটি দেহ, প্রভু ও পোষোর, নিথর হয় এক সময়। বস্তির এই রুদ্ধদ্বার চৌখোপের মধ্যে যে সাময়িক উত্তাল উঠেছিল, তা থিতোয়। দুটি দেহ পড়ে থাকে মেঝেতে। রক্ত গড়ায়—কালীর ঠোঁট আর সনাতনের কণ্ঠনালি বেয়ে।

বিচারবিহীন এ লড়াইয়ে কে জেতে কে হারে, তা নির্ণীত হয় না—এখনই।

শব্দ-কল্প

কিন্নর রায়

পূবে হাঁস
পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে বেড়ে
দক্ষিণে ছেড়ে

ঘর তৈরির এই যে পুরনো দেশি ফর্মুলা, তা মেনেই আমার বাবা বাড়ি তৈরি করেছিলেন। তা বাড়ি ধরুন মেদিনীপুরের ডেবরা থানায়, লোয়াদা। গ্রামের নাম মামুদাবাদ। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে এখনও অনেক বেলগাছ, নিমগাছ আছে। বাবা লাগিয়েছিলেন। ঐ যে—দক্ষিণে ছেড়ে, পূব দিকে পুকুর আছে। পশ্চিমে বড় বাঁশঝাড়।

অনেকটা কথক ঠাকুরের ভঙ্গিতে এমনটি বলতে বলতে আলম খান তার চোখের রোদ চশমাটা খুলে ফেলে। শেষ আষাঢ়ের রোদে ধক আছে। এই বৃষ্টি এলো তো, ঐ রোদ। ভিতের ওপর পাঁচতলা ফ্ল্যাট গাঁথার কংক্রিট পিলারেরা এই রোদে জলে খানিকটা কালচে মেরে গেছে। সাইটে ছ'মাস হলো কাজ বন্ধ। বুকিং হচ্ছে না। পেপার অ্যাড্ না দিলে—ভাবতে ভাবতে আলম খান লম্বা খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল। মাথার ওপর ছাউনি দেয়া ত্রিপলে কোথাও কোথাও ফুটো আছে। সেখান থেকে চুঁইয়ে আসা জল দু-এক ফোঁটা খানের মাথার ওপর। চল্লিশ আর পঞ্চাশের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা শরীরে মাথার পেছন দিকে চুল কমে এসেছে। বৃষ্টির জলের ছোঁয়া সেই বিরল কেশ জায়গাটি থেকে সারা গায়ে অন্যরকম অনুভূতি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর বৃষ্টি ধোয়া আকাশে রোদ উঠে এলে তার রঙটুকু ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে, যেন বা শতজল ঝর্ণার ধ্বনি. খান দেখতে পায়—কত যে আলোর বিন্দু।

বাতাসে গরমের আঁচ টের পাওয়া যায়। খান আবারও এই সস্তার কাঠের চেয়ারে বসে, সামনে রাখা টেবিলের ওপর লাইন টানা লম্বা খাতার পাতায় সামান্য ঝুঁকে মামুদাবাদ দেখতে পায়। গ্রামের দক্ষিণে কংসাবতী নদী। শীতে বর্ষায় গ্রীষ্মে—আলাদা আলাদা ঋতু পর্বে, তার চেহারা, জলের রঙ, ঢেউ—খান যেন বা সত্তরের দশকের শুরুর ডেবরাকেও দেখে—তখন ডেবরা গোপীবল্লভপুরের

নাম কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে। আর অনেকটা রাতে গোটা গ্রাম সি আর পি. মিলিটারি ঘিরে ফেলে কুম্বিং অপারেশান। বড় বড় সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় অন্ধকার কাটা পড়ছে। গুলির শব্দ। সংঘর্ষ।

আমার বাবা যে ভাবে ঘর তৈরি করেছিলেন, তা মনুসংহিতার রীতিনীতি মেনে। রাজস্থানের, উত্তর ভারতের যে কোনো দুর্গে প্লেন ছাড়া ঢোকা সম্ভব নয়, এমন ভাবতে ভাবতে আলম খান আবারও সামনের দিকে তাকাল।

চা আনব ? পঞ্চানন এসে দাঁড়িয়েছে।

আলমের মনে হলো শিবের আর এক নাম পঞ্চানন। পুরাণের শিব লোক-বিশ্বাসে পঞ্চানন হলেন। শিবের অধঃপতিত রূপ শংকর। যার থেকে বর্ণসংকর কথাটির সৃষ্টি। এসব কথাই আলম লিখে রাখছিল লাইন টানা লম্বা খাতার পাতায়; মেনকা মানে নষ্টা স্ত্রীলোক। প্রাইভেট কনট্রাকটার। উর্বশী-মেনকা-সবাই প্রাইভেট কন্ট্রাকটার। হিমালয়ের স্ত্রী মেনকা। হিমালয় সরকারি কন্ট্রাকটার। সরকারি কন্ট্রাকটার তার কাজের ব্যাপারে ডিড্-এ রাষ্ট্রপতির পক্ষে সই করে। সে শিবের সঙ্গে—শিব মানেই সত্যম-শিবম-সুন্দরম, পার্বতীর বিয়েতে বাধা দেয়।

আলম খান লিখছিল, সংস্কৃত ভাষার আত্মভিত্তিক শব্দ রপ্তানি হয়ে ইউরোপে যায়। তার বহু উদাহরণ আছে। যেমন অণ্ড হলো অ্যাণ্ড, মেদিনীপুরে 'বতর' বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে। বতর হলো ওয়াটার। ক্ষেত্র হলো স্কিম। মহিলা শব্দটি একটু বিশেষ। মহ সমাজে নারী-পুরুষের কোনো ভেদ ছিল না। ছিল না জ্ঞানী-কর্মী বিভাজন।

এটুকু লেখার পরই আলম শুনতে পেল, পঞ্চানন আবারও বলছে, আপনার জন্যে আনব ?

আনাও। মিষ্টি কম দিতে বলবে। সঙ্গে দুখানা বিস্কুট।

দাদা, লিচুতলায় কি মাল ফেলব ?

ইট বালি তো ফেলছে। খাতায় চোখ রেখেই আলম বুঝতে পারছিল পঞ্চানন চা আনতে খানিকটা সরে গেছে। তাই মুখ নিচু করেই বলল, পঞ্চানন, সুশীল এসেছে। ওর জন্যে আরও একটা এন, বেশি মিষ্টি দিয়ে।

আমি বলছিলাম সিমেন্ট—বলতে বলতে সুশীল সামনে রাখা কাঠের বেঞ্চে বসে পড়ে।

এ সি সি দেব না রেমণ্ড, নাকি শংকর—আবারও শংকর—শিবের অধঃপতিত

রূপ, আলম মনে মনে জোড়ার চেষ্টা করছিল। দক্ষ হলো স্পেশালাইজেশানের আদি চেহারা। একই কর্মের পুনরাবৃত্তি। দক্ষের যজ্ঞস্থল কনখল—কে খল নয়—খান মনে মনে জুড়ছিল।

নিশ্চয়ই এল টি দেবে না। এসি সি-থাক। ঐ রেমন্ড দিয়েই করো। বলতে বলতে সিগারেট ধরালো খান।

আপনার বাংলাদেশ পার্টি টাকা পাঠালো? পঞ্চাননের আনা ভাঁড়ের চায়ে শব্দ করে চুমুক দিতে দিতে সুশীল যেন বা খানিকটা অন্তরঙ্গ হতে চায়।

কই, আর পাঠালো ভাই! তাহলে কি আর তোমাদের পেমেন্ট আটকে থাকে! কাচের বেঁটে গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে জবাব দিচ্ছিল খান। তার মনে পড়ছিল, দক্ষ তো একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করে। আর সেই বারে বারে একই কাজ করার ভেতর লুকিয়ে আছে মৌলবাদের শেকড়। মৌলবাদও পরিবর্তনে বিশ্বাসী নয়, তার বিশ্বাস পৌনঃপুনিকতায়। শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহের ফলে জন্ম নিল অধঃপাতিত লেবার কন্ট্রাকটার। ভারতবর্ষের আদিম সাম্যবাদী জীবনে চালু হলো দক্ষের শাসন।

সস্তার বিস্কুট চায়ে একবার ডুবোলেই কাদা। জিভে আনতে আনতেই খসে যায় প্রায়। সেই গলা গলা বিস্কুট জিভে নিয়ে চায়ে চুমুক দিল খান। একটু দূরে ভিতের ওপর ফেলা নবীন মাটিতে তেলাকুচোর সবুজ লতা। তার গায়ে শাদা ফুল। একটি রোদ-লাগা হলুদ প্রজাপতি তার আশেপাশে।

আপনাদের এই ফ্ল্যাটের বুকিং শুরু হলো? চায়ের ভাঁড়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে সুশীল জানতে চাইছিল।

এখনো হয়নি ভাই। তবে লোকে দেখে যাচ্ছে।

পেপারে অ্যাডভার্টাইজ করতে হবে দাদা। এখন অ্যাডভার্টাইজের যুগ।

সে তো বুঝি। কিন্তু বিজ্ঞাপনের যা রেট—বলতে খান আবারও চায়ে চুমুক দিল।

তাছাড়া আপনারা তো সব টাকাটা হোয়াইটে নেবেন না। হোয়াইটে নিলে বলছেন আপনাদের মার্জিন অনেক কমে যাবে। তা এখন দাদা ছাপোষা বাঙালির ঘরে কত আর টাকা আছে? যে খানিকটা বেলাক, খানিকটা হোয়াইট। সবাই তো লোন করে বাড়ি করে। ফ্ল্যাট কেনে। অফিস লোন। সেখানে বেলাকের ফেসিলিটি কই! বলতে বলতে ভাঁড়ের শেষ তলানিটুকু নিজের ভেতর টেনে নিল সুশীল।

এ সি সি পার ব্যাগ একশো পঁচিশ তো ?

আরে, আপনার ব্যাপার অন্য খানদা—বাইরে তো একটু বেশিই যাচ্ছে। আমিও নিচ্ছি। একশো সাতাশ। চার আনা বস্তা ভ্যান প্রতি ভাড়া। আপনি নিলে ঐ একশো পঁচিশ।

দক্ষের জন্ম কনখলে—দক্ষ-ভাবনা কনখলে জন্মাল। জেনারেলাইজেশান থেকে স্পেশালাইজেশান। শিব যুগ থেকে দক্ষ যুগ। কনখল—কে খল নয় ? আমরা যেমন এখন বলি না—কে চোর নয় ? কোন শালা চোর নয় রে। আকাশে খানিকটা মেঘ উড়ে এসে আষাঢ়ের রোদ আড়াল করে দিল। আবার হয়ত এক পশলা হবে। টানা বৃষ্টি হলে বালি ধুয়ে যায়। ডেলা পাকায় সিমেন্ট—যদি জলের ছাট লাগে। ভালো করে সিমেন্টের ব্যাগ পলিথিন দিয়ে ঢাকা দরকার, খান মনে মনে ভেবে নিচ্ছিল। এখনই সুশীলের সঙ্গে সাইকেল দিয়ে পঞ্চাননকে পাঠাতে হবে। তারপর মুখে মুখে একটা সি এফ টির হিসেব—ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে না আলম। তাতে মগজের ধার কমে।

তালে দাদা, মাল ফেলে দিচ্ছি ?

হ্যাঁ সুশীল। আমি তোমার সঙ্গে পঞ্চাননকে পাঠাচ্ছি। সিমেন্ট বালি সব ও ঢেকে ঢুকে ঠিক করে রাখবে।

এক নম্বর এখন পিক্‌ট কত করে দিচ্ছ সুশীল ?

ও আপনি আগে যা দিয়েছেন, এখনও তাই দেবেন। বর্ষায় ইট পোড়ানো বন্ধ। তাতে অপেনার কি। সতেরশোই দেবেন। এখন হাজার ইট আঠারোশ চলছে।

বাইরে বৃষ্টি এলো। গুঁড়ো গুঁড়ো জল উড়ে এসে খানের গায়ে লাগছিল। সামনের খাতা গুছিয়ে রাখল খান। বাংলাদেশের টাকাটা এসে গেলে চারপাশের নানা রকম দেনা থেকে খানিকটা খানিকটা হাল্কা হওয়া যায়। দু কাঠা জমির ওপর বড় দোতলা বাড়ি। ওপরে নিচে তিনখানা করে বড় বড় ঘর। জমি ঘিরে উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল। অনেক টাকার কাজ। ভদ্রলোক বাংলাদেশের ডাক্তার। দুই ছেলের একটি ডাক্তার। অন্যটি সোনালী ব্যাঙ্কে চাকরি করে। ঢাকায় নিজেদের বাড়ি। তবু এপারে, ইন্ডিয়ায় কিছু একটা করে রাখার ইচ্ছে মাখনলাল চক্রবর্তীর। স্ক্যালপেল, সিজার, ফরসেপ—টাকা, টাকা—তবু তো খানিকটা অনিশ্চয়তা—যদি কিছু হয়, যদি কিছু হয়—

আমি তালে যাই খানদা।

এসো। বিকেলে এসো একবার। বাংলাদেশ থেকে ডিমান্ড ড্রাফটা এলেই আমি তোমায়—বলতে বলতে খান দূরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ছিলেন এমন দিনে কংসাবতী খানিকটা ফুলে ফেঁপে ওঠে। লোকাল নাম কাঁসাই। আমাদের বাড়ির একটু দূরেই কলাপাড়া। জয়দেব কলা, অনিল কলা—সবাই জাতে চণ্ডাল। আমাদের গ্রামের অর্ধেক আদিবাসী ভূমিজ। অর্ধেক মুসলমান। বর্ণহিন্দু এক ঘর। আমার নানা-নানী মাংস খেতেন না। মা-ও না। তাঁদের লম্বা লম্বা গড়ন, ফরসা রঙ। মামারাও সেইরকম। তাঁরাও কেউ মাংস খান না। মা বলতেন, নানাদের বাবা তার বাবা, তারও অনেক বাবা আগে কেউ ইরান থেকে এসেছিলেন।

বুকের মধ্যে কংসাবতীর স্রোতের ওঠাপড়া। দূরে হঠাৎ গা ছেড়ে নামা বৃষ্টি আচমকাই কমে এলো।

তুমি আজ স্কুটার আনোনি সুশীল ?

গাড়ি গ্যারাজে খানদা—এতো কাদা ঢুকেছে ভেতরে—তাছাড়া তেলও একটু বেশি খাচ্ছে। তাই রিকশায় এসেছি। এখান থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে নেব।

বৃষ্টি বোধহয় ঋতুর নিয়মেই ধরে এলো। আবারও রোদ উঠল ঠেলে। রোদ্দুরের গায়ে তখনও জলের দাগ।

পঞ্চানন, তুমি সুশীলের সঙ্গে যাও। সাইকেল নিয়ে যাও। লিচুতলা সাইট্ থেকে সোজা এই সাইটে চলে আসবে। তুমি এলে তবে আমি বাড়ি যাব।

মাথার ওপর ছড়িয়ে থাকা ত্রিপলের অজস্র ফুটো দিয়ে রোদ আবারও অনেক, অনেক আলোর বিন্দু হয়ে খানের গায়ে মাথায় টেবিলে বেঞ্চে গড়িয়ে যাচ্ছিল। জল থেমে যেতেই সেই হলুদ প্রজাপতিটি, সবুজ তেলাকুচো লতা আর শাদা ফুলের পাশে পাশে। খান আবারও খাতা খুলে লিখতে শুরু করল—যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিল—ঋগ্বেদ/১০ম/১০শ/সুক্ত

কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়তে গিয়ে আমরা প্রথম পয়ারেই আটকে যাই—

গোলক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর

মন্দির কেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল ভারতবর্ষে। তার ভেতরই সুদখোরের জন্ম।

খানের মনে পড়ছিল বেদ-পুরাণে সমস্ত চরিত্রই টাইটেলবিহীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়লে দেখা যাবে আমরা যেমন কোনো লেখা লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ টেনে আনি, তেমনই কৌটিল্য ভীষ্ম, দ্রোণ, ইন্দ্র প্রমুখের প্রসঙ্গ টেনেছেন। পুরাণ, মহাভারত হচ্ছে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস।

খান লিখছিল—

মহিলা শব্দটি একটু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মহসমাজে নারী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ ছিল না। জ্ঞান কর্মও বিভাজন হয় নি। তাই জ্ঞানী, কর্মী—এই ভাগও হয় নি। যাকে বলে আদিম সাম্যবাদী সমাজ। 'ইর' বা 'ইলা' শব্দটি অধঃপতনের সূচক। ইংরেজিতে এই ইল-ই ill হয়ে গেছে। যেহেতু মহ বা আদিম সাম্যবাদী—মহান্-জ-দারুর সমাজে মেয়েরাও পুরুষের মতো সমমর্যাদা সম্পন্না ছিল।

লোকে যখন শুম্ভ-নিশুম্ভের অধীন, তখন কল্পবৃক্ষ হইতে অষ্টসিদ্ধি হইত। দেবীপুরাণ। পৃষ্ঠা ৯৩।

মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ, খিলহরিবংশ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লিখিত দুখণ্ডের বাংলা অভিধান—আলম খান যেন বা কোনো বৃক্ষের শিকড় সন্ধান করছিল। একদিন গড়িয়ার মোড়ে—সেও প্রায় আট দশ বছর আগে বুক শপে কাচের শো কেসে দুখণ্ডে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র আশি টাকায়—সে তো জলেরই দরে প্রায়—যেখানে কথার কথামালা, আশ্চর্য সব অর্থ—একই শব্দের নানা অর্থ। আলম খান যেন বা কল্পবৃক্ষের মূলটি খুঁজে বার করতে চাইছিল।

আমি তো হ্যানিম্যানের সালফার বইটি অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলাম, হোমিওপ্যাথির ওপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে। রোগের আদি হচ্ছে সুরা। মিথ্যে কথা বললে শরীরে রোগ প্রবেশ করে। অসুস্থতা মানে ডিরেলমেন্ট অফ লাইফ ফোর্স। হোমিওপ্যাথির শেষ থেকে ভারতীয় পুরাণের শুরু। খান যেন বা দেখতে পাচ্ছিল তাদের গ্রামের বাড়িতে বাবা বসে। বাবার চেহারা ভালো না। যেমন শূদ্রদের হয়। আমরা তো শূদ্র, তবে অভিমানী। ব্রাহ্মণ্যে ধর্মের নানান চাপে আমরা হাঁপিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ অনেকটা বাতাসে শ্বাস নেওয়ার জন্যে ইসলাম নিলাম, সেও তো কত বছর আগে। ভাবতে ভাবতে খান নিজের হাতের দিকে তাকাচ্ছিল। আমার গায়ের রঙ, হাইট—কোনোটাই মামাবাড়ির মতো হয়

নি। মায়ের মতোও না। মা ছিলেন ফর্সা, ছিপছিপে। পাতলা গড়নের সুন্দরী। আমার ছেলেটা অনেকটা যেন আমার মামাদের মতো—উচ্চতায়, গায়ের রঙে। বাবা বলতেন, আল্লার গুনতি করা দানা ফেলতে নেই বাবা। এসব লক্ষ্মীর দানা। লক্ষ্মীর দানা বলতে তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে যেত না। বলতে বলতে তিনি চাল কুড়িয়ে রাখতেন। একদানা চাল কোথাও পড়ে থাকলে, কেউ, ভাত নষ্ট করলেই তাঁর গলায় রাগের ঝাঁঝ। কপালে বিরক্তির ভাঁজ।

খাওয়ার শেষে যখন তিনি থালা ছেড়ে উঠতেন, তখন সেই পাতে বসে আরও একজন বসে ভাত খেয়ে নিতে পারত। একেবারে শরিয়তী মতে খাওয়া। চেটেপুটে থালা, আঙুল—সব সাফ করে। আমাদের গ্রামের মসজিদে থালা পাতা থাকত। সেখানে বসে যে কেউ খেয়ে আবার উঠে যেত। থালায় খাবার লেগে থাকার উপায় ছিল না।

সেই আকবর বাদশার আমলে টোডরমল যখন জমি মাপামাপির ব্যাপারটা, খাজনা আদায়ের নিয়মকানুন সব কিছু আইনে বাঁধার চেষ্টা করছেই তখন আমাদের ঠাকুরদার ঠাকুরদার—সে কত আগের ঠাকুরদা হবে—খান মনে মনে হিসেব করছিল। ১৫২৬-এর ২১ এপ্রিল, দিল্লির পানিপথে ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে বাবরের প্রথম পানিপথের যুদ্ধ। আকবরের জন্ম সিন্ধুতে। ১৫৪২-এর ১৫ অক্টোবর। আকবর ভারত সম্রাট হলেন ১৫৬০। তাঁর সময়েই তানসেন, বীরবল, টোডরমল, ফৈজি, আবুল ফজল।

খান দেখতে পাচ্ছিল, সারাদিন ঘোড়া দাবড়ে যতটা জমি পাওয়া যায়, ততটা জমি তোমার হবে—এমন ফরমান পেয়েছিলেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদার···। কালো পাথর পাথর চেহারার মানুষটি ছিলেন বিশাল মুঘল আর্মির সিপাহি। সামান্য সিপাহি। মেদিনীপুরের কাশীজোড়া পরগনার কাছে রাজচন্দ্রপুরে জমি ধরে বসলেন আমাদের আদিপুরুষ মামুদ। সত্তরের ঝাঁঝ খানিকটা থিতিয়ে এলে, 'কুম্বিং অপারেশন, এনকাউন্টার, গ্রেপ্তার—এসব কিছু খানিকটা খানিকটা ইতিহাস হতে থাকলে আমিও মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস চর্চায় নিজেকে সামান্য সামান্য জড়িয়ে ছিলাম কয়েক দিনের জন্যে। জেলা কালেকটরেট থেকে ফার্গুসনের আমলের কিছু কিছু চিঠিপত্র, পুরনো দলিল-দস্তাবেজ, দানপত্র, থানা মৌজা ম্যাপ—খান দেখতে পাচ্ছিল সূর্যের খর তাপের নিচে কেশর ফোলানো ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে একজন কৃষ্ণবর্ণ বলশালী পুরুষ। তার গালে কপালে ঘামের ফোঁটা। ঘোড়া ছুটছে ছুটছে ছুটছে।

মামুদের আরও জমি চাই। আরও। আস্ত একটা পরগণা হলেই বোধহয় তাঁর সুবিধে হয়।

রোদের তাপে ঘোড়ার ঘাম, মানুষের ঘাম মিশে যাচ্ছিল। কতদূর কতদূর—ফাঁকা মাঠ, গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, দেবালয়, পুষ্করিণী, শ্মশান, কবরস্থান, উপাসনাগৃহ—একজন অভিমানী-শূদ্র তার কবজায় কত কি আনতে চাইছিল। আকাশের পাখি, আলো, মেঘ—সেও বুঝি তার দখলের সীমানায় টেনে নামিয়ে আনতে পারলে খানিকটা আরাম পাওয়া যায়। ঘোড়ার কষে ফেনা জমছিল। মামুদের চোখে মামুদাবাদের স্বপ্ন।

সামনের লোহার শিক বের করা কনস্ট্রাকশানের থামেরা এই রোদে খানিকটা যেন গ্রিক মন্দিরের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর ছাদ নেই। অথচ ছাদ ধরে রাখার থামটি আছে। যেমনটি দেখা যায় ছবিতে কিংবা প্রাচীন সময় ধরে রাখা সিনেমায়, হয়ত বা ওলিম্পিকের মশাল সূর্যের আলো থেকে জ্বালিয়ে নেয়ার আগে সেই কবেকার গ্রিসিয় স্থাপত্য, খান মনে মনে হিসেব করে।

আকাশে আবার ও খানিকটা খানিকটা মেঘ উড়ে আছে। খান দেখতে পায় সাইকেল নিয়ে পঞ্চানন ফিরছে।

আমরা অভিমান ভরে, হয়ত বা অত্যাচারেও খানিকটা খানিকটা ইসলাম নিলাম। ভারতবর্ষের গায়ে বৈদিক জামার ওপর সনাতন ধর্মের জোব্বা পড়ল, তার ওপর ইসলামের আলখাল্লা, শেষে সাহেবদের কোট প্যান্ট। মাঝে বৌদ্ধ, জৈনদের আচার-বিচার পোশাক-আশাক আছে খানিকটা। আমার জেলা মেদিনী-পুর বলতে গেলে মিনি ইন্ডিয়া। কিনেই সেখানে—নদী, জঙ্গল, সমুদ্র, পাহাড়ের আভাস। দিঘা থেকে চন্দনেশ্বর যাওয়ার শাদা বালিয়াড়ি। মাথার ওপর রোদ উঠে এলে তাকে মরুভূমি বলে ভ্রম হতে পারে। গড়বেতার ভাষার সঙ্গে দিঘার ভাষার কোনো মিল নেই। ঝাড়গ্রামের কথাবার্তার সঙ্গে খড়্গপুরকে কতটা মেশানো যাবে? এসব ভাবনার মধ্যেই খান তাকিয়েছিল শেষ না হওয়া গাঁথনি, কনস্ট্রাকশানের দিকে। আতাবাগানে জমি দিল ইসমাইল, গোড়ার দিকে খরচের খানিকটা টাকা দিল শোভান। আমার প্ল্যান, ড্রইং, বুদ্ধি, মিস্ত্রির খাটানো—রেগুলার পরিশ্রম, সাইটে বসা। কিন্তু সবই প্রায় পণ্ড হতে চলেছে। সবাই প্রায় অফিস লোন নিয়ে বাড়ি করবে, ফলে কেউ ব্ল্যাক দিতে চাইছে না। সব টাকা হোয়াইটে নিলে আমাদের মার্জিন থাকবে না। আতাবাগান সাইটে কনস্ট্রাকশান বন্ধ। বুকিং না হলে আর টাকা দেবে না শোভান—সাফ জানিয়ে দিয়েছে। পেপারে অ্যাড

দিতে পারি নি। আর মিস্তিরির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে যে ফ্ল্যাট বুকিং হয় না, সেই অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সেটা হলো নতুন করে।

দাদা, সব মাল ঠিক মতো লাগিয়ে দিয়েছি। ইট সাজিয়ে, বাঁশ-টালি, ত্রিপল একপাশে খানিকটা হোগলা, তার ভেতর একটা চৌকি, স্টোভ, কেরোসিনের বোতল, ক'টি হাঁড়ি কড়া, থালা গ্লাস, জলের কুজো—পঞ্চানন থাকে। রাতে দিনে।

কোনো মাল নষ্ট হবে না তো পঞ্চানন ? এটুকু বলতে গিয়েও খানের থেমে যাওয়া। পঞ্চাননের কর্তব্যবোধ, সিনসিয়ারিটির কোনো তুলনা নেই। তবু ভয় থাকে। বাংলাদেশের ডাক্তারবাবুটি ইণ্ডিয়ায় বাড়ি করার জন্যে আমার প্রাপ্য টকাটি পাঠিয়ে দিলে আর গঞ্জনা শুনতে হয় না। পাওনাদারদের শুধুই শুনিয়ে যাই—আসছে। বাংলাদেশ থেকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট আসছে। এলেই সকলেরটা পাই টু পাই মিটিয়ে দেব। কিন্তু সেই ড্রাফট ডানা মেলে আসছে কই !

পঞ্চানন, তুমি তা লে খেয়ে নাও। আমি বাড়ি থেকে খেয়ে আসি। সাড়ে বারোটা বাজল। বলতে বলতে খান টেবিলের ওপর থেকে খাতাটি তুলে নিল। সঙ্গে ফোল্ডিং ছাতাটি। তার একটা শিক ভাঙা। দূরে তখনই কোনো মাঠচরা দোয়েল শিস দিয়ে উঠল। একবার দুবার···।

বাড়ি তেমন দূরে নয়। দোতলায় ভাড়া ঘর। মাথার ওপর অ্যাজবেস্টস। সাইকেলে বাড়ি থেকে সাইট ঠিক তিন মিনিট।

বাড়ি ফিরে স্নান সেরে ভাতে বসতে বসতে মিনিট পনের। চানের জায়গা এক তলায়, বাড়িঅলার সঙ্গে, কমন। স্নান সেরে চুল আঁচড়ে ভাতের থালার সামনে বসতে বসতে খান এই ঘরের গরম টের পেল। অ্যাজবেস্টসের চাল ক্রমশ তেতে উঠছে, দু এক পশলা বৃষ্টি তাকে আটকাতে পারে নি। আতপ চালের ভাত থালার ওপর স্টিলের হাতা দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল মেরি। একটা ফিকে সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল বাতাসে। ভাতের গরম ভাপ জল ধোয়া থালার গায়ে খানিকটা খানিকটা কুয়াশা তৈরি করতে পারছিল। ভাতের সঙ্গে খানিকটা মটর ডাল কুমড়ো শাক দিয়ে। মেরি কত সুন্দর বাঙালি হিন্দু রান্নাটি শিখে গেছে। খান তার চোদ্দ বছরের বিয়ে করা বৌ মেরিকে দেখছিল। তেমন ফরসা নয়। পেটানো স্বাস্থ্য। মাথার কোঁচকানো চুল খুব লম্বা নয়। সামান্য উঁচু দাঁত, ভারি ঠোঁট। বাড়িতে সাধারণ ভাবে হিন্দি-বাংলা মিশিয়েই কথা হয়। এটা হলদিয়ায় থাকার সময়ের অভ্যেস থেকেই। খান হিসেব করছিল আজ বৃহস্পতিবার। এ রবিবার মেরি চার্চে যাবে। বেশ কয়েক সপ্তাহ যায় নি। ছেলে-মেয়েরা সব স্কুলে। তাদের

এই নতুন জায়গা, আতাবাগানে স্কুলে ভর্তি করাও এক বড় ঝামেলা বিশেষ। দেশ থেকে টি সি আনাও। এখানে জমা দাও। তাও তেমন কোনো পায়াভারি, ডোনেশান চাওয়া স্কুল নয়। নেহাতই পাতি বাংলা স্কুল। যার অনেক জানলাই ভাঙা। চেয়ার, বেঞ্চের পায়া নড়বড়ে।

মেরির দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে খানের কেন জানিনা মনে হয়, তার চেহারার ভেতর সেই মারাঠি ব্যাপারটা এখন বোধহয় আর তত নেই। হয়ত তাকে অনবরত দেখতে দেখতেই এমন অভ্যেস হয়ে গেছে, খান মনে মনে হিসেব করতে করতে নতুন ভাত ভাঙছিল। পটলের তরকারি আসবে। মেরি নিরামিষ খাবার বেশি পছন্দ করে। আলম খানও। তার মনে পড়ছিল এসবে রোজার ঈদের কাছাকাছি সময়ে ইসটার পড়ল। মেরির রোজা চলল কতদিন ধরে। খানের আঙুলে ঝোলের হলুদ রঙ গড়িয়ে যাচ্ছিল এমন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে।

বাংলাদেশের ড্রাফট—নতুন করে থালায় গরম ভাত নামিয়ে জিভে দিতে মেরি জিজ্ঞাসায় ছিল।

নাহ্—আয়া নেই। খান মাথা নাড়ল হয়ত খানিকটা অধৈর্য ভাব ফুটে উঠেছিল সেই মাথা নাড়ায়। মেরি আর কিছু বলতে চাইল না। তার তামাটে গালে একটা হালকা লম্বা ভাঁজ জেগে উঠেই মুছে গেল।

দক্ষ, দক্ষের সোসাইটি এখন—একই কর্মের পুনরাবৃত্তি, স্পেশালাইজেশানের যুগ। খান মনে মনে বলছিল। পুরাণকাররা কেমন করে যেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখে গেছেন সংকেতে। আর পরিশ্রম করেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে কি গবেষণা, অসম্ভব পরিশ্রম। শব্দকে ধোঁয়াশার আড়াল থেকে টেনে বের করা।

পাতের শেষ ভাতটুকু মেখে ফেলতে ফেলতে খানের মনে হলো, আমি কি পারব এভাবে শব্দের নতুন নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় করতে! আমার খাতাটি ভরে উঠবে কি জ্ঞান-কর্মের প্রকৃষ্ট সমন্বয়ে? কবে যেন টেলিভিশানের পর্দায়, হয়ত কোনো দুপুরেই হবে, খানের 'একটি জীবন' চলচ্চিত্রটি দেখা ছিল। দেখতে দেখতে মেরি বলে উঠেছিল, তুমকো ভি অ্যায়সে হি।

বুঝলে মেরি, মানুষের চোখটা খালি খুলে দেয়া। শব্দ চেনার চোখ। আমাদের সেখানকার সংস্কৃত শব্দ বণিকদের হাত হয়ে আরব ঘুরে ইউরোপ পৌঁছে গেছে। তারপর সেই সব শব্দ আবার ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান—আলাদা

আলাদা নাম নিয়ে, বলতে বলতে আবিষ্কারের উত্তেজনায় খানের দু চোখ বড় বড় হয়ে আসে।

মেরি তাকে আর ভাত দেবে কি না জানতে চাইছিল। নাহ্—এমনটি ঘাড় নেড়ে খান ভাবছিল. শিবহীন দক্ষযজ্ঞ, দক্ষের ছাগমুণ্ড, দক্ষের মৃত্যু, সতীর দেহত্যাগ-এমনই তো নতুন করে ভেবে দেখার বিষয়। দক্ষের শাসন। স্পেশালাইজেশানের জয় জয়কার, ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি ভেঙে এক তলায় নেমে প্লাস্টিকের মগের জল কুলকুচো করার চেষ্টা খানের। একটু গড়িয়ে নিয়ে আবারও সাইটে গিয়ে চেয়ারে বসা। অপেক্ষা করা। যদি বুকিং হয়। যদি পার্টি আসে।

মা বলতেন, কামিনা পার্টি। কি কথায় কি কথায় যেন খারাপ কিন্তু বোঝাতে এই ব্যবহার। আমাদের বাড়িতে যাত্রা দেখা নিষেধ ছিল। মানা ছিল তাস খেলায়। যাত্রা দেখতে গেলে ছেলেরা মেয়েদের তোলাতুলি করে. তাসের সাহেব বিবি, তার মধ্যেও ছেলেমেয়ে, তাই ওসব মানা। মা 'কামিনা পার্টি' বললে আমরা একটু বড় হলে জিজ্ঞেস করতাম—কামিনা পার্টিটা কি মা।

চৌকিতে নিজেকে মেলে দিয়ে আলম খান খোলা জানলা পেরিয়ে বাইরের আকাশ দেখতে পাচ্ছিল। মেঘে মেঘে ভারি আকাশ যে কোনো সময় বৃষ্টি হয়ে ভেঙে পড়তে পারে। একটা গরম স্থির হয়ে আছে ঘরের ভেতর। পাখার হাওয়া তাকে তাড়িয়ে, ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়া যাচ্ছে না। মেঘের গায়ে গায়ে একটি কালো চিল। সেদিকে তাকিয়ে খান আবারও ঘরের কোণে হাত-মেশিন চালানোর শব্দ শুনতে পেল। বাড়িতে বসে কিছুতে কিছু অর্ডার—ব্লাউজ, সায়া, দোকানের অর্ডারও থাকে এর তৈরি মধ্যে করে সাপ্লাই দিতে পারলে খানিকটা সুসার সংসারে। বুকিং হয় না, ড্রাফট আসে না বাংলাদেশ থেকে—রোজের বাজার খরচ, ছেলে-মেয়ের স্কুলের মাইনে, অসুখ-বিসুখ, এটা ওটা এক্সট্রা টাকা। মেরি সামলে দিকে চেষ্টা করে।

হাত-মেশিনের ঘর ঘর কানে আসছে। আমি দক্ষের শাসন ভেঙে দেন। নিজেকে যেন নিজেই শোনান যান খান। আমার তো ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার ডিগ্রি নেই। তবু ঠিক ঠিক কাজ চালাতে পারি, পার্টি আসে। কনস্ট্রাকশান ভেঙে পড়ে না। মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খানের মনে পড়ছিল আমার ফরসা, সুন্দরী ছিপছিপে মা দিলারা বেগম আঁচের পাশে খাওয়ার পিঠে ভাজছে। সেদিনটা পৌষ পাব্বন হতে পারে। সবেবরাত হতে পারে। আমার এক দূর

সম্পর্কের কাকা আরিফ হঠাৎ ভেতর বাড়িবে এসে কি এক রসিকতা করে তার ভাবির পিঠে তৈরিতে মন্ত্র করে দিল। আমরা তখন অনেক ছোট।

খান দেখতে পারছিল মায়ের ভাজা পিঠে পুড়ে যাচ্ছে। মায়ের বমি পাচ্ছে। চাচিমা পীর পরিবারের মেয়ে। তিনিও পাশে ছিলেন। কি দেখে হঠাৎ বললেন, তুমি আরিফকে কয়েকটা পিঠা দিয়ে এসো।

মা মুখ তুলতে পারছে না। খালি বমি আসে। শেষ অব্দি আমার এক পিসি ছুটে এসে মাটির পাত্রে খানিকটা চালবাটা নিয়ে উনোনে চাপায় ও কি কি সব দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়ে। এবার ছুটে আসে আরিফ ভাবির পিঠে যাতে আর না পোড়ে তার ব্যবস্থা করে।

মা কত কি জানত। মা জানত বড়ির জন্যে বাটা ডালে নুন না মেশালে বড়িতে পোকা ধরে না। আচারের আম সর্ষের তেলে ভালো করে ভেজে নিয়ে চিনিতে পাক করলে অনেকদিন থাকবে। আড়াই সের আম ভাজতে এক পো তেল। মিষ্টিতে ফোটানো হয়ে গেলে তার ভেতর চন্দনী, মেথি ভাজা গুড়ো, আরও কি কি মশলা।

আসলে পণ্যের উৎপাদন প্রোডাকশান, শব্দকে বদলে দিতে পেরেছে। দক্ষের শাসন এ কাজটি করল। এ মন অবস্থায় ভাবনার ভেতর শুয়ে শুয়ে পাশ ফিরল খান। আমরা খোসলাসিন গোত্র। নতুন যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের আমরা খানিকটা হেলাফেলাই করতাম। ঠাকুরদা ঘুরে বেড়াতেন সত্যপীরের গান গেয়ে। তখন গ্রামে মানুষ সত্যপীরের গান মানত করত—আমার অসুখ হলে পীরের গান দেব।

ঠাকুরদার বড়দা মারা গেলেন হঠাৎ। বাড়ি ফিরে ঠাকুরদা তাঁর বৌদিকে বিবাহ করলেন। তাঁর দাদার একটি কন্যা ছিল। এবার দেবরের ঔরসে বৌদির গর্ভে—তখন আর তিনি বৌদি নেই, বাবা, কাকা, জ্যেঠামশাই, পিসি। ঠাকুরদা তিন ছেলেকেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামে জ্যোঠামশাই প্রথম এনট্রান্স পাশ। তাঁকে একটু দেখার জন্যে আশপাশের দশখানা গ্রাম থেকে মানুষ ভিড় করেছিল।

কত কি মনে পড়ে যায় এই অলস দুপুরে। আমাদের বাড়িতে মৌলবী সাহেব থাকতেন। তিনি ফারসি পড়াতেন। মাসের শেষে তাঁর প্রাপ্য ছিল দশ সের চাল আর একটা টাকা। জ্যঠামশাইয়ের কাচ-কাঠের আলমারিতে শেক্স-পিয়ার, নানারকম অভিধান, ইংরেজিতে লেখা অঙ্কের বই।

বাবা ছিলেন মাইনর পাশ। ঐ সিক্স অব্দি। কাকা ম্যাট্রিক। তাঁরা তিন ভাই ছিলেন সরকারি চাকুরে। বাবা বলতেন, খিদের মুখে ভাত আর নুন পেঁয়াজই যথেষ্ট। অ্যাপেটাইট ইজ দ্য বেস্ট সস। তাঁরা তিন ভাই-ই ধুতি-শার্ট পরতেন। ঘুষ নিতেন না।

জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা, বৃষ্টি ছোঁয়া বাতাস আসছিল। দূরে কোথাও হয়ত জল হচ্ছে। খানের মনে পড়ছিল আমাদের আদি পুরুষদের একজন মোগল আমির মামুদ স্থানীয় এক নারীকে বিয়ে করে বসে গেলেন মামুদাবাদে। তারপর কতদিন, কত বছর—কংসাবতী দিয়ে বহে যাওয়া কত জল। মৈনানের পীর সাহেবের ছেলে জহির। গ্রামের দক্ষিণে যে কাঁসাই, তার ওপারেই মানখণ্ড মৈনান। সেই জহির লিখলেন 'অজ গাঁয়ের বেগম'—আমার গাঁয়ের লোকাল ডায়লেক্টে।

সে বড় মজার ভাষা—আমাদের গ্রামে এখনও এভাবেই বলা হয়; কেয়ারে বেটা, কাঁহা যায়ে রে!

খিদিরপুর ডকে কাজ করতেন জহির। সৈয়দ জহিরুল ইসলাম। ছদ্মনাম নিয়েছিলেন—খালাসি কবি মুমূর্ষু বাগ। তাঁর আর একটি বই 'দুরন্ত দীপ্ত দিগন্ত'। একাত্তরে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় জহির খুন হলেন, ঐ বাংলাদেশেই; তাঁর উপন্যাসে মৈনানের পীর সাহেব ছিলেন ভিলেন। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম ছিল—পীরসাহেব মুরিদান বাড়িতে থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। বাড়িতে থাকলে এক ওয়াক্তও না।

তখন ক্লাস এইটে পড়ি। প্রতি সপ্তাহে মজলিশ বসে। পীর সাহেব আসেন। এক অজানা কৌতূহলে তাঁর সঙ্গে অনেক, অনেকটা সময় কেটে যায়। কি এক রহস্য পীরবাবাকে ঘিরে। কি যেন এক ঘোরে থাকি।

ঠাকুরদা সত্যপীরের গান গাইছেন। নানান মানতের অনুষ্ঠানে। ছেড় আর ঈশ্বরের স্তুতি—এই দুই মিলে সত্যপীরের গান। এখন আর কোনো কথা মনে নেই। কিন্তু ছেড় আসলে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রুখে দাঁড়ানো। টানা পাঁচ রাতও চলে সত্যপীরের গান, যার যেমন মানত।

এসব ভাবনার ভেতরই খানের ভাতঘুম এসে যায়।

তার গ্রামের রাস্তা, কাঁসাই নদী, স্কুলের পথটি—সেই স্কুলের ছাত্র বৈদ্যনাথ মুর্মু। হঠাৎই একদিন মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ', বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর সাত-আট মাস পরে ফিরে এলে সে একেবারে আগের মতোই। মুখে আর কৃষ্ণ নাম নেই।

খানের দুচোখে ঘুম নেমে এলে আকাশও মেঘ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা বাতাস, যার গায়ে জলকণা লেগে আছে, ঢুকে পড়ে এঘরের হাওয়ায়। সেলাই মেশিন বন্ধ করে তাড়াতাড়ি উঠে আসে মেরি। জানলার ছিটকিনি লাগায়। ছাটে বিছানা ভিজবে, এমন ভয় তো থেকেই যায়।

জানলা বন্ধ করতেই ঘর অন্ধকার। খান ততক্ষণে ঘুমের অতলে। এখন আলো জ্বালা যাবে না। বাড়িঅলার কড়া হুকুম। দিনে আলো জ্বাললে যদি চোখে পড়ে তো সোজা উঠে আসবে দোতলায়। বন্ধ দরজা ধাক্কাবে। লাইট নেভাতে বলবে। এমন অপমান। ভাড়াবাড়িতে থাকার কষ্ট। মানুষটা এত লোকের বাড়ি ফ্ল্যাট তৈরি করে, কিন্তু নিজেরটা বললেই বলবে, দাঁড়াও দাঁড়াও, হবে হবে।

আসলে থিতু হয়ে বসা কোনো কোনো মানুষের ধাতে থাকে না। মেরি আবারও তার স্বামীর দিকে তাকায়। এই মেঘলা অন্ধকারে মুখ মাথা সব যেন মুছে গেছে। তবু খানিকটা নজর করলে বোঝা যায়, গায়ে দুদিনের না কামানো দাড়ি। থুতনির আশেপাশে দুচারটে শাদাটে বয়েস। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। উল্টে, টেনে পিছন দিকে আঁচড়ানো। প্যান্ট আর শার্ট তার প্রিয় পোশাক। এখন চিত হয়ে, পরনে শাদা পাজামা। রোমশ বুকটি ঘুম ছোঁয়া নিশ্বাসে আস্তে আস্তে নামছে, উঠছে। যেমন হয়ে থাকে।

খান তখনও ঘুমের ভেতর তার মাকে দেখতে যাচ্ছিল।—কেয়া রে বেটা, কাঁহা যায়ে রে। সেই ঘুমতলে থাকা খান আবছা আবছা শুনতে পাচ্ছিল মায়ের গলা। এই মা পরে যেমন কেমন হয়ে গেছিল। বাবা-মায়ের এক মেয়ে, তার ওপর সুন্দরী। খানিকটা জেদ, খেয়াল—এসব তো ছিলই; তারপর বাবার হঠাৎ চলে যাওয়া, তারও পরে আমার এক বোন।

গীতায় ধ্যানযোগ কর্মযোগ রাজযোগের কথা আছে। হকিকত মারফত শরীয়ত ইসলামি পথে সাধনার নানা ধারার কথা বলতেন সেই পীর সাহেব। তাঁর একমুখ পাকা দাড়ি। অনেকটা লম্বা শরীর, ফর্সা রঙ, হাত পায়ের দীর্ঘ পাতা ও আঙুল আর করতলে যেন বা গোলাপির আভাস, সেই পীরকে সামান্য অপার্থিব. আমাদের থেকে আলাদা তো করে তুলতই। ওঁর হাতের লম্বা লাঠিটি, যা কিনা খানিকটা সাপ চেহারার, আঁকাবাঁকা। আর সেই দণ্ড শরীরে ছুঁইয়ে দিলে হয়ত বা সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে তাঁর কেরামতিতে, এমন বিশ্বাস নিয়ে দূর দূর থেকে আসা মানুষ। মুরিদান। বলশালী, সুদর্শন এই মানুষের ঘোড়া

ছিল আর পালকি। তিনি ঘোড়ায় চড়ে দূরে দূরে মুরিদান-বাড়ি চলে যেতেন। ফিরতেন অনেক ভেট নিয়ে।

আর বড় পীরবাবার উরশ-এ মাজারে জরির পাড় বসানো সিল্কের চাদর যেত আমাদের বাড়ি থেকে। সঙ্গে আগরবাতি, গোলাপপানি, বাতাসা, নকুল দানা। এক গুণ প্রসাদ চৌগুণ হয়ে ফিরে আসত।

বাবা, বোনের আচমকা মৃত্যু—মা খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তারপর কি এক বিষাদ-রোগ তাঁকে পেয়ে বসল। শুধুই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাকাতে তাকাতে চোখে পানি। পানি হি পানি। 'কামিনা পার্টি' আর বলে ওঠেন না রাগ হলে। খাবার নিয়ে বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খাবেন কিনা— তার কোনো ঠিক নেই।

দূরে কোথাও চরাচর ঝলসে দিয়ে বাজ পড়ল। তার শব্দে, আলোর ঝলকানিতে এক মুহূর্তের জন্যে হলেও খানিকটা অন্যরকম হয়ে গেল পৃথিবী। বোধহয় চমকে খানিক ঘুম ভেঙে অথবা স্বপ্নভঙ্গে পাশ ফিরে শুলো খান।

আরও বৃষ্টি থাকলে ছেলেমেয়েরা কেমন করে স্কুল থেকে ফিরে এমনি দেবে অস্থির হচ্ছিল মেরি। ওদের কারোকেই ছাতা কিনে দেওয়া হয় নি। রিকশায় আসার পয়সা নেই। এরকম আবহাওয়া, রাস্তায় কাদা বলে ছেলেকে সাইকেলও নিয়ে যেতে দেয় নি। মেরির মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। মানুষটা যেন কিরকম। বারবার ভাড়া বাসা বদল করে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে এখানে করতে করতে বহুবার স্কুল বদল হয়েছে বাচ্চাদের। খান বলত, ইংরেজি বাংলা হিন্দি, অক্ষর পরিচয় আর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ জানা থাকলে একটা লোক বাকিটা তার নিজস্ব কমনসেন্স দিয়ে করে নেয়। আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে দেখছি, ইঞ্জিনিয়ারিং এক পাতা না পড়েও ইঞ্জিনিয়ার। তবে হ্যাঁ, দক্ষ সোসাইটিতে ডিগ্রি দরকার। এখন স্পেশালাইজেশনের যুগ। দক্ষরাই কর্তা। শিব অধঃপতিত শংকরে।

মানুষটাকে যখন আমি প্রথম হলদিয়ায় দেখি, তখন একাত্তর সাল। একজন মারাঠি জৈনর বাড়ি থাকত। সুমেধ দোশী। পড়াতেন সে বাড়ির ছেলেদের। সুমেধ যোশী লম্বায় সাত ফিট প্রায়। ও'র বৌ সুভদ্রাও বেশ লম্বা, পাতলা পাতলা চেহারা। যোশী-বাড়িতে থাকে আলম খান। টিউশানি করে। সকালে খায় এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট। দুপুরে জনতা স্টোভের ওপর এক কড়াই জল দিয়ে—তার মধ্যে ডাল, চাল, আলু, লংকা—ব্যস, ফুটে উঠলে নামিয়ে নাও।

পাতলা পাতলা সপাসপ মেরে দাও। রাতেও তাই। শুধু কোনো দিন বেগুন কাঁচকলাও থাকত। এরকম খেতে খেতে মানুষটার চেহারাই বদলে গেল এক বছরে, মুখের কথাও। কবে যেন পাঁশকুড়া কলেজ থেকে খানিকটা রাজনৈতিক তাড়া খেয়ে হলদিয়ায়, তারপর দিকশূন্য যাত্রা। এঘাট ওঘাট। মেরি তখনই আলমকে দেখেছিল।

বাইরে আবারও বাজ পড়ল। চরাচর আলো করে সেই শব্দ ছড়াল দূরে।

মেরির মনে পড়েছিল আলম তাকে অনেকদিন আগে এক গল্প বলেছিল। সে গল্পটি এরকম। আলম তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে। মেদিনীপুর বাঁকুড়া যাওয়া আসা করা গোপনে, কখনও বিহারে। মেদিনীপুর বাঁকুড়া বর্ডারের এরকম একটি গ্রামে হঠাৎ এক পাগলির পেটে বাচ্চা আসে। তা এরকম তো কতই হয়। পাগলীর শরীর একটু একটু করে বদলে যেতে থাকে। তার গর্ভে সন্তান আনা মানুষটির খোঁজ পাওয়া যায় না। সময় যায়।

তারপর হঠাৎই একদিন কাকভোরে আলমদের ইউনিট লিডার সেই লোকটিকে আবিষ্কার করে। খুব ভোরে যে জলায় শৌচকার্য করা হয়, সেখানে শৌচের কাজ সেরে মানুষটি মুখ ধুচ্ছিল। একই জলে দুরকম কাজ। তাকে ধরা হয়। প্রথমে জেরা, পরে ভয় দেখানো ও প্রহারে প্রহারে মানুষটি স্বীকার করে—তাই স্বভাব, পাপ, অভ্যাস—এসব নিয়ে যখন আলম কথা বলে মেরির চুপ করে থাকা ছাড়া কোনো কাজ থাকে না। একজন নানা বিষয় জ্বালা পোড় খাওয়া মানুষকে দেখতে দেখতে মেরির মনে এক গোপন আহ্লাদ খেলা করে—এই মানুষটিই আমার স্বামী। একে আমি ভালোবাসি।

রাতে টেবিল-আলোর পাশে আলম চুপ করে বসে থাকে। দূরে বৃষ্টির শব্দ। ব্যাঙের ডাক। টেবিলের ওপর খোলা মৌজা ম্যাপ, অনেকগুলো পরচা। খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বরের জটিল অঙ্ক। অ্যামোনিয়াপ্রিন্ট করা জমির ম্যাপ। দলিল, খাজনা রসিদের জেরক্স, ড্রইং করার জন্যে টেবিলের সঙ্গে লাগানো আলাদা বোর্ড, টি, স্কেল, পেনসিল, ইরেজার, লাল-নীল পেনসিল, চাইনিজ কালি, কালি তোলার ইরেজার—কত কি লাগে। এত সব কিছুর মধ্যেও খান পুরাণের দেব-অসুর সংগ্রামের কথা ভাবছিল। কশ্যপ আর দিতির পুত্রেরা দৈত্য। অদিতির পুত্রেরা দেবতা। কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষরাজার অন্যতমা কন্যা দিতির গর্ভজাত

বংশধরগণ দৈত্যনামে পরিচিত। দেবাসুরের সংগ্রাম সেই প্রাচীন ভারতের শ্রেণী সংগ্রাম—আলম তার খাতার দিকে চোখ রাখছিল।

দেবতাদের আক্রমণে সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হলে দিতি স্বামীর নিকট ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ স্ত্রীর প্রার্থনা পূরণ করে বলেন, 'তোমাকে সহস্র বৎসর গর্ভধারণ করে, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা দেহে ও মনে শুচি হয়ে থাকতে হবে। দিতি যথাসাধ্য স্বামীর বাক্য পালন করতে লাগলেন। অপরদিকে ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করে ইন্দ্র দিতির গর্ভ নষ্ট করার জন্য সদাসর্বদা ছিদ্রান্বেষণ করতে থাকেন। শেষে একদিন দিতিকে অধোত পদে শয়ন করতে দেখে সেই সুযোগে ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করে বজ্র দ্বারা তাঁর জরায়ুকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করলেন। গর্ভের এই বিভক্ত সন্তানের ক্রন্দনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ইন্দ্র সেই প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাত খণ্ডে বিভক্ত করলেন, এবং এইরূপে প্রসূত সন্তানেরা মরুৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

খান রামায়ণ ভেবে নিতে চাইছিল। প্রায় একই কাহিনী। একটু অন্যরকম।

বাইরে রাত নটার আতাবাগানের পৃথিবী নিজের মতো করে আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল।

দিতি কশ্যপের কাছে ইন্দ্রহন্তা পুত্র প্রার্থনা করিলে কশ্যপ বলেন যে, দিতি যদি সহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকতে পারেন, তবেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এই বলে কশ্যপ দিতির অঙ্গ স্পর্শ করে তপস্যার জন্য গমন করেন। তখন দিতি কুশপ্লব নামক স্থানে তপস্যা আরম্ভ করেন।

ইন্দ্র তাঁকে নানা ভাবে পরিচর্যা করতেন। ৯৯০ বৎসর অতিক্রান্ত হলে দিতি সানন্দে ইন্দ্রকে বলেন, আর দশ বৎসর পর তোমার নিধনের জন্য যে পুত্র চেয়েছিলাম তার জন্ম হবে, এবং তুমি তার সঙ্গেই নিশ্চিন্তে ত্রিলোক শাসন করবে।

ইন্দ্র তখন তাঁর ছিদ্রানুসন্ধানে রত হন। তখন একদিন দিতি মধ্যাহ্নকালে মাথার দিকে পা ও পায়ের দিকে মাথা রেখে নিদ্রা যাওয়ায় ইন্দ্র তাঁকে অশুচি জ্ঞানে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভস্থ সন্তান বজ্রদ্বারা সপ্তধা বিভক্ত করলে, গর্ভস্থ শিশুর রোদনে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। ইন্দ্র 'মা রুদ' (কেঁদোনা) বলে শিশুকে কাটতে থাকেন। দিতি 'মেরো না' বলায় ইন্দ্র বেরিয়ে এসে সবিনয়ে বলেন যে দিতি অশুচি হয়ে শুয়েছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁর ভাবী হত্যাকারীকে বর্তন করেছেন। দিতি তখন আত্মদোষ স্বীকার করেন ও বলেন যে, ইন্দ্র 'মা রুদ' বলেছেন বলে এই সপ্ত খণ্ড গর্ভ সপ্ত পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করুক ও মরুৎ বলে খ্যাত হয়ে

সপ্ত-লোকে বিচরণ করুক। তাহাই স্থির করে ইন্দ্র ও দিতি স্বর্গে প্রস্থান করেন।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। টেবিলের পুরনো টাইমপিস টিক টিক ডেকে যাচ্ছিল। আজও বিকেলেও তেমন কোনো আশার খবর এলো না। বাংলাদেশের থেকে ড্রাফট আসেনি। বুকিং নেই। জমি দেয়া ইসমাইল, কনস্ট্রাকশানের খরচের বেশ খানিকটা দেয়া শোভান—সবাই আমায় দেখলে এড়িয়ে চলে। দক্ষ-শাসিত সমাজে আমি—ভাবতে ভাবতে আলমের মনে পড়ছিল—দক্ষ একজন প্রজাপতি। এ'র জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষ সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণণা আছে। দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হতে জন্ম বলে এ'র নাম দক্ষ। ইনি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রসূতির গর্ভে এ'র ষোড়শ কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাদের মধ্যে ত্রয়োদশটি ধর্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি মিলিত পিতৃগণকে এবং অবশিষ্ট সতী নাম্নী কন্যাটিকে মহাদেবের হস্তে দক্ষ সম্প্রদান করেন। একবার বিশ্বস্রষ্টাগণ এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে সমস্ত দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হন। দক্ষ প্রজাপতি সেই যজ্ঞে উপস্থিত হলে সকল দেবতাই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন, কেবল মহাদেব ও ব্রহ্মা নিজেদের আসন হতে উত্থিত হন না। এতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবনিন্দা আরম্ভ করেন এবং শিবকে অভিসম্পাত দেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে মহাদেব যজ্ঞের ফল ভাগ গ্রহণে বঞ্চিত হবেন।

আলম তার নোট লেখা ডায়েরির পাতা ওল্টাচ্ছিল।

কিছুদিন পরে ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির ওপরে আধিপত্য করার অধিকার দান করেন। এতে দক্ষ গর্বিত হয়ে বৃহস্পতি নামে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন, ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, কেবলমাত্র মহাদেব ও সতীকে আমন্ত্রণ থেকে বাদ দেন। সতী যজ্ঞের কথা শুনেই বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে উপস্থিত হওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহাদেব অনুমতি না দিলেও সতী স্বামীর বাক্য উপেক্ষা করে পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। তখন সতীর সম্মুখেই দক্ষ জামাতা মহাদেবের নিন্দা করতে আরম্ভ করেন। স্বামী নিন্দায় অপমানিতা সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। মহাদেব সতীর প্রাণত্যাগের কথা শ্রবণকরতঃ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তৎক্ষনাৎ মস্তকাস্থিত একটি জটা ছিন্ন করে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। ফলে উক্ত ছিন্ন-জটা হতে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। বীরভদ্র শিবের অনুচরদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করতে যাত্রা করেন।

তিনি ভৃগুর শশ্রু ও পূষণের দন্ত উৎপাটন এবং অস্ত্রাঘাতে দক্ষের শিরশ্ছেদ করেন। পরে দক্ষের ছিন্ন শির যজ্ঞের অগ্নিতে ভস্ম করা হয়।

ব্রহ্মা দক্ষের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হয়ে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে কৈলাস গমন পূর্বক নানা প্রকারে শিবকে তুষ্ট করে দক্ষের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন।

তখন শিব বলেন যে, দক্ষের মুণ্ড যখন দগ্ধ হয়েছে, তখন তার পরিবর্তে ছাগের মুণ্ড দক্ষের শিরস্থানে স্থাপিত হউক। মহাদেবের কথানুসারে দক্ষের শিরস্থানে এক ছাগমুণ্ড সংযুক্ত করেন। দক্ষ জীবিত হয়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে মহাদেবের স্তবগান করতে থাকেন।

একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করা টেকনোক্রাটরা আসলে ছাগল, পুরাণকাররা তাই বলতে চেয়েছেন। এমনটি ভাবতে ভাবতে খান একটা সিগারেট ধরাল। অ্যাজবেস্টাস চাল দেয়া দোতলার এই ঘরে আজ তেমন গরম নেই। ছাদের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ আসছে। ঝিপ ঝিপ, ঝিপ ঝিপ। আমি কি দক্ষ, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করি ? খান নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করছিল।

বাংলাদেশে টাকাটা ড্রাফটে না দিয়ে বড়বাজারে হুন্ডি করেও তো পাঠাতে পারত মাখনলালবাবু। টাকার খুব টানাটানি। যারা সাইটে মাল ফেলছে তাদের দিতে, হবে পঞ্চাননের মাইনে. সংসার খরচ আছে। খান নিজের সামনে ছাগমুণ্ড সমেত অনেক দক্ষকে হাসতে দেখল। একসঙ্গে।

তারপর অনেকটা রাত বেড়ে গেলে খান টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে বাইরে। এখন আর তেমন মেঘ নেই। জানলা খুললে স্পষ্ট চাঁদ ভাসা আকাশ চোখে পড়ে। মেরি এখনও তার হাত মেশিনে একঘেয়ে শব্দ তুলে যাচ্ছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আতাবাগান সাইটটা আরও স্পষ্ট নজরে পড়ে। এক ফালি বারান্দাটুকু খান আর মেরির কাছে অনেকখানি অক্সিজেন। টবে বেলফুল গাছ করেছে মেরি। এই বর্ষায় তাদের সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডবল শাদা ফুল। হাওয়ায় মিষ্টি গন্ধ। বুক জুড়োয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে খান আরও খানিকটা বাতাস পেল। তার হাতে নতুন সিগারেট। ছেলেমেয়েরা সব মশারির ভেতর। ট্রানজিস্টারে কি একটা ধীর লয়ের গান বাজছে। পাড়ার কোনো দোকানের ঝাঁপই খোলা নেই। সিগারেটের ধোঁয়া ভেতরে টেনে নিতে নিতে খান আবার অসমাপ্ত পিলারের ওপর পড়ে থাকা চাঁদের আলো দেখতে পেল। রাতের এই মায়া জ্যোৎস্নায় সেই সব খাম্বা বুঝি বা কোনো পুরনো রোমান অ্যামফি থিয়েটার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল খান সেই অ্যামফি থিয়েটারে ঘোড়া

দাবড়ে দাবড়ে ছুটে আসছিল একজন মোগল সৈন্য। তার কোমরে কিরিচ, হাতে তলোয়ার। গালের এক পাশে জ্যোৎস্না পড়লেও মুখ তেমন করে বোঝা যাচ্ছিল না। ঘোড়ার খুরের নিচে থেঁতলে যাচ্ছিল আতাবাগানের বৃষ্টি ভেজা ঘাস। তেলাকুচার লতায় ঝুলে থাকা শাদা ফুলটি। আলম খান আবছা আলো আঁধারিতে মামুদাবাদ পরগণার মামুদকে চিনতে পারছিল। আবার চিনতে পারছিলওনা।

চাঁদের ফিকে আলোয় সেই ঘোড়সওয়ার, তার ছুটে আসা, যেন বা কোনো টি. ভি সিরিয়ালে দেখা স্লো মোশান শট হয়ে খানের সামনে আসছিল। ধীরে দুলে দুলে। ঘোড়ার পায়ের নিচে থেঁতলে পিষে যাওয়া ঘাস, সবুজ তেলাকুচো লতা, তার শাদা ফুলের ভেজা ভেজা গন্ধ পেয়ে যাচ্ছিল আলম। গন্ধ পাচ্ছিল ঘোড়ার ঘামের।

শেষ না হওয়া খাঁ'বাদের লম্বাটে ছায়া পড়েছিল খানিকটা দূরে। খান দেখতে পাচ্ছিল এখন পঞ্চাননের ঘরে কোনো আলো নেই। গোটা ঘর চাঁদের আলোর নিচে স্থির। শাহেনশা আকবরের আমলে মেদিনীপুরে ঘোড়া দাবড়ানো সেই মামুদ খান, আমার পূর্বপুরুষ, ঘোড়া সমেত তাঁর লম্বা ছায়াটি যেন বা কোনো মৌজা ম্যাপ হয়ে জ্যোৎস্না লাগা আকাশের গায়ে একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এই কি মামুদ খান, না অন্য কেউ? খান নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে।

ঘোড়সওয়ার থামছিল না। ঘোড়ার পায়ে পায়ে শব্দ উঠছিল খপ খপ খপ খপ। আর তাদের ছায়ায় তৈরি হয়ে ওঠা সেই বিশাল মৌজা ম্যাপখানা উড়তে উড়তে, দুলতে দুলতে কোন দিগন্তে মুছে যেতে চাইছিল।

খান কিছুতেই আকাশের গায়ে আলোয় ছায়ায় ছায়াছবি হয়ে বসে যাওয়া সেই ম্যাপটিকে কোন মৌজার তেমনটি নির্দিষ্ট করে চিনতে পারছিল না।

দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে, দেখতে চেয়ে সেই আকাশ পৃথিবী এক করে দেয়া মানচিত্রটির বুক থেকে দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর পড়ে নিতে চাইছিল আলম। পারছিল না। ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। দূরে কোথাও।

হরিদাস এবং তার গুপ্তকথা

রমাকান্ত চক্রবর্তী

॥ এক ॥

'হরিদাস' নামটির দ্বারা এখনও পর্যন্ত সামান্যতা ও সরলতা ব্যঞ্জিত হয়। নামটি শুনলেই এমন মনে হতে পারে যে, হরিদাসের কোন গুপ্তকথা থাকতে পারে না। বাঙালি হরিদাসদের জীবনে বিশেষ কোন নাটকীয় ঘটনা, উল্লেখযোগ্য উত্থানপতন ঘটে না। তার সুখদুঃখ সর্বদা একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে থাকে।

তথাপি এইরকম এক হরিদাসকে নায়করূপে দেখিয়ে গুপ্তকথামূলক 'নবন্যাস' 'রহোন্যাস' রচনা করেছিলেন শোভাবাজারের রাজা উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (১৮৪০–১৯১৩) এবং ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২–১৯১৬)। উপেন্দ্রকৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন রাজা রাজকৃষ্ণ এবং পিতা ছিলেন রাজা রাজকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র রাজা অপূর্বকৃষ্ণ দেববাহাদুর।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্যঃ তুমি কি আমার? (নবন্যাস, ১৮৭৩-১৮৭৯) রহস্য-মুকুর, আশ্চর্য গুপ্তকথা (১৮৭৭-৭৮) বিলাতী গুপ্তকথা, ২ খণ্ড (১৮৮৮–১৮৮৯) বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা (সহযোগী লেখক কৃষ্ণধন বিদ্যার্পতি, ২ খণ্ড, ১৮৯০) রামকৃষ্ণ চরিতামৃত (১৯০১) বঙ্গ রহস্য, দুই খণ্ড (১৯০৪) হরিদাসের গুপ্তকথা (নবন্যাস, ১৯০৪) লণ্ডন রহস্য, ১ (১৯১২–১৯১৪) রাণী ইউজিনীর বৈঠক (১৯২৪) রাজা আদিত্য নারায়ণের গুপ্তকথা

ভুবনচন্দ্র রচিত প্রহসনঃ পাঁচ পাগলের ঘর (১৮৮০) ঠাকুরপো (১৮৮৬) মা এয়েচেন !!! (১৮৭৩)

তিনি 'সিপাহী-বিদ্রোহ বা মিউটিনী' নামে মহাবিদ্রোহের ইতিহাসও রচনা করেন (প্রকাশকাল ১৯০৭)।'পরিদর্শক', 'সোমপ্রকাশ', 'বিদূষক', 'পূর্ণ শশী', 'বসুমতী', এবং 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার সম্পাদনাও তিনি করেছিলেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভুবনচন্দ্র সারাজীবন ধরে কণ্টকাকীর্ণ, রহস্যময়, অন্ধকার পথে চলেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে লোকে তাঁকে ভুলে গেল। সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেনঃ[২]

একটা কথা সাহিত্য পরিষদ সাহিত্যসভা প্রভৃতি মোড়লদের জিজ্ঞাসা করিব, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মরিয়াছেন, তোমাদের সে খবর আছে কি··· নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে যে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গঙ্গাস্রোতের মত সমানভাবে ষাট বৎসর কাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে, সেই ভুবনবাবু দলের একজন ছিল না বলিয়া আজ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিল।

সুকুমার সেন যুক্তির প্রয়োগে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচনা করেন।[৩] কিন্তু এই মত সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। ভুবনচন্দ্র-রচিত নকশা 'সমাজ কুচিত্র' (জানুয়োরি, ১৮৮৫)। ভাষায় এবং ভঙ্গির বিচারে এই দুইটি নকশার স্পষ্টতঃ ভিন্ন।[৪]

॥ দুই ॥

হরিদাসের গুপ্তকথা দুইটি গ্রন্থে আছে। প্রথম গ্রন্থ, 'এই এক নূতন। আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য!!! কুমার শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেব দ্বারা প্রকাশিত। (ইংরেজি হরফে) Kumar Upendra Krishna প্রণেতা। দ্বাদশ সংস্করণ / সংবৎ ১৯৬৩ (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ)। দ্বিতীয় গ্রন্থ, "হরিদাসের গুপ্তকথা' (চার খণ্ডের অখণ্ড সংস্করণ) শ্রী ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা-৯। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৯৪ (প্রথম সংস্করণ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ)

কেউ কেউ ভেবেছেন যে, প্রথমোক্ত গ্রন্থটির রচয়িতাও ছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৭০-এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কলকাতায় প্রকাশ করেছিলেন নবীনকৃষ্ণ বসু। তাঁর বিবৃতি অনুসারে 'কুমার' উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতৎ উপাখ্যানের স্থূল গ্রন্থি, স্থূল মর্ম, স্থূল বৃত্তান্ত এবং স্থূলে স্থূল সমস্ত আখ্যান-কাণ্ড আখ্যান করেন। তাঁহার উপদেশে, তাঁহার সাহায্যে, এবং তাঁহার উৎসাহে··· তাঁহার অকৃত্রিম পরম মিত্র সংবাদ প্রভাকর পত্রের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অলঙ্কারাদি যোগে উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের নামে এই আখ্যানটি রচনা করেন।" কিন্তু, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'এই এক নূতন'-এর দ্বাদশ সংস্করণে প্রণেতারূপে "Kumar Upendra Krishna" সুস্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। এই গ্রন্থের 'কৌতূহল পরিতৃপ্তি' অংশে (পৃ. ৪৮৭) লেখা হয়েছে ঃ

কলকাতা শোভাবাজারের রাজকুলকিশোর, স্বজাতীয় কাব্যসাহিত্যের অকপট অকৃত্রিম মিত্র, শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতৎ উপন্যাসের একমাত্র প্রণেতা,—তিনিই এই রহোন্যাসটি বিরচন করেন···সবজান্তা কুমার শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর···এখন এঁর সেই আয়াস—সেই যত্ন সফল হোলো কি না, সে বিচার আপনাদের হস্তে।

প্রকাশক

এ গ্রন্থের 'অন্ত্য স্তবক' (পৃ ৪৮৩) ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। সুকুমার সেন লিখেছেন ঃ[৫]

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই দেখি ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের হইয়া রেনলড্‌সের উপন্যাস-কাহিনীর অনুকরণে একটি বৃহৎ উপন্যাস লিখিতেছেন। এই বইটি দুই বৎসরের অধিককাল ধরিয়া (ডিসেম্বর ১৮৭১ হইতে এপ্রিল ১৮৭৩ পর্যন্ত) মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়াছিল 'এই এক নূতন !'···নামে। লেখকের নাম ছিল না।"

পাদটীকায় অধ্যাপক সেন লিখেছেন ঃ[৬]

বইটি নায়ক হরিদাসের আত্মকথা। পরে ভুবনচন্দ্র 'হরিদাসের গুপ্তকথা' নাম দিয়া স্বনামে প্রকাশ করিলে পর স্বত্বাধিকার লইয়া উপেন্দ্রকৃষ্ণের সহিত বিবাদ হয়। ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণের গ্রন্থস্বত্ব স্বীকার করেন এবং 'হরিদাসের গুপ্তকথা' নামে আর একটি বই লিখিয়া প্রকাশ করেন।

সমস্ত বিষয়টি জটিল হয়ে উঠল। ভুবনচন্দ্র 'এই এক নূতন' আখ্যাযুক্ত বইকে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আখ্যা দিয়ে কখন প্রকাশ করলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। 'হরিদাসের গুপ্তকথা'-র আধুনিক দ্বিতীয় সংস্করণে (পূর্বে উল্লিখিত) এ তথ্য দেওয়া হয়েছে যে, এর প্রথম সংস্করণ ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। আবার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ তথ্য উল্লেখ করেছেন যে, ভুবনচন্দ্র-রচিত 'আর এক নূতন ! হরিদাসের গুপ্তকথা' ২৭.৩.১৯০৪-এ প্রকাশিত হয়। এই দুইটি গ্রন্থ 'এই এক নূতন' থেকে ভিন্ন। উপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে কখন বিবাদ হ'ল, তা জানি না। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এইরূপ হয় যে, 'এই এক নূতন'' রচনার জন্য উপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং ভুবনচন্দ্র একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। দুইজনে মিলেই এই 'রহোন্যাস'-টি লিখেছিলেন, একা ভুবনচন্দ্র তা লেখেননি। কিন্তু 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ভুবনচন্দ্রই লিখেছেন। 'এই এক নূতন'-এর নায়ক হরিদাসের অভিজ্ঞতা, 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র নায়ক

হরিদাসের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন।[৭] কিন্তু দুই হরিদাস আসলে এক হরিদাস। সমস্ত বিষয়টি কিছুটা রহস্যময় এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

॥ তিন ॥

জি, ডব্লু, এস, রেনল্ড্স্ নামক ব্রিটিশ সাংবাদিক (১৮১৪-১৮৭৯) ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে, এবং তার পরে, প্রথমে 'দি মিস্ট্রিস্ অফ্ লণ্ডন', এবং 'দি মিস্ট্রিস্ অফ্ দি কোর্ট অফ্ লণ্ডন' লিখেছিলেন। সস্তা কাগজে, চক্ষুর রোগ উৎপাদক হরফে মুদ্রিত এসব গ্রন্থ এ শতকের পঞ্চাশের দশকেও কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের 'দেয়াল-দোকানে' দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে উভয় 'মিস্ট্রিস্' ৬২৪ খন্ডে মুদ্রিত হয়। এ বই অবশ্যই কলকাতায় আসে, এবং অচিরেই এক শ্রেণীর পাঠক-সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং ভুবনচন্দ্র 'মিস্ট্রিস্'-দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষভাবে ভুবনচন্দ্র এসব বিলায়েতি কেচ্ছাকে বঙ্গে প্রচার করেন; মনে হয় যে, তিনি সাহেবি-কৃষ্টির অন্ধকার অংশ-গুলোকে কোন অনির্দেশ্য জাতীয়তাবাদী প্রেরণা থেকেই বঙ্গভাষায় প্রচার করেন। বিশেষভাবে বাঙলা ভাষায় তিনিই "অন্য ভিক্টোরিয়ান্"দের মুখোস খুলে দিলেন।[৮]

এখানে এ তথ্যও উপেক্ষনীয় নয় যে,উপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং ভুবনচন্দ্র রেনলডস্-এর রচনার আদর্শের সঙ্গে প্রচলিত দেশী রহস্য-কথনের আদর্শ মিশ্রিত করেন। রঙ্গ ভরা বঙ্গদেশে রহস্যের তথা গুপ্ত কথার অভাব ছিল না। সুরঙ্গ কেটে মালিনীর ঘর থেকে রাজনন্দিনী বিদ্যার ঘরে গিয়ে অবাঙালি রাজকুমার সুন্দর যে লীলা করতেন, তার বিশদ বিবরণ ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে দিয়েছেন। এই গোপন, এবং সম্পূর্ণভাবে দৈহিক প্রেম-রহস্য আরওঅনেক বাঙালি কবি-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'-তে উদ্ঘাটিত হয়েছে।[৯] 'হরেহর মঙ্গল'-সঙ্গীত এ,[১০] 'কামিনীকুমার'-এ[১১] এই ধরনের গোপনীয় লীলার বিবরণ অস্বস্তিকর ভাবে বিশদ। ভাবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, বহু আলোচিত 'কলিকাতা কমলালয়,' 'নববাবু বিলাস,' 'নব বিবি বিলাস,' 'দূতিবিলাস' রহস্য কথনের জন্যই বিশিষ্ট। গৌরীশঙ্কর তর্ক-বাগীশ অথবা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'সংবাদ রসরাজ' পত্রিকায় বহু 'গুপ্ত' সংবাদ অভব্য ভাষায় প্রকাশিত হ'ত।[১২] নারায়ণ চট্টরাজ নামক লেখক অসভ্য, অথচ রক্ষণশীল' প্রহসন রচনা করেন।[১৩] দাশরথি রায় তাঁর কয়েকটি পাঁচালীতে

বেশ্যাদের এবং লম্পটদের কীর্তিকলাপের বিবরণ দিয়েছিলেন।[১৪] গুপ্ত কথার শিল্পিত প্রকাশে, ভাষার অনন্যতায়, আর সবাইকে অতিক্রম করেছিলেন হুতোম প্যাঁচা। 'এই এক নূতন'-এ, 'হরিদাসের গুপ্ত কথা'য় এই প্রবহমান বাঙালি ধারার, বাঙালি রীতির প্রভাবও সুস্পষ্ট।

হরিদাস প্রধানতঃ এমন এক বাঙালি যুবক, প্রচলিত ব্রহ্মণ্য নীতিবোধে যার বিশ্বাস সর্বদা স্থির। হরিদাসের মানসিক গঠনে 'ভিক্টোরীয়' সংস্কৃতির কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তার পরিচিত নরনারী প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বাঙালি। হরিদাস জমিদারের সন্তান এবং উত্তরাধিকারী হলেও বাঙালি জমিদারদের প্রতিনিধিরূপে চিহ্নিত হয়নি। তার গুপ্ত কথার ভৌগোলিক পটভূমি উক্ত গ্রন্থ দুইটিতে আসাম থেকে গুজরাট পর্যন্ত প্রসারিত। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার ধারায় আত্মস্বরূপ জানার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। হরিদাস নিজের পরিচয় জানতে চায়। আত্মানুসন্ধানের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা হরিদাসের গুপ্ত কথায় খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার পার্থিব অনুষঙ্গ সেখানে স্পষ্ট। ঐতিহ্যবাহিত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রভাব সেখানে দেখা যায় না। তাতে দেখা যায় শাস্ত্রীয় নীতির প্রভাব। কিন্তু তা কোন ইংরেজ লেখকের রচনা থেকে ধার করে আনা হয় নি। অথচ, হরিদাস কাহিনীর অন্তর্নিহিত পার্থিবতা অবশ্যই প্রকরণের বিচারে বৈদেশিক।

॥ চার ॥

হরিদাস যখন আত্মপরিচয় জানার জন্য দেশে দেশে ঘুরছিল, তখনই সম্ভবতঃ ঠগীদের দমন করা হয়।[১৫] তখনও রেলপথ তৈরি হয়নি। হরিদাস স্থল পথে এবং জল পথে ভ্রমণ করেছে। উইলিয়াম স্লীম্যান্ হক ও তাঁর সহযোগীগণ মধ্যপ্রদেশে ঠগীদস্যুদের দমন করার জন্য বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিলেন। বর্ধমানে ঠগীদের একটা বড় আড্ডা ছিল। বর্ধমেনে ঠগীদের বলা হ'ত 'ভাগিনা'। 'ভাগিনা'–ঠগীরা ছিল জলদস্যু।[১৬] কতকগুলো দস্যু-গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গে ডাকাতি এবং নর হত্যা করত।[১৭] হরিদাসের গুপ্ত কথায় দেখি, বর্ধমানের ঠগীদের মধ্যে কারু কারু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হরিদাসেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মানকরের জমিদার মানিকচাঁদ / মোহনলাল। দস্যুদের সাহায্য নিয়ে,

এই ব্যক্তি মানকরের জমিদারির আসল উত্তরাধিকারী হরিদাসকে বার বার ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রকৃত ঠগী দস্যুদের সম্পর্কে হরিদাসের গুপ্ত কথার ধাঁচে একটি বড় উপন্যাস রচিত হয়। আমার সংগ্রহে ন্যস্ত এই বইটির কোন আখ্যাপত্র নেই। 'অঙ্কুর' শীর্ষক ভূমিকায় লেখকের নাম নেই। এর রচনাকাল ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ। বইটির আখ্যা 'ভবানী ঠাকুর'; এটি ৩৫নং আহিরীটোলা স্ট্রীটে সুধার্ণব যন্ত্রে শ্রীনিবারণ চন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল। 'অঙ্কুর'-এ অনামী লেখক লিখেছেন :

> আর যে সকল পাষণ্ড অদ্যাবধি সংসারের বুকে বোসে সংসারকে নরকে পরিণত কোচ্চে, যে সকল কুলটা সতী নামের আড়-ঘোমটায় মুখ ঢেকে সংসারের শান্তি ভঙ্গ কোচ্চে, যে সকল হাঁদা-পেটা বড় মানুষের গাধারাম ছেলে বাবুরা সংসারটাকে সরার মত দেখছে, তাদের··আশ্চর্য্য কীর্তিমালা অতি স্পষ্ট··চিত্র কোরে আপনাদের সম্মুখে ধারণ কোর্ত্তে অগ্রসর হয়েছি···

এ গ্রন্থে মেডোস্ টেলর্-রচিত 'কন্ফেসনস্ অফ্ এ নান্' [রচনাকাল উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক, প্রকাশকাল ১৮৩৯]-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। কৈশোরে ভবানীঠাকুর ঠগীদের দলেই ছিল। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দেবী চৌধুরাণী'-উপন্যাস (প্রকাশকাল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ)-দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভবানীঠাকুরের সঙ্গে স্লীম্যান্-সাহেবের বন্ধুত্বের বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক।[২৮] স্লীম্যান্ অনেক ভাষা শিখেছিলেন ; লেখক দেখিয়েছেন যে তিনি চমৎকার বাঙলাতেও চিঠি-পত্র লিখতেন।[২৯]

প্রসঙ্গতঃ এ তথ্যও উল্লেখ্য যে, 'এই এক নূতন' ও যে ধরনের পারিবারিক গুপ্ত কথা প্রকাশিত হয়েছিল, অনেকটা সে ধরনের গুপ্ত কথার প্রকাশ বহু বাঙলা প্রহসনে দেখা যায়। অর্থাৎ 'এই এক নূতন' এক ধরনের বাঙলা প্রহসনরচনার প্রেরণা যোগায়। তাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করি :[৩০]

> বেচুলাল বানিয়া, 'ছোট বউর বোম্বাচাক' [প্রকাশকাল অজ্ঞাত] বেচুলাল বানিয়া, 'কমলিনীর মধুচাক' [প্রকাশকাল অজ্ঞাত] কালুমিয়া, 'রাতে উপুর দিনে চিৎ; ছোট বউর এ কি রীতি' [প্রকাশকাল অজ্ঞাত]

কালিপদ ভাদুড়ী, 'গুণের শ্বশুর' (২য় সং, ১৮৮১)

অম্বিকাচরণ গুপ্ত, 'কলির মেয়ে ছোট বো ওরফে ঘোর মূর্খ' (১৮৮১)

বিনোদবিহারী বসু, 'সরস্বতীলতার গুপ্ত কথা' (১৮৮৩)
শম্ভুনাথ বিশ্বাস, 'শ্বাশুরি-জামাই' (১৮৮৩)
হারাণশশী দে, 'কলিকালের রসিক মেয়ে' ২ খণ্ড (১৮৮৮-১৮৮৯)
কুঞ্জবিহারী বসু, 'তুই না অবলা ?' (১৮৮৪)
আশুতোষ বসু, 'সমাজ কলঙ্ক' (১৮৮৫)
মোহনলাল মিত্র, 'রসিক কামিনীর হন্দ মজা রথ দেখা আর কলাবেচা' (১৮৮৯)
হরিপদ ভট্টাচার্য, 'মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা' (১৮৯৭)
চন্দ্রশেখর শর্মা, 'নারী চাতুরী' (১৮৯৫)
এস. এন. লাহা, 'গোপাল মণির স্বপ্ন কথা' (১৯৮৭)
মণিলাল মিত্র, 'শান্তমণির চূড়ান্ত কথা' (১৮৮৭)
ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, 'ছোট বউর গুপ্তপ্রেম' (১৮৮৬)
পঞ্চানন রায় চৌধুরী, 'কুল কলঙ্কিনী বা কলিকাতার গুপ্তকথা' (১৯০০)[২১]

॥ পাঁচ ॥

হরিদাসের গুপ্ত কথায় বার বার বিভিন্ন ঘটনার বিবরণে এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, মানবিক মূল্যবোধ এবং শাস্ত্রীয় সদাচার যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে তার জন্য কেবলমাত্র বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় না। প্রহসন রচয়িতাদের মতে 'কলিকাল'-এ এরূপ দুর্নীতি এবং অসভ্যতা দুর্নিবার ছিল। কিন্তু হরিদাস 'কলিকাল'-এর দোহাই দেয় নি। সে দেখাতে চেয়েছে যে, ব্যক্তি-চরিত্রের অধঃপতনের জন্য ব্যক্তি দায়ী ছিল, দায়ী ছিল তার মানসিক দুর্বলতা। হরিদাস আধুনিক শিক্ষা লাভ করেনি ; তাই উনিশ শতকীয় যুক্তিবোধের এবং আধুনিকতার ধার সে ধারে না। এটাই ছিল উপেন্দ্রকৃষ্ণের এবং ভুবনচন্দ্রের পরিচিত জমিদারি-পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রচলিত নৈতিক ধারণা।

উনিশ শতকের বাঙলা উপন্যাসে কখন কখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব, তান্ত্রিক এবং শৈব ধর্মের প্রভাব তখন প্রায় দুরতিক্রম্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তার উর্ধে উঠবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। কিন্তু হরিদাস ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়লেও কোন দয়ালু দেবতার শরণ নেয় নি। বুদ্ধিবলে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে সে বিপদে রক্ষা পেয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল এই যে, হরিদাসের চৈতন্যে শাস্ত্রীয় মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেও কোন উপাস্য দেবতার

স্থান ছিল না। যেখানে এত অত্যাচার, নরহত্যা, লুণ্ঠন, ব্যাভিচার, এবং পীড়ন, সেখানে সুসভ্য ইংরেজদের মতো প্রধান পৌরাণিক দেবতারাও অপ্রাসঙ্গিক। এই বিশেষ ভাবধারা হরিদাসের গুপ্তকথায় সুস্পষ্ট। সেখানে দৈব-নিরপেক্ষ প্রযত্নই গুরুত্বপূর্ণ, ধর্ম কিম্বা ভক্তি নয়। এই তত্ত্ব বিদেশ থেকেই আসুক, অথবা এ দেশেই উদ্ভাবিত হোক্ না কেন, এর অসীম সম্ভাবনা ছিল। 'সেকুলার'-উপন্যাসের এই ক্ষীণ ধারা উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে চাপা পড়ে গেল।

উপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং ভুবনচন্দ্র-সৃষ্ট হরিদাস কলকাতার লোক নয়। হরিদাসের গুপ্তকথা কলকাতার গুপ্তকথা নয়।[২২] ভুবনচন্দ্রের হরিদাস সুপরিণত বয়সে কর্মসূত্রে একবার কলকাতায় এসে 'বাহির মির্জাপুর'-এ অবস্থিত নিজগৃহে কিছু-কাল থাকে। তখন সে ধনী জমিদার, এবং দুই পুত্র, এক কন্যার পিতা। একদিন সাহায্যপ্রার্থী এক ব্রাহ্মকে সে বলে ঃ[১৩]

> রাজা রামমোহন রায় যে উদ্দেশে, যে মূলের উপর নির্ভর কোরে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কোরেছিলেন সে উদ্দেশ্য এখন বিফল, সে মূল এখন বিপর্যস্ত ; ব্রহ্মজ্ঞান যেন বাজারের পণ্যবস্তু, বালকের ক্রীড়ার বস্তু। হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার আজকাল স্বেচ্ছাচারে পরিণত।

ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি ছিলেন 'কথ্‌বার্টসন হার্‌পার কোম্পানীর বাড়ি'র-র হেড্ ক্লার্ক্। তা জেনে, হরিদাস 'অন্তরে ঘৃণা, মুখে অল্প হাস্য আনয়ন কোরে 'তৎক্ষণাৎ' বলে ঃ[১৪]

> এই দেখুন, মুচির বাড়িতে চাকুরী কোরে আপনি সমাজ সংস্কারের মুরুব্বী হতে চান! এটা কত বড় আশ্চর্য কথা! আপনার মত লোকের দ্বারা সমাজের উন্নতি একপ্রকার বিড়ম্বনা।"

'জমিদার' হরিদাসের এমন সিদ্ধান্তে তার মানসিক সীমাবদ্ধতারই প্রকাশ দৃশ্যমান।

॥ ছয় ॥

মধ্যযুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা সমূহ নানা কারণে বিচ্ছিন্ন ছিল। আধুনিক কালে প্রাগাধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতি 'বাঙ্গালীর' বিশিষ্টতা'রূপে চিহ্নিত হয়েছে।[২৭] এই বিশিষ্টতার রূপরেখা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে সুস্পষ্ট হয়। চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের ফলে কিছুকালের জন্য বাঙালি

বৈষ্ণবদের সঙ্গে ভারতের অনান্য অঞ্চলের বৈষ্ণবদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিরন্তর প্রযত্নে বৃন্দাবন একটি বড় তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। বঙ্গের মুসলমান কবিদের কোন কোন রচনায় বহির্বঙ্গীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাঙলা মঙ্গলকাব্যের আঞ্চলিক রূপ সুস্পষ্ট হয়ে রইল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী বাঙলার প্রশাসক গোষ্ঠী মুগল যুগে বঙ্গের সাংস্কৃতিক বিকাশে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন নি। এমন একটা সময় এল যখন সপ্তগ্রামের বণিকরা পর্যন্ত ঘরে বসে থাকতেন।[২৬] শেষ পর্যন্ত বাঙলা আধ্যাত্মিক গানে এমনও বলা হ'ল যে, হৃদয়স্থিত ঈশ্বর। ঈশ্বরীকে উপাসনা করার অভ্যাস থাকলে আর গয়াকাশী প্রয়াগ বৃন্দাবনে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।[২৭]

পলাশির যুদ্ধের পরে যখন কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশরা তাদের শাসন-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে থাকে, এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে পথ-ঘাটের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে থাকে, তখন বঙ্গের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহুস্তরবিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এ সংযোগ শুধু মধ্যকালীন চাউল চিনি আর কাপড় চালান দেওয়ার জন্যই অর্থনৈতিক সংযোগমাত্র ছিল না। অনেক বাঙালি কর্মচারী, আইনবিদ্, ঠিকাদার, শিক্ষক বঙ্গের বাইরে চলে যেতে থাকেন। যদুনাথ সরকার এই ঘটনার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২৮] সামরিক কমিশারিয়াট্'-এ যে সব বাঙালি কাজ করতেন, তাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বত্রই যেতেন। বঙ্গের অন্তরণ অথবা বিচ্ছিন্নতা আর রইল না।

কিন্তু এই ইতিবাচক ঘটনা প্রথমে সাহিত্যে তেমন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় নি। 'হরিহরমঙ্গল', 'কামিনীকুমার'—জাতীয় কোন কোন অর্ধ 'পর্ণোলিজি'-তে অবঙ্গীয় প্রসঙ্গ রয়েছে। তাতে এই দেখান হয় যে, উদ্দাম রতিলীলা বঙ্গীয় পরিবেশে সম্ভাব্য না হলেও, [রক্ষণশীল একান্নবর্তী পরিবারে তা সম্ভাব্য ছিল না], পাটনাতে, উত্তর ভারতের অন্য কোন সহরে তা বেশ ভালই চলতে পারে। এমতাবস্থায় 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালি' নব্য বঙ্গীয় সাহিত্যে কল্কে পেলেন না; সাম্প্রতিক কালে তাঁরা অল্পস্বল্প কল্কে পাচ্ছেন।

এই সাহিত্যিক বায়ুমণ্ডলে হরিদাসের গুপ্তকথায় দেশে দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হ'ল ডাকাতির, ব্যাভিচারের, লুণ্ঠনের, অত্যাচারের এবং ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিক বিবরণ। তা ঠিক্ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়।[২৯] হরিদাসের ভ্রমণ বিবরণের বিশেষ কোন

আধ্যাত্মিক এবং নান্দনিক ব্যঞ্জনা নেই। নিতান্তই প্রাণের দায়ে হরিদাস গিয়েছে আসামে কামাখ্যার মন্দিরে, মুর্শিদাবাদের গ্রামে, মাণিকগঞ্জে, ঢাকা সহরে, ত্রিপুরার গ্রামে, কলকাতাতে, ফরাসডাঙ্গাতে, বৈচীতে, বর্ধমানে, মানকরে, বীরভূমে, পাটনা কাশী এলাহাবাদ মধ্যভারত গুজরাটে। সমকালীন এবং পরবর্তী বাঙলা উপন্যাসে এত সব জায়গার বিশদ বিবরণ দেখা যায় না। এর কিছুটা সমান্তর কেবলমাত্র শরৎচন্দ্র রচিত কোন কোন উপন্যাসেই আছে।

পবিত্র তীর্থ কাশীধামে নানান ধরণের বাঙালি সমাজবিরোধীদের সমাবেশ হয়েছিল। ভুবনচন্দ্রের ভাষায়,[৩০]

> কাশীধাম কি ইদানী (?) নানা পাপের আশ্রয়স্থান হোয়ে পোড়েছে? লোকের মুখে যে রকম শুনতে পাওয়া যায়, সে প্রমাণে ঐরূপ কলঙ্কই যেন সত্য মনে হয়। বাঙালী দলের বেশী কলঙ্ক। জাতিতে জাতিতে বিজাতিতে, সম্পর্কে সম্পর্কে সম্পর্কে, নিঃসম্পর্কে বাঙালী নরনারী পাপলিপ্ত হোলেই নিরাপদের আশাতে কাশীতে পালিয়ে আসে; মাতুলের ঔরসে ভাগিনীপুত্রী, পিতৃব্যের ঔরসে ভ্রাতৃকুমারী. ভ্রাতার ঔরসে বিমাতৃ-কুমারী, ভাগিনেয়ের ঔরসে মাতুলানী, জামাতার ঔরসে শ্বশ্রূঠাকুরানী, শ্বশুরের ঔরসে যুবতী পুত্রবধূ গর্ভবতী হোলেই কাশীধামে পালিয়ে আসে!

উপেন্দ্রকৃষ্ণর বিবরণে কাশী প্রধানতঃ বাঙালী পতিতাদের, গুণ্ডাদের, এবং খুনিদের আশ্রয়স্থল। সেখানে নরঘাতী বাঙালী ডাকাতরা দিবালোকে বেশ ঘুরে বেড়ায়।

বিভিন্ন স্থানের যে বিশদ বিবরণ হরিদাসের গুপ্তকথায় আছে, তা এখানে আলোচনা করা যাবে না। কিন্তু কলকাতার এবং বর্ধমানের বিবরণ সামান্য ভাবেও দিতে হয়। উপেন্দ্রকৃষ্ণ অনেকটা নকশার ধাঁচে কলকাতার চিত্র এঁকেছেন:[৩১]

> রাস্তায় রাস্তায় গোরুর গাড়ী আর হাঁটা লোকের অসম্ভব ভীড়···যতদূর যাই, ততদূর কেবল বাড়ী···গাড়ীর গড় গড়···নিকটে এসে দেখি, গাড়ী অগুনতি! ইস্কুলের ছেলেরা, কেউ কেউ গাড়ীতে, কেউ বেহারার কাঁধে, কেউ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে চোলেছেন···দূরে গোলাপী রেউড়ী, সখের জলপান, গোলাপী গাণ্ডেরী, আম-আঁচার, জিলিপি, কচুরী, মন্ডা, মিঠাই, সখের চানাচুর, গায়ে গায়ে ইমারত, গায়ে গায়ে গায়ে বারান্ডা, মাঝে মাঝে

পাকা কাঁচা রকমারি দোকান…বেধড়ক বিক্রী হোচে…এক জায়গায় একজন মানুষ…ভেউ ভেউ কোরে কাঁদচে। জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, তার কোমর থেকে বার টাকা গাঁটকাটাতে কেটে নিয়েছে…এই সকল দেখে শুনে আমার মনে বড় ভয় হোলো।

ভুবনচন্দ্রের বিবরণ এইরূপ ঃ[৩২]

গরাণহাটা থেকে কলুটোলা-রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেম, দু-ধারি বারান্দায় বারান্দায় রকমারি মেয়েমানুষ। রকমারি বর্ণের কাপড় পরা, রকমারি ধাতুর গহনা পরা, রকমারি ধরণের খোঁপা বাঁধা অনেক রকম মেয়েমানুষ। কেহ কেহ টুলের উপর বোসে আছে, কেহ কেহ চেয়ারে বোসেছে, কেহ কেহ রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রূপাবাঁধা হুঁকায় তামাক খাচ্ছে, কেহ কেহ রেলিঙের উপর বুক রেখে ভানুমতী ধরণের মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে ঝুলেছে…কারা এরা ?…কলিকাতার বেশ্যানিবাসের প্রণালীটি অতি জঘন্য। গৃহস্থ বাড়ীর কাছে বেশ্যা, ছেলেদের পাঠশালার পাশে বেশ্যা, ডাক্তার কবিরাজের আবাসের পাশে বেশ্যা, কোথাও বা ভালমানুষের মাথার উপর বেশ্যা! অধিক কথা কি, ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের আষ্টেপৃষ্ঠে বেশ্যা! সহরের উপরে আমার ঘৃণা হোলো! কলকাতায় আর বেশীদিন থাকবো না, মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কল্লেম।

বর্ধমান ঃ[৩৩]

বর্ধমানে এক মহারাজা থাকেন…একে একে অনেকগুলি আমার দেখা হোলো। রাজবাড়ী, রাজগাড়ী, রাজঠাকুর, রাজবাগিচা, রাজবানর, রাজতুরঙ্গ, রাজমাতঙ্গ, রাজমৎস্য, রাজবাদ্য, রাজসিপাহি, রাজসাগর, রাজ-পশুশালা, কৌতুকে কৌতুকে আমি সব দর্শন কোল্লেম। সকলগুলিই আশ্চর্য্য!

সমকালীন বাঙ্গালা উপন্যাসে উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের বিবরণ খুব কম দেখা যায়। ভুবনচন্দ্র এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ত্রিপুরার এক গ্রামে, মধ্যসত্ত্বোপভোগী গৃহস্থের বাড়ির ছাদে, সেই বাড়ির এক সুন্দরী বিধবা, 'পায়রা বাবু' নামক উপপতির সঙ্গে, পোষা কয়েকটি কুকুরের পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, আঁধার রাতে তাদের নাচের শব্দ শুনিয়ে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের লোকদের ভুতের ভয় দেখিয়ে, লীলা খেলা করত। তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন ভুবনচন্দ্র।[৩৪]

॥ সাত ॥

হরিদাসের গুপ্তকথার মৌল উৎস জমিদারি ব্যবস্থা। মানকরের জমিদার মানিকচাঁদ / মোহনলাল সেই সব মফস্বল জমিদারদের 'আর্কিটাইপ', যারা বেআইনি ভাবে জমিদার হয়েছিল, এবং যারা নিজের স্বার্থে বিভিন্ন ধরণের সমাজবিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। অথচ, উপেন্দ্রকৃষ্ণ নিজেই ছিলেন বিখ্যাত জমিদার; তাই তিনি এবং তাঁর বন্ধু ভুবনচন্দ্র কখনই জমিদারি ব্যবস্থার সমালোচনা করেননি। কলকাতার জমিদারদের সঙ্গে হরিদাসের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। জমিদারির পরিচালনার বিষয়টি সম্পর্কে হরিদাস কিছুই বলেনি। অথচ, পূর্বোক্ত 'ভবানী ঠাকুর' গ্রন্থে বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত, এবং কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে।[৩৫]

মানকরের জমিদার খুব খারাপ লোক ছিলেন। তিনি হরিদাসের উপরে ভীষণ অত্যাচার করেছেন। বর্ধমানের মহারাজার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেই বোধ হয় হরিদাসের সুবিধা হ'ত। কিন্তু সে বহু কষ্টে বরোদাতে গিয়ে 'শাহুইকুমার'– রাজপুত্রের পরম বন্ধু হ'ল। এই ঘটনা কষ্ট কল্পিত, অস্বাভাবিক। হরিদাসের গুপ্ত কথার এটা একটা মস্ত বড় দুর্বলতা। আসলে এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, চরিত্রহীন, অত্যাচারী ক্ষুদ্র গ্রাম্য জমিদারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য চরিত্রবান পরোপকারী বড় জমিদারের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় ছিল।

হরিদাসের কাহিনীতে শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের কোন ভূমিকা নেই। যেখানে সর্বদা দস্যুতা, রাহাজানি, নরহত্যা চলে, সেখানেও শান্তিরক্ষক সাহেবরা নেই। দেশী দারোগা পুলিশ নিস্ক্রিয়। থানায় এক নরহত্যার ঘটনা জানাতে গিয়ে হরিদাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ এইরূপ:[৩৬]

> আমি নিজেই থানায় গেলাম। গিয়ে দেখি দারোগা মশাই তখন পর্য্যন্তও ঘুমচ্ছেন। অনেক ডাকাডাকিতে নিদ্রাভঙ্গ হলো; খড়ম পায়ে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে এই ঘটনা আরম্ভ কোল্লেম। তিনি বোধ হয় আমার কথা শুনে কিছু বিরক্ত হোলেন। গম্ভীর স্বরে একজন চাকরের নাম কোরে ডেকে বোল্লেন, "তামাক দে রে!" ···দারোগা একখানি চেয়ারে বোসে আমীরি ওজনে গুড়্‌গুড়ি টানতে লাগলেন। চক্ষু দুটী জাহাজের কম্পাসের মতন একদিকেই হেলে রইলো। এক একবার "এরে ওরে" বোলে ডাকেন, আবার মৌন হয়ে তামাক খান; আমি যে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি, দৃষ্টিতে নাই!··এক ঘণ্টা পরে···

একজন মুহুরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সেনাহেতু বহি কোথা ?" মুহুরী উত্তর কোল্লে, "মুন্সীর সিন্দুকে।" দারোগা বোল্লেন, "ডেকে আনো। ওরে, তামাক দে রে···"

যখন নরহত্যার পরে [বর্ধমানের] দারোগার এই রকম গদাই লস্করী চাল, তখন জমিদারদের জীবনধারা এবং ব্যবহার যে কেমন ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

॥ আট ॥

মানকরের ষড়যন্ত্রকারী জমিদার 'রাজা মাণিকচাঁদ'-এর বিবরণ এইরূপ ঃ[৩৭]

রাজা মাণিকচাঁদের ঘাড় পর্যন্ত লতানো ঝাঁকড়া চুল স্তবকে স্তবকে চুনাট করা, তার উপর পশমী কাজ করা একটি মৌলবী তাজ, গায়ে ঢাকাই মলমলের ছোট ছোট বুটাদার আজানু আলখাল্লা, তার উপর গোটাদার ঢাকাই একলাই···পরিধান চওড়া পেড়ে কল্কাদার ফিনফিনে ধুতি, সামনে সট্‌কা।

রাজা মাণিকচাঁদের মোসায়েব ঃ [৩৮]

একজন মোসায়েব অনবরত হো হো রবে হাসচে আপনা আপনি হেসে হেসেই মজলিস সর গরম কোচ্চে··[তার] গড়ন ঢেঙ্গা, দোহারা, মাথায় চুল ছোট ছোট, কতক পাকা কতক কাঁচা, ঠিক যেন শান্তিপুরে নীলাম্বরী শাড়ীর উপর শাদা শাদা মাছি কাটা··শরীর ঢিলে ··দাঁত আঙুলে পাঁচটি আংটি সাজানো, ট্যাকে চাবী বাঁধা মোহর ঝুলোনো মোটা ঘড়ির চেইন, শান্তিপুরে মিহি ধুতি পরা, ঢাকাই গুলবাহারের চাদর গায়, কোমর শরু, তাতে হেলে হারের মতন সোনার মোটা গোট, কাপড়ের উপরে বার করা ; ডান হাতে একখানা ঢাকাই রুমাল মুঠো করা বয়স আন্দাজ ৭০ ; ৭৫ বৎসর, কিন্তু সাজগোজ দেখে বোধ হয়, ঠিক যেন একটি নবীন ছোক্‌রা, সকের যাত্রার নকীব।

মোসায়েবির নমুনা ঃ [৩৯]

অন্য গল্পে ভঙ্গ দিয়ে সেই লোক অকস্মাৎ জোর গলায় বোলে উঠল, 'রাজা ত' রাজা···রাজার বেটা রাজা ! হাঃ হাঃ হাঃ। যেমন চেহারা, তেম্‌নি পছন্দ ! দেখেছ, কি সুন্দর খুলেছে। বর্ণখানি কেমন ফুটেছে ! যেন

দুধ উথ্‌লে পোড়চে সোনার নদী ঢেউ দিচ্চে···হাঃ হাঃ হাঃ। ক্ষণ জন্মা মহাপুরুষ! হাঃ হাঃ হাঃ। এই সেদিন সাড়ে তিন লাখ টাকা দিয়ে একটা ঘোড়ার জীন কিনেছেন। সক্‌টা কি? এক টাকা পাঁচ টাকা নয়। এক হাজার পাঁচ হাজার নয়। সাড়ে তিন লাখ টাকা! লোকটা কে! বার বার এই কথা বোলে সোর্‌ গোল কোত্তে লাগল···

মোসাহেব এবং মোসায়েবির এমন শিল্পিত, এমন বিশদ বিবরণ বাঙলা সাহিত্যে আর আছে কী না, জানিনা।

॥ নয় ॥

'এই এক নূতন' ছিল সেকালের বৃহত্তম বাঙলা উপন্যাস।[১০] কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই রহোন্যাসটি পড়ে মনে হয় যে, এর কোন একটি চরিত্র তেমন স্পষ্ট নয়। এমন অদ্ভুত, কুয়াশায় ঢাকা সুবৃহৎ উপন্যাস বাঙলা ভাষায় আর রচিত হয়নি বললে অত্যুক্তি হয় না। কেবল হরিদাসকে, আর কখন কখন দেখা দেওয়া রাজা মাণিকচাঁদকে কিছুটা যেন বোঝা যায়। কিন্তু অন্য সব চরিত্র অস্পষ্ট, অপরিচিত।

প্রধানতঃ সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতী, এবং দুর্নিবার রিরংসার প্রনোদনায় ব্যভিচারে নিমগ্ন স্ত্রী পুরুষরা এই গুপ্ত কথায় ভিড় করে আছে। এসব চরিত্রের সঙ্গে হরিদাসের পারিচিতি অনেক ক্ষেত্রে তার দর্শনকাম থেকে সুনিশ্চিত হয়। হরিদাস নিজে একজন অলজ্জিত *Voyeur*, অথবা Peeping Toms; গুপ্ত কথা শোনা, এবং গুপ্ত রহস্য দেখা তার অভ্যাস।

তার দেখা সমাজ বিরোধীরা দেখতে ভয়ঙ্কর[৩১]:

> গাঁট্‌কাটা যেন যমদূতের মতন মিষ্‌কালো, মাথায় কাফ্রিদের মতন নুড়িনুড়ি অনেক চুল···খালধারের ঝাউ বনের মতন গালের দুপাশে কান পাট্টা দাড়ী··· লোকটা বেঁটে, কৃষ্ণবর্ণ, গঠন গাঁট গাঁট, একখানা হাত বড়, একখানা হাত ছোট···পা-দুখানা বাঁকা··বুক পেট সমান, মুখখানা গোল··হস্তীদন্তের ন্যায় বড় বড় দুটো দাঁত, দেখলেই ভয় হয়

কিন্তু স্বৈরিনী মহিলারা কুৎসিত নয়ঃ[৩২]

> [আমোদিনী] শ্যামবর্ণ, গড়ন দোহারা, অতি চমৎকার দেখতে, খুব সুশ্রী—আক্ষেপের বিষয় বিধবা। [উদয়মণি] শ্যামবর্ণ; দোহারা, দিব্বি

চেহারা, বেঁটে খেঁটে কোমর, সরু দাঁতগুলি যেন মুক্তো সাজি দিয়েছে···
কিন্তু বিধবা।

বাবুর ছোট খুড়ী গৌরবর্ণ যেন হলুদ ফেটে পোড়চে···দোহারা,·চোক্ দুটি ছোট···চুলগুলি বেশ কালো, ঠোঁট দুখানি টুক্‌টুকে···বিধবা·বটেন, কিন্তু হাতে দু গাছি বালা···

লক্ষণীয় হরিদাসের দেখা লম্পটদের মধ্যে সকলেই ছিল অজাচারাসক্ত। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লম্পট ছিল ফরাসডাঙ্গার বীরচন্দ্র। কাশীতে ডাকাতরা তাকে তপ্ত ঘিয়ে ভাজে। এলাহাবাদে অজাচারের ফলে একটি সমৃদ্ধ বাঙালি পরিবার বিনষ্ট হয়। অন্ততঃ দুই জন দুশ্চরিত্রা যুবতী দস্যুদলে যোগ দিয়েছিল। হরিদাস আসলে দর্শনকামাসক্ত হলেও, এ রকম স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে থেকেও, নিজের চরিত্রটি রক্ষা করে চলেছে।

হরিদাসের গুপ্ত কথা থেকে এ তথ্য স্পষ্ট হয় যে, প্রচলিত প্রাগাধুনিক নীতিবোধ অনেক ক্ষেত্রে প্রাগাধুনিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। যে কালে হরিদাসের আবির্ভাব হয়, সে কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রভাব মফস্বলে সঞ্চারিত হয়নি। মূল্যবোধের অবলুপ্তির কারণরূপে হরিদাস-রহস্যের স্রষ্টারা কখনই আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করেননি। হরিদাস বার বার এটাই দেখেছে যে, কুপ্রবৃত্তি যদি দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে তবে তাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সামাল দেওয়া যায় না। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের আভ্যন্তর সংকটের রূপরেখা হরিদাসের গুপ্ত কথায় সুস্পষ্ট। এই গুপ্ত কথার নায়ক নায়িকারা রোমান্টিক প্রেমের খবর পাননি। তাঁদের প্রেম, এবং তাঁদের রিরংসা সমার্থক।

॥ দশ ॥

হরিদাস কথ্য ভাষায় তার গুপ্ত কথা বলেছে। সে বলে :[৪৩]

এই ঐতিহাসিক বিবরণে আপনারে আমি পরিশ্রান্ত কোরেছি—বিরক্ত কোরেছি—কৃত্রিম শোকদুঃখ অভিনীত কোরেছি—জানছি; কিন্তু এরি সহযোগে—এরি মধ্যে কারো পক্ষে যদি কোনপ্রকার ধর্মনীতি সাধুনীতির সদুপদেশ বিতরণ কোত্তে সমর্থ হোয়ে থাকি, চলিত ভাষার গৌরব রক্ষা কোত্তে যদি কৃতকার্য্য হোয়ে থাকি, তা হোলেই আমার বহু শ্রম···সার্থক জ্ঞান কোরবো।

না মেনে উপায় নেই, উপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং ভুবনচন্দ্র উপন্যাসে কথ্য ভাষা ব্যবহারের একটি ভাল আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের ভাষা টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষা নয়, হুতোমি ভাষার অন্ধ অনুকৃতিও নয়। তাঁদের ভাষা বেশ কিছুটা তৎসম বাঙলা ঘেঁষা। এখন এরকম বাঙলা প্রচলিত আছে। কিন্তু, সহোদর ভাইকে "জননী জরায়ু সখা" বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।[৪৪]

ভুবনচন্দ্রের কোন কোন বর্ণনা বড়ই বিদঘুটে, যেমন ঃ[৪৫]

> ·ভাল ভাল ঘাট বাঁধা ছিল, সে সকল ঘাট এখন ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়ে বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীরের চর্মশূন্যে দন্তপাতির ন্যায় বিকটদর্শন হয়ে আছে।

দাঁতের আবার চামড়া থাকে না কী ?

> ··যদি কিছু শোনা যায়, সে কেবল সায়ংশৃগালের চীৎকার ধ্বনির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দনধ্বনি।[৪৬] শিশুর কান্না আর শিয়ালের হুক্কা-হুয়া এক শোনায় !

॥ সূত্রনির্দেশ, এবং প্রয়োজনে মন্তব্য ॥

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮৪ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭১) পৃ, ৫-২০

২। তদেব পৃ, ১০-১১

৩। শ্রী সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড উনবিংশ শতাব্দ (ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৭৭) পৃ, ২০০-২০২ ; অরুণ নাগ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা' (সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৩৯৮), পৃ, ১১-১২ ; "হুতোম প্যাঁচা কে—", পৃ, ২৭-২৮, টীকা-২০

৪। দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা, সমাজকুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৯১)

৫। সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ, ২০২

৬। তদেব, পাদটীকা-১ ঃ দ্রষ্টব্য ঃ ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, 'তুমি কি আমার ?' (কলিকাতা, ১৮৭৩-১৮৭৯)

৭। 'এই এক নূতন'-এ মানকরের জমিদার মাণিকচাঁদ ; 'হরিদাসের গুপ্তকথা'য় তার নাম মোহনলাল। প্রথমোক্ত গ্রন্থে হরিদাস যে কুমারীকে উদ্ধার করে, সে তার আত্মীয়া বোন ; দ্বিতীয় গ্রন্থে মেয়েটির নাম আলাদা, এবং মেয়েটি হরিদাসের প্রণয়িনী। এরকম বহু ভিন্নতা আছে।

৮। দ্রষ্টব্য : **Steven Marcus, The Other Victorians** (London, 1966)

৯। 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, তারিখ নেই)

১০। পরাণচাঁদ কাপুর, 'হরিহরমঙ্গলসঙ্গীত' পরাণচাঁদ বর্ধমানের মহারাজা, তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক, (এবং পরে শ্বশুর) ছিলেন। আবদুস সাম্মাদ 'বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য' (কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯১), পৃ, ৬০—৭৭। গ্রন্থটিতে চিত্রশিল্পী রামধন স্বর্ণকার কর্তৃক অঙ্কিত ৭১টি ধাতুখোদাই চিত্র আছে। দ্রষ্টব্য :

১১। কালীকৃষ্ণ দাস, 'কামিনীকুমার' (প্রথম সংস্করণ ১৮৩৬, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৪)

১২। নমুনার জন্য দ্রষ্টব্য, অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা,' পূর্বোক্ত. পৃ. ৫, ১৭৫–১৭৬, ২০১

১৩। ব্রজগোবিন্দ চট্টরাজের পুত্র নারায়ণ চট্টরাজের বাড়ি ছিল কাটোয়ার কাছে বহরান গ্রামে ; তিনি ছিলেন 'কলিকুতূহল' গ্রন্থের, এবং কলিকৌতুক' গ্রন্থের লেখক। তার উপাধি ছিল 'গুণনিধি'। প্রথম গ্রন্থ ১৮৫৩-তে, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৮৫৮-তে প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থে অজাচারের বিবরণ, পৃ. ৪৪-৪৬ ; দ্বিতীয় গ্রন্থের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, জয়ন্ত গোস্বামী 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' (সাহিত্যশ্রী কলিকাতা, ১৩৮১), পৃ. ১১১৫।

১৪। হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' [কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), দ্রষ্টব্য, 'বিধবা বিবাহ', পৃ, ৬৫৭ ; 'নবীণচাঁদ ও সোনামণি ; পৃ, ৬৬৯, 'প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ', পৃ, ৬৭৯ ; 'কলিরাজার উপাখ্যান ও চারি ইয়ারি ; পৃ, ৭১৯ ; 'নলিনী ভ্রমরের বিরহ প্রথম এবং দ্বিতীয়,' পৃ, ৭২৫ ৭৩২

১৫। দ্রষ্টব্য : শ্রীপান্থ, 'ঠগী' (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,

কলিকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৭৯) দ্রষ্টব্য : টি ওয়াকফ্ সাহেব কর্তৃক হুগলি, বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরে "দস্যুশাসন" বিষয়ক সংবাদ : 'সংবাদ ভাস্কর', ১৬ আগস্ট, ১৮৫৬ : বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র,' তৃতীয় খন্ড, (বীক্ষণ, কলিকাতা ১৯৬৪), পৃ, ৩২৩-২৪

১৬। তদেব, পৃ, ৫৪

১৭। তদেব, পৃ, ৪৮-৫৪

১৮। 'ভবানী ঠাকুর', পৃ. ৩৫৫ : ভবানীঠাকুর 'মাননীয় শ্লীমান সাহেবের অনুগ্রহে' 'কাপ্তেন ভবানী ঠাকুর' হলেন।

১৯। 'ভবানী ঠাকুর', পৃ. ৩৮৭-৮৮।

২০। দ্রষ্টব্য, জয়ন্ত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, 'বেশ্যাসক্তি'; ১৯৮ পৃষ্ঠা থেকে ; লাম্পট্য, পৃ. ২১৭-২৪০ ; জয়ন্ত গোস্বামী গ্রন্থের শেষাংশে ৫০৫টি প্রহসনের নাম, লেখক, এবং প্রকাশনার তারিখ উল্লেখ করেছেন। আরও দ্রষ্টব্য, কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত, 'যষ্টিমধু' বৈশাখ ১৩৮০, এবং বৈশাখ, ১৩৮৪।

২১। পঞ্চানন রায়চৌধুরী 'কলিকাতার গুপ্তকথা' ছাড়াও লিখেছিলেন 'সচিত্র হরিদাসীর গুপ্তকথা' (বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯৪ ; প্রথম প্রকাশ ১৩২৭) এই রচনা ভাল হয় নি। গ্রন্থটি সাধুভাষায় রচিত।

২২। দ্রষ্টব্য, শ্রীপান্থ, 'কলিকাতার গুপ্তকথা', শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯৫, পৃ. ১৭-২৮।

২৩। 'হরিদাসের গুপ্তকথা,' পৃ. ৬৭৩

২৪। তদেব, পৃ ৬৭৪

২৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী,' ২ খন্ড (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৫০-১৯৫১), প্রথম খন্ড, "বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা" এবং পরবর্তী প্রবন্ধ সমূহ ; দ্রষ্টব্য, Ramakanta Chakraborty, "Panchkari Badyopadhyaya : The Ideologue of Bengali Nationalism," **Socialist Perspctive**, December 1981, pp, 123-137 ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি', (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১), পৃ. ১-৩০

২৬। কবিকঙ্কন মুকুন্দ, 'চণ্ডীমঙ্গল', ৭ / ৪১৭ঃ "সপ্তগ্রামের বণিক কোথাহনা জায়। ঘরে বস্যা সুখমোক্ষ নানা ধন পায়"

২৭। যথা, রামপ্রসাদ সেন-রচিত গান ঃ "আর কাজ কি আমার কাশী / মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারানসী" ; "কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী / কালীর চরণ কৈবল্য রাশি ", "কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী / যার হৃদে জাগে এলোকেশী" "কাজ কি আমার কাশী / যাঁর কৃত কাশী, তদ্‌রসি বিগলিত কেশী ॥" ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য, দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, 'বাঙালীর গান,' (বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩১২ সন) পৃ. ৩-৫৩

২৮। Sir Jadu Nath Sarkar, The History of Bengal, Muslim Period (Janaki prakashan, Patna, 1977), a. 497-99

২৯। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমন' (বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্র, পটলডাঙ্গা। কলিকাতা, সংবৎ ১৯০৬, খ্রিষ্টাব্দ ১৮৪৯ ; তখন কৃষ্ণকমলের বয়স মাত্র নয় বৎসর। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৫৭তে প্রকাশিত হয়, টেমার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'রামকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য' সাহিত্য সাধক-চরিতমালা—২ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৩)

৩০। 'হরিদাসের গুপ্তকথা', পৃ. ১৬৬-৬৭

৩১। 'এই এক নূতন', পৃ. ৩৭-৩৮

৩২। 'হরিদাসের গুপ্ত কথা,' পৃ. ৮৫-৮৬ ; বেশ্যাপল্লীর বর্ণনার একটি সু-প্রাচীন রীতি, এবং চমৎকার রীতি দেখা যায়, গুপ্ত যুগে রচিত চারটি "ভাণ"-নাটকে। দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীমোতীচন্দ্র, শ্রীবাসুদেব শরণ অগ্রবাল সম্পাদিত, 'চতুর্ভানী' (দেবনগরী হরফে মুদ্রিত) (হিন্দীগ্রন্থ রত্নাকর কার্যালয় প্রাইভেট লিঃ বোম্বাই, ১৯৫৯), ভূমিকা, পৃ. ১-৮৭ ; রমাকান্ত চক্রবর্তী, "চতুর্ভানীর বৈশিক কর্ষণা", 'চতুরঙ্গ' কার্ত্তিক-পৌষ, ১৯৭১, পৃ. ২০৫-২১৬

৩৩। 'হরিদাসের গুপ্তকথা', পৃ. ৩৬-৩৭

৩৪। তদেব, পৃ, ৪০৩-৪৮৮

৩৫। 'ভবানীঠাকুর', পৃ, ২৭৯-৩০০, ৩০৮-৩১২৷

৩৬। 'এই এক নূতন,' পৃ, ১১-১২

৩৭। তদেব, পৃ, ৩৬৮–৬৯

৩৮। তদেব, পৃ, ৩৬৮–৭০

৩৯। সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৪৯

৪০। 'এই এক নূতন', পৃ, ৬, ৭, ৩৯

৪১। তদেব, পৃ, ২৯, ৬৫–৬৬

৪২। তদেব, পৃ, ৪৮১ ; 'হরিদাসের গল্পকথা', পৃ, ৩

৪৩। 'এই এক নূতন', ৪৫৩

৪৪। 'হরিদাসের গল্পকথা', পৃ, ৩২৯

৪৫। তদেব, পৃ, ৩২৯

কেতন নন্দীর বাবা

সুশীল জানা

কেতন স্কলারশিপ নিয়ে মৌরিডাঙা হাইস্কুলের পাঠ শেষ করল। মাস্টার মহল এবং ছাত্রমহল, ছাত্রমহল থেকে গ্রাম্য মধ্যবিত্তদের অন্দরমহল পর্যন্ত একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করল। স্কুল একদিন ছুটি হয়ে গেল। বয়োবৃদ্ধ মেয়ে-পুরুষ বাপবেটা দুজনকেই আশীর্বাদ শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল। মৌরিডাঙায় এমন কাণ্ড আর কখনো ঘটেনি।

এবার ভবিষ্যতের কথা।

বাপ চেতন নন্দী কেতনকে বললে, 'আমাদের রেলের লোকে সেডে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকসনে এ্যাপ্রেন্টিস নেবে—এই বেলা দরখাস্ত করে দে। বাকিটা বড় সাহেব রামস্বামীকে ধরে ব্যবস্থা করে নেবো।'

কেতন বললে, 'আমি কলকাতার কোনো ভালো কলেজে পড়বো বাবা। তোমার ও রেল লাইনে ছোটার মধ্যে আমি নেই।'

'কেন কেন?' চেতন বললে, 'আমাদের লাইনটা কি খারাপ?'

কেতন কথা বাড়াল না। শুধু বলল, 'আমি পড়তে চাই বাবা।' একটু থেমে আবার বলল, 'খরচ খরচার জন্য ভেবোনা। ও আমি টিউশানি ক'রে জোগাড় করে নেবো।'

শেষ কথাটায় চুপ করে গেল চেতন নন্দী। তার নিজের কথাই মনে পড়ে গেল। এই টিউশনী করে নিজেও সে একদিন বি. এ. পাশ করেছিল। গ্রামের সামান্য মধ্যবিত্ত, সম্বল সামান্য জমি জিরেত। তার ওপরে নির্ভর করে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়া যায় না। এমন দিনে মৌরিডাঙা ইশটিশনের এক নতুন স্টেশন মাস্টার এসে পড়েছিল। গুচ্ছের ছেলেমেয়ে। যোগাযোগে পেয়ে গিয়েছিল পড়াবার ভার। মাইনে দশ টংকা, উপরি দু-একটা ফাইফরমাস, কখনো সখনো বাজার হাট। এমনি করে বি. এ. টা পাশ করেছিল চেতন নন্দী।

বোধ হয় মনে মনে সদয় হয়ে উঠেছিল স্টেশন মাস্টার কেশব দত্ত। ওর হাতে পড়ে ছেলেমেয়েগুলোও ফি-বছর পাশ করে যাচ্ছে। মেয়েটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে দশ ক্লাশ পর্যন্ত উঠে গেল অবলীলায়। একটু হাঁপালো গড়ন। কিন্তু চেতনের দিক থেকে কোনো দিন এদিক ওদিক দেখেনি। চেতন-মাস্টার তো মাস্টার।

কেশব দত্ত একদিন একটা ফর্ম ধরিয়ে দিয়েছিল চেতনের হাতে। বলেছিল, 'রেল কোম্পানী লোক নেবে। ফর্মটা ভর্তি করে আমাকে দিয়ো। আমাদের এখানেও লোকের দরকার। স্টেশনের কাজের চাপ ঢের বেড়ে গেছে। স্টেশন বড় হচ্ছে।'...

তা দিনে দিনে বড় হচ্ছিল বৈকি। কাজ কারবার বেড়ে যাচ্ছিল। পান চালানির ব্যবসা, তাঁত কাপড়ের ব্যবসা ভেতরে গ্রাম-গ্রামান্তরে দিব্যি বেড়ে গিয়েছিল আস্তে আস্তে গাঁট গাঁট মাল এসে পড়লে একা 'মালবাবু' সামাল দিতে পারে না। লোকাল ট্রেন ছিল কুল্লে তিনটে—সে জায়গায় হয়ে গেল পাঁচটা। ফড়ে, মহাজন, গাঁয়ের তাঁতী, চাষী যাত্রী—সব মিলে দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে মৌরিডাঙা ইশটেশন জমজমাট।

সেই হিড়িকে চেতনের চাকরি হয়ে গেল এবং বোধকরি কেশব দত্তের চেষ্টায় মৌরিডাঙাতেই নিযুক্তি।

'চাকরি তো হয়ে গেল চেতন।' কেশব দত্ত বলেছিল, 'এখন ভাবছি—ছেলেমেয়ে-গুলোর পড়াশোনার কি হবে। লীলার তো সামনে ফাইনাল।'

চেতন বলেছিল, 'ওরা যেমন পড়ছিল তেমনি পড়বে স্যার। ভাববেন না—আমি ম্যানেজ করে নেব।'

কেশব বলেছিল, 'আমি বলেছিলুম অন্য মাস্টারের কথা। তা লীলা বললে—তোমার কাছেই পড়বে।'...

'আমিই পড়াবো।'

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতে কোথায় পড়ানো আর কোথায় কি। ট্রান্সফার—বদলি! কেশব দত্ত যেমন এসে পড়েছিল একদিন অকস্মাৎ পোঁটলা পুঁটলি, বাক্স-প্যাটরা, এণ্ডি গেণ্ডি নিয়ে, তেমনি একদিন চলে গেল।

বিদায় নেওয়ার সময় চেতনের কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বলেছিল, 'এ লাইনের এমনি রেওয়াজ চেতন—মায়া বসবার জো নেই। আসি তবে। পারলে গিয়ে পড়ো কোনো একদিন। এবার উত্তরে ঠেলেছে। স্টেশনের নাম তো জানা রইল।'...

জানত চেতন। কিন্তু যাওয়া হয়নি। এ লাইনে সে-ও ছুটেছে-এখনও ছুটছে। বাড়িতে থিতু হয়ে থাকার ভাগ্য ঘটেনি। চেতন যদি এ লাইনে আসতে না চায়—বলার কি আছে তার?

অতএব, কেতন কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়তে চলল একদিন। বাক্স

সুটকেশ বেডিং গুছিয়ে দিলে দুই বিধবা দিদি। মা ঘন-ঘন আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। ঠাকুমা তাকিয়ে আছে শূন্য চোখে। মুখে কথা নেই।

শুধু যাওয়ার সময় বললে, 'আবার কবে আসবি?' কেতনের ছোট উত্তর, 'ছুটি হলে।'

'আমার জন্যে একটা জিনিস আনবি দাদা?'

'বলো।'

'একটা রামকৃষ্ণের ছবি—বড়সড় দেখে। এখানে তো পাওয়া যায় না।'

'আনবো।'

'মনে থাকবে?'

'থাকবে।'—

বাপ-বেটা রওয়ানা দিলে কলকাতায়।

চেতন নন্দীর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ছিল কলকাতায়। তাদের সহায়তায় হোস্টেল পেতে অসুবিধে হলো না কেতনের। ভর্তিও হয়ে গেল ভালো কলেজ—প্রেসিডেন্সীতে।

এসব দায় চুকিয়ে, খরচ-খরচা বুঝিয়ে চেতন বললে, 'পারলে এক-আধবার বাড়ি ঘুরে আসিস। এই তো ৬০/৭০ মাইল। বড় জোর ঘণ্টা দুই লাগে।—কতলোক ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করছে।'

তুমি এখন বাড়ি ফিরছো?'

'এ বেলা বাড়ি ফিরছি—ও বেলা সিধে বাঁকা কেষ্টপুর।' চেতন বললে, 'পুজোর ছুটিতে অন্য কারুকে ডিউটি গছাতে পারলে কদিনের জন্য বাড়ি ফিরতে পারি। ওই সময়ে আবার দেখা হবে। সাবধানে থাকিস। যা যখন দরকার হবে জানিয়ে চিঠিপত্র আবার দিস।' কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল চেতন। বললে, 'আর তোর ঠাকুমা কি ছবি নিয়ে যেতে বলেছিল—মনে করে নিয়ে যাস যেন।'

•

পুজোর ছুটির আগে একবার যখন বাড়ি গেল কেতন-সঙ্গে ছবি নিতে ভুলল না। বেশ বড়সড়—বাহারি ফ্রেম বাঁধাই। সন্ধের মুখোমুখি হবে তখন। ঢুকেই চেঁচিয়ে বললে, 'ঠাকুমা, তোমার ছবি এনেছি।'

সন্ধে হয়ে গেছে। লণ্ঠনের আলোতেও ভালো করে দেখা যায় না বুড়ো চোখে। কেমন যেন সব জ্যাবড়া জ্যাবড়া লাগে। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুমা

বললে; 'কাল সকালে ভাল করে দেখব। গঙ্গা জলের ছিটে দিয়ে একেবারে আমার পুজোর ঘরে তুলবো। এখন উঁচুতে কোথাও তুলে রাখ দাদা।'

রাতের জন্য ছবিটা রইল কেতনের পড়ার টেবিলে।

সকালে স্নানটান সেরে পুজোর ঘরে ছবি নিতে এসে ঠাকুমা থমকে গেল। পুবের জানালা দিয়ে বেশ ঝকঝকে আলো এসে পড়েছে ছবিটার ওপরে। বেশ স্পষ্ট দেখছে বুড়ি—শক্ত জব্বর ফ্রেমে বাঁধানো, কাটবোর্ড বাঁধাই—শুধু একটা মুখ, এলোমেলো চুল, এক গাল ঘন চাপ দাড়ি। বুড়ির মনে উঁকি দিতে লাগল কেমন সংশয়। এক দৃষ্টিতে পরখ করে দেখছে তো দেখছেই।

এমন সময় পেছন থেকে কেতন বলল, 'অত কি দেখছ ঠাকুমা।'

'এ কি রামকৃষ্ণ দেবের ছবি ?' বুড়ির কণ্ঠস্বরে উৎসাহ নেই।

মিটিমিটি হাসছিল কেতন। বললে' 'সেই তো একগাল দাড়িয়ালা মুখ।'

'এ কেমন দাড়ি। ছ্যাত্‌রালো—যেন ময়ূরপঙ্খী প্যাখম মেলে দিয়েছে।' বুড়ি দ্বিধাভাবে বললে, 'সেবার উদ্বোধনের মেলায় গিয়ে মন্দিরে দেখেছিলাম যে। বুড়ি ঘাড় নাড়লে।' উহুঃ—এ দাড়ি সে দাড়ি নয়।'

'তবে থাক আমার ঘরে।' তেমনি মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললে কেতন। 'এ দাড়ি' যদি তোমার পছন্দ না হয়—'

বুড়ি বললে, 'কি জানি দাদা। দেখি, ও বেলা পান্তুর মাকে এনে একবার দেখাবো।'

এবেলা ওবেলা করে বুড়ি গায়ের ঢের মহিলাকে ডেকে ডেকে এনে দেখালে ছবি। সকলেরি সংশয়।—যে মুখ তারা দেখে এসেছে মেলায়—এ মুখ সে মুখ নয়। শুধু দাড়ি থাকলেই তো হয় না। ইত্যাদি—নানা মন্তব্য। বোনেরা দেখলো, মা দেখলো, কেউ চিনতে পারল না।

এ মুখ মৌরিডাঙা গাঁয়ে এই প্রথম।

নিজের মাথার দিকের দেয়ালে সোৎসাহে টাঙিয়ে দিয়ে কেতন পরের দিন আবার চলে গেল কলকাতা।

মা বলল, 'ছবিটা রেখে গেলি-ফেরৎ দিবিনা ?'

'ফেরৎ কি আর নেয়।' কেতন ঠাকুমাকে বলে গেল। 'এবার ঠিক ঠিক দাড়ি চিনে তোমার জন্যে ছবি কিনে আনবো ঠাকুমা, দেখো—ভুল হবে না।'

'আবার কবে আসবি ?'

'পুজোর ছুটিতে।'

পুজোর ছুটিতে এলো কেতন। এবার দু-দুটো ছবি সঙ্গে। টেবিলে সাজিয়ে দিলে পরপর। বললে, 'দেখ দেখি ঠাকু'মা। তোমার জন্যে দু রকম দাড়ি বেছে বুছে নিয়ে এসেছি। দেখ কোনটি তোমার পছন্দ হয়।'

'ও মা! আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কি।' ঠাকু'মা বলল, 'রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ।' ঠাকু'মা এগিয়ে এল টেবলের দিকে—বুড়ো চোখ বিস্ফারিত করে দেখলে। বললে, 'দোকানী তোকে আবার ঠকিয়েছে নির্ঘাৎ। এ সব কার ছবি? একটার লম্বা তো লম্বা, যেন গলায় দাড়ির কুঁড়ো জালি ঝুলিয়েছে—আর একটার ছাগুলে দাড়ি। আমার সঙ্গে মস্করা করছিস।' বুড়ি বললে একটু থেমে, 'হ্যাঁ জানি, রামকৃষ্ণেরও দাড়ি ছিল। তা বলে দাড়ি থাকলেই রামকৃষ্ণ।'

তেমনি মিটিমিটি হাসছিল কেতন। বললে, 'তোমার রামকৃষ্ণ না হোক—এঁরাও বড় সাধক ছিলেন। এখন এঁরাই জগতকে সাধনের পথ দেখাচ্ছেন।'

বলতে বলতে চেতন নন্দীর প্রবেশ। ছেলের ঘরে মা, বৌ দুই মেয়ের জটলা দেখে, কিট্‌স ব্যাগটা রেখে সোজা এগোল সেই দিকে।

তাকে দেখতে পেয়ে তার বুড়ি মা ডেকে বললে, 'এই দ্যাখ চেতু—কেতুর কাণ্ড। হাত দাড়িয়ালা ছবি এনে আমাকে দেখিয়ে বলছে—'

'কই, কি ছবি?' দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল চেতন।

'এরা কেউ রামকৃষ্ণ?' বুড়ি জিজ্ঞেস করল। 'তুই বল। তুই তো সেই মেলায় গিয়ে দেখেছিস। জপের আসনে বসা সেই সাধকের ছবি—সে কি আমি ভুলবো? কেতু বলে—ওরাও নাকি সাধক।'

মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিলে কেতন। কেতনের মুখের দিকে একবার চেয়ে মুচকে একটু হাসল। বললে, 'হ্যাঁ মা, সাধক ওঁরাও—ভিন্ন পথে, ভিন্ন মতে। তোমার রামাকৃষ্ণের কথায় যত মত তত পথ।' শেষে চিনিয়ে দিলে মাকে ছবিগুলি 'ওই যে দেয়ালে—ওঁর নাম কার্ল মার্ক্স: টেবিলে লম্বা দাড়ি ওঁর বন্ধু এঙ্গেলস, এবং ছাঁটা দাড়ি লেনিন।' কয়েক পলক ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চেতন নন্দী অনুমান করতে পারল কলকাতায় এই ক' মাসে ছেলের গতি-মতি-এর পরিবর্তন।

অশ্রুতপূর্ব নামগুলো শুনে ঠাকু'মা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

কেতনের দিকে চেয়ে চেতন বললে, 'ঠাকু'মাকে রামকৃষ্ণের একটা ছবি এনে দিলে খুব ক্ষতি হত কি?'

কেতন বললে, 'ঠাকুমা তো রোজ সন্ধ্যেবেলা একটু করে আফিং খায়ই—আর ডোজ বাড়াতে চাইনে।' বলতে বলতে কেতন বাপের সামনে থেকে সরে পড়ল।

বাপ-বেটার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারল না চেতন নন্দীর বুড়ি মা। প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, 'হুঁ, এক সরষে আফিং খাই—নইলে বাতের ব্যথা যে সইতে পারিনে চেতু।'

'ও কথা থাক্ মা।' কেতন বললে, 'ছুটিতে আছি তো ক'দিন। এর মধ্যে তোমার ছবি আমিই এনে দেবো।'

সত্যিই, ক'দিনের মধ্যে রামকৃষ্ণের ছবি এসে গেল; কেতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—বাপ নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ছবিটা টাঙিয়ে দিলে দেয়ালে-মায়ের জপের আসনের সামনে।

কেতন মন্তব্য ছুঁড়ে দিলে, 'ডবল ডোজ।'—

'উঁহুঁ—মিক্স্চার।' চেতন নন্দী বলল, 'সহাবস্থান বলে একটা কথা আছে না? আমার মায়ের দিন শেষ হয়ে এল—তোদের দিন আগে, জানি না কি কাণ্ড ঘটবে।' একটু থেমে আবার বললে, 'সহ্যগুণ একটা শক্তি কেতন—যে সয় সে রয়।'···

কেতন হাসতে হাসতে বলল, 'কুলগুরু আমাদের যদি গোঁসাই হয়—'

ওর কথা শেষ হতে না হতে চেতনও হাসতে হাসতে বললে, 'আমার রেল লাইনে হয়তো কাটা পড়ে গেছে। সেই কবে থেকে ছুটছি পশ্চিম থেকে উত্তর, উত্তর থেকে দক্ষিণ—ধড় মুণ্ডু যে কোথায়, খোঁজবার ফুরসুৎ হয়নি, দেখিওনি।'

চেতন নন্দী লাইনে ছুটে এসেছে সেই প্রথম যৌবন থেকে। ঘরে থাকে ক'দিন? এই লাইনে ছোটার সুবাদে নানা দেশ, নানা মানুষ তার অভিজ্ঞতার পুঁজি মাত্র। বয়সও তো পঞ্চাশ পার করে দিয়েছে। তার সঙ্গে পেয়েছে একটা ধীর স্থির বিচক্ষণতা। এ হেন চেতন নন্দী ছেলের মুখে, ভাবে-ভঙ্গীতে একটা নতুনের চাপা উচ্ছ্বাস দেখে প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। কলকাতায় পড়তে যাওয়ার পর থেকেই এই চঞ্চলতা সে লক্ষ্য করেছে। মৌরিডাঙা হাইস্কুলের স্কলারশিপ্ পাওয়া সেই বাক্যালাপ বিরল শান্তশিষ্ট কেতন এখন যেন অনেক বদলে গেছে। ভেতরের বোধবুদ্ধি তীক্ষ্ণতা কোথায় শান পেয়ে যেন আরও চোখা হয়ে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

স্কুলের পুরানো মাস্টাররা এখনও তার গুনগানে মুখর। পরের ছাত্রদের

সে 'কেতন দা'। কেতন বাড়ি এলে কেউ কেউ নাকি পড়তেও আসে। পাড়া পড়শি গ্রাম্য ভদ্র গৃহস্থের কাছে সে আদর্শ সন্তান। ছেলেপুলেদের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখলে বলে, ওই দেখ্‌গে নন্দী বাড়ির ছেলেটাকে। প্রায় কিষাণ পাড়া পর্যন্ত তার খ্যাতি পৌঁছে গেছে। বোধ করি বা তারও বেশী কিছু।

হঠাৎ একদিন দু'জন গাঁউলি মানুষ চেতন নন্দীর সামনে এসে দাঁড়াল।

একজন হেঁট হয়ে প্রণাম করল। অন্যজন বলল, 'সেলাম মালবাবু।'

চেতন নন্দী খানিক হকচকিয়ে গেল। 'মালবাবু' কথাটা কত দিন পরে সে শুনলো। কবে সেই কেশব দত্তের দৌলতে স্টেশনের আসল মালবাবুর অ্যাসিসটেন্ট হয়ে ঢুকেছিল—কাজ ছিল চালানি মালে দাগ নম্বর মারা আর চালান কাটা। ক' বছর বাদে আসল 'মালবাবু,' তারপর বদলি। অ্যাসিসটেন্ট স্টেশন মাস্টার হয়ে চলে যেতে হল বহুদূরের এক গাঁউলি স্টেশনে। তারপর কত বদলি—কত স্টেশন, প্রদেশ থেকে প্রদেশে। সব যেন এক লহমায় চোখের ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেল। আর মনে ঘা মারল কেতনের সেই মন্তব্য ঃ ওই তোমার লাইনে ছোটার মধ্যে আমি নেই।···

চেতন নন্দী লোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমরা কে গো?'

'আজ্ঞে আমি পিতে মণ্ডল, আর ও নসু মিঞা।' পিতে বললে, 'বাপ-খুড়োর সঙ্গে ছেলেবেলায় আসতুম আপনার ঠোয়ে মাল চালান দিতে।'—

'আমার কাছে কিছু চাও?'

'আজ্ঞে না।' নসু মিঞা বললে, 'কেতুদাদা আসতে বলেছিল। কলকাতা থেকে কে মাস্টারবাবু আসবেন, আজ ম্যাজিক লণ্ঠনের কেলাস হবে।'

'বটে বটে!' চেতন সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করল, 'তা তোমরা বুঝি কেলাসে পড়? কতজন?'

'আজ্ঞে সে ঢের ঢের। কতজন হবে নসু?

'এ্যাদ্দিন তো গুনিনি। তা হবে···সব্বাই।···ধরুন—'

এমন সময় হাঁক আসে কেতনের, 'নসু চাচা···'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আপ ৩১৬, গোমো প্যাসেঞ্জার। স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে আসছে কেতন, সঙ্গে ভারিক্কী বয়সের কে একজন—বোধকরি কলকাতার মাস্টার বাবু। পেছনে রেলকুলির মাথায় বোধ করি ম্যাজিক লণ্ঠন।

ওরা পুবের সড়ক ধরে চলে গেল। চেতন নন্দী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ভাবতে লাগল। কলকাতার কলেজে ভর্তি হওয়ার পর কেতনের

পরিবর্তন। মনে হলো—প্রথম উচ্ছ্বাসে সে-ও ছুটেছে। আর এক লাইনে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে চেতন নন্দীর বুড়ি মা মারা গেল। শেষ শরতের ধাক্কা।

তখনও পুজোর ছুটি। বাপ বেটা দুজনেই বাড়ীতে। বছরে ক'দিনই বা তা ঘটে। তবু নন্দী পরিবারে একটা শূন্য ঘর গোটা বাড়িটাকে যেন থম্‌থমে করে দিয়েছে। কেতনের ছাত্র বন্ধুরা আসে, রেল কোয়ার্টারের ছেলেমেয়েরাও। বাইরের চাতালে তাদের কলরব বাইরেই থেকে যায়। সন্ধ্যের পর একটা ঘরে শুধু প্রদীপ জ্বলে শূন্য জপের আসনের সামনে। বাইরের কলরব সেখানকার স্তব্ধতা ভাঙতে পাবে না।

সেদিন খেতে বসে কেতন বলল, বাপকে, 'তুমি রাজি থাকলে ঠাকু'মার ঘরে একটা সমিতি করি। ঘরটা তো অমিই পড়ে থাকছে—'

'সমিতি ?' চেতন নন্দী ছেলের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল।

কেতন বলল, 'মহিলা সমিতি। দিদিরা তো বসেই আছে। মা-ও থাকবে। রেল কোয়ার্টারের মহিলারা আছেন। আমি হেডমাস্টার মশায়ের স্ত্রীকে রাজি করিয়েছি। উনি সেক্রেটারি হ'বেন।'

চেতনের পরের প্রশ্ন, 'সমিতি করবে কি ? তোর রাজনীতি ?'

খোঁচা খেয়ে কেতন চটে গেল। বললে, 'সে ওদের পছন্দ হলে করবে। তার আগে ওরা একত্র হোক, নিজেদের সমস্যাটা বুঝুক। লেখা-পড়া করুক, হাতের কিছু কাজও তো করতে পারে। এই তো দিদিদের তুমি শুধু বসিয়েই রাখলে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। চেতন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। পরে বললে, 'আমাকে একটু ভাবতে দে কেতু। পড়ে বলবো।'

বললে পরের দিন সকালেই।

বাইরের চাতালে বসে চা খেতে খেতে চেতন বললে, 'হোক তোঁর সমিতি। তবে একটা কথা'—চেতন নিঃশব্দে তাকাল ছেলের মুখের দিকে।

কেতনও জিজ্ঞাসু চোখে নীরবে চেয়ে রইল বাপের দিকে।

কেতন নন্দী বলতে লাগল আস্তে আস্তে, 'তোর দিদিদের বসিয়ে রেখেছি—ঠিকই। আজ পর্যন্ত শুধু লাইনেই ছুটেছি। ওদের বিয়ে দিয়েছিলুম দায় এড়াতে। হলো না—বিধবা হয়ে ফিরে এল।

বড় ঘরে বিয়ে দিতে পারি নি। কোথায় খেতে পরতে পাবে কি পাবে না—তাই নিয়ে রেখেছি নিজের ঘরে। ওদের কোনো কষ্ট হোক আমি চাইনি কেতু।' বলতে বলতে বাপের চোখ সজল।

কেতন বললে, 'আমি তোমাকে ও কথায় আঘাত দিতে চাইনি বাবা।'

'ঠিক আছে। কর তুই সমিতি।' চেতন গাঢ় গলায় বলল, 'শুধু দেখিস—বাড়ির সম্ভ্রম যাতে নষ্ট না হয়। আমি সইতে পারব না।' একটু থেমে আবার বলল, 'যত হোক—এ গ্রাম দেশ, অল্পতেই একটু ছুটি কথায় কথায় বেড়ে ওঠে। আমরা বড় লোক নই যে টাকার জোরে সে-সব চাপা দেবো ; এমন প্রভাবশালী নই যে প্রভাবে চাপা পড়বে। আমার পুঁজি শুধু শ্রম ও সম্ভ্রমবোধ। আমি ভাগ্য নিয়ে এতদিন ছুটে বেড়িয়েছি লাইন থেকে লাইনে। আমার প্রতিবেশীরাই, সত্যি বলতে কি—এতদিন সংসার দেখেছে। বিরোধ আমার কারুর সঙ্গে নেই। দেখিস—তার মধ্যে যেন না পড়তে হয়।' শেষ রেলের ভাষায় বললে, 'সবুজ নিশান উড়িয়ে তোর লাইনে ক্লিয়ার করে দিলুম।'

এবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল মহিলা সমিতির।

ঠাকুমার ঘরের এক কোণে পাতা জপের আসন পাততাড়ি গুটোল। সরে গেল রামকৃষ্ণের ছবি। পরিবর্তে চার দেয়ালে শোভা পেতে লাগল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং নতুন সংযোজন স্টালিন। ছাত্রদের দলবল নিয়ে সব করতে লাগল স্বয়ং কেতন।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল চেতন নন্দী। একবার শুধু মিন মিন করে বলেছিল, 'মহিলা সমিতি যখন সিস্টার নিবেদিতার একটা ছবি দিলে পারতিস।'

কেতন রুখে মন্তব্য করল, 'দো-আঁসলা।'···

ছুটি ফুরালো। চেতন নন্দী তার কালো কোট আর চিরসঙ্গী কীটসব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে রওয়ানা দিলে গুমো জংসন। যাওয়ার সময় স্ত্রী সাবিত্রীকে একান্তে বলে গেল, 'সমিতির সব খবর প্রতি সপ্তাহে দিয়ো—দু ডজন খাম রেখে গেলাম। মেয়েদের ব্যাপার—কোনো লুকোছাপা করো না।'

না, কোনো লুকোছাপা করেনি সাবিত্রী। মহিলা সমিতির বিস্তারিত বিবরণ থাকত চিঠিতে। নানা কাজ কর্মের উদ্যোগ, পরিকল্পনার কথা। নানা বক্তৃতা, আলোচনা, সমস্যা। মাঝে মাঝে শহর থেকে আসা দু' চার জন যুবক এসে শুনিয়ে যায় দেশ-বিদেশের কথা। কেতন প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে আসে—শনিবার থেকে

সোমবার চলে যায়। মৌরিডাঙার সবার মুখে এক কথা। সোনার টুকরো ছেলে কেতন।···ইত্যাদি।

বছর ঘুরতে চলল। চেতন নন্দীর দিয়ে যাওয়া দু' ডজন খাম তখনো শেষ হয়নি। ছন্দ ভেঙে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম।

'সুষমা নিখোঁজ। জল্‌দি এসো।'

চেতনের ছোট মেয়ে সুষমা।

মেয়েদের কি এক বার্ষিক উৎসবে কলকাতায় গিয়েছিল সমিতির কিছু মেয়ে—কেতনই নিয়ে গিয়েছিল। সুষমাও ছিল। চার দিনের উৎসব। উৎসব শেষে সুষমা নিখোঁজ নাকি কোনো এক যুবকের সঙ্গে। কেতন হন্য হয়ে খুঁজছে।

পরের ট্রেনে ছুটে এসেছিল চেতন নন্দী। গুম্‌ হয়ে বসে শুনেছিল বিবরণ। তারপর হঠাৎ যেন দুঃস্বপ্ন ভেঙে বলে উঠেছিল, 'জল দাও।'—

ঢক্‌, ঢক্‌ করে জলটুকু শেষ করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'বিছানাপত্র বাঁধো। তোমার আর সুরমার সব কিছু গুছিয়ে নাও।'

'মানে?' সাবিত্রীর বিস্মিত প্রশ্ন।

'আর এখানে নয়।' চেতন বলেছিল, 'রাত দশটায় আমাদের ফেরার শেষ ট্রেন।'

'কিন্তু কেতন—'ক্ষীণ স্বরে বলেছিল সাবিত্রী।

'সে আমি বুঝবো।' দৃঢ় জবাব ছিল চেতন নন্দীর, ভরাট গলায়।

কেতন তখন কলকাতায়।

ক'বছর বাপ-বেটার পত্রালাপ পর্যন্ত বন্ধ।

সাবিত্রী সুরমার ওপর চেতন নন্দীর কড়া নির্দেশ। কোনও যোগাযোগ নয়।

কেতন নন্দীর কথা—ঢেউ উঠছে জনজীবনের স্রোতে। তাতে নামতে গেলে কিছু নোংরা যদি লাগে তো লাগবে। বিধবা ছোড়দির (সুষমা) জীবন জোর করে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল এবং তার জন্য দায়ী বাবা।

চেতন নন্দী সব যোগাযোগ বন্ধ রাখলেও কেতন খবর রাখতো। উপরতলার মর্জি মাফিক বদ্‌লিতে বদ্‌লিতে যে চেতন নন্দী ছিল ক্লান্ত ও বিরক্ত, সেই মানুষটিই নিজে উদ্যোগ করে বদলি নিয়ে চলে গেল আরও দূরে—রায়পুরে মধ্যপ্রদেশ। ওখানে কেতনের যোগাযোগের সূত্র ছিল রেলওয়ে অফিসের মধ্যবয়সী এক

ভদ্রলোক। কেতন তাকে প্রায়ই লিখতো : বাবার মতি-গতির দিকে একটু নজর রাখবেন। রাজনৈতিক চেতনাহীন মানুষের যা হয়—ইত্যাদি। ও তরফ থেকে উত্তর বড় একটা আসতো না। তা বলে কেতনের হুঁশিয়ারীর কথা বাদ পড়তো না।

সেই হুঁশিয়ারী আরও প্রখর হলো। সামনে এলো সারা ভারত-জোড়া এক রেলধর্মঘটের কাল। জংশনে জংশনে মিটিং মিছিলে উত্তেজনা। বড় বড় নেতারা ছুটে বেড়াচ্ছেন সারা ভারতে। স্টেশনে স্টেশনে সাজ সাজ রব। কর্মীদের দীর্ঘকালের দাবী-দাওয়া, বেহক বদলি, পে-স্কেল, ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ। সামান্য মৌরিডাঙ্গা স্টেশন চত্বরও বাদ গেল না। কেতন বড় বড় নেতাদের কলকাতা থেকে এনে মিটিং মিছিলে সরগরম করে তুললে। এ লাইন ওরা অবরোধ করবে।

এবং রায়পুরের যোগাযোগকে লিখল।

বাবার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমার মাথা হেঁট না হয়। জানি—আপনাদের ওখানকার ইউনিট খুবই শক্তিশালী। তবু···

কিন্তু স্বয়ং কেতনকেই ধর্মঘটের একদিন আগে ধরে হাজতে ভরে দিল পুলিশ। দরজা ভেঙে ঘর খানাতল্লাসী হল। দেয়ালে টাঙানো সাধের ছবিগুলো ভেঙে ছিঁড়ে তছনছ করে দিলে। কাগজপত্র বুলেটিন যা পেল সঙ্গে নিয়ে গেল। হাজতে বসে ফুঁসতে লাগল কেতন।

ধর্মঘটের দিন লোকাল প্যাসেঞ্জারও সাঁজোয়া প্যাসেঞ্জার হয়ে ঝম্ ঝম্ করে চলে গেল মৌরিডাঙ্গার ওপর দিয়ে। দু' পাশে জানালায় মাঝে মাঝে উঁকি মারছে রাইফেলের নল। গাড়িতে চড়নদার নেই।

তিন দিন পরে হাজত থেকে খালাস হয়ে কেতন খবর পেল বাইরের। ধর্মঘট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সরকার। তবু কোথাও কোথাও হয়ে গেছে চরম লড়াই। উপড়েছে রেল লাইন, আগুনে জ্বলেছে স্টেশনে। কোথাও ভাঙচুর।

বাড়ি ফিরে থ হয়ে দাঁড়াল কেতন। সারা ঘর তার ওলট পালট। স্টেশন কোয়ার্টার থেকে একটি ছেলে দৌড়ে এসে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলে তার হাতে।

'আপনার একটা টেলিগ্রাম কেতন দা।'

টেলিগ্রাম খুলে দেখল কেতন।

মায়ের টেলিগ্রাম : 'জল্‌দি এসো। বাবাকে দেখ।'

পরের ট্রেনেই রায়পুর ছুটল কেতন। কাগজে দেখেছে কেতন—ওখানে গোল-মাল চরমে উঠেছিল। তার সেই অরাজনৈতিক বাবা কি করেছিল? ··

ট্রেনে কেটে গেল পুরো একটা দিন। এতদূর এসে বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। হাসপাতালে নাকি পড়েছিল অজ্ঞান হয়ে পুরো দু' দিন। লাইন অবরোধীদের মধ্যে ছিল—পেটে লেগেছিল গুলি। শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে রক্ত ক্ষরণে। সরকারী ডাক্তারের রিপোর্ট।

সতীর্থ সহকর্মীরাই এ বিদেশ বিভুঁয়ে শেষকৃত্য রয়েছে। মুখাগ্নি করেছে বড় মেয়ে সুরমা।

'এই সুটকেশে আছে ওনার সব দরকারী কাগজপত্র।' সুটকেশটা কেতনের দিকে ঠেলে দিয়ে সাবিত্রী সামনে থেকে সরে যেতে যেতে বলে গেল,'দেখে বুঝে নে।' গলা ভাঙা ভাঙা।

কি দেখবে—কি বুঝবে কেতন! অসাড় হাতে তবু সুটকেশ খুলল। দেখল ঃ

ব্যাংকের খাতা। জমা সামান্য—হাজার আড়াই টাকা।

ইন্সিওরেন্সের কাগজ। মাত্র পঁচিশ হাজার।

এক গাদা ইন্সিওরেন্সের রসিদ, কিছু কেতনের চিঠি—সেই প্রথম দিনকার। মায়ের বোনেদের কিন্তু চিঠি, কেতনের প্রথম কলেজে ভর্তি হওয়ার রসিদ, হোস্টেলের খরচ-খরচার একটা খাতা।

আর কিছু?—খুঁজতে খুঁজতে তলার দিক থেকে উঠে এল একটা খাম। খামের ভেতর আলাদা কভার পেপারে মোড়া একটা শক্ত কার্ডের মত জিনিস। টেনে বের করে খুলে দেখল কেতন। লাল রঙের কার্ড। ভাঁজ খুললো। কেতন নন্দীর পার্টি সদস্যের কার্ড। কভারের লাল রং চোখে যেন বিদ্যুৎ হানে। ধোঁয়াসার মধ্যে ভেসে ওঠে একটা মুখ··একটা দীর্ঘকায় মানুষ তার ভরাট গলা যেন হো হো করে হাসছে।···

কেতনের হাত কাঁপল।

কেতনের চোখ জ্বালা করছে।

কেতন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইছে। পারছে না।···

বাঙালি মুসলমানের আত্মজিজ্ঞাসা ও কাজী আবদুল ওদুদ

হোসেনুর রহমান

বাঙালি মুসলমান কবে যথেষ্ট পরিমাণে মুসলমান হয়ে গেল ! এতই হল যে তার বাঙালিআনায় টান পড়ল। এই জটিল এবং জরুরি প্রশ্নটি নিয়ে ঐতিহাসিক, গবেষক রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর গ্রন্থে '(দ্য বেঙ্গল মুসলিমস, ১৮৭১-১৯০৬) সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই নিবন্ধে সে সব বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংকট কাল চিহ্নিত করা এবং কবে থেকে আরম্ভ হল বাঙালি মুসলমানের আত্মহনন, এ কথা দিয়েই এই নিবন্ধের সূচনা করা যেতে পারে। শিল্প ও সংস্কৃতির সংকট কাল আরম্ভ হল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চরণ থেকে। এই হল সেই কালরাত্রি যখন আরম্ভ হল মুসলমানের পরিচয় সন্ধান-প্রবৃত্তি। মুসলমান না বাঙালি ? যাঁরা বড় বেশি পরিমাণে একালধর্মী তাঁরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা আন্দোলনের মধ্যে অতীতের কোন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পান নি। বুঝতে পারেন নি যে এই বাংলা ভাষার জন্যে কেবা আগে করিবে প্রাণদানের একটা ইতিহাস আছে। একটা দীর্ঘ অতীত ইতিহাস আছে, একটা আত্মবিকাশের জন্যে কান্না আছে। কোন মর্মান্তিক ইতিহাস একদিনে তৈরি হয়ে যায় না। সেই ইতিহাস মনে রাখলে তৎকালীন পূঃ বাংলার দুঃসাহসিক সেকুলার ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে সহজেই বোঝা যাবে।

সেই ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর এক নিদারুণ যন্ত্রণাসম্ভব ইতিহাস। একটি সম্প্রদায় তার মনপ্রাণ বিকশিত হয়েছে যে ভাষায় যে প্রত্যয়ে যে প্রত্যাশায় সেই ভাষা এবার পরাজিত হতে চলেছে ধর্মের শাসনের কাছে। ধর্মের অভিভাবকদের রোষানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি পরিণত ভাষা গোষ্ঠীর মাতৃভাষা, বাংলাভাষা। রফিউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশী ঐতিহাসিক, সুদূর চট্টগ্রাম থেকে চলে যান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বরিসালের কীর্তিবাসার জমিদার প্রয়াত অমিয় রায়চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বাংলার মুসলমানের আত্মপরিচয় সন্ধানের গবেষণা করতে। ইতিহাস কৌতুক প্রবণ বৈকি। হিন্দুমুসলমানের বিরোধ থেকেই ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। সেই

হিন্দু-মুসলমান এখন গুরু-শিষ্য, একযোগে অনুসন্ধান চালালেন অক্সফোর্ডে বসে, বাঙালি মুসলমানের আত্মহননের কারণ কী?

কারণ ধর্ম। কারণ ধর্মের আধিক্য। ধর্মের নিরিখে বিশ্বভুবনের জাল বিস্তৃত। পরকাল বলে একটা জিনিস আছে তো। বাংলা ভাষায় কী আছে? হিন্দুর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতার অর্থ? স্বধর্মে নিধন শ্রেয়। স্বনিধন যেন সম্ভব নয় বাংলা ভাষায়। উর্দু এবং আরবি, ইসলাম এবং ইসলামি সংস্কৃতি। এই হল মুসলমানের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এখানেই একটি সম্প্রদায়ের পরবর্তী শতবর্ষের জীবনজিজ্ঞাসা থেমে এল। নিথর হয়ে এল অতীতের শিল্প-সংস্কৃতি আকাঙ্ক্ষা। বাঙালি মুসলমান এতদিনে যেন মুসলমান হতে পারল। অথচ এই মুসলমানই ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার করেছিল। ব্রাহ্মণ-মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করেছিল। বহু মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ব্রাহ্মী-ইসলামের এই যুক্ত জীবনসাধনার ইতিহাস আমাদের যেন কোনদিন তেমন করে আকর্ষণ করে নি। অথচ মানবেতিহাসে মধ্যযুগের এই যুক্ত জীবনসাধনা পরবর্তীকালের ভারতীয় সংস্কৃতিকে এক অসীম ঐশ্বর্য দিতে পেরেছিল এবং জগৎকে স্তম্ভিত করেছিল মধ্যযুগীয় এমন বিমিশ্র সংস্কৃতি। সেদিন এমন 'মানবসত্য' পৃথিবীর কোন প্রান্তরে এমন সমৃদ্ধতর রূপ নিয়েছিল বলে আমি অন্তত জানি না। দেখুন, ইতিহাসের ভাষায় এই মহামানবপন্থার চেহারা কেমন ফুটেছে: ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালি যে নূতন ধর্মের আন্দোলন করিয়াছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার। হিন্দু ও মুসলমান সমান অধিকারে এই ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে—একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে, একদিন হিন্দুর সঙ্গে একত্রে মুসলমানও এই ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রচার করিয়াছিল, গ্রহণ করিয়াছিল। ইতিহাস তাহার সাক্ষী।······

.. ..

হিন্দু ও মুসলমান—এই উভয় ধর্মের, বিশেষতঃ হিন্দুর ব্রাহ্মণ-প্রধান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বাঙালির বৈষ্ণব ধর্মে একটা বিদ্রোহ আছে। বৈষ্ণব ধর্মই একটা বিদ্রোহের ধর্ম। এই বিদ্রোহ বাঙালি ষোড়শ শতাব্দীতে করিয়াছিল। বাঙ্গালার অনেক বিখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও সমাজের সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল? মহাপ্রভু এই বিদ্রোহের চরম বিকাশ।··শুধু একা

অদ্বৈতের হুংকারেই নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইয়া অবতীর্ণ হন নাই। অদ্বৈতের সঙ্গে সেদিন যবন হরিদাসও ছিলেন। অদ্বৈত ও যবন হরিদাস, এই 'দুই জনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার (শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পারিষদগণ, শ্রীগিরি শংকর রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫১-৫২)

ষোড়শ শতাব্দীর এই বাঙালি (মুসলমান-বৈষ্ণব হিন্দু)-কে এমন করে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে পরাজয় বরণ করে নিতে হল কেন ? কেন স্বর্গ থেকে এই বিদায় প্রায় অর্ধ বিংশ শতক ধরে চলল অবলীলাক্রমে ? কেন বাঙালি মুসলমান প্রাণপণে বাঙালিত্ব বিসর্জন দিয়ে বিস্তৃত আত্মহননের পথ বেছে নিল ? কেন বাঙালি মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতিনির্ভর জীবনকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের চেয়ে অধিকতর মনে করতে পারল না ? যাঁরা ভারতবর্ষে ইসলামের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা জানেন ইসলামের রূপ শহরে নগরে যেমন ফুটেছে তেমন গ্রামে ফোটে নি। ইসলাম দিল্লি বা লাহোরে যেমন করে প্রতাপের সঙ্গে প্রসার লাভ করল, এই অঞ্চলের জনজীবনকে প্রভাবিত করল, অক্ষত করে তুলল ইসলামিক সংস্কৃতির অভিব্যক্তিকে, তেমন কিছুই করতে পারে নি গ্রামীণ ভারতীয় জীবনে। সেই বঙ্গদেশে বাঙালি মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে থেকেছে শ্রীযুক্ত হয়ে সমাজে সংস্কৃতিতে শিল্প-সাহিত্যে। তাই তো মধ্যযুগে মুসলমানকে সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে কোথাওই নিষ্প্রভ, নিরক্ত, নিষ্প্রাণ দেখায় নি। যে প্রাণ সাহিত্যগত সেই প্রাণই তো বিশ্বগত, সেই প্রাণ মুক্ত, তাই সেই প্রাণ নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত। এই মুসলমান ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্ন হল, নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মধ্যযুগে কোন নবাব আবদুল লতিফ বা সৈয়দ আমির আলি ছিলেন না। এটাই সে কালের সৌভাগ্যের সার কথা। এই দুই বড় নাম এখানে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা গেল। নবাব লতিফ বলেন গর্বভরে, তিনি মুঘল বংশজাত, অতএব চূড়ান্ত অভিজাত। অতএব তিনি বাঙালি মুসলমানের নেতা বলে সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, শ্রেণীচেতনা সমস্ত কিছু বাঙালি মুসলমানের জীবনযাত্রার ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এমনই প্রবাহের সন্তান আমির আলি। হুগলি মহসিনের ছাত্র হলেও তাঁর অবস্থান ইংলণ্ড বা আফগানিস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এঁরা বাঙালি মুসলমানের সমূহ ক্ষতি করলেন।

ধর্ম যে মানুষের সামাজিক-সংস্কৃতিক চেতনার প্রকাশ, রসোত্তীর্ণ প্রকাশ, এই কথাটি লতিফ—আলি, সর্ব-ভারতীয় স্তরে আলি ভ্রাতৃদ্বয়, কোন দিনই অনুভবেও

বুঝতে পারেন নি। একটি দৃষ্টান্ত। প্রায় সব বাঙালি ঘরের মুসলমান ছেলে মেয়ে কোরান পাঠ করে থাকেন জীবনের গোড়ায়। কিন্তু, তাদের ক'জন কোরান বুঝেছেন এ বিষয়টি বিচার করতে বসলে বিপদের আশংকা আছে। কারণ আরবি ভাষা না বুঝে কোরান মুখস্থ করা এক জিনিস, আর কোরান আত্মস্থ করে ইসলামের সার কথাটি বুঝে নিতে পারা আর-এক জিনিস। এবার বাঙালি মুসলমান বিপদে পড়ল। এতদিন সে কী যথেষ্ট মুসলমান ছিল না? এত-দিনই তো সে যথার্থ মুসলমান ছিল। ধর্মের ধারণা ব্যাপকতার প্রকাশের মধ্যে মানুষ মুসলমানকে আবিষ্কার করে নিতে পেরেছিল। কিংবা উল্টো দিক থেকে মুসলমান নিজেকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে আবিষ্কার করেছিল মানুষ হিসেবে সগৌরবে। এবং ঘটনাচক্রে সে ছিল মুসলমান। এই মুসলমানের জীবন মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসায় নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আরো কিছু ছিল। সেই 'আরো কিছু' মুসলমানের ভাগ্যে সইল না। উদবৃত্ত মুসলমানের জন্যে নয়। রূপ রস গন্ধ মুসলমানের জন্যে নয়। তাকে ঈশ্বর নাম নিতে হবে অহরহ, কোরান হজরত মহম্মদ হাদিস-নির্দেশিত পথে অবিচলিত থাকতে হবে আজীবন। এ জীবনে সঠিক পথে চলতে পারাই সবচেয়ে বড় পুণ্য। অন্তত মুসলমানের জন্যে। এর অর্থ এই নয় যে সব বাঙালি মুসলমান কোরান আরবিতে পড়েছে এবং বুঝেছে। অর্ধশিক্ষিত মুসলমান পণ্ডিত বাড়িতে এসেছে, আরবি কোরান মুখস্থ করিয়েছে। ঐ পর্যন্ত। কোরান পাঠ যাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। মৌলভি প্রচুর ইসলামি আইন, হাদিস, রোজা-কিয়ামত —ঐ সব গভীর বিষয়ে পড়ুয়াকে মুখে মুখে বলে চলেন। এটা একটা ভাঙাচোরা 'কোয়াক' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতেই বাঙালির সন্তান একপ্রকার মুসলমান হয়ে ওঠে। ছেলে মেয়ে কৈশোর-এ পা দিতে না দিতেই 'নামাজশিক্ষা' নামক ইসলামী করনের প্রথম বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। যে কোন বাঙালি মুসলমানের ঘর-বাড়ির চেহারা ছিরি প্রায় এক ও অভিন্ন। যে কোন মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি বাড়ির সঙ্গে এদের পার্থক্য আকাশপ্রমাণ। আমি ঊনবিংশ শেষ—বিংশ শতাব্দীর কথা বলছি। মুসলমানের বাড়ি শূন্য প্রায়। কেমন একটা, অভাব অভাব ভাব আছে চারিদিকে। কোন মাসিক পত্রিকা, কোন তৈলচিত্র, কোন গান বাজনা সামগ্রী—এ সব যেন একেবারে অনুপস্থিত। ঘরের সাজসজ্জায় মুসলমানি আনার ছাপ সুস্পষ্ট। খুব বেশি হলে দেয়ালে আজমের শরীফের ছবি টাঙানো থাকতে পারে। এবং আরবিতে ঈশ্বর নাম কারুকার্য খোচিত

একটি কোন শিল্পকর্ম দেয়ালে শোভা পেতে পারে। এমন দু-একটি ধর্মীয় বাণী বাঙলাদেশের ধনীর গৃহে আজকাল শোভা পায়। এবং এ পারেও তার অনুসরণ বাঙালি মুসলমানের বাড়িতে চোখে পড়ছে। মাঝের দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান বাড়িতে এ মন সব ছবি দেখা যেত না। এর অর্থ গভীর। ইসলামীকরণ একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি চলেছে জগৎ জুড়ে। কোথাও বেশি, কোথাও কম। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ীকরণ এক প্রকার, পাকিস্তান কিংবা মক্কায়, সাউদি আরব কিংবা ইরাকে অন্য এক-প্রকার। ইন্দোনেশিয়া বা মালয়াসিয়া কট্টরপন্থী মধ্যপ্রাচ্য ইসলামের তুলনায় ভিন্ন। এতই ভিন্ন যে এই ভিন্নতা মুসলিম বিশ্বে একদিন এমন এক সুগভীর রূপান্তরের ইঙ্গিত বহন করে আনবে যে ইসলামবিদ্‌দের সে দিন ইসলামি রিফরমেশন বলে একটা 'সামাজিক বিস্ফোরণ'কে চিহ্নিত করতে হবে। সাম্প্রতিককালে এতৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এই বিস্ফোরণ সম্ভব হয়েছিল। ভাষার আন্দোলন কেবল মাত্র ভাষাতেই স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। ভাষা কিংবা জাতীয়তার আন্দোলন জগতে কোন অপ্রত্যাশিত ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্বোধক হতে পারে না। জাতীয়তার আন্দোলন কোন মহৎ সংস্কৃতি বা সভ্যতার জন্ম দিতে পেরেছে বলে জানি না। অন্যত্র কোথাও এভাবে বহুদিন আগে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলাম ঃ "but nationalism by itself is not a progressive culture, neither has it ever produced an advanced civilsation. যেমন "language is merely a means of communication ; it expresses ideas, it does not create them."

বাঙালি মুসলমান সেদিন সজ্ঞানে এত বড় কাজ করেছে এমন কথা ভাববার কোন হেতু নেই। রাজনৈতিক—অর্থ নৈতিক ক্ষমতা অর্জনের স্পৃহাও কম কাজ করে নি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। আবার ভাষা ও জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছিল ধর্মজিজ্ঞাসা। সেই ধর্মের বাঁধন ও ভেতর থেকে শিথিল হয়ে আসছিল। রবীন্দ্র-নাথের গান, সাহিত্যকর্ম, হঠাৎই মুসলমানের জীবনে নতুন প্রভাত সঙ্গীত হয়ে উঠল। সে আবিষ্কার করল ধর্মের বিকল্প হতে পারে কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীত। হঠাৎ বাঙালি মুসলমান রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে একটা যেন শিবির রচনা করল। যুদ্ধ রাষ্ট্রচিন্তার অন্তর্গত থাকল না। মুসলমান বললে আগে আমি বাঙলাভাষী, পরে আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আমি মুসলমান। এই হল ইসলামীকরনের মূলে কুঠারঘাত করা। যে কোন গোঁড়া বা মধ্যপন্থী মুসলমানের

বিচারে একেই বলতে হয় অমুসলমানীআনা। এই প্রথম ইসলামের ইতিহাস ও ধারাবাহিকতা চূড়ান্ত বাধাপ্রাপ্ত হল।

অন্য পরিবেশে অন্য পটভূমিকায় অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমান উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে এই যুদ্ধ শিবিরে ঘোরা ফেরা করেছে, জীবনের নতুন অর্থ সন্ধান করেছে। ধর্ম যে সব কিছুর মূলে একমাত্র চাবিকাঠি নয়, তাও বহু শিক্ষিত মুসলমান অনুমানে অনুভবে বুঝেছে। কিন্তু পরাজয় তার জীবনে ইতিমধ্যে ব্যাপক হয়ে উঠল। 'সামাজিক মুসলমান' উনবিংশ শতকের গোড়ায় ততটা না হলেও শেষের অধ্যায়ে এসে 'রাজনৈতিক ইসলামে' আসক্ত হল। 'সামাজিক মানুষ' 'পলিটিক্যাল কম্যুনিটি'তে পরিণত হতে আরম্ভ করল। এই হল এই উপমহাদেশের ট্র্যাজেডি। মধ্যযুগের মুসলমান মনেপ্রাণে সামাজিক মুসলমান। সাহিত্যে সমাজ ইতিহাসে তার প্রমাণ মেলে যত্র তত্র। সে অগ্রগামী। সে সামাজিক অর্থে উচ্ছ্বসিত, পূর্ণ, সমৃদ্ধ।

আধুনিক কালে এই বাঙালি মুসলমানকে মৌলানা মৌলভী পীরের দরবারে এসে বাধা পড়তে হল। অর্থাৎ মুসলমানের জন্যে মধ্যযুগ ছিল যথার্থই, মুক্তির যুগ, আর আধুনিক যুগ মধ্যযুগ। অর্থাৎ past into the present। এইবার পেছনে চলা আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে ইংরেজের ভারতজ্ঞানও পাল্টে এসেছে। উদাহরণ W. W. Hunter-এর Indian Mussalmans (১৮৭১)।

এবার মুসলমানকে বেশি বেশি সুযোগ সুবিধে দিতে হবে, কারণ তারা সমস্ত অর্থে পশ্চাদগামী। এবার হিন্দু দুয়োরানীর ছেলে মুসলমান সুয়োরানীর ছেলে, এই হল নতুন ছক। স্বভাবতই মুসলমান আনন্দে ভরে উঠল। সুদিন তাদের ফিরল বলে। এদিকে একই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার পালা। হিন্দু মন অনেক আগে থেকেই সাহিত্যে গানে কবিতায় ব্যাঙ্গ-কথায় স্বাধীনতাকে সংকল্পগত করে তুলতে পেরেছে। তারা অনেক আগে মিল বেন্থাম, শেক্সপীয়র, ব্রাউনিং আত্মস্থ করেছে। রিপনের স্বায়ত্তশাসন, এক ব্যক্তি এক ভোট এ সব বুঝতে কোন অসুবিধেই হবার কথা নয় বাঙালি হিন্দুর। অসুবিধে যত হল, তার প্রায় সবটাই মুসলমানদের।

যুক্তিসংগত কারণে ইংরেজি পড়ে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বাঙালি হিন্দু অনেক বেশি গণতন্ত্রমুখী হল, মুসলমান গণতন্ত্রকেই ভয় পেল। কেমনতর বাঙালি হিন্দুর এই গণতন্ত্র প্রবণতা। প্রধানত চাকুরি, আইনের চোখে সবাই সমান, সমানাধিকার, আইনের শাসন এ সব

গণতান্ত্রিক অনুশাসন বাঙালি হিন্দু শিক্ষায় বুদ্ধিতে যুক্তিতে এবং জীবনের তাগিদে বুঝতে পেরেছিল। একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে সর্বত্র-গামী ছিল। আলিগড় থেকে রেংগুন পর্যন্ত ছিল তার বিস্তৃত কর্মকান্ড। এই বাঙালি হিন্দুকে উত্তর ভারতের জনজীবনে দেখতে পেলেই ইংরেজ সি আই ডি প্রধান বলতেন, এই ধুতিপরা হিন্দু বাঙালি বাবু যারপর নেই ভয়ানক, অতএব আপত্তিকর। প্রথম দর্শনে এরা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু একটু পরেই সেক্সপীয়র, ব্রাউনিং, ডারউন, মার্কস এবং ফ্রয়েড বেরিয়ে পড়বে। এরাই ভারতবর্ষে সর্বত্র বৃটিশ অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এই ছিল এমন একাধিক হোম-পলিক্যাল বিভাগের রিপোর্টের সার কথা। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ইংরেজের শিরপীড়ায় কারণ হল। অন্যদিকে মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে এহেন ইংরেজ প্রভুদের মনোভাব ছিল ঃ ওই আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ? চিৎকার করছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে চিৎকার করে গগন ফাঠাচ্ছে। আসলে ওরা কিছু নয়। ওদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন হেতু নেই। হ্যাঁ, এমন এমন কথা সি আই ডি ইংরেজ সিংহ আবুল কালাম আজাদ সম্পর্কে কোনদিন বলতে সাহস করেনি। সেটা আর এক প্রসঙ্গ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজাদের ভূমিকা আজও যথেষ্ট বিচার করা হয় নি। তাঁকে কেবল-মাত্র একজন মওলানা ধর্মজ্ঞ বলেই চেনা গেছে। এমন বহু চেনা মুখ অচেনা মানুষ এ কালে যত্র তত্র কালে ভদ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আবার হারিয়ে গেছে। ইতিহাসের সংক্ষিপ্তকরণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ভারত বিভাগের মূলে কাজ করেছে বহুবিধ অর্থে।

বাঙালি মুসলমান এ সব বুঝতেই চায় নি। কারণ আধুনিক শিক্ষা তাকে স্পর্শ করে নি। যখন সে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করল এই শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় দশক থেকে, তখনও সে ঘরে গ্রাম বাংলার কৃষিপ্রধান সংস্কৃতির সন্তান, আর বাইরে সে শহর-কলকাতার 'সন্নিকটবর্তী মানুষ'। এখনও সে কলকাতার অন্তর্দেশে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে পারে নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে জানাশোনা বোঝাপড়া ও বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। এই জানাশোনার পারাপারের সেতু দেশভাগের আগে পর্যন্ত এতই সংকীর্ণ জরাজীর্ণ ছিল যে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ প্রসঙ্গটি বুঝতেই সময় ফুরিয়ে যাবে। অবিরোধের সামান্য ইতিহাসটুকু জানার সময় পাওয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে যিনি কিংবা যাঁরা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে

প্রধান কাজী আবদুল ওদুদ। শেষ থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে। এই সেদিন যুক্তিপন্থী ওদুদের জন্ম শতবর্ষ এসে চলে গেল নিঃশব্দে। একটি বাংলা দৈনিকে (প্রতিদিন ২৬ এপ্রিল ১৯৯৪) তাঁকে এ ভাবে স্মরণ করার চেষ্টা করেছিলাম : ওদুদ চিরকাল ধর্ম বলতে এই মনুষ্যত্ব সাধনকেই বুঝেছেন। তিনি যখন হজরত মহম্মদের জীবনকাহিনী লিখছেন তখনও তিনি কঠোর যুক্তিপন্থী, মানবতন্ত্রী। মানব সভ্যতার অন্তর্নিহিত যে ঐশ্বর্য, যে মাধুর্য, যে ঐতিহ্য—যা সমস্ত কালের সমস্ত জিজ্ঞাসার সহায় সেই মানুষকেই তিনি হজরত মহম্মদের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন অকপটে। যাঁরা ধর্মব্যবসায়ী, যাঁরা ধর্মান্ধ, যাঁরা মৌলবাদী তাঁদের উদ্দেশে ওদুদ বলেছেন : "কিন্তু কোরানের বাণী এক অতিপ্রাকৃত পদ্ধতিতে লাভ হলেও মূলতঃ তা যুক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, এ সবের সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত। মোতাযেলারা বলেছিলেন : ধর্মশাস্ত্রের বাণী সুসঙ্গত হওয়া চাই যুক্তি বিচারের সঙ্গে। কোর্আনে বার বার বলা হয়েছে, কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবার জন্য নবী আসেন নি। তিনি এসেছেন মানুষদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনটি সুপথ আর কোনটি বিপথ তা জানিয়ে দিতে (হজরত মহম্মদ ও ইসলাম, পৃ ২৫৯)।"

কোরানের মূল সুরটি ওদুদের মতে "পর্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশ এই দুয়ের উপরে কোরানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মুসলমানেরা একদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতির বাহন হতে পেরেছিলেন পর্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশের উপরে জোর দিয়েই। কোরানের শিক্ষার এই দিকটার কথা আমাদের নতুন করে ভাববার দিন এসেছে (ঐ পৃঃ ২৬০)।"

কোন রফা না করেই মুসলমান বাঙালির কাছে ওদুদ বুদ্ধির মুক্তি দাবি করলেন। তাকে বোঝালেন : আগে স্বকাল সংস্কৃতি সমাজকে চিনতে বুঝতে পারতে হবে। পরে নিছক ধর্ম স্বচ্ছন্দেই আসতে পারে। ধর্ম বলতে সাধারণত হিন্দু মুসলমান যা বোঝে তার মূলেও কুঠারঘাত করলেন। এবার রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিলেন। ধর্মবোধ ভাল, ধর্মমোহ নয়। "আমাদের দেশে ধর্মের যা প্রকৃতি তাকে নিছক আচার-পূজা না বলে উপায় নেই, সৃষ্টি-ধর্ম তাই তার তরফ থেকে বাধাই বিশেষভাবে পায়। এহেন ধর্মকে জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া বাস্তবিকই বিপজ্জনক।" এই হলেন কাজী আবদুল ওদুদ। এ হেন মানুষ রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ গান্ধী-কে যুক্তি-তর্ক সহযোগে গ্রহণ করলেন। মুসলমানকে বোঝালেন ওহাবি আন্দোলনের পথে নয়, মক্তব মাদ্রাসার পথেও

নয়. গভীর জীবন জিজ্ঞাসা, সমাজ সম্পর্ক-শূন্য অন্বেষণ, মানুষে মানুষে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন, মুসলমানকে যথার্থ মুক্তি দেবে। ওদুদ এবার রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করছেন ঃ "ধর্মসম্প্রদায়েও যেমন সমাজেও তেমনি। কোন এক পূর্বতনকালে যে সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তীকালেও আপন অধিকার ছাড়তে চায় না। পতঙ্গ মহলে দেখা যায়, কোন কোন নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছদ্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজনীতিও তেমনি। তা নিত্যধর্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। একদিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর অন্যদিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন কি, অন্যায় প্রণালী ঘর-গড়া নরকের তর্জনীসংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তনা।"

এই অন্ধ ধর্মাচার মুসলমান বাঙালিকে পেয়ে বসল বিংশ শতকের গোড়া থেকে প্রবলবেগে। সাহিত্যে সমাজে সংস্কৃতিতে সে প্রধানত মুসলমান, ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে বাঁচবে কিংবা মরবে, এই তার প্রতিজ্ঞা। এবং সে বেঁচেই মরে থাকল। ইতিমধ্যে রাজনীতি প্রবল আকার ধারণ করল। মৃতপ্রায় সামাজিক মুসলমান পলিটিক্যাল ইসলাম-কে জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করল। দু-একটা দৃষ্টান্ত ঃ আলি ভ্রাতৃদ্বয় উচ্চ-শিক্ষিত, অভিজাত, আভিজাত্য সচেতন মুসলমান। খিলাফত এঁদের ইসলামি জীবনকে সঞ্জীবিত করল। এবার বলে দেয়া ভাল ঃ মুসলমান সমাজে সে কালে কোন প্রকৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিস্তার দেখা যায় নি। আর বঙ্গদেশে তো নয়ই। এহেন বাঙালি মুসলমান আগে সৈয়দ আহমদ খান এবং পরে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের ডাকে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে সাড়া দিতে কোন দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে উত্তর ভারতের ধনী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই দীন দরিদ্র স্বল্প শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানকে ব্যবহার করেছে। রাজনৈতিক কারণে 'মুসলমান ভাই ভাই' এই শ্লোগান যত সহজ ছিল সামাজিক কারণে উচ্চ শ্রেণীর অভিজাত মুসলমানের সঙ্গে কোনদিন দরিদ্র বাঙালি মুসলমানের সামান্যতম সম্পর্ক আদৌ সহজ ছিল না। এই স্বাভাবিক ঘটনাটিকে অস্বাভাবিক জটিলতার আবর্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলতে যিনি শেষ পর্যন্ত পারলেন তিনি আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং মহম্মদ আলি জিন্না। ইতিহাসের দুটি প্রধান চরিত্র—এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সুরাবর্দি। এঁদের যদি কোন কারণে বঙ্গদেশে (কল্পনা করতে আপত্তি কী?) তৎকালীন কংগ্রেস নিজেদের সঙ্গে রাখতে পারত তাহলে দেশভাগ

বানচাল করা অসম্ভব ছিল না। এবং দেশভাগ না হলে বাঙালি মুসলমানকে এতবার আগুনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হোত না। বার বার তার বাঙালিত্ব নিয়ে এত বিপত্তি হোত না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে তৎকালীন পূর্ব বাংলা ভাষা আন্দোলনের আগে কী আর কখনো বাঙালি মুসলমান বাঙালিত্ব রক্ষার সংকল্পে জীবনপণ করেছে? দুটো ইতিহাস চিরকাল দুটোই হবে। তবু ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসের মধ্যে সমজাতীয়তার জায়গাগুলো আমাদের সন্ধান করে আবিষ্কার করতে হয়! আমরা সেই পরিবর্তনগুলো সহজে দেখতে পাই না। কারণ আমরা মনে মনে যা দেখতে ভালবাসি তাই নিঃসংকোচে দেখে চলি। গতানুগতিক মুসলমান চরিত্র সমাজে সব সময় দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। দু-একটা দৃষ্টান্তের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেশভাগের আগে 'নবযুগ' দৈনিক বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যৎসামান্য লক্ষ্য করেছে। মুসলমানের দৈনিক বলতে সেকালে 'আজাদ' পত্রিকাকেই বোঝাত। কিন্তু নবযুগের সম্পাদক আহমদ আলি অক্লেশে জোরের সঙ্গে মুসলীম লীগ ও তার দ্বি-জাতিতত্ত্বের সমালোচনা করেছেন, দেশভাগের নিন্দে করেছেন। যেমন মহারাষ্ট্র, সেখানে মোহম্মদ আলি কুরীম চাগলা দেশভাগ ঘোরতর অন্যায় হচ্ছে কংগ্রেসের দরজায় দরজায় গিয়ে বলেছেন। কিন্তু কে কার কথা শুনেছে। চল্লিশের দশকে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্স্টি-টিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান যুবক সম্মিলনীতে (২রা আগস্ট, ১৭ই শ্রাবণ, রবিবার ১৯৪২ সাল) এ, কে, এস, জাকারিয়া সভাপতির ভাষণে এক জায়গায় সাহিত্য প্রসঙ্গে বলছেন: 'আমি আর একটা কথা বলিতে চাই। সেটা হইতেছে বাংলাদেশের সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণ হইতে আজ পর্যন্ত যে কটা সাহিত্য গঠন হইয়াছে এবং আজও ২১১টা সাময়িক পত্র যে ভাবে চালিত হইতেছে সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ঐ সাহিত্যটা একটা সম্প্রদায় বিশেষের, সমস্ত জাতির নয়। আমি ছাত্র যুবকদিগকে তাই অনুরোধ করিতেছি যে, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যিক, তাহারা যেন বাঙালীর নূতন সাহিত্য গঠন করেন। উপন্যাস, নাটক, কাব্য, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকাদি এমনভাবে লিখিত হউক, যেন সেগুলি শুধু বাঙালীরই হয় কোন সম্প্রদায় বিশেষের না হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ও ক্ষিরোদপ্রসাদ, সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও জলধর সেন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বাঙালীগণ প্রকৃত সমগ্র বাঙালী সাহিত্যের যে গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরই পথানুসরণ করিলে বাংলার প্রকৃত সাহিত্য

গঠন হইবে। প্রবাসী ও বসুমতীর বিষ আর কিছুদিন ছড়াইতে দিলে দেশ আরও নীচে নামিয়া যাইবে এবং আরও ঘোর অন্ধকারে ডুবিবে।”

বলাই বাহুল্য, জাকারিয়ার স্বাধীনতা আছে তাঁর মত পোষণের। বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা প্রবাসী ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাকারিয়ার মত তাঁরই, আমার নয়। এই দুটি দ্বিমত সত্ত্বেও বাঙালি পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন জাকারিয়ার মন্তব্যের মধ্যে কতটা ঘন বাঙালিত্ব মুসলমানত্বকে ছাপিয়ে উঠেছে।

এহেন সভাপতি বলছেন ঃ বাঙালী মুসলমান যুবকদের আহূত এই সভা। আমি তাহাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলিয়া জানিয়াছি যে, তাঁহাদের সভ্যগণ সকলেই জন্মভূমিকে ভালবাসেন এবং তাহার অধিবাসীদের উপর তাঁহাদের সহানুভূতি আছে। অতটুকু জানিতে না পারিলে আমি আজ এই সভার সভাপতিত্ব করিতে আসিতাম না এবং এই সভাপতির পদটা যত বড়ই হউক না কেন, চিরদিন যেভাবে করিয়া আসিয়াছি আজও সেইভাবে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতাম। আমি রোগ শীর্ণ দেহ লইয়া আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে চাই এবং এই অতি কষ্টদায়ক বাঁচিয়া থাকার আকাঙ্ক্ষা যেন বিদায় লইবার পূর্বে দেখিয়া ও শুনিয়া যাইতে পারি যে, এরূপ সভাগুলি আহূত হইয়াছে বাঙালী যুবকদের দ্বারা। দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হইয়াছে বাঙালী জাতি দ্বারা এবং দেশে প্রয়োজনীয় সমিতিগুলির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে সমগ্র বাংলাদেশের অধিবাসী দ্বারা। ঐ সব সভা ও প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচয় দিবে যে, তাঁহাদের কর্তৃপক্ষগণ কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়, হিন্দুর নয়—মুসলমানের নয়—খৃষ্টানের নয়, বাঙালীর—বাঙালী জাতির—তথা ভারতীয় ভারতবাসীর। বিদেশিরা যাঁহারা এদেশে ভ্রমন করিতে আসেন, তাঁহারা যেন অদূরে ভবিষ্যতে রেল স্টেশনে শুনিতে না পান “হিন্দু চা, মুসলমান চা”, “হিন্দু পানি, মুসলমান পানি”, বিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিতে গিয়া যেন বুঝিতে না পারেন যে, সেগুলি হিন্দু স্কুল, কি মুসলমানের স্কুল, সভা সমিতিতে যোগদান করিতে গিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারেন যে সেগুলি কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়। সর্বদা এই যেন চোখে পড়ে ও তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে সব প্রতিষ্ঠানগুলি সীমাবদ্ধ জাতীয়—বাঙালী তথা ভারতের।”

এই অভিভাষণের গোড়ায় সভাপতি জাকারিয়া যা বলেছেন তা দিয়ে এই বক্তৃতা পর্ব শেষ করছি ঃ

আমরা এই সাড়ে পাঁচ কোটি বাঙালী একই ভাষা বলি, একই আবহাওয়ার

মধ্যে প্রতিপালিত, একই সংস্কার ও কৃষ্টির পরিচয় লইয়া মনুষ্য জগতের মনুষ্য সমাজে আমরা পরিচিত। একই ভাবপ্রবণতা আমাদের রক্তমাংসে সমান ভাবে জড়িত। আমরা ধর্মাবলম্বী কেহ, কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খৃষ্টান, কেহ বৌদ্ধ। ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব। ইংরাজী ভাষাতে যাহাকে "Nation" বলে যেমন ইংরাজ, জার্মান, ফরাসী, চীন ও জাপান। আমরাও তেমনি সাড়ে পাঁচ কোটী বাঙালী ও তথা ৪০ কোটী ভারতবাসী। আজকের সভার উদ্যোগী যাঁহারা, তাঁহারা এর নাম দিয়াছেন নিখিল বাঙালী মুসলমান যুবক সমিতি। কেন যে নামটা তাঁহারা এরূপভাবে রাখিলেন তাহা আমি বুঝি না। বাঙালী মুসলমান যুবক সমিতি, বাঙালী খৃষ্টান সমিতি ইত্যাদি এই যে সব নামগুলি ইহাতে দেশের উপকার হওয়া ত দূরের কথা এই নামগুলি আমাদের দুর্বলতা আনিয়াছে, করিয়াছে আমাদের হাস্যাস্পদ ও ঘৃণিত এবং হেয় এবং আমরা যে একটা জাতি নই তাহা সর্বত্রই প্রমাণ করিয়াছে। যখনই দেখি বা শুনি যে, ধর্মের দোহাই দিয়া এবং এই কর্মটা নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া কতকগুলি অবাঞ্ছিত লোক চারিদিক দিয়া আমাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া নিজেরা এবং নিজেদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু কিছু আপাত সুবিধা করিয়া জন্মভূমি ও জাতির আত্মসম্মানকে অতি নিম্নস্থানে আনিবার প্রয়াস পাইতেছে, লজ্জায় আমার মাথা অবনত হইয়া যায়। যে স্বার্থান্বেষী যাহাদের আমি চিরদিনই মাতৃভূমি ও মাতৃভূমির সকল সন্তানদের 'মহাশত্রু' বলিয়া মনে করিয়াছি তাহারা যে কোন স্তরের হউক না কেন, আমি তাহাদের ঘৃণা করি। তাহাদের একেবারে উচ্ছেদই হইবে দেশের একটি অন্যতম সুকর্ম

... ...

আমি তোমাদিগকে করজোড়ে অনুরোধ করিতেছি তোমরা সকল দিক দিয়াই বাঙালী হও। কথা বল এক ভাষায়, পরিধান কর এক পোষাক এবং পরিচয় দাও নিজেদের বাঙালী বলিয়া। ক্যাবিনেট করিবেন ফজলুল হক সাহেব কি শ্যামা-প্রসাদবাবু, তাহাতে ক'জন হিন্দু বা মুসলমান মন্ত্রী হইতেছেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও না বা কোনদিনই সে কথা ভাবিও না। সর্বদাই মনে করিবে কেবিনেট গঠন করিবেন বাঙালীর শ্রেষ্ঠ নেতা এবং মন্ত্রী গঠন হইবে শ্রেষ্ঠ বাঙালী দ্বারা। সেই প্রকৃত বাঙালী—যে এই বাংলাদেশ ও তার প্রত্যেক সন্তানকে ভালবাসে, বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং বাঙালী পরিচ্ছদ পরিধান করে, যাহার কাছে আত্মপর

নাই, হিন্দু মুসলমান বিভিন্নতা নাই, পারিবারিক ও বন্ধু বাৎসল্যের দুর্বলতা যে রাজ্যশাসনে আনে না—সেই প্রকৃত বাঙালী।”

এর চেয়ে কোন অর্থে কী বাঙালী মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর বাঙালীত্বের দাবি পেশ করেছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান শাসনকর্তাদের দরবারে? একদিন আমাদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে স্পষ্ট করে। আমরা যারা বাঙালি ভারতবাসী আমাদের একদিন বলতেই হবে কেন আমরা জাকারিয়ার এই অভিভাষণের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি নি। কী হিন্দু কী মুসলমান উভয়কেই এই উত্তর দিতে হবে। কারণ জাকারিয়ার আর্তনাদ আত্মগ্লানি, সংকল্প প্রস্তাব সে দিন যদি বাঙালি কান পেতে শুনতে পেত তাহলে বোধকরি দেশভাগ বন্ধ করা যেত। 'ফজলুল হক'কে বিকিয়ে দিতে হোত না পাকিস্তানের, দ্বি-জাতিতত্ত্বের পিতা মহম্মদ আলি জিন্নার পাকিস্তান আন্দোলনের প্রস্তাবের কাছে। ফজলুল হক ভাল মানুষ ছিলেন। এই পর্যন্ত। এ এক ধরণের 'নেতিবাচক ভালমানুষ'। তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। কিন্তু তিনি যে অসাম্প্রদায়িক তা কোন দিন যুক্তিতর্ক বা কোন ভাবঘন ভাবনা চিন্তার দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। শিক্ষিত বাঙালির কাছে তা হল ঃ সভা সমিতিতে যথেষ্ট পরিমাণে বাঙালি হিন্দু মুসলমানের মনোহরণ। তা যে বড় 'ক্ষণিকের অতিথির' মতো। আসতেও সময় লাগে না। যেতেও সময় লাগে না। কোন গভীরতর অর্থে ফজলুল হক বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, ধর্মভয়, লোকভয় তাঁকে মুসলিম লিগের শিবিরে পেঁছে দিয়েছে। তিনি 'ইসলাম বিপন্ন' নামক অস্ত্রের শিকার হয়েছেন শেষ পর্যন্ত। ইতিহাসের এক হতভাগ্য, নগণ্য চরিত্রে পরিণত হলেন জীবনের শেষ বেলায়। তাঁর মধ্যে যে অগ্নিকনা ছিল সেই আগুনই তাঁকে দাহ করল। সে কালে স্টেট্‌স্‌ম্যানের জবরদস্ত সম্পাদক আর্থার মুর ফজলুল হক সম্পর্কে যথার্থই 'মন্তব্য' করতে পেরেছিলেন। তাঁর মন্তব্য ঃ ফজলুল হক সেই দ্রুত যান নাম যার অটোমোবিল কিন্তু সে গাড়ি যে কোনদিন গন্তব্যস্থলে এসে পেঁছলো না।

এখানে স্পষ্ট করে বলার কথা, বাঙালি হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সে কালে এত সর্বভারতীয় অগ্রগণ্য মানুষ ছিলেন যাঁরা সাহিত্য ইতিহাস সমাজ চিন্তায় ছিলেন এক একজন এক একটি দিকপাল ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল, মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত, শ্রী অরবিন্দ প্রমুখ। এ'রা কী না করেছেন। সাহিত্য থেকে রাজনীতি, বাংলা থেকে ভারতবর্ষ, এ'দের সাধনার বিষয় হয়েছে।

আর মুসলমান বাঙালি নেতাদের মধ্যে কেউ একটা কিছু লিখে রেখে যান নি। সর্বভারতীয় স্তরে জিন্না থেকে লিয়াকাত থেকে ফজলুল হক বা সুরবার্দি কেউ কোন ছিন্নপত্র রচনা করেন নি, আত্মজীবনী তো দূরের কথা। জিন্নাকে বা ফজলুল হককে বুঝতে হয় তাঁদের তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়ে। আর সুরবার্দির কথা ? আজ না হয় অনুক্ত থাক। কারণ বাঙালি মুসলমানের জাগরণ কিংবা বিসর্জন কোনটাতেই তাঁর কোন বিশেষ ভূমিকা ছিল না। লোকমুখে পরিচয় সন্ধান করে জানতে হয় ও'রা বাঙালি ছিলেন। হ্যাঁ, অক্‌সফোর্ডের কৃতি ছাত্র দার্শনিক হাসান সুব্বার্দি অন্য কথা। তিনি বানীর বরপুত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রীতিভাজন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকার উল্লেখযোগ্য লেখক। অর্থাৎ তাঁর বুদ্ধির মুক্তি ঘটেছিল। তাঁকেই বা ক'জন শিক্ষিত মানুষ মনে রেখেছেন। এই মর্মে বাঙালি মুসলমান জীবনের মস্ত এক ট্রাজিডি হল ঃ যে ক'জন সার্থক বাঙালি মুসলমান শিক্ষায় সংস্কৃতিতে জীবনদর্শনে ধর্ম ও সমাজের বধ্যভূমি থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন তাঁদের বৃহত্তর মুসলমান সমাজে জায়গা হয় নি। আর শিক্ষিত, উদারমনা হিন্দু বাঙালি? তাঁরা সন্দেহ, সংকোচ, এবং শেষ পর্যন্ত কৃপা করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল।

এমতাবস্থায় যখনই ঝড় উঠল তখনই শিক্ষিত হিন্দুমুসলমান ঘোষণা করলেন আমরা তো পুরাকালেই মিলে মিশেই কলাতিপাত করছিলাম। যত গোল বাধালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ। ব্যস, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। এ বিষয়ে যিনি সবার আগে সমাজবিজ্ঞানীর যুক্তি ও ভার প্রয়োগ করে নির্মম হয়ে উঠতে পারলেন তিনি স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ 'পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুপতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয় অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলাবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃস্টানধর্মালম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন ; তাদের মন মধ্যযুগের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এই জন্যে অপর ধর্মালম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। 'য়ুরোপীয় বৌদ্ধ' বা 'য়ুরোপীয় মুসলমান' শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামের যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মূখ্য পরিচয়।

'মুসলমান-বৌদ্ধ' বা 'মুসলমান-খৃস্টান' শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপরপক্ষে হিন্দু-জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-vioient non-Co-operation. হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফাৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু। সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।·········ভারতবর্ষের এমন কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে ; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে। এক সময়ের ভারতবর্ষে গ্রীক, পারসিক, শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবাণ জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়।"

···সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়। মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে য়ুরোপ সত্য সাধনা ও ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চালনার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথের অভয়বানী এ রকম : শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—তারপর আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে

ভয় পাবার কারণ নেই ; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটিব যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব ; যদি না আসি তবে, নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। [শ্রাবণ ১৩২৯, কালান্তর, পৃঃ ৩৭৫–৭৭]

রবীন্দ্রনাথের অভয় বাণী ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে পারে বৈকি। অগ্নি দগ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন এস ওয়াজেদ আলির মত শিক্ষিত সাহিত্য প্রেমী। অনন্য জীবন শিল্পী বীরবল, প্রমথ চৌধুরীর অসীম চেষ্টায় ও প্রেরণায় ব্যারিস্টার, ইংরেজীনবিশ ওয়াজেদ আলি বাংলায় কলম ধরলেন। মানুষ জমিনে সোনা ফলল। 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে' অনুভব করবার অধিকার তিনি অর্জন করলেন। জীবনে সমকক্ষতার মর্যাদা সত্য মূল্য তথ্য দিয়েই অর্জন করতে হয়। বাঙালি মুসলমান এ কথাটি আজও যথেষ্ট পরিমাণে বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয় না। যত দুঃখ তো এখানেই। এই দুঃখ ওয়াজেদ আলিকে পঙ্গু করে নি, সজাগ করেছে। তিনি সদর্পে লিখতে পারলেন ঃ বাঙালি না মুসলমান।··· একজন পাঞ্জাবী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি পাঞ্জাবী, একজন হিন্দুস্থানী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি হিন্দুস্থানী ; একজন সিন্ধী মুসলমান বলবেন তিনি সিন্ধী। কারণ সকলেই নিজ নিজ দেশের পরিচয় দিয়ে থাকেন। অথচ তাদের মুসলমানত্বের বিষয় কেউ সন্দেহ পোষণ করবেন না। একজন বাঙালী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু বলবেন তিনি মুসলমান। কিন্তু দেশ কোথা জিজ্ঞেস করলে বলবেন নোয়াখালি কিংবা কুমিল্লা ; হুগলী কিংবা বর্ধমান। সোজাসুজি বাঙালি বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা আসে। এ মানসিকতা যতদিন থাকবে, ততদিন কি করে বাঙালি মুসলমান দেশের জীবনে উচ্চস্থান দখল করতে পারবেন। Inferiority complex যে তার ডানা বেঁধে রাখবে।"

এই বাহ্য। এবার ওয়াজেদ আলি আরো গভীরে যেতে চান। এবার প্রসঙ্গ ভাষা।

"এখন ভাষার কথা নেওয়া যাক। উর্দুভাষীরা উর্দু বলতে কিংবা লিখতে কুণ্ঠা অনুভব করেন না। বাঙালি মুসলমানের বেলায় কিন্তু এর ব্যাতিক্রম দেখতে পাই। উচ্চপদস্থ এবং অভিজাত বংশীয় (তথাকথিত) বাঙালি মুসলমানেরা বাংলা লিখতেও কুণ্ঠা অনুভব করেন। উচ্চপদস্থ কোন মুসলমান রাজকর্মচারীর বাড়িতে গিয়ে দেখুন একটি বাংলা বই কিংবা সাময়িক

পত্র দেখতে পাবেন না ; অথচ এই শ্রেণীর কোন হিন্দুর বাড়িতে ওসব জিনিসের ছড়াছড়ি। বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টান্ত আজকালকার যুগে আর কোথাও পাবেন না। এ সব কম লজ্জা আর পরিতাপের বিষয় (এস ওয়াজেদ আলি রচনাবলী-২ পৃ. ৪৯৮)।

কাজী অবদুল ওদুদ, এস ওয়াজেদ আলি এবং এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেজাউল করিম বাঙালি মুসলমানের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এ সব চাওয়া দেশভাগের আগেই আরম্ভ হয়েছিল। এবং এঁরা সবাই অখন্ড ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এই চেয়েছিলেন। তবু দেশ ভাগ হল, স্বাধীনতা এল। এক নিমেষে বাঙালি মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করল যে তারা আবার আর একটা স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধ শিবিরের প্রস্তুতি নিতে চলেছে। এবার ভাষা সাহিত্য ইতিহাস রক্ষার যুদ্ধ। এবার মুসলমানের সংসারের মধ্যে গৃহদাহ।

অনেক দাম দিয়ে যা পাওয়া যায় না তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করাও যায় না। সমগ্র ভাষা আন্দোলন তার উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। এই ভাষা আন্দোলন সেই আন্দোলন যাকে বলা যেতে পারে মুসলমানের জীবনে এক সামাজিক বিস্ফোরণ। জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূলে নিদারুণ কুঠারঘাত। অবিভক্ত ভারতবর্ষে মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রাম বলুন সামাজিক পরিবর্তন বলুন বা আধুনিকীকরণ কোন বিভাগেই তার প্রত্যাশিত কর্তব্য, দায়িত্ব পালন করে নি। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে একটা নিদারুণ জিনিস আছে। ভাষা আন্দোলনের আগুনে পুড়তে পুড়তে মুসলমান যথার্থ বাঙালি পদমর্যাদায় ভূষিত হল, ধর্ম চলে গেল দ্বিতীয় সারিতে প্রথম সারিতে উঠে এল গীতাঞ্জলি—ঈশ্বর-মানব সম্পর্কের নতুন এক নৈবেদ্য। আজ সেই মানব ভূমিতে যতই ধর্মীয় মৌলবাদের তান্ডব নৃত্য হোক বাঙলা দেশের ইতিহাস আর কোন দিন কেবলমাত্র ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পুণ্যভূমি (?) হতে পারবে না। সাম্প্রতিক বাঙ্গলাদেশ সফয়ে জনৈক বন্ধুর (চক্রবর্তী বামুন, বামমার্গী বটে) গৃহে নৈশ ভোজের আড্ডায় শফিকুর রহমান ঘোষণা করলেন ইসলাম ও আধুনিক মানুষের জীবনাদর্শ সম্পূর্ণ দুটো ভিন্ন মেরু। এরা পরস্পরে মিলতে পারবে না কোনদিন। মনে পড়ে গেল ১৯৬৬ সালে হায়দ্রাবাদের অভিজাত নিজাম ক্লাবে অধম এক আলোচনা চক্রে পেপার পড়েছিল : Islam and modern human ideals. শেষ পর্যন্ত এক জবরদস্ত জার্মান ইসলামবিদ এসে অজ্ঞাত কুলশীলকে রক্ষা করেছিলেন। কপাল ভাল, তখনও দেশে মৌলবাদের এমন

সমৃদ্ধি সংক্রামক হয়ে ওঠে নি। সে দিনই বুঝেছিলাম বাঙালি মুসলমানেই পারবে যা কোনদিনও উর্দুভাষীরা পারবে না। তৎকালীন পূর্ববাংলা তাই পারল বটে।

সেই পূর্ববাংলা, পরে বাঙলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কী পারলেন একবার দেখা যেতে পারে। অধ্যাপক আবুল ফজল স্মারক-বক্তৃতা দিচ্ছেন। স্থান : শিল্পকলা একাডেমী, চট্টগ্রাম, ১৭ আগস্ট, ১৯৮৯. উদ্যোক্তা ঐতিহ্য সংরক্ষণ পরিষদ, চট্টগ্রাম। বিষয় : রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার। ···প্রসঙ্গ কাজী নজরুল সেলাম।

নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ প্রথম থেকেই আছে, এখনও এ প্রশ্নে সবাই একমত নন। অসামান্য কবিশক্তি নিয়ে এসেছিলেন। অতি অল্প সময়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন; অতি দ্রুত একদিকে যেমন কৃতজ্ঞ ও উচ্চকিত দেশবাসীর সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন, তখনি লক্ষ্য হয়েছিলেন রাজরোষের ও সামাজিক বিরুদ্ধতার। তিনি ব্যাপক আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন এবং ব্যাপকতর সংবর্ধনাও অভিষিক্ত করেছে তাঁর কন্টকমুকুটশোভিত সম্পর্ক। এজন্য দায়ী তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব দুইই; কারণ উভয় পরিচয়েই তিনি ছিলেন এক বিরল মৌলিকতার প্রতীক।···কবি পরিচয়ে বাঙলার কবিদের মধ্যে সন্দেহাতীভাবে প্রথম সারির, নিশ্চিতভাবে প্রথম দশজনের একজন তিনি কি না, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাঁর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খ্যাতি নির্ভর করছে মূলতঃ গীতিকার হিসেবে তাঁর বিপুল ও বিশিষ্ট সৃষ্টির উপর। তাঁর প্রতিভা যেমন বিতর্কের ঊর্ধ্বে সেই প্রতিভার অপচয়জনিত পরিণামহীনতাও তেমনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি মর্মন্তুদ সত্য। শেষ পর্যন্ত তিনি থেকে যান এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার প্রতীক পরিচয়ে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ হয় না। অনেক আবেগ জমা হতে থাকে তাঁকে অবলম্বন করে। আমাদের বাংলাদেশে প্রকৃত বিগ্রহের অভাবে তাঁকে দিয়ে সেই অভাব মোচনের চেষ্টা হয়। এবং যারা এই বিগ্রহের প্রয়োজনে তাড়িত হয়ে তাঁকে ব্যবহার করে, তারা তাঁকে ইচ্ছে মতো ভাঙে ও গড়ে। তাঁকে সম্পূর্ণ ও অবিকৃত থাকতে দেয় না। এ সবই তারা করে রাষ্ট্রানুকূল্যে, কারণ রাষ্ট্রের কাছেও তাঁর ব্যবহারিক মূল্য অজানা থাকে না। একদা ধর্মদ্রোহী, নাস্তিক, হিন্দুয়ানী ভাবাপন্ন কবি এক মুসলিম অধ্যুসিত সমাজে সমাদৃত হয়ে যান জাতীয় কবি পরিচয়ে, এবং এই যুক্তিতে যে তিনি বাংলার মুসলিম জাগরণের উদ্গাতা। একদার ইসলামদ্রোহীকে এই

শিরোপা দানের মধ্যে ইতিহাসের কৌতুকবোধ যেমন ধরা পড়ে, তেমনি ধরা পড়ে খ্যাতি-অখ্যাতির উত্থান-পতনের এক পরিচিত ছবি।

এবার বোধকরি বাঙালি মুসলমানের দেনাপাওনার ইতিহাসের একটি পর্বের সমাপ্তি ঘটল। বলাই বাহুল্য, একাজ ওপার বাঙলার মানুষ করলেন। এবং করছেন। এখন প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান নজরুল সম্পর্কে এমন উক্তি কী করতে পারবেন? স্পষ্ট করে বলা সম্ভব, না পারবেন না। তার একটি মুখ্য কারণ (ঐ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মন্তব্য অনুসরণ করে বলা) এ পারের রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্যে তেমন নজরুল চর্চা ভাল নয়ঃ রাজ্যের ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নজরুলের ভাবমূর্তিকে আঘাত করা চলবে না। মনে রাখবেন আমাদের প্রধান লক্ষ্য জাতীয় সংহতি। তাহলে এ কথা কী প্রশ্ন আকারে উঠে আসতে পারেঃ নজরুলকে মুসলমান যত চায় হিন্দু তত চায় না। আবার স্পষ্ট করে বলাঃ আদৌ তা সত্য নয়। এ বঙ্গে হয়তো উল্টোটাই সত্যি। এ বঙ্গে মুসলমান এখনো সেই হীনমন্যতায় ভোগে; ভাবে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ তার ভারতীয় নাগরিকত্ব, সে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ভারতবর্ষের প্রেস, সেকুলার রাজনীতি, সংবিধান বিচার, কোন এক মুহূর্তের জন্যে মুসলমানকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে ভাবতে পারে না। কারণ ভাবের কথা বাদ দিয়ে, কেবল যদি যুক্তির কথা বলতে হয় তাহলে বলতে হয়ঃ কোটি কোটি মুসলমানকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষ কোনদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, এ কথা প্রতিটি আধুনিক ভারতবাসী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষের শিল্পকলা সঙ্গীত সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান সর্বত্রআধুনিক মুসলমান আধুনিক ভারতবর্ষে অপরিহার্য। বাঙালি মুসলমানকে এই কথাটি মনে রাখতে হবে সবার আগেঃ সেকুলার গণতন্ত্র দাবি করে প্রতিটি ভারতবাসীকে স্ব স্ব পথে কোন এক অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে, দেশের জন্যে উপযুক্ততা অর্জন করতে হবে, অপরিহার্য হয়ে উঠতে হবে সমাজের কোন এক স্তরে। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির সেই আপ্ত বাক্যটি পৃথিবীর যে কোন সংখ্যালঘু মানুষের জন্যে প্রণিধানযোগ্যঃ সংখ্যালঘুকে ডমিনেন্ট সংখ্যালঘু হতে হবে। তবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু সম্পর্ক সমকক্ষ, সুসংহত, সংস্কৃতিতে পরিণত হবে, অন্যথায় নয়। কেবল বক্তৃতায় কেবল রাজনৈতিক কলাকৌশল, কেবল অধিকতর সুযোগ সুবিধায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভিযান সম্পূর্ণ হবার নয়। যা এতদিন চলেছিল বা এখনো চলে আসছে কোথাও ধর্মের নামে কোথাও কায়েমী স্বার্থের বা রাজনীতির প্রয়োজনে

তার আমূল পরিবর্তন আজ হোক কাল হোক অবশ্যম্ভাবী। তার সেই পরিবর্তনে আছে বাঙালি মুসলমানের যথার্থ মুক্তি। তাকে এই কথাটি বুঝতেই হবে যে পরিচয় আকাঙ্ক্ষা ভাল। তবে কতটা সুদূরপ্রসারী এই পরিচয় স্পৃহা হতে পারে তাও বুঝতে পারা চাই। আমি বাঙালি। আমি ও আমার দেশ, আমার পরিচয় আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। আমার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে আত্মস্থ হবে এই তো আমার সবচেয়ে বড় সংকল্প। কারণ আমি সবার আগে ভারতবাসী বাঙালি এই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

এই পরিচয় অর্জন করতে হলে কী করতে হবে 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধী' বক্তৃতামালায় ১৯৩৫ সালে কাজী আবদুল ওদুদ এভাবে বলতে পারলেন: এইখানেই বড় প্রয়োজন সৃষ্টিধর্মী নব নেতাদের। অতীতের প্রতি তাঁরা হবেন শ্রদ্ধান্বিত, তার পুজারী কখনো নয়—তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সেইদিন সুপ্রাচীন "হিন্দু" ও "মুসলমান"—এর মিলন তাঁদের কাম্য হবে না, কেন না তা অসত্য ও অসম্ভব, তাঁদের কাম্য হবে একটি নব জাতি গঠন—যার সূচনা নানাভাবে বহুকাল ধরে দেশে হয়েছে, দেশের একালের জীবনের জন্য যার প্রয়োজনের অন্ত নেই। মনোজীবন ও রাষ্ট্রজীবন দুই ক্ষেত্রেই অশ্রান্তভাবে চলবে তাদের সৃষ্টির কাজ। একালের যে ধর্মসম্প্রদায়গত রাষ্ট্রজীবন সেটি কদাচ তাঁদের সমর্থনের বিষয় হবে না, কেননা তার ফলে এ দেশের অভিশাপ-রূপ জাতিভেদ নব নব সম্ভাবনা লাভ করে চলবে; তাঁদের সাধনার বিষয় হবে দেশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ, কেননা, তারই ভিতরে নিহিত রয়েছে দেশের রাষ্ট্রজীবনের, অথবা জীবনের সত্যকার বিকাশ সম্ভাবনা ···

··· ··· ···

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নয়, জ্ঞান ও জাতীয়তা দেশের লোকদের শরণ্য হবে, নিঃসন্দেহ; কিন্তু জাতি কি বোঝা যাবে? বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাব?—না ভারতীয়? ভারতবর্ষ বহুকাল ধরে একটি দেশ। ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় না হয়ে ভারতবাসীর পরিত্রাণও নেই। তবু আপাততঃ বাঙালী, মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবী হওয়াই বেশী ভাল মনে হয়; কেন না তা বেশী স্বাভাবিক ও কম কষ্টসাধ্য। অবশ্য ভারতীয়ত্বের বিরোধী যে বাঙালীত্ব মাদ্রাজীত্ব ও পাঞ্জাবীত্ব তা কদাচ কাম্য নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"ভারতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত মস্তিষ্ক। তার চাইতে এই কথা বলাই ভাল, ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে

পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ। ইসলাম ও বেদান্ত মানুষের সৃষ্টি-শক্তিরই পরিচয়-চিহ্ন। মানুষের সেই সৃষ্টি-শক্তি কোনো দিন নিঃশেষিত হবে না, চিরদিন অক্লান্ত ও অম্লান থাকবে, এইই তার জন্ম-অধিকার। সে অধিকার সত্য হোক।"

মানুষের সৃষ্টি-শক্তি যে সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য এই মানবলোকের সে কথা স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে বেশি আর কে বিশ্বাস করতে পেরেছেন। ওদুদ স্বামীজীর হাতে গড়া প্রতিমার যতটুকু পরিবর্তন চাইলেন ততটুকু না চাইলে দু-জনের চিন্তায় কতটা পার্থক্য হচ্ছিল? তবু ওদুদ যেমন করে চলেছেন আজ থেকে ৫৯ বছর আগে তা বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু উভয়কেই চমৎকৃত করবে, স্তম্ভিত করবে।

বাঙালি মুসলমানকে বুঝতে হবে ওদুদ স্বাধিকার ও স্বাধীনতা কতটা চান, এবং বিশ্বাস করেন, যা না পাওয়া গেলে মানব জীবন ব্যর্থ হয়।

ওদুদের প্রসঙ্গ দিয়েই শেষ করতে হয়। তিনি বাঙালি মুসলমানদের কাছে কী চেয়েছিলেন? 'বুদ্ধির মুক্তি'। ১৯২৬ঃ মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং তার মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকা বাঙালি মুসলমানের জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই পত্রিকাকে এক সামাজিক আন্দোলনের পুরোধা করে তোলেন ওদুদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল প্রমুখ। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রধান মূলধন ছিলঃ বুদ্ধির চর্চা, পরমত সহিষ্ণুতা, মনন ও অনুশীলন। এর অর্থ, এই গোষ্ঠী আধুনিক মন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক চেয়েছিলেন; মুসলমান থাকুক তার ধর্ম নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রনীতিতে সে আধুনিক মানুষ হয়ে উঠুক এই ছিল এ'দের শপথ বাক্য।

ওদুদ বাঙালি মুসলমানের সার্বিক পরিবর্তন চেয়েছেন। ভেদবুদ্ধি, ধর্মমোহ, ক্ষুদ্রস্বার্থান্ধতা মুসলমানকে ক্ষতবিক্ষত করছে। মুসলমানের বুঝতে পারা চাই আধুনিক মানুষের জীবনের বিকাশ ও বিস্তার কিসে হতে পারে। ওদুদের যুক্তি এরকমঃ যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভারের মতনই মানুষের জীবনের উপরে চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তাও 'কর্মপ্রবাহ' রুদ্ধ ও শীর্ণ হয়ে আসে (কাজী আবদুল রচনাবলী—(প্রথম খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, পৃ ৩২-৩৩)। অতএব মহাপুরুষ, আনুষ্ঠানিক ধর্ম, আচার—

বিচারের মধ্যে আধুনিক মানুষ বাঁচতে পারে না। "মহাপুরুষ যে সর্বজ্ঞ নন, মানুষের প্রভু নন, মানুষের জীবন-সংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোক স্তম্ভ ; তাঁর কথা ও চিন্তাধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা, সমস্ত সমাধান যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়···(ঐ)।

এই মানুষই মুসলমানকে এমন পরামর্শ দিতে পারে ঃ শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তন অবশ্য অসম্ভব, কেননা অতীত অস্তমিত, মৃত—তার যে অংশ সজীব সে তুমি ও আমি ; অতীত পুনর্জীবিত হবে না, তবে তুমি ও আমি বিপুল সাধনায় সব মহিমা লাভ করতে পারবো (হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, পৃ ৪৭৮)।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪—১৯৭০) ১৯৩৫ সালে নিজাম বক্তৃতামালায় বিশ্বভারতীতে এমন বলিষ্ঠ এবং সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। সেদিন এমন নির্ভীকতার, ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যের, সৎসাহসের প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঃ এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পাই না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক-একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশ-শক্তির বিশিষ্টতা।"

১৯৩৫ এবং ১৯৯৪। এর মধ্যে পৃথিবী এত বদলে গেছে। যা গেছে তা আর ফিরে আসবার নয়। ইতিমধ্যে বাঙালি মুসলমান জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এখনো দ্বিধার মেঘ কেটে যায় নি। এখনো তার মর্মান্তিক জীবনযন্ত্রণা তাকে পরিপক্ক করে তোলে নি। এখনো সে ওদুদের জীবনচর্যার ঐশ্বর্যের সন্ধান করতে পারল না। আত্মঘাতী বাঙালি মুসলমান এখনো আত্মশক্তির ও আত্মমর্যাদার মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারল না, বলতে পারল না, মানুষ মুসলমান সবার আগে, সবার ওপরে কেবলই মানুষ। তারপর অন্য সব পরিচয়।

যদিও শরীর

অজয় চট্টোপাধ্যায়

ডাইনে এবং বাঁয়ে কুড়িফুট চওড়া ধাতব রাস্তা মূল জনস্রোত ধারণ করে আছে। সড়কের মাঝখানে যোজকের মতো জুড়ে আছে অনধিক পাঁচফুট চওড়া আর এক রাস্তা। অহরহ থিকথিক করে জল কাদা, আর ডানপাশে দশমিটার ধাওয়া করলে এক খুদে পল্লীর অবস্থান। ঘিঞ্জি। বাড়িগুলো গায়ে পড়া, বাতাসের প্রবেশ কুন্ঠিত। ফলে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার প্রভুত্ব বজায় থাকে সংবৎসর।

লম্বা ধাঁচের ঘর। খাট, আয়না বসান আলমারি, সোফা; আসবাবপত্র মুখ্যত কাঠের। আকারে বড়। ওজন এবং কারুকার্যে প্রাচীন রুচির ছাপ। সাজ টেবিল, আলনা, আলনায় গুছোন অন্তর্বাস এবং বহির্বাস সম্পর্কিত সমুদয় পোশাকে বর্ত্তমান রুচির স্বীকৃতি। অতীত এবং সমকালীন উভয় ধর্মী রুচির মিশ্রণে জবর জং।

মাছের আঁশ, ডিমের খোলা, শালপাতা, মাংসের হাড়, এবং আরো বহুবিধ জীবনভিত্তিক আবর্জনার সঞ্চয়ে পরিবেশ ঘিনঘিনে। হয়তো দুর্গন্ধের দাপটে অথবা সন্ধ্যার সংকেতে চাঁপার দিবানিদ্রা ভেঙে যায়। অগাধ আলস্যে দু-হাত মাথার পেছনে আনে। আঙুলে আঙুল জড়ায়। মটকায়। আড় ভাঙে। হাই-তোলে। বারবার খোলা চুল মুঠির শাসনে সংহত করতে থাকে আনমনে। প্রথমে কাশি, এবং কাশি অনুগমন করে একজন লোক দরজায় প্রথমে টোকা এবং তৎপরে মৃদু চাপ দেয়। ভেজান দরজা অবারিত। পায়ে হাওয়াই চটি। হাঁটু ধুতি এবং হাফহাতা টেরিকট সার্ট পরনে। আগন্তুকের নির্লিপ্ত মুখ। চৌকাটের ওপারে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে সংবাদ দেয়—পাখি এসেছে।

—সুজা?

—লক্কা।

মেয়েটির ঠোঁটে দাঁতের চাপ পড়ে। ধন্দে পড়ে। বেলা পড়ে এলেও ঠিক সাঁঝবেলা নয়। প্রস্তুত হতে সময় লাগবে। অথচ বউনির খদ্দের। প্রথম মুরগি তাড়াতে মন খুঁত খুঁত করে। বলে—বসা।

ঘুমের আমেজ জড়িয়ে আছে। আলস্য ঝরিয়ে দিতে মেয়েটি তৎপর হয়, তাড়া অনুভব করে জলে যাওয়ার। শরীরে জলের কাজ সেরে ফিরে আসে ঘরে। এবার সে দ্রুতলয়ে কিন্তু নিখুঁত প্রসাধনে রত। উপকরণ যা যা আছে একে একে ত্বক-সেবায় নিয়োগ করতে থাকে। প্রসাধন শেষ করে টি, ভি, মডেলের মত পাক খেয়ে খেয়ে নিজেকে পরখ করে, অনুপুঙ্খ। পূর্ণপ্রসাধিত হয়ে পায়ে পায়ে এসে উপস্থিত হয় এজমালি বৈঠকখানায়। ফোমে মোড়া গদির পিঠে হাত ছড়িয়ে আগন্তুক অপেক্ষায়।

—আসুন। বলে চাঁপা পিছন ফিরে। ইঙ্গিতে ধরতে পেরে যুবক উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটি গতিশীল। যুবকের অনুগমন নিজের ঘরে ঢুকেই মেয়েটি মুখ ফেরায়। সামান্য সরে জায়গা করে দেয়, হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করে অন্দরে আসতে। যুবক ভেতরে আসামাত্র সোফা লক্ষ্য করে মেয়েটি হাত প্রসারিত করে। যুবক বসে। মেয়েটিও বসে খাটের ওপর। কিনার ঘেঁষে। ছত্রিতে পিঠ ঠেকিয়ে। তারপর পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দিয়ে যুবককে জরিপ করতে থাকে। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। বাঁধা খদ্দের নয়। চেনা যে তাও স্পষ্ট হচ্ছে না। মেজাজ রুচি ওজন কিছুই আন্দাজে আসছে না। ঝুঁকি থাকছে। অথচ বউনির খদ্দের। যদি ফসকায়। দোমমনা অবস্থায় মেয়েটি আর্জি পেশ করে, বিনীতভাবে।—তৈরি হতে আমার একটু সময় লাগবে, মাত্র পাঁচ মিনিট। বলার তালে তালে পাঁচটা আঙুল মেলে ধরে। অনুমোদন প্রতীক্ষায় চোখ টনটান করে।

—শিওর। আমি অপেক্ষা করছি। ঘোষণায় যুবক সোচ্চার।

কিছুক্ষণ ছুটি প্রার্থনা যে অজুহাত নয় প্রমাণ হাতে নাতে। একগুচ্ছ কাগজ পাকিয়ে মেয়েটি বাণ্ডিল করল। তারপর তাতে আগুন জ্বালায়। বাণ্ডিলটা ডান হাতের মুঠিতে চেপে ধরে। অগ্নিসংযোগে জ্বলন্ত বাণ্ডিল চৌকাঠ, দরজার ওপরে, ফ্রেম ঘিরে আরতি করতে থাকে। দেওয়াল জুড়ে ফ্রেমে বন্দী দেব-দেবীর ফটো। ফটোতে আছে রামায়ণ মহাভারত থেকে নেওয়া কিছু বাছা বাছা দৃশ্য। রামকৃষ্ণের ছবি আছে। দেওয়াল সংলগ্ন প্রত্যেকটি দ্রব্যে মেয়েটি আগুন ছোঁয়ায়। দু-হাতের মুঠিতে বাণ্ডিলের গোড়া চেপে চোখ মোদে। কপালে ঠেকায়। কয়েক দণ্ড। চোখ খোলে। ফু দিয়ে আগুন নেভায়, চৌকাঠের বাইরে রেখে আসে।

সন্ধ্যাকালীন আচারে যবনিকা। বিবর্ণ গদি আঁটা চেয়ারে চাঁপা জাঁকিয়ে বসে যুবকের মুখোমুখি। মাঝে নিচু সেন্টার টেবিল। যুবক ঘরের চারপাশে

নজর বোলাচ্ছিল, চোখ ঘুরতে ঘুরতে এসে স্থির হয় মেয়েটির মুখে। চাঁপা শুধোয়,—বাবু বুঝি এ পাড়ায় নতুন।

যুবকের বুকে অপমানের চাবুক পড়ল। কোনক্রমে হজম করে। পাল্টা শুধোয়,—ভাল করে চাও। দেখতো চিনতে পারো কি না। মুখটা সে ভাসায়। স্বীকৃতিকাঙাল।

মেয়েটি দৃষ্টি কুঁচকে শাণিত করে। সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। বহু মুখ··· অগণিত মুখ, সব একাকার। রজনীর লীলাভূমিতে মুখ কোন সত্তা নয়, সংখ্যা। মুখের জটলা থেকে এই মুখ ছেঁকে তুলতে স্মৃতি তোলপাড় করে। কোন লাভ হয় না। বিড়ম্বনা বাড়ে। কিন্তু সে ভাঙে না। সেয়ানা হয়। পেশাগত দক্ষতায় মুখের ওপর ছড়িয়ে দেয় আবছা হাসি।

—অনেক দিন পর এলেন।

—একমাস আগে এসেছি। দেরী কই।

—ওমা এক মাস কাবার। দেরী নয়। মেয়েটি কপালে চোখ তোলে। আহত ভঙ্গি করে। অভিমানে গোমড়া হয়।

যুবক তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি। তুষ্ট হয়। বলে, সব সময় কেমন যেন লাগে। পানসে। তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ ছুটিয়ে প্রেম করতে চাই।

চাঁপা চটুল স্বরে খলবল করে।—আমার ঝাঁপ খোলা। স্বর-ক্ষেপনে ভিন্ন মাত্রা আরোপ করে। হাঁক পাড়ে। কানাই, অ কা-না-ই-ই···। ডাক-এর রেশ থাকতে থকতে ধুতি-হাফসার্ট পরা নির্বিকার মুখ হাজির, চাঁপা অর্নবের দিকে কান্‌কি মেরে—বিয়ার? উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজস্ব জিজ্ঞাসায় নিজেই ইতি টানে।—পাইট আন। ঘোড়া মুখ। অর্নবকে আঙুল উঁচিয়ে পকেট ইসারা করে। অর্নব পকেটে হাত ঢোকালে বলে, আশি।

অর্নব গুনে গুনে একখানা পঞ্চাশ আর তিনটে দশ টাকার নোট বাড়ায়। গম্ভীর হয়ে পার্সের চেন টানে। ক্ষুন্ন হয়েছে। শরৎচন্দ্রের বারবণিতা এত স্পষ্ট ও অসঙ্কোচে টাকার কথা পাড়ত না।

সব যেন নাগালে এবং রেডী। মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট ব্যবধানে লোকটা ফিরে আসে। হাত জোড়া। কাচের গ্লাস-বোতল-ভরা জলের জগ এবং চাট হিসেবে ভাজাভুজি নোনতা বাদাম ট্রেতে করে নিয়ে এসেছে। যত্ন সহকারে টেবিলে রাখলে। জগ জলে টলটল করচে। আসর গরম করার আয়োজন পূর্ণ।

আবেগের প্রথম চোট অর্নব সামলে উঠেছে। বন্ধুত্বের দাবীতে শুধোয়,-তোমার কথা বলো। খুব জানতে ইচ্ছে করে তোমার শৈশব—মা বাবার কথা—কি করে এ পথে এলে।

মরণ! এত ঘটা করে কথা বলে কেন। কবি নাকি। কাঁচা পিস। নির্মাকি ছেনাল। ভোগাবে। চাঁপা সতর্ক হয়। ধূর্ত চিন্তা মগজে কিলবিল করে। দেবে নাকি করুণ রস ঢেলে? অনেক সময় মোটা ফায়দা তোলা যায়। পরক্ষণে অন্য দিকটা ও ভাবে। বৃথা সময় খোয়ান। আখেরে লোকসান। নির্বাসিন দেয় ভিজে কল্পলোক। কিন্তু মুখের ওপর এ'টে দেয় দুঃখ দুঃখ ভাব। দু হাত জড়ো করে কোলের কাছে আনে। চোখের পাতা ঢেকে দেয় মণিদ্বয়। না সঙ্গীত না আবৃত্তি, খিচুড়ি স্টাইল। অথচ অনবদ্য। বেশ ভাব দিয়ে উচ্চারণ করে, দুলে দুলে।

ভাত কাপড় জোটে মোর তোমার কৃপায়।
মা নাই, বাপ নাই, নাই সহোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেন ভেসে বেড়াই।

কথা চলছে। চলছে পানাহার। কোন বিপন্ন বিস্ময় মগজে খেলা করে না। চিন্তার ভাব নেই। টেনশন নেই। বেশ লাগছে। কোষে কোষে উপভোগ্যতার ঝিমানি। হোক অর্থ দিয়ে পাওয়া, তবু পাওয়া কি যায় এমন পরিবেশ আপন স্ত্রী অথচ পরাধীন নারীর কাছে? কোথায় লভ্য এমন বিচরণভূমি, উদ্দাম উপভোগের আয়োজন যেখানে অবাধ?

অন্তত এই চাহিদা পূরণ করতে চাঁপার খ্যাতি তুঙ্গে। বাক্‌পটু। রসিকা। ছলনাময়ী। ঈদৃশ গুণে চাঁপা প্রসিদ্ধ। মুখ্যত আদি রস ঘে'ষা, তা হোক, তবু প্রবচনের ওপর সহজ দখল। প্রচুর উর্দু শের কণ্ঠস্থ এবং যথাযথ প্রয়োগে দক্ষ, সুখার্থীর রুচি এবং মেজাজ অনুসারে খাপ খাওয়াতে ওস্তাদ। ভ্রমর বৃত্তি উস কে দিতে মহার্ঘ উপাদান। এসব তো উপরি পাওনা। আর আছে আসল। শরীর টান টান, পিচ্ছিল ত্বক, উন্নত গড়ন, বিকশিত স্বাস্থ্য। রটনা আছে এই পাড়া বর্তমানে চাঁপাগ্রস্থ। আড়কাঠিরাও বাছাই খদ্দেরকে এই ঘরের সুপারিশ করে।

হাত বাড়ালেই ফুল্লকুসুমিত রমনী ত্বক। রিপু-জর্জর অর্নব চাঁপার অতসী বর্ণ উদরে থাবা বসান মাত্র দরজায় দেখা দেয় তেলতেল গোল মুখ। চোখাচোখি হতেই ঝারি সমেত হাত কপালে ওঠে।

—রাম রাম বাবু।

লঘু পায়ে চাঁপা এগিয়ে আসে। মালা নেয়। মালা সমেত অঞ্জলি নাকের কাছাকাছি আনে। ঘ্রাণ নিতে থাকে। চৌকাটের ওপারে মালাকার অপেক্ষায়। চাঁপা অর্নবকে চোখ মারে। অর্ণব পকেটে হাত পোরে। খুচরো নেই। সবই দশ। দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিতেই, যেন তর সয় না. কপালে হাত ঠেকিয়ে চকিতে মালাকার চম্পট। একে ছন্দপতন তায় আশা ছিল কিছু ফেরত পাবে, পেল না। অর্নবের মুখে ব্যাজার। অগত্যা চাঁপা শরীরের উদ্দাম আবেদন মেলে ধরে ছন্দ ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয়ে ওঠে। সফলও হয়।

দফায় দফায় অর্থ বিয়োগ। অর্নব বচ্চনীয় কায়দায় দরজায় লাথি মারে। বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। অথৈ নির্জনতা, দৃষ্টি আবিল, ঘোর ঘোর চাঁপা তা লক্ষ করে অপাঙ্গে নিজেকে দেখে। এইবার ধামসাবে। শায়া-ব্লাউজ-ব্রার দফারফা। জানা আছে সব। এ চলে যাবে। কিন্তু তার মুক্তি নেই। ও চলে গেলে পুনরায় প্রস্তুতি। অপেক্ষা। পড়ে আছে সারারাত, পণ্যমূল্যের অধিকমূল্য কে আর তাকে দেবে? এমনি রাতের পর রাত তাকে পণ্যমূল্যে নিজের দেহ বিকোতে হয়। পুরুষের কামাগ্নির ইন্ধন তার দেহ।

॥ দুই ॥

ময়লা কাদা এড়িয়ে যাতে প্যান্টের ক্রিজ বাঁচে দু' আঙুলের আওটায় প্যান্টের প্রান্ত উঁচু করে সিপাই ঢুকছে। হেলে দুলে। তার চলনে কিছুটা কর্তব্যের টান বেশীটা বেড়ানোর ভঙ্গী। ধু ধু দুপুরে নিঃশব্দ চিড় খায় গম্ভীর আওয়াজে।—কই গো সব সন্ধ্যারাণীর দল।

রানীরা কেউ সাড়া দেয় না। এগিয়ে আসে মালকিন। হৈ হৈ করে স্বাগত জানায়।— নমস্তে নমস্তে। বহুৎদিন পর পা পড়ল।

জবাব দেওয়া বাহুল্য বোধ করে সিপাই। তিনফুট উঁচু রোয়াকে থামের গায়ে একটা চেয়ার পাতা আছে। অনুরোধের পরোয়া না করে চেয়ারের গর্ভে নিজেকে সেঁটে দেয়। বন্দুকটা শুইয়ে রাখে মেঝেতে। মুখ ঝাঁকিয়ে খাটো গলায় বার্তা জানায়।— বড়বাবু তলব করেছে।

পরিচালিকার মনে উদ্বেগ আর রাগ যুগপৎ খেলা করে। পাথুরে মুখ কর্কশ হয়। রুক্ষ স্বর বাড়ায়-ফের তলব? তিনদিন কাবার হয় নি সব হিস্যা মিটিয়েছি।

সিপাই এই কূট বিবাদে ঢোকে না। ঠোঁটের ওপর ছড়িয়ে দেয় পাতলা হাসি। রহস্যবোধক। জানার ভান। জানি, বলব না। নিচু হয়ে কন্দুকটা তোলে। উঠি উঠি ভাব। অথচ ওঠে না। দ্বিধার পেছনে কি তাল পরিচালিকা আঁচ করে। দোকানদারি চায়।

ব্যস্ত হয়ে পরিচালিকা ঘরে-যায়। ফিরে আসে অধিক ব্যস্ততায়। থেলা মুঠিতে নগদ গুঁজে দেয়

বড়বাবুর তলব, না গিয়ে উপায় নেই। তাঁকে খুশি না রেখে এ পেশা চালান যায় না। পরিচালিকা সরল গতিতে প্রবেশ করে বড়বাবুর খাসকামরায়। বড়বাবু নাকের গর্ত থেকে লোম ছিঁড়তে মগ্ন। কয়েক মিনিট পর হাঁচির কারণে মাথা সামান্য বাঁক নিলে দৃষ্টিতে আসে পরিচালিকা। সাথে সাথে টেবিলে থাবা পড়ল। ধ্বনিত হোল হুঙ্কার।

—পড়তি বয়সে চাকরি খোয়াব, এ্যাঁ ?

পরিচালিকা অবিচলিত। কোম্পানির পোশাক পরা বাবুদের দৌরাত্ম্য গা-সওয়া।

—সময়ে না চললে সন্ধ্যাবাজার ভোগে যাবে। আই. জি অবধি কেসটা গড়িয়েছে।

পরিচালিকা নির্বিকার। চাল দিচ্ছে, তোলা আদায়ের ফিকির। খতরনক জাত। আইন বলবৎ করার ভয় দেখিয়ে টাকা খায়। টাকা খেয়ে আইনকে কলা দেখায়। গাছের খায়। তলার কুড়োয়। চেনা আছে সব। ইত্যবসরে সময় কিছুটা ক্ষয় হয়। বড়বাবুর প্রাথমিক উত্তেজনা থিতোয়।

—ইয়েস, আই রিমেম্বার। চাঁপা, চাঁপা নামে কেউ আছে ?

—আছে।

—হু ইজ দ্যাট রেন্ডি ? বড়বাবু খাপছাড়া গলাবাজী করেন।

পরিচালিকা বিকারহীন। এসবে অভ্যস্ত। বাগে পেলে চোট দেখাবে। তারা সইবে। প্রথা তাই। নীরব থেকে বড়বাবুর দাপট সে শোষণ করতে থাকে। কিন্তু সহিষ্ণুতা অবজ্ঞা হিসেবে গণ্য হয়, অন্তত বড়বাবুর হিসেবে। তিনি খাঁকিয়ে ওঠেন—হালের আমদানি ?

এবার অস্বস্তির পালা। পরিচালিকার। চাঁপাকে সে কোন সূত্রে মূর্ত করে। পরিচালিকা দ্বিধাগ্রস্ত।

—কি চুপ করে আছ কেন। নিশ্চয়ই স্লাম এরিয়ার কালেকশন। ডার্টি হেরিটেজ। বলো।

বারংবার তাড়া দেওয়ার পরিচালিকা মুখ খোলে। প্রথমে আকৃতি পরে প্রকৃতি এবং অবশেষে ঘটনা সূত্র ধরিয়ে স্মৃতি খোঁচায় এবার কাজ হয়। বড়বাবুর চোখে ফুটছে স্বীকৃতির চিহ্ন। ঠিক। স্মৃতির জটলা থেকে মেয়েটি ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে পটভূমি। ঘটনা রোমন্থনে বড়বাবু আচ্ছন্ন।

রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে রাউন্ড দিচ্ছে। অলসভাবে জিপ নিয়ে চক্কর দিতে দিতে ধূমপানের তাড়না জাগে। উন্মুক্ত পরিবেশে ধূমপান জমিয়ে উপভোগ করা প্রিয় অভ্যাস। ইচ্ছেপূরণ করতে তিনি জীপটা ধীরে ধীরে রাস্তায় ধার ঘেঁসে নিয়ে আসেন। থামিয়ে তড়াক করে ছোট্টলাফ দিয়ে মাটিতে বুট রাখেন। নিরিবিলি আলোছায়া। অন্ধকার পরিসর। মূত্রত্যাগের উপযোগী স্থান হিসেবে নির্বাচন করে একজন পুরুষ উদ্যোগ নিচ্ছে হালকা হতে, মানুষী সাড়ায় সচকিত হয়। ঘাড় ফেরায়। চমকে ওঠে—তুই ?

একই শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে—তুই ?

—ইয়েস দোস্ত। আমি অধম দিব্য।

—কতো বছর পর ?

দিব্য চোখ মোদে। হিসেব কষে। চোখ খোলে। বলে—তের বছর। ঠিক ?

—সেনপারসেন্ট কারেক্ট। সমীর অনুমোদন করে হিসেব।—তোর খবর কি ? প্রফেশন ?

—বিজনেস। একটা গ্রসারী। একটা হাসকিং মেশিন, তিন কাঠা জমির ওপর নার্সারী এই নিয়ে আছি।

—চমৎকার ধনধান্যে পুষ্পে ভরা।

—পুলিস লাইনে তোর উন্নতির আশা নেই। কাব্যিক মন টিকে আছে।

—আরে না-না এখন সাহিত্য প্রীতির হ্যাণ্ডওভার চলছে। সমীর সিগারেট বার করে। একটা বাড়িয়ে দেয়। নিজেরটা দাঁতে-ঠোঁটে। লাইটার জ্বালে। ছোট ছিমছাম লাইটার, একটু মেলতেই বিকিনিপরা সুন্দরী ঝিলিক দেয়।

দিব্য দৃশ্যটা নজর করে।—তোদের চাকরিটা বেশ না তৃপ্তি আছে। থ্রীল আছে।

—কী রকম। কৌতুহলে সমীর শিরা টান টান করে।

—পকেট শূন্য ? চলোরাউন্ডে। বেবীফুড চাই, হানা দাও দোকানে। বউ

বায়না ধরছে ফরেন পারফিউম চাই, চিরকুট চালান কারো গুপ্ত ঘাটিতে। ছেলেকে ভর্তি করতে হবে, ফোনে ফোনে ফাইনাল খেলায় টিকিট চাই, মুঠিতে হাজির। মন ভার? বসাও মাইফেল। ইচ্ছা পূরণের চাকরি।

দিব্যর চোখে লোভের ঝিলিক, কণ্ঠস্বর বিষন্নতায় ভেজা।—হ্যাঁরে, তোর দেখলে নাকি কত মজা-ফূর্তি। আমায় একটু প্রসাদ দিবি?

আকুলতা এবং আর্তি এমন খাঁটি যে সমীর আমূল নাড়া খায়। চিবুক ভারি হয়। ঝুলে পড়ে।

সমীর মুখ তোলে—চ. আহ্বান জানায় এবং ইসারা করে জীপের পেছনে উঠতে।

তিরতির করে জীপ এসে থামে ক্ষুদে পল্লীতে। বাড়ির মালকিন কাম পরিচালিকার সঙ্গে এসে বসে এজমালি ড্রয়িংরুমে। কিছুক্ষণ বাদে ঘরে এসে জড়ো হয় বাছাই তিন মেয়ে। তাদের প্যারেড করিয়ে পরিচালিকা সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে। বিনীত অপেক্ষা। পেশাদার আদব কায়দার মেয়ে তিনটি নিজেদের প্রদর্শন করছে। ভঙ্গিমা বিভিন্ন। আবেদন অভিন্ন। কে নিবি আমায়।

সমীর চোখ দিয়ে পরখ করে, জরিপ করে মনে মনে নম্বর বসাচ্ছে। স্বাস্থ্য রূপ বয়সের ওপর, আলাদা আলাদা এবং মোট নম্বর। ১ নং বাতিল। ২ নং চলে ৩ নং ভোগে নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে পূর্ণ উপযোগী।

এই হচ্ছে চাঁপা-গামীতার প্রেক্ষাপট। সমীর দীর্ঘ হাই তোলে।—আই সী। দ্যাট অ্যাকোমপ্লিজড লেডী।

দাঁতে দাঁত চেপে পরিচালিকা নিরুত্তর। বড়বাবু খোসা ছাড়াচ্ছেন, ভাবছেন, ভাঙ্গবেন।

—ওকে হঠাও। নইলে সন্ধ্যাবাজার ভোগে যাবে।

—সে কী! পরিচালিকা বিস্ময়ে সচকিত হয়ে ওঠে। দৃষ্টি বিস্ফারিত। আতঙ্ক জাগে, সন্ধ্যাবাজার যদি উৎখাত হয়। আতঙ্ক, চাঁপা যদি হাতছাড়া হয়। চাঁপা যে বাণিজ্যের ট্রাম্প কার্ড। মুখ বাড়িয়ে বড়বাবু বলেন,—মেয়েটার গুপ্ত রোগ হয়েছে।

পরিচালিকা ফোঁস করে,—কিস্‌সা। সব ঠিকাদার বাবুর কলকাঠি। খালি ঘুর ঘুর করে। আমায় পাঁচ হাজার দেবে বলে লোভ দেখাচ্ছে। পাত্তা দেইনি। পাড়া উঠিয়ে ফ্ল্যাট বানাবার ফন্দি। উত্তেজিত। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে। খানিক অপেক্ষা করে পুনরায় বলে,—শুরু হয়েছে আর এক নতুন উৎপাত। ওটাকা মস্তান

রোজ ঝামেলা পাকাচ্ছে। পটকা-বোমবাজি চলছে। ঠিক সন্ধ্যে থেকে। ব্যবসা লাটে ওঠার যোগাড়।

বড়বাবু অংকটা জানেন। বাড়িওলা + প্রমোটার = বহুতল প্রাসাদ। সুস্থ পরিবেশ নাগরিক পবিত্রতা সব অজুহাত, স্পর্শকাতর ইস্যু দিয়ে, ভাড়াটে গুন্ডা লেলিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি আসলে সন্ধ্যাবাজার তছনছ করার প্রথম ধাপ। মালহোত্রার কৌশল। নেপথ্যে বড় মাথা কাজ করছে পরে আসবে বড় আক্রমণ, উচ্ছেদ রদ করা যাবে না, পুঁজির জোর জিতবে, জিতুক, আসলে তো গণিকারা ব্যবসায়ীর চৌবাচ্চায় জীয়ান এক ঝাঁক কৈ। বাণিজ্যের সেবায় ঝাঁকটা ছত্রভঙ্গ হবে, তাতে তার কিছু এসে যায় না, কিন্তু এই তালুকের সেও একজন খুদে প্রভু। তাকে ডার্কে রাখা হচ্ছে। আক্ষেপ ক্ষোভ এখানে। বুটে বুটে ঘর্ষণে রাগ ফেটে পড়ে। মুখে কিছু ভাঙে না। বলেন-যুগটা ধরা করার, এম. এল. এ, কাউন্সিলর, পার্টির দাদাদের সঙ্গে লাইন করো, হত্যে দাও। এছাড়া রাস্তা নেই আর। বলে কব্জিতে চোখ রাখেন। বিদেয় হতে ভদ্র ইঙ্গিত, পরিচালিকা উঠে দাঁড়ায়। কথার জের টেনে বড়বাবু বলেন,—আর ডাক্তার দিয়ে যাচাই করো চাঁপার গুপ্ত রোগ হয়েছে কি না।

ডাক্তার এসেছে। উপসর্গ খুঁটিয়ে দেখে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রায় দিলেন। সিফিলিস। মেয়াদী রোগ। চিকিৎসা চালালে সারবে। জীবিকা থেকে ছুটি নিতে হবে আপাতত।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরিচালিকা রায় দেয়,—সাতদিন সময় দিলাম, এর মধ্যে নিজের পথ নিজে দেখে নে। আর যা যা বলল তা অনেক রাগ-ক্ষোভ-বিরক্তি সব মিশিয়ে খিস্তির বিলাপ। যার মোদ্দা অর্থ সন্ধ্যাবাজার ফুটে ওঠার প্রস্তুতি পর্ব থেকে বন্ধ ঘরে অন্তরীণ। মেয়াদ অন্তে আর ঠাঁই নেই।

—চাঁপার গণেশ ওলটাল। যতদিন গতর ততদিন আদর। ভাল্লাগে না। বিন্দা হাই তুলতে তুলতে গজেন্দ্রগামিনী।

টানা বারান্দার এক সেকেলে থামে ঠেস দিয়ে বসে আছে চাঁপা। ভাঁজ করা হাতের তালুতে থুতনি। চারপাশে অক্ষর বাক্য এবং শব্দসমূহ ডানা ঝাপটাচ্ছে। শব্দসমূহের সংলগ্নতা কোনরূপ সৃষ্টিতে অপারগ, অন্তত চাঁপার কাছে। বরং থরে থরে শব্দ তাকে দান করেছে অদ্ভুত বধিরতা।

চাঁপা, তুমি কি নিঃসঙ্গ বোধ করছো। স্বাভাবিক। পুরুষ সমাজ গোটা মানব সমাজের প্রতিভূ হয়ে তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। রজনীতে রজনীতে

তোমার গৃহাঙ্গনে লীলায়িত হয়েছে অপূর্ব জাতীয় সংহতি। পদমর্যাদায় ধর্মে ভাষায় বয়সে আসমান জমিন ফারাক। কিন্তু তাদের প্রতি তোমার ছিল বিস্ময়কর সাম্য ব্যবহার। যৌবনকে নীলাম করেছ ঘাটে ঘাটে। যারা এসেছে—অর্থ খরচ করে সুখ লুণ্ঠন করতে, তাদেরই কেউ তোমার রক্তের অভ্যন্তরে বুনে দিয়ে গেছে সংক্রামক ব্যাধির বীজ। জাগ্রত হচ্ছে কারো প্রতি ঘৃণা? জাগছে কি প্রতিশোধ স্পৃহা? না। বিশেষ কোন বোধ নয়। এক অদ্ভুত শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে।

চাঁপার চারপাশে জড়ো হয়েছে সহকর্মীরা। মেয়েরা, যাদের মন হিংসুকে, প্রবৃত্তি স্বার্থপর, চেতনা উদর সর্বস্ব, তারাও মনের আড়াআড়ি ভুলে যায়। চাঁপা আর তাদের কাছে নিছক ব্যক্তি-নারী নয়। রেণ্ডি টুলির সমগ্র নারী সমাজের প্রতিভূ। তার মধ্য দিয়ে তারা প্রত্যক্ষ করছে আপন-আপন ভয়ংকর ভবিষ্যত।

চাঁপার দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন। তাকে ঘিরে আছে অনেক মেয়ে। চাঁপা মুখ তোলা মাত্র নাক ও গালের অববাহিকা বেয়ে চিবুকে এসে টলটল করে বড় বড় ফোঁটা। অশ্রু বড় সংক্রামক। সাথে সাথে অনেক আঁচল উঠে আসে চোখে। থমথমে মুখ, কিন্তু চকিতে চোখে চোখে কথা হয়ে যায়। তারা দলবদ্ধভাবে এসে ঘেরাও করে পরিচালিকাকে। তোড়ে কথা বলতে শুরু করে। একে একে নয়। এক সঙ্গে। কথার উৎস শুধু মুখ নয়। জিভ আর ঠোঁটের কসরৎ নয়। সর্ব অঙ্গ। হাত-মাথা-পা ছটফট করে। শরীরী ঝাপটা আর এলোপাথারি বাক্য বর্ষণে তুমুল হট্টগোল।

—এ তোমার কেমন বিচার গো মাসি।

—শরীর থাকলে অসুখ থাকবে। দেহ তো নাট বল্টু নয়। তাই বলে শরীরটা ফেলে দেয় কেউ।

—হাড়মাস কালি করে খাটছি। আমরাও ভাত কাপড়ে আছি তোমারও সোনাদানা হচ্ছে। বেইমানী ধম্মে সইবে না।

—চাঁপা চাঁপা করে দিন নেই রাত নেই হেদিয়ে মরো, যেই ওকে দিয়ে নাফা হবে না অমনি পা-পোষ। ভগবান সইবে না মাসি।

—তোমার যে এত রমরমা মূলে তো চাঁপা। একটু দয়ামায়া নেই। সব খুইয়েছ!

অভিযোগ—আবদার—দাবী ইত্যাদি কলরবে বাতাস ভারি। পরিচালিকা বিব্রত। রাগী। সেও ছাড়বার পাত্রী নয়। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি—

—আমি দানছত্র খুলে বসিনি। কড়ি ফেলে তেল মাথার নিয়ম। হায় খতর-খাকী। একবার যদি পাড়ার বদনাম হয় কেউ তোদের ছুঁতে আসবে না। সবকটা না খেয়ে পচবি, তখন যাবি কোন্ চুলায়।

ভয় কোন কাজ দেয় না। কলকল করে ওঠে জমায়েত।—সে পরে ভাবব। এখন আমাদের সঙ্গে চাঁপাও থাকবে তোমার চুলোয়।

—রস কত। ঢং দেখে বাঁচি না। লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো।

অর্থাৎ কথায় কাজ হবে না। বাঁকা আঙুলে ঘি তুলতে হবে। যেমন এসেছিল একসঙ্গে, আলোচনা ভেঙে যেতে দলবদ্ধ ভাবে স্থান ত্যাগ করে।

প্রবেশের মূল দরজার গায়ে টুলের ওপর বসে থাকে সন্ধ্যে থেকে রাতভোর গুঁফো প্রহরী। তার হাতে আড়াআড়ি, লম্বমান থাকে লোহার ফলা বাঁধান তেল চকচকে বাঁশ। কোন মিটিং হয় নি। কোন প্রস্তাব পেশ হয় নি। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। অথচ কখন কি ভাবে যেন বোঝাপড়া হয়ে যায়। প্রস্তুত হয় পরিকল্পনা। প্রহরী ভেতরে ঢুকে ফটক বন্ধ করে। যেখানে যত দরজা এবং জানালা ছিল, ছিল অবারিত। ক্ষিপ্রহাতে পটপট করে কটি বিদ্যুৎ পয়েন্ট অফ্ করে দেওয়া হয়। আজ আর সন্ধ্যাবাজারের চাকা ঘুরবে না। আঁধার অধ্যায়ের নায়িকারা আজ আর রসের যোগান দেবে না। এরপর গাঢ় আঁধারের পটভূমিকায় পাতা সতরঞ্চি এবং তেরপালের ওপর খোল করতাল হারমোনিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বসে যায় কীর্তনের আসর। একজন মেয়ে পড়ে নেই যে দেওয়ালের ঘেরটোপ ছেড়ে উঠনের মঞ্চে অনুপস্থিত।

একটি লাইন গেয়ে গায়েন থামে। বিরতি দেয়। বিরতি ছিন্ন হয় সেই লাইনটির জোটবদ্ধ ধুয়োয়। বাদ্যযন্ত্রের বায়েনদের হাত প্রচণ্ড দাপটে ঘন ঘন আছড়ায়। তালে তালে সভার মাথা দুলছে। যন্ত্র এবং কণ্ঠ উৎপাদিত সর-ধ্বনি ক্লান্তিহীন, বাতাসে তাণ্ডব বইছে। পর পর তিন দিন সন্ধ্যাবাজারের ঝাঁপ বন্ধ। শেষ পর্যন্ত ফল ফলল। পরিচালিকা চুক্তিতে আসে। আপোস হয়। যতদিন চাঁপা সুস্থ না হয় এখানেই থাকবে। সুস্থ হলে এখান থেকে শরীর বেচবে। চিকিৎসার দায়-দায়িত্ব চাঁপার নিজস্ব। পুঁজি ভাঙিয়ে বেকার দিনগুলোর দায় বহন করতে হবে।

॥ তিন ॥

বছর পার হয়েছে। অনেক কিছু ঘটে গেছে পৃথিবীতে। যুদ্ধ হয়েছে, দাঙ্গা হয়েছে। সরকার অদল-বদল—কত কি হয়েছে। চারদিকে মৃত্যু ধ্বংস পতন ও গঠনের প্রক্রিয়া। কিন্তু সন্ধ্যাবাজার নির্বিকার। সন্ধ্যা হলেই সাজ সাজ রব, উন্মামতা, বেশ্যারা তাদের ধর্মে অনড়। তারা উত্তেজিত শুধু একটা খবরে। সন্ধ্যাবাজার উচ্ছেদ পাকাপাকির দিকে। তার মানে, মহা বিপদ। শুকিয়ে মরতে হবে। এ তারা মেনে নিতে পারে না। যেভাবে হোক সন্ধ্যা-বাজার চালু রাখা চাই। এবার তাগিদ শুধু মেয়েদের দিক থেকে নয়। পরিচালিকা ও সহযোগী। দিনরাত শলা-পরামর্শ হচ্ছে। রীতিমত ভাবগম্ভীর পরিবেশ। কঠিন মুখ তারই নিদর্শন। সমস্যা নিরসনের জন্য পথের সন্ধান চলছে। রাতের বাবুদের একজন তাদের পথ দেখায়। স্থানীয় এম-এল-একে ধর। ইচ্ছা করলে তিনিই পারেন বাঁচাতে। মেয়েদের সভায় একটি মেয়ে প্রস্তাবটা রাখতেই সবাই আশান্বিত হয়ে ওঠে। এখন বড় সমস্যা, কেমন করে তাঁকে ধরা? যদিও ইলেকশানের সময় এই এম-এল-একে তারা দেখেছে। তাঁর দলের কর্মীরা পাড়ায় এসে অনেক ভাল-ভাল কথা বলেছে, তাদের জন্য অনেক কিছু করার ভরসা দিয়ে ভোট চেয়েছে।

পরিচালিকা বলে,—যদি ঘেঁসতে না দেয়।

—তাহলে মিছিল হবে। ধর্ণা দেবু।

ময়না কথা বলে। যেটুকু বলে তার শতগুণ হাত-মুখ-পা ছোঁড়ে। অনেকক্ষণ তা সহ্য করার-পর বোঝা গেল ও বলছে,—হ্যাঁ, পায়ে পা বাড়িয়ে ঝগড়া নয়। কোঁদল নয়। নেকাপড়া জানা মান্য লোক। এয়ে বলে কতা। মুখ খারাপ করলে চলবে নি। আমাদের হয়ে কে কতা কইবে? সমস্যা বটে। যুক্তি আছে। সকলে বেশ ভাবিত। প্রমাণ নীরবতা।

জবা বাজার দরে চাঁপার ঠিক পরের ধাপ। অহরহ ঈর্ষায় জর্জরিত। সে প্রস্তাব রাখে,—চাঁপা নেতা হোক কেন? ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়।—চলনে বলনে ভদ্র ছাঁদ আছে। ওর জানাশোনা অনেক। চটক আছে। ভদ্রবাবুরা ওর কাছে ঘেঁষে বেশী।

সমাবেশ লুফে নেয়, সকলে খলবল করে,—হ্যাঁ হ্যাঁ চাঁপা লিডার।

রত্না খিলখিল করে,—জোর কেলো হবে।

কথা আর কাজে ফাঁক নেই। তর সইছে না। ডেকে আনা হল পুরোহিতকে।

পাঁজি ঘাঁটাঘাঁটি করে তিনি নিদান দেন শুক্রবার দিবসে ৮ ঘটিকা থেকে শুভক্ষণ সূত্রপাত, মেয়াদ ১১ ঘটিকা অবধি।

খোঁজ চলল-এম-এল-এ-কে কখন পাওয়া যায়। কোথায়। কিভাবে। খোঁজ মিলল। এম.-এল.-এ সকালে নিজ বাসায় আমদরবার বসান। প্রত্যহ। সাক্ষাৎ অবারিত।

কেউ পরামর্শ দেয় নি। কোন আলোচনা হয় নি। কোন অভিজ্ঞতা নেই। চাঁপার সহজাত উপলব্ধি যে মুখে রঙ মাখা অচল। আলতো করে পাউডার বোলাল মুখে—গলায়-ঘাড়ে। উদ্ধত খোঁপা বেমানান। অতএব আঙুলের পাকে পাকে নির্মাণ হয়ে যায় এক বেণী। ক্যাটক্যাটে শাড়ী বরখাস্ত। এখানেই থমকে যায়। পড়ে গূঢ় সমস্যায়। মজুত শাড়ীর সংখ্যা প্রতুল। কিন্তু সবই চোখ ধাঁধানো। বড় বেশী উজ্জ্বল। রাত্রির প্রমোদ বাসরে উগ্রতার জয়জয়কার। তন্ন তন্ন করে খোঁজে। একটা বাছাই করে। কোটা। সবুজ জমিতে হলুদ বুটির সমারোহ। যেন সবুজ দিগন্তে ফুটন্ত সর্ষে ফুল। চলবে। ধীরে সুস্থে গায়ে জড়াল। অনেক চিন্তা অনেক শ্রম অনেক সময় ব্যয় করে প্রসাধনে পোশাকে আটপৌরে ভাব আনে। ঘরোয়া এবং গৃহস্থ আদল। নবরূপ। সবুজ বিস্তার করেছে স্নিগ্ধতা। হলুদে দীপ্তির উদ্ভাস চোখ টানে অথচ কড়্‌কড়্‌ করে না। আয়নায় পাক খেয়ে চাঁপা নিজেকে পরখ করে। বেশ লাগে। মজা। মজা পায়। একটা পান মুখে পুরতে গিয়ে পুরল না। পাতলা হিলের চপ্পল, নিজের শয় জবারটা পায়ে গলিয়ে গলা ছাড়ে। হৈ হৈ করে মেয়েরা জড়ো হয়।

—ও মা এ যে লক্ষ্মী ঠাকুরুণ গো। একদম ভাসানের পিতিমে।

সকলে ঘন হয়ে আসে। একজন হঠাৎ আঁচলটা টেনে দেয় মাথায়। বধূবরণ ভঙ্গিতে মুখটা উঁচিয়ে নিরীক্ষণ করে। হাততালি দেয়—মাইরি কুলের বধূ।

॥ চার ॥

সুবোধকান্তর আমদরবার সবে ফুটেছে। তার সকালটা প্রার্থীদের। প্রার্থীরা সোজাসুজি আসে। প্রার্থনা জানায়, কিছু পূরণ হয়, বেশির ভাগ বার বার ঝালাই হয়। ব্যক্তিমানুষ সোজাসুজি তার কাছে অকপট হতে পারে। তিনি ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন। সমাজের চেহারা। লাভের দিক, তৃপ্তির দিক ও বটে। তা ছাড়া স্বার্থও আছে। মানুষের প্রার্থনাই তাঁর স্থিতি ও বিকাশের পুঁজি।

প্রসন্ন উপহার, দু-তিন জনের সঙ্গে কথা সেরে মেয়েটির দিকে নজর দেন। ব্যস্ত হয়ে বলেন,—বসুন।

চাঁপা বসে না। আঁচলে দাঁত কাটে। সংকোচ দেখে সুবোধকান্ত কৌতুক বোধ করেন। সেই তো থোড় বড়ি খাড়া। ছেলে ভর্তি, সিউ লোন, পারমিট আদায়। ইনস্ট্রুমেন্ট অব প্যাম্পিং মানি। জানা আছে সব। মেয়েটি বসে না। কিছু বলে না। অস্বস্তি—বিরক্তি উৎপাদক প্রতীক্ষা।

সুবোধকান্ত ক্রমশ অসহিষ্ণু। সময়ের দাম আছে।—কে পাঠিয়েছে আপনাকে। কোথায় থাকেন? কোন কাজ হয় না।

সুবোধকান্ত এবার ধাতান। —বলুন কি চান। বাড়ি কোথায় আপনার?

কাজ হয়। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাঁপা বলে। —সন্ধ্যাবাজার।

তড়িতাহত। রি রি করে গা। সুবোধকান্তর মাথা পেছনে হেলে পড়ে।

—বাবু আমাদের কি হবে?

চিরায়ত প্রশ্ন। চিরকালীন সমস্যা। ক্রাইসিস মুহূর্ত। চোখ ছিটকে যায় দেওয়ালের ওপর অংশে। রাজনৈতিক পুরুষকার ফ্রেমেবন্দী হয়ে দেওয়াল সংলগ্ন। ফ্রম এঙ্গেলস টু স্তালিন। তাঁর প্রেরণার উৎস। কে হতে পারে এই মুহূর্তের সহায়। নিকটতম দিয়ে শুরু করা যাক। স্তালিন? সুবোধকান্তর মাথা দুপাশে হেলে যায়। না, সুবিধে হবে না। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, শোক-তাপ, বৈচিত্র্যময় অনুভব, অন্তর্জগতের রহস্য এ সব বিষয় নিয়ে স্তালিন মাথা ঘামান নি। এই সব বিষয় নিয়ে চিন্তা তাঁর কাছে বিলাস। বাহুল্য। তত্ত্বের শব বহন করা তাঁর ধাতে নেই।

আসা যাক লেনিনে। কথিত আছে বিপ্লবের অব্যাহিত পরে ১৯২০ সালের শেষ পদে সোভিয়েত সমাজ থেকে দেহগত বাণিজ্য প্রথা খতম তালিকায়। ঝাড়ে বংশে উৎখাত। অবশ্যই যাদু বলে নয়। লেনিনের দরদীমন উৎকৃষ্ট সংগঠন প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু কোন কর্মসূচী কি পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কলঙ্কময় অধ্যায়ের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে জানতে কৌতূহল হয়। বিবরণ ব্লু প্রিন্ট নিশ্চয়ই পুঁথিতে মুদ্রিত আছে। সুবোধকান্ত প্রত্যাশা-ভরা দৃষ্টি সার সার আলমারিতে প্রসারিত করেন। স্মৃতিতে কিছুই ফুটে ওঠে না। বিপুল রচনাবলীর গহ্বর অক্ষর-বাক্য সমুদ্রের ভেতর থেকে সেই নক্সা মন্থন করে আনা আবিষ্কার তুল্য।

নেতা চিন্তিত। সাথে সাথে দরবার কক্ষে মেঘ ঘনায়। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা

সংগীতের গাম্ভীর্যে থমথম করে ঘর। নেতার মনন দীর্ঘ হতে অবকাশ পায়। মার্কসে নিশ্চিত দিশা মিলবে কারণ তাঁর সমগ্র চৈতন্য জুড়ে ক্লিষ্ট মানুষের ছায়া, তাঁর কাছে পৃথিবী যেন নিছক ভুখা মানুষের হাহাকারে অস্তিত্বময়। ক্ষুধাই হচ্ছে নিরঙ্কুশ সত্য। ভজন-পূজন গ্রন্থাদিতে কিছু দেখা যায় না। শোন শোন সাধুগণ, সব কিছুই দেখা যায় রুটিতে। কবিতার ভাষায়ঃ

না কুছ দেখা ভাব ভজন মে
না কুছ দেখা পোথিমে
কহে কবীর শুনো ভাই সন্তে
জো দেখা সো রোটিমে।

দরিদ্র মানুষ সম্পর্কে এই প্যাশন আর কোন দার্শনিকের? অতএব ভরসা মার্কস। সুবোধকান্তর দৃষ্টির আলোকসম্পাতে মার্কস স্থির। মগজে অন্তত এ বিষয়ে কিছুই প্রতিফলিত হচ্ছে না। মার্কসচর্চায় কোন দিশা নেই। পড়ে আছে এঙ্গেলস। অঙ্ক এবং এঙ্গেলস দুই তাঁর কাছে সমার্থক। কষ্কে পাওয়া দুষ্কর। সংখ্যা তত্ত্বের গোলক ধাঁধা এবং দর্শন কণ্টকিত অরণ্যভূমিতে অসহায়। থৈ পায় না। ভীতিপ্রদ এলাকা। নিভৃত দুর্বলতা।

ঘাত প্রতিঘাতের নিদারুণ বিভাজনে সুবোধকান্ত পাথরবৎ। কি গেরো। সদর দরজা দিয়ে হন হন করে ঢুকে গেল মেয়েটা। এতো স্পর্ধা আসে কি করে এঁটো মেয়ের। উত্তেজনায় ভেতরটা গরগর করে। চোখের ওপর ভেসে বেড়ায় সর্বব্যাপী পাপ ও বিশৃঙ্খলার ছায়া। লোকাল ইউনিটগুলো হয়েছে ধান্দাবাজি আর কেচ্ছার আখড়া। কোন সিস্টেম নেই। প্রসেসের ধার ধারে না। নইলে গৃহস্থ বাড়ির অন্দরে ঢুকে পড়তে সাহস পায় একটা বেশ্যা। পাবলিক কি ভাবে নেবে। ছিঃ। জমাট রাগ গিয়ে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অপেক্ষমান কর্মীদের প্রতি। যত সব থার্ড গ্রেড ক্যাডার। রদ্দিমাল।

নিস্তব্ধতা ছিন্ন হয়। চাঁপা বলে ওঠে,—আপনি কথা দিয়েছেন।

—কি কথা?

—আমাদের উদ্ধার করবেন। ইজ্জত দেবেন।

সুবোধকান্ত চমকিত। মজা পায়। বলে কি? এ যে গোড়া ধরে নাড়া দেয়। কত কথা বলতে হয়। ময়দানে জনারণ্যে। সফরে সফরে কথা আউড়ে কেটে গেল দীর্ঘবেলা। তো কি! যদি কথা কারো ব্যক্তিত্বে দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চার করে থাকে তিনি নিরুপায়। ওভার ডোজড্‌। তত্ত্বানুসন্ধান আর তত্ত্বের প্রত্যক্ষ

প্রয়োগে যে অভিন্নতা তাই মার্কসীয় অভিজ্ঞানতত্ত্ব। সম্ভোগবাদের যুগে এই ঘোষণা কি তেমন প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে আছে ? যদি তাই হয় তাহলে তিনি কি ? প্রশ্ন প্রশ্ন টানে। বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় চিন্তাকোষে। সর্বাঙ্গে লেপটে আছে শাসনের ঘাম। শাসক সত্তায় জনরুচি প্রশ্রয় পাবে না,—হয় ? না কমরেড মার্কস। তত্ত্বের মোহ নিয়ে ক্ষমতার রাজনীতি করা যায় না। ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে যত বিশ্বাসের ভগ্নস্তূপ। তোমার দোষ নেই গুরু। প্রযুক্তির ভয়াবহ স্বরূপ তুমি প্রত্যক্ষ করনি। তুমি প্রত্যক্ষ করনি ভোগবাদের ভয়ংকর প্রভাব। পন্যমোহবন্ধতার প্রকৃত রূপ। বর্তমান প্রজন্ম নিত্য নতুন ভোগ্যপন্যের বিরলে অপরিতৃপ্ত। মালিক থেকে শ্রমিক এক রা। শ্রেণী বিভাজন একাকার।

ফেড আপ, আদর্শবাদ কোন সহায় হতে অপারগ।

চোখ পাশ ফেরাতে চাঁপার সঙ্গে চোখাচোখি। চেয়ে আছে। সুবোধকান্তর ভেতরটা পুড়তে থাকে। জীবনটা যখন নিরাপত্তার আবাসে অটুল তখন জবাব-দিহি ? ইয়ার্কি। তাও একটা খানকির কাছে ? অনেক পাত্তা পেয়েছে। আর নয়।— ক্রোধে ফেটে পড়তে গিয়েও সংযত হয়। ক্রোধ প্রকাশ পায় না। বিপুল বিক্রমে বিস্ময় ঝড়ে পড়ে—এখানে এলি কোন আক্কেলে। পার্টি অফিস খোলা থাকে। সেখানে যা। ভাসাভাসা দৃষ্টির অভিব্যক্তি ছাড়া চাঁপার আর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তিনি প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করেন। কৈফিয়ত সুরে—আশ্চর্য। সাহস কোথা থেকে পেলি।

কল্পলোকে ঘা পড়ছে। শোক এবং বিস্ময় চাঁপার চৈতন্যে যুগপৎ কেলি করে। পায়ের নীচে ভূলোক কেঁপে ওঠে, অসহায়ত্বে ছাড়ুখাড় হচ্ছে মনোভূমি। বড় বিস্ময় লাগে, এত বড় মানুষটা ভুলে যাচ্ছে। তার সাহসের উৎস তিনি স্বয়ং। তার প্রদত্ত শক্তি তিনি নিজেই ছিনতাই করে নিচ্ছেন। বেইমান। নাকি আপন-ভোলা।

"রাজা কহিলেন, এ উত্তম কল্প ; কই, কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও।"

চাঁপার হাতে কোন স্মারক চিহ্ন নেই। যা প্রদান করলে বিস্মরণ মোচন হয়। তার সম্বল স্মৃতি।

রাজীব মারা যাওয়ার ঠিক পরে যে ভোটহয় সেই ভোটের সময় এক লক্ষ্মীবারে মিটিং ডেকেছিল লাল পার্টি। সন্ধ্যাবাজার আর গৃহস্থ পল্লীর সন্ধিস্থলে। জন-সমাবেশের দিকটা মাথায় রেখে খিচুড়ি এলাকা বাছা হয়েছে। আসল ঝোঁক সন্ধ্যাবাজারের ভোটার। জোটবদ্ধ হয়ে চাঁপাও মিটিংয়ে হাজির।

—দেহপসারিনীরা আমাদের মা-বোন। তাঁদের ঘৃন্য জীবনের জন্য দায়ী সমাজ। এ আমার তোমার সকলের পাপ ; সিসটেম সিসটেমের প্রয়োজনে নোংরাপ্রথা সৃষ্টি করেছে। বাঁচিয়ে রাখছে। এই প্রথা সভ্যতার অভিশাপ। মানুষের হাতে মানুষের কুৎসিত নিগ্রহ মনুষ্যত্বের পরাজয়। আমরা যে সমাজ গড়ব সেই সমাজে দেহ ব্যবসার প্রয়োজন নেই। যে সব দেশে লালপার্টি শাসন চলছে সে সব দেশে এই প্রথা চিরতরে খতম। একবিংশ শতাব্দী কড়া নাড়ছে। অমরা বয়ে বেড়াচ্ছি আদিমতার বোঝা। সমাজের এই গ্লানি দূর না করলে সামাজিক অগ্রগতি মানবমুক্তি সম্ভব নয়। ইত্যাদি কত কথা। ভাষা ভঙ্গি পরদেশী। চাঁপা সে সব বোঝে না। কিছু কিছু বোঝে। এটা বোঝে বক্তা তাদের কথা বলছে। তাদের হয়ে বলছে। এক সুন্দর জীবনের ছবি হাত-ছানি দিচ্ছে। বক্তার কণ্ঠস্বরে আন্থা মমতা বেদনা ঝরছে। আন্তরিকতা ভেতরটা কাঁপিয়ে দেয়। মনে হয় না ভুজুং ভাজুং। বিশ্বাস করতে সাধ হয়। চাঁপা মুগ্ধ। বক্তা ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেই শান্ত নন, উপরন্তু আহ্বান জানাচ্ছেন। আহ্বানে সাড়া দিলে ফল এক তরফা নয়। তিনি প্রদান করছেন যাজক-সদৃশ বরাভয়।

—খুব গরম খাওয়াচ্ছে। সভাস্থলেই ফোড়ন কাটে বিন্দা।

কিন্তু চাঁপা আজ অন্য চাঁপা। সে সংক্রামিত। অনুপ্রাণিত। ভাষণ উপাদান মাত্র। চাঁপার মনোজগত তোলপাড় হচ্ছিল অনেকদিন ধরে। সে এখন আর অতীতের প্রতিফলন নয়। আত্মোপলব্ধির যন্ত্রণাময় অনুভবের শিকার। এক অদ্ভুত অনুভূতি। সত্তার স্বরূপ আবিস্কার। ঈদৃশ বোধের তাড়নায় চৈতন্য ছিন্নভিন্ন। বড় কষ্টের অনুভব। মোহের অনুভব। সৃজনশীলতার অনুভব। বন্ধন-মুক্তির প্রক্রিয়া।

আবেশ উচ্ছাসে চাঁপা স্বপ্নময়। অভিভূত। প্রার্থনা-বিধুর পবিত্র আলোয় ছেয়ে যাচ্ছে মুখ। ওর দিকে তাকালে মনে হয় ওর প্রার্থনার মত সত্য মহা-পৃথিবীতে আর কিছু নয়। আজও ওর মনে ঘাপটি মেরে বসে আছে এক দুর্বল স্নিগ্ধ আনাড়ী মেয়ে, যে কিনা সংসার কামনায় ব্যাকুল হৃদয়াবেগে মথিত হয়। লাল পার্টির কথাগুলো সুন্দর। দরদে ভরা। ঘোর ঘোর। বহু ভুয়োদর্শনে অভিজ্ঞ চাঁপা মজলো। চাঁপা কামনা করে এমন সুযোগ কি আসবে—কোনদিন ?

অনেক প্রস্তুতির পরিণাম আজকের অভিসার। বাধা যত রোখ চাপে তত।

সুবোধকান্তর চরণে গড় হতে মাথা নোয়ায়। উন্মুল হয়। পুষ্পিত অর্ঘ্যের মত লুটায়। বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনে বন্দী করে পদযুগল।

—আঃ কি হচ্ছে। পা ছাড়। আস্থা যত কমে মেজাজ তত চড়ে।

আবেদন কোন ফল প্রসব করে না। বন্ধন দৃঢ় হয়। সুবোধকান্ত পা ঝাপটায়। পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি হয় মাত্র। মন দোলাচল। এই কঠিন, এই দ্রব, কঠিনের থেকে কোমলের পাল্লা ভারি হতে হতেও পালাবদল। রেডি। শুধু এই পরিচয় তার মনের ওপর রুচির ওপর যে প্রাচীর তুলে দিচ্ছে তাতে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় সরব আবেদন। নির্বাক আর্তি। বিশেষ পারিবারিক পরিমন্ডলে বিবমিষা জাগে, বরং অবর সংস্পর্শ সহনীয়। চাঁপা পড়ে আছে। সাষ্টাঙ্গে। বলির পাঁঠার মত।

ধৈর্য গলছে। যে বিখ্যাত ধমকের চোটে ক্যাডাররা দুর্বল, প্রার্থীরা কাপড়ে চোপড়ে হয়, তা প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন। পরক্ষণে হিসেবী মনের প্রবল প্রভাবে উদ্যোগ মার খায়। পরিবেশ-সতর্ক হয়ে ওঠেন তিনি। আমদরবার পূর্ণ ফুটছে। "দাদা নমস্কার"। "মাইনরিটি সরকার টিকবে?" "দিল্লীর খবর কি!" "পশ্চিমবঙ্গে রাম জন্মভূমি ইসু ঠাঁই পাবে না।" "বাড়ীর খবর ভা-লো?" "জাপান ডেলিগেশনে আছেন তো।" নানান সম্ভাষণে নানান জিজ্ঞাসায় ভীড় বাড়ছে। বেলা বাড়ছে। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে গড়ে তোলা ইমেজের বারটা বাজতে দেওয়া মূর্খামী।

সুতরাং মেয়েটি লাই পায়।

লোকাল কমিটির সম্পাদক অসীম প্রমাদ গণে। যুবক হলেও ঘুঘু। নেতার মুড্ চেনে। বুঝতে পারে। সুবোধকান্ত ফিরে যাচ্ছেন ভাবরাজ্যে। এবার প্রশ্রয় পাবে আবেগ। কড়া হাতে ট্যাক্‌ল করা দরকার।

যেমনটি দেখা যায় জনসভায়; বক্তা ভাষণদানে রত। মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য নেতারা এই ফাঁকে ঝুঁকে ঝুঁকে নিজেদের মধ্যে কথা-চালাচালি করে। অসীম অনুরূপ মুদ্রায় সুবোধকান্তর কানের কাছে নিয়ে আসে মুখ। দু মাথা এক হয়। অসীম ফিসফিস করে। —চট জলদি কোন মন্তব্য নয়। নো প্রমিস। অ্যাটি-মেট্রিক বেস ইউনিটকে ফেস করতে হয়। তাছাড়া মালহোত্রা ইতিমধ্যে প্রোজেক্টে হাত দিয়েছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ে লোকাল কমিটির থ্রি পয়েন্ট পোগ্রাম। টুলি উচ্ছেদ ফার্স্ট এজেন্ডা। কেঁচে গণ্ডুষ না হয়।

মন্ত্রপূত বানী। চকিতে আবেগ প্রবাসে। সামনে নির্বাচন। বেস্-ইউনিট

চটলে আখেরে লোকসান। তর সয় না। মহূর্তে যথাযথ নেতা। অশ্রুসিক্ত ব্রাহ্মণ্য পাদুকা জোরে ঝাপটায়। নো এফেক্ট। বিড়ম্বনার একশেষ। না, অনেক হয়েছে। আর নয়। রগড়ে দিতে হবে। সুবোধকান্ত চোখ খেলান। ওৎ পেতে ছিল হরিধন। হাতের কাজে দক্ষ। ছোঁ মেরে কেস টেক-আপ করে।

বাগে আনার কসরৎ হিসেবে প্রথম ধাপ অধোমুখি চাঁপার পিঠভাস চুল মুঠিতে খামচে ধরে। দ্বিতীয় ধাপ ঃ হ্যাচকা টানে খাড়া করতে চায়।

তৃতীয় ধাপ ঃ বাতাস কাঁপান ধমক ;—ওঠ্ খান্‌কি। অনেক নকসা হয়েছে।

চাঁপা ওঠে না। টাল খেয়ে টলে পড়তে পড়তে হাতের তালুতে ভর দিয়ে সামলায়। তার বাঁকা চোখে নিরতিশয় চমক। টানাটানির ধাক্কায় নারীমুখ, উর্ধ্বমুখী, তির্যক, না প্রসাধিত মুখের কাটা কাটা নাক-চোখ-ঠোঁট-গ্রীবার মৌলিক আদল ঝলসিত। বাঁকা চাঁদের ঝলক। বিস্ময়-আকুলতা-হতাশা-আর্তি ইত্যাদির সমীকরণে সংজ্ঞাহীন বিহ্বল দৃষ্টি।

আমদরবার খুদে জনসভার চেহারা নিয়েছে। সুবোধকান্ত দ্রুত সিদ্ধান্তে চেষ্টা করেন। বাস্তবানুগ হতে হবে, নইলে বিপুল খেসারত। তিনি পাকা নেতা, কি করে অন্তর্গত বিক্ষোভ হিংস্রতা ও বিরাগের শোভন রূপ দিতে হয়, তা অনায়াস দখলে, যথাযথ প্রয়োগে ওস্তাদ, প্রাণাধিক ভাবমূর্তি আলুথালু হবে একটা রেণ্ডির জাঁতাকলে! ভাবা যায়! এখন সে বিখ্যাত। সাধ, বিখ্যাত যেন রয়ে যেতে পারে। সন্তর্পনে পা ফেলতে হয়। রং স্টেপিং মানে, ধ্বস, ভাবমূর্তির কোরবানী। কখন কিভাবে নিজেকে উদ্যত করতে হয় এ জ্ঞান প্রখর। তলায় যাই থাক উপরের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। তাছাড়া আরো একটা দিক আছে। দু-তিনটে বাক্য, "আমাদের উদ্ধার করুন", "কথা দিয়েছেন, ইজ্জত দেবেন", "আমাদের কি হবে', জাতীয় জিজ্ঞাসা ছাড়া আর কিছু উদ্‌গার করেনি। শুধু ধানাই পানাই চলছে। এখানেই রহস্য। পুরুষবাটা মেয়ে। বোকা নয়, তলে তলে গূঢ় ধান্ধা আছেই। সেটা যে কি, জানার আগ্রহ সুবোধকান্তর তুঙ্গে। তাছাড়া আর একটা দিক আছে। এটা দলীয় জমায়েত নয়, গণচরিত্র প্রধান, উদার ভাবমূর্তি নির্মাণের উর্বর সৃজন কেন্দ্র। হিসেব কসে সুবোধকান্ত চাল দেন। আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করেন।—হাত ছাড়্ হরি, ছি। আমার সামনেই এই। এই আচরণ নিয়ে তোমরা মানুষের মধ্যে নিয়ে যাবে পার্টিকে, মানুষ ভরসা রাখবে? ব্যথিত মুখ, বিষণ্ণ দৃষ্টি। আড়ে আড়ে পরিবেশটা জরিপ করেন। সন্তুষ্ট, আকাঙ্ক্ষিত মাত্রা

আরোপিত হয়েছে। বাঁকা চিবুক ঝুঁকে আসে চাঁপার কান বরাবর।—মা, কুণ্ঠা কোর না, সেবাই আমার ব্রত, বল কি চাও ?

মা ! চাঁপা তড়িতাহত, এ কী সম্বোধন। ছ্যাবলা না-কী, অথবা উ'চুদরের ঢপের কারবারী। সত্যি পারে বটে। চাঁপা কিঞ্চিত আপ্লুত, অধিক শঙ্কিত। হর্ষ এবং উদ্বেগের যৌগিক ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন। ভ্রমরবৃত্তিকে উসকে দেওয়া তার পেশা। সে পুরুষ চেনে, পুরুষ খেলান তার কারবার। অশন বসনের উৎস। সে যেন এক্স রে মেশিন, শরীর নির্বিকার দর্পণ। উদ্ভট আকাঙ্ক্ষা, অদ্ভুত বাসনা, বিচিত্র মনোবিকলন। অনেক দেখা আছে, পুরুষেরা আসে, একাত্ম হতে চায়। সংসর্গ হয়। উভয়পক্ষ সেয়ানা, চলে উসুল নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এসবে অস্বস্তি নেই, অভ্যস্ত। কিন্তু এ কী বিড়ম্বনা। এমন পরিস্থিতিতে কোন হিসেব খাপ খাচ্ছে না। লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মূল্যায়ণ। চাঁপা হত-বিহ্বল। পুরুষটিকে যত মাপতে যায় বিভ্রম বাড়ে। রাগ অভিমান বাড়িয়ে দেয়। আত্মপ্রকাশের তাড়নায় অন্তর পুড়তে থাকে। নাকে-চোখে জল, দর্শক দৃষ্টি অপলক। মহার্ঘ্য দৃশ্য, ফসকে না যায়, সুবোধকান্তর চোখে ধূর্ততার ঝিলিক, পতিত ? তাতে কি ! জনগন মাত্রই হরিজন, সুবোধকান্তর হাত ক্ষিপ্রতায় উঠে আসে, চাঁপার মাথায় স্থাপনে উদ্যত, স্পর্শতার নিকটতম। দুরন্ত ছবি হতে পারে, উপকরণ মুঠোয়, এই তো সেই বিরল মুহূর্ত ; পীড়িত মস্তকে কোটি কোটি আশীর্বাদের বীজমন্ত্র এঁকে দেন লোকনায়ক। প্রেস লুফে নেবে, জনতা খাবে, জানেন তিনি। সুবোধকান্তর হাত নিসপিস করে, অথচ উদ্যত পাঞ্জা কুলটা-মস্তকে লগ্ন হয় না। যতই হোক পাপপুণ্য একাকার হতে দেওয়া যায় না, ভরন্ত সংসার। কল্যাণ-অকল্যাণ আছে, নিজস্ব সমাজ আছে, শত হোক কমিউন-জীবন তো নয়, দ্বন্দ্বময় মুহূর্ত। সুবোধকান্তর প্রসারিত বাহু শূন্যে নিথর, বিবশ। পরিবেশ থমথমে। হঠাৎ স্তম্ভিত পরিবেশ চিড় খায় চাঁপার চিল-চিৎকারে।—আমাদের উচ্ছেদ করুন, তাড়িয়ে দিন। লোপাট করে দিন, টুলি থেকে, পাড়া থেকে, শহর থেকে, দুনিয়া থেকে।

লুপ্ত জীবিকার দ্বিতীয় পাঠ

সুদর্শন সেনশর্মা

এইমাত্র দেবাশিস ফোন করেছিল। ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে শোভন-সুন্দর প্রমিতাকে বলল, 'ভবেশবাবুকে নিয়ে হার্ট ক্লিনিকে ঝামেলা হচ্ছে। আমাকে এখুনি একবার যেতে বলছে।'

'কন্ডিশন খারাপ হয়েছে ?'

'না, তা নয়। ভর্তির তিনদিন বাদে যখন একটু স্টেবল হলেন এক ভদ্রলোক এসে নাকি তম্বি করছেন তার বাবাকে কেন এখানে ভর্তি করা হয়েছে ? কে করেছেন ? তিনি নাকি কোঠারি, পিয়ারলেস কত কি বলছেন।' শোভন-সুন্দর বলল।

'ছেড়ে দিতে বলছে নাকি আবার ?' প্রমিতা বলল-'আচ্ছা, ভবেশবাবুতো তেমন কোন ছেলের কথা আমাদের বলেন নি, ওঁর বাউন্ডুলে জামাইটা নয় তো ?'

'ঘুরে না এসে কিছুই বলা যাচ্ছে না। দেবাশিসকে খুব ওরিড মনে হ'ল।'

'দেখ আবার মাথা গরম করতে যেও না' প্রমিতা দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বলল।

ভবেশ মুখোপাধ্যায় শোভনসুন্দরদের প্রতিবেশী। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এই বৃদ্ধ বিপ্লবীর ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল শোভনের স্কুলের একদা সহপাঠী···কি নাটকীয় সাক্ষাৎকার! সেই জোড়া অশ্বত্থতলা স্কুলের বন্ধুও এখন খ্যাতিমান কথাশিল্পী। প্রমিতার আবার সে প্রিয় লেখক। ভবেশ বাবুরতো সেদিন সকাল থেকেই ভালো রকম চেস্ট পেইন হচ্ছে। ইন্টারভিউ তাই হয়নি মাঝখান থেকে স্কুলের দুই বন্ধুর···

প্রমিতা পকেট বইটা যত্ন করে সোফা থেকে তুলে রাখে। ইট রঙের পকেট বই, হাল্কা বিস্কুট রঙের জ্যাকেট—কি নেই তাতে! পুকুর জলের ডুবুরি, আলতা পরানো নাপতিনী, সিঁদেল চোর দাই মা থেকে কম্পাউন্ডার বাবু। শোভন তো সেদিন হাসতে হাসতে বলেছে ভাই···

শুধু একটা চাপ-ধরা ব্যথা। প্রেসার ঠিক ছিল। ঘামছিলেনও না। হাসপাতালে যাবার আগে শোভন কার্ডিয়াক এনজাইমগুলো দেখার জন্য ব্লাড

পাঠালো। ভবেশবাবুকে অনেকবার শোভন বলল 'আপনাকে দেখার লোক নেই।' চলুন আমার হাসপাতালে ভর্তি করে দি। চেষ্টা-চরিত্তির করে হয়তো আপনাকে পারব ভর্তি করে দিতে', ভবেশবাবু শুধু বলছিলেন 'আহ্ শোভন আর একটু দেখুন না। এখুনি হাসপাতালে পাঠাচ্ছেন কেন? বললেন তো ই. সি. জি ঠিক আছে। তবে আবার শুধু শুধু···এই বাড়ি ছেড়ে···

'আপনার একটু অবজার্ভেশনে থাকা দরকার। এখানে···'

ভবেশবাবু বলেন 'আমিতো প্রমিতা মার অবজার্ভেশনে দিব্যি আছি।'

'আপনার প্রমিতা তো আর ডাক্তার নয়।'

'সে নাই বা হ'ল। এতদিন একটা বড় ডাক্তারের ঘর করার কোন দাম নেই। কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?'

শোভন তর্জনীটা নাচিয়ে বলল 'বেশ এবেলাটা আপনাকে ছাড় দিলুম। রিপোর্টটা আসুক। কিন্তু এত কথা বলা চলবে না···'

—'বেশ ভাই ঠিক আছে···'

শোভনসুন্দর সেদিন দেরী করে ফেলেছিল। কিন্নর রায়কে বাসস্টপ অব্দি এগিয়ে দিয়ে ব্লাডটা ক্লিনিকে পৌ'ছে দেবাশিসকে ফোন করতে করতে দেরি হয়েছে। আর এই সাহাপুর থেকে··হাসপাতাল আউট ডোরে ঢোকার মুখে মধ্যবয়স্ক এক জন ঘড়িটা দু'বার দেখল এবং সবাইকে দেখিয়ে বলল, ন'টা প'য়ত্রিশেও আউটডোরে বড় ডাক্তার না এলে···

শোভনসুন্দর হেসেই বলল—প্রতিবেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, একটু দেখে আসতে গিয়ে···

—'প্রাইভেট প্রাক্টিশ! হাসপাতালতো আপনাদের হাতের পাঁচ অ্যাঁ?—আপনাদের খই তো দিন দিন···'

শোভনসুন্দর গম্ভীর হয়ে গেল। তার ফর্সা মুখে লালচে আভা প্রকট হচ্ছে, 'আপনি কে?'

'দেখছত হে, আমার আইডেনটিটি জানতে চাইছেন। আমায় চেনেন না। আমি একজন বিধায়ক। ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে আছি··কাজেই বুঝেছেন—' সেই মধ্য বয়স্ক চিবিয়ে বললেন 'আমি জবাবদিহি চাইতেই পারি।'

—'নিশ্চয়ই পারেন' শোভন বিষণ্ণ গলায় বলে, 'আপনারা কেন শুধু—সবাই পারে, কাল যেমন রাত দশটায় তালতলার উনিশ জন যুবক, যাদের মধ্যে পনের জনই তখন ডেড-ড্রাঙ্ক, ইনডোরে ঢুকে বিনা কারণে শাসালো—আমরা ত আসবই,

মন্ত্রীই বলেছেন সরকারি হাসপাতালে কেমন কাজ হচ্ছে—জনগণকেই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে···'

'লিসেন, আপনি কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছেন···'

শোভনসুন্দর লোকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হাসপাতালের চেনাজানা কয়েকজনও তার সঙ্গে। শোভন বলল, তেভাগা আন্দোলনের এক স্বনামধন্য সংগঠক এবং প্রবীণ বিপ্লবী আমার প্রতিবেশী। তিনি একা থাকেন। সকাল থেকে তাঁর বুকে ব্যথা ওঠায় সব ব্যবস্থা করে···'

শোভন আর না দাঁড়িয়ে তার ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। আমলারা সব করিডোরে দাঁড়িয়ে।

'আপনার এলাকাটা ?' বিধায়ক প্রশ্নটা ছুঁড়লেন।

পেছন ফিরে শোভনসুন্দর ফের দাঁড়ায়, 'এনকোয়ারি করবেন ? সাহাপুর, তারাতলার কাছে হাউজিং—

'আউটডোরে অনেকে ওয়েট করছে—সরি ফর ইনকনভিনিয়েন্স' শোভন হাঁটা লাগায়।

'আচ্ছা নামটা কি ভদ্রলোকের !' বিধায়ক ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেন।

কে একজন আউটডোরে শোভনের ঘরে ছুটে এসে বলল, ডাক্তারবাবু উনি সেই বিপ্লবীর নাম জানতে চাইছেন।

—কার !

—আপনার সেই প্রতিবেশী ভদ্রলোক।

শোভন বলল—'খোঁজ নিতে বলুন। আপনারাও এসব লোকের পোঁ ধরে ঘুরছেন। ভবেশ মুখোপাধ্যায়, তেভাগা আন্দোলন, যানু নামটা বলে দিন। আশ্চর্য্য সত্যি···'

লোকটা চলে গেল।

আউটডোর শেষ না হতেই মৃগাঙ্ক ছুটতে ছুটতে এল। ডাক্তারদের মেসে রান্না করে। শোভনও এককালে সেই মেসে থেকেছে। শোভনবাবু একটু, আপনাকে ইমার্জেন্সীতে বলে দিতে হবে যে—···

ইমার্জেন্সী এক বিপজ্জনক জায়গা এখন। যখন তখন যে কেউ এসে তম্বি করে যাচ্ছে। ভাঙচুর করে যাচ্ছে··শোভনসুন্দর কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। আচ্ছা মৃগাঙ্ক তোমাকে বলেছি-ত-হাসপাতালে আজকাল আর ডাক্তারদের-ভর্তি করার ক্ষমতা নেই। মুরোদ থাকে ত ছাপ মারা চিঠি নিয়ে এস—বাবা বাছা করে

তোমাকেই সবাই পালঙ্ক এগিয়ে দেবে। নয়তো ওয়ার্ড মাস্টারকে ধর। নিদেন কোন ধড়িবাজ জি. ডি. এ—ওদের ক্ষমতা এখন . . . . .

মৃগাঙ্কর রোগী, সৃষ্টিধর নায়েক। বয়স ষাট। মেয়ের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে আলের ওপর পায়ের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেতেই লাফিয়ে উঠেছিলেন তখনই পায়ের পাতায় কামড়। আধঘণ্টার মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এগরা হাসপাতালে ছিলেন, চার ঘণ্টা পেচ্ছাপ হয়নি। সেখান থেকে মেদিনীপুর বড় হাসপাতাল—সেখানে এক রাত্তির। পেচ্ছাপ হয়নি তাও। পরদিন কলকাতার পথে হারা উদ্দেশ্যে? রাত্তিরে আর. জি. কর, পি. জি ঘোরা শেষ। এই হাসপাতালেও শেষ রাতে 'রিগ্রেট' তকমা জোটার পর তারা মৃগাঙ্কর জন্য ভোর অব্দি অপেক্ষা করে। সকালে তাকে ধরেও। এখন মৃগাঙ্ক তাকে ধরেছে। আড়াই দিন প্রায় যে লোকটার পেচ্ছাপ হয় নি, সাপে কেটেছে, অতদূর থেকে এসে হাসপাতালে একটা বেড পাবে না? ইমার্জেন্সীর চেয়ারে তো এখন একটি ঘট বসে আছে। শোভন সুন্দর তাকে বলল 'ভাই হাসপাতালের ডক্তর'স মেসের কুকের রিলেটিভ—সেটা অবশ্য কোন কথা নয়—মোদ্দা কথা হচ্ছে অ্যাকিউট রেনাল ফেইলিওর ফলোয়িং স্নেক বাইট···এমনিতেই যা অবস্থা বাঁচবেনা। এতদূরে থেকে কলকাতায় এল ·· একটা বেড যদি কোনক্রমে···'

—'না দাদা বেড তো দূরে অস্তু। একটা ট্রলিও নেই।'

—একটাও নেই? ··

—একটা আছে যদি কোন অ্যাক্সিডেণ্ট আসে।

—এটা অ্যাক্সিডেণ্ট নয় বলছেন?

'কি আর করবে মৃগাঙ্ক', বিমর্ষ শোভন বলল 'তোমার যদি কোন মন্ত্রীর চিঠি থাকত—যে কোন মন্ত্রীর, নিদেন কোন বিধায়কের—তবে পাছায় ফুসকুরি নিয়েও ইমার্জেন্সীতে ভর্তি হতে পারতে। বিরাট হাইড্রোসিল থাকলেও তোমায় গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি করে দেখা যাবে···?

হাসপাতাল ফাঁড়ির জজবাবুও শোভনের কথা শুনে হেসে ফেলল। শোভনকে আড়ালে ডেকে বলল—সত্যি আপনাদের জন্য কষ্ট হয়···এত খাটেন তবু···স্যার আই বি-র লোক সব ঘুরে বেড়ায় এসব কথা নাই বা বললেন—অপ্রিয় সত্য তো? সুশান্ত আসছিল। হাসপাতালেই কবে যেন আলাপ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। চাকরিও তেমন কিছু আহামরি করে না। তবু ওর একটা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে। প্রয়োজনে রক্ত দেয়। দুঃস্থ রোগীদের নিয়ে এধার ওধার

ছোটাছুটি করে। হাসপাতালে প্রয়োজনে ভর্তিও করিয়ে দেয়। সুপার ওকে স্নেহ করাতে হাসপাতালের আড়কাঠি, দালালদের ওর ওপর বেজায় রাগ।

'সুশান্ত ভাই এর কেসটা একটু দেখবে?' শোভন বলল।

'দাদা, এইবার সুপার মারবেন। এই মাত্র ও'কে বলে কয়ে বস্তির একটা ছেলেকে দোতলায় ভর্তি করলাম। কালো পায়খানা, বমি হচ্ছে। তা যাক্-এর কেসটা কি?'

—সাপে কাটা। আড়াই দিন পেচ্ছাপ বন্ধ—কোন হাসপাতালে জায়গা জুটছে না।

সুশান্ত ম্লান হেসে বলল—'স্যার আপনি পারলেন না।

শোভন দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে বলল—'না ভাই পারিনিতো দেখতেই পাচ্ছ···।'

কাল মানব এসেছিল। প্যাথলজির। সরকার-অনুগত ডাক্তারদের অ্যাসোসিয়েশন করে। এককালেও পান্ডাও ছিল। নিজে থেকেই বলল, দাদা বলুন তো এসব কি হচ্ছে? পেপার, জনমত, সরকারি বক্তব্য সব শুনলেই মনে হবে ডাক্তাররা এক বিপজ্জনক প্রজাতির মানুষ। অ্যাসোসিয়েশনে ত কিছু বলতে গেলেই ধামা চাপা দিয়ে দেয়া হয়···

আমাদের প্রফেশনের সবাই খারাপ। সংবাদ মাধ্যম, জনমত সব বিরুদ্ধে যাচ্ছে! প্ররোচনা দিয়ে দিয়ে সবাইকে এককাট্টা করা হচ্ছে···আপনি তো আমাদের বন্ধু চন্দনকে চেনেন, ওকালতি করে—যত সব অনাথা, ডেস্টিটিউট, বাস্তুচ্যুত, ডেজার্টেড দের হয়ে ও কেস লড়ে, নিজের ট্যাকের পয়সায় ও বলছিল 'আমলাদের কথা ছাড়'—এখন রুখে দাঁড়াতে হবে—আমিই তো কত কমরেড উকিলকে দেখলাম —লম্বা লম্বা বাত—অথচ যারা ভাগচাষীদের পয়সায়, রক্তে এখন বড় লোক···দেখ দাদা এসব কথাতো···যারা ডাক্তারদের চোর বলছে, অসাধু বলছে, তারা এত ব্যস্ত এখন দাদা আয়নায় নিজেদের মুখটা দেখবারও সময় পায় না···শোভন বলেছিল এসব আমাকে বলে কি হবে মানব—আমার কথাবার্তায় তো তোমরা অসন্তুষ্ট হতে —বলতে দাদা আপনি একটু বেশী বলছেন · এখন দেখ। তোমাদের জি. বি তে বল অবস্থা কিন্তু আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। এমন অবস্থা পাড়ার উঠতি মস্তানরাও এখন হাসপাতালে ওয়ার্ম আপ করতে আসে। চল বে—এ হাসপাতালে একটু নেট প্রাক্টিশ করে আসি। এইতো মির্জাপুরে সেদিন দু'পার্টিতে মারামারি একদল হাতে লাঠি, ক্ষুর নিয়ে ওটি কমপ্লেক্সে ঢুকে পড়েছিল—অপারেশন করতে যাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—তাকেই ওরা মারবে।

মানব তুমি 'লুপ্ত জীবিকা'টা পড়েছ ?'

'পড়ে দেখতে পার। আমার এক স্কুলের বন্ধু খ্যাতিমান কথাশিল্পীর লেখা —কি নেই তাতে। যে সব জীবিকা এখন হারিয়ে গেছে বা হারাতে বসেছে—যেমন ধর পুকুর জলের ডুবুরি, আলতা পরানো নাপতিনী, কুয়োর ঘটি তোলা দাইমা থেকে সাইকেল চড়া কম্পাউন্ডার বাবু···বইটা পড়বে মানব এর পরের সংখ্যায় হে হে' শোভনসুন্দর খুব হাসল।

শোন মানব আমার প্রতিবেশী তেভাগা আন্দোলনের পুরোধা প্রাক্তন বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী এক বৃদ্ধ আমায় বলেছিলেন আপনি তো হাসপাতালে কাজ করেন। ধরেন আমার অ্যাটাক হইল বেয়াড়া সময়—কল দিলে আইবেন না ? আইতে হইবই, কেননা আমার বাহুবল আছে—হাসি (ফার্টাকি, আসলে কিস্যু নাই চু চু)—কিন্তু পয়সা তো পাইবেন না।

—সেই ভদ্রলোক কি বলব, হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ভর্তি আছেন হার্ট ক্লিনিকে। এমন অবস্থা হয়েছিল যে সাহাপুর থেকে দূরে কোন হাসপাতালে শিফ্‌ট করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি এখন ভিজিটর হিসেবে যাচ্ছি। উনি হাসতে হাসতে বললেন এত খাটনি কর—কি পাও তোমরা—তোমরা ওই পুরোন গানটাই একটু পাল্টে গাওনা—

'ওরা আমাদের প্রাকটিশ করতে দেয় না পল রোবসন'

—'ওনার এক প্রতিষ্ঠিত ছেলে আছে। তার পরিচয় ভর্তি হবার অনেক পরে পেলাম। ভবেশ বাবু বলেছেন হি ইজ দ্য সান অব হিজ মাদার···আমার কেউ না। আমি বিপ্লবী, জেল খেটেছি। আর ওরা বিপ্লবের স্তোক দিয়ে চেয়ার দখল করে এখন শরীরে বাড়তি মেদ জমিয়ে ফেলেছে। ওদের সব শেষ। বিপ্লব এখন রাধার হেপাজতে নিপাট কেষ্ট সেজে আছে।

ভদ্রলোকের সব কথাতেই মজা। ছেলের বৌ-এর নাম বোধহয় রাধা। ছেলে বিধায়ক।'

হার্ট ক্লিনিকের রাস্তায় দেবাশিসের গাড়ি শোভনকে দেখে দাঁড়াল। দেবাশিস গাড়ি থামিয়ে বলল, কি কেস লোড করে দিলে গুরু—

'কেন কি হয়েছে' শোভন বলল।

'আচ্ছা ভদ্রলোকের কোন ছেলে আছে আমায় বলিস নি তো।'

—'থাকতে পারে।'

—'দু' দিন আগে তোর হাসপাতাল আউটডোরে কারুর সংগে কথা কাটা-কাটি হয়েছিল।'

শোভন একমিনিট ভাবে মুখ তোলে—'আই সি, হ্যা হয়েছিল তো কি··তার সংগে···!'

'সেই লোকটিই তোমার বিপ্লবীর ছেলে। ক্লিনিক থেকে বাপকে নিয়ে যেতে চাইছিল। ওর হাতে একটা বহুদিনের পুরোনো অর্থোপেডিক আউটডোরের টিকিট ছিল, বাবার—ও'র মেয়ে হয়তো কোনদিন দেখিয়ে ছিল—' দেবাশিস বলছে 'কি শয়তান সেটা দেখিতে চাইছিল হাসপাতালের পেসেণ্টকে এনে এই ক্লিনিকে ভর্তি করল কে—সংগে আবার একটা ডি ডি-র লোক নিয়ে যাচ্ছে। তোর একটা আমাকে লেখা চিরকুট ছিল—সেটা হাতাতে যাচ্ছিল—আমি ভবেশ মুখোপাধ্যায়কে তুলে দিলাম ঘুম থেকে—তিনি সব শুনে ওদের ডাকলেন দাবড়েও দিলেন—ছেলেকে বল্লেন দেখিস না শুনিস না তোকে এখানে এসে রাজনীতি করতে কে বলেছে? অ্যাঁ? শোভনবাবুরা না থাকলে অমিত সেদিন রাতেই মরে যেতাম। আমি ফ্রি পেসেণ্ট—সবাই দেখছে—তোদের হেল্প চাইওনি, লাগেও নি ওষুধ পত্তর ওতো ওরাই, হাসপাতালের উন্নতি ত করতে পারবিনা, টেলিফোনটা অন্তত ঠিক করে দে—আমাকে সংগে করে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন বলে অনেকক্ষণ ফোন করেও হাসপাতাল ধরতে পারেন নি—হাসপাতালের টেলিফোন বেজে যায়—বোর্ডে কেউ ধরেনা··রিয়েলি? শোভন উৎসাহিত হয় যাক ভদ্রলোক বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

—'ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। আবার ট্রাঙ্কুইলাইজার দিয়েছি—' দেবাশিস বলল।

ওরা চলে গেছে?

হ্যাঁ—

শোভন হেসে বলল আমার চিরকুটটা দিয়ে দিয়েছ তো! একটা পাকানো কাগজ শোভনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল দেবাশিস, এইনে—যত সব ঝামেলা আমার ঘাড়ে দিবি—চাকরিটা ছাড় না?

—সত্যি রে আর পারছিনা। বল প্রতিবেশী, ইনভলভড্ না হয়ে তুই পারবি?

দেবাশিস গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে অন্য হাতে দরজা খুলে দিল। নে উঠে আয় শোভন—অনেক জ্বালিয়েছিস চল তোকে নামিয়ে দিয়ে যাই···

সামনা সামনি একেবারে। কিন্তর ভেবে দরজা খুলে দেখা গেল সেই আউট ডোরের লোকটি, ধুরি ভদ্রলোক, বিধায়কবাবু। সঙ্গে বছর পাঁচেকের একটি ছেলে।

আপনার কাছেই এসে পড়লাম। বাবা-ই পাঠালেন। বাবা তো আপনাদের দয়াতে সুস্থই এখন। কাল বাড়ি এসেছেন।

—'দয়া নয়। প্রতিবেশীর প্রতি ওটা কর্ত্তব্যের আওতায় পড়ে। আমি তাই ভাবি।' শোভন বলল

—আমার ছেলেটাকে একবার দেখে দিতে হবে।

—আমি তো বাইরে, বাড়িতে কাউকে দেখি না।

—পুরোনো কথা ভুলে যান। আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। বাবা–ই কিন্তু তাঁর নাতিকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

—সেত উনি পাঠিয়েছেন, কিন্তু আপনি যে আবার আমার প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে পুলিসে জমা দেবেন না, তার গ্যারান্টি আছে ?

প্লিজ ওরকম করবেন না ডাক্তারবাবু, ছেলেটা পয়সা খেয়ে ফেলেছে। কাল একটু পেটে ব্যথার কথাও বলছিল

—তা বেশ, তা বেশ শোভন হাসতে শুরু করে···পয়সা তো বেশ ভালো জিনিস···উপাদেয় ··

—আপনি মজা করছেন।

—এক্সরে হয়েছে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো দু'বার হয়েছে। প্রথম দিন। তৃতীয় দিন। হলুদ ঢাকা থেকে এক্সরে প্লেট বের করে শোভনের হাতে তিনি তুলে দিলেন···

এক্সরে দেখতে শোভন অনেক সময় নেয়। খুব মনোযোগ দিয়ে যেন দেখে। প্লেট দুটো ফেরৎ দিতে দিতে বিধায়কের মুখের দিকে তাকিয়ে শোভন হাসতে শুরু করে। আপনার বাবা বলছিলেন আপনার সল্টলেকে বাড়ি আছে, এন্টালিতে ফ্ল্যাট আছে—আগে আপনি না বললে সল্টলেকে নাকি জ···থাক সে কথা। এখন ছেলেটাকে কাগজ পেতে হাগতে বলবেন। পয়সা পড়ে যাবে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে···

—কিসের আনন্দ ডাক্তারবাবু, আমার তো ভয়ে···

প্রথম দিন এক সার্জন বলেছিলেন অপারেশন লাগতে পারে

ঠিকই বলেছিলেন এক টাকার কয়েন তো। ভাগ্য ভালো নেমে এসেছে। ভয় নেই আর। লার্জ গাটে কয়েন পৌঁছে গেছে যখন···

—কোন ওষুধ যদি।

—ওকি কনস্টিপেটেড না পায়খানা নিয়মিত ··

—না না ওর ওসব নেই··· আমিই একটু কনস্টি···

—সেত আপনার মুখ দেখলেই··ছেড়ে দিন পয়সাটা পড়ে গেলে আমাকে

জানাবেন। আর ও কিন্তু কাগজ পেতে ঘরের মেঝেতে যাব্দিন না···

বুঝেছি বুঝেছি···

শোভন উঠে ছেলেটিকে আদর করে বলল, তুমি খুব বড় হবে বুঝতে পারছি। তোমার উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবেনা···

বিধায়ক ভ্রূ কুঞ্চন করে বলে—আপনি ভাগ্য গণনাও করতে পারেন নাকি? কি করে বলছেন?

শোভন বলল—এসব বলতে গনৎকার হতে হয় নাকি? আপনি যেমন বলেছিলেন। এটুকু আমি বলতেই পারি ও কমসে কম একজন বিধায়ক তো হবেই।

ভদ্রলোক, বিধায়ক ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর তখন—বাহ, কি করে বুঝলেন।

—শোভন হেঃ হেঃ করে অনেকক্ষণ হাসল। 'বা রে বুঝব না কেন? দেখছেন না এখনই ও পয়সা, কয়েন খাচ্ছে।' দাঁত চেপে বিধায়ক বলে উঠল—'আমি কিন্তু মেটাতেই চাইছিলাম, এখন দেখছি ঝগড়াটা আপনিই জিইয়ে রাখতে চাইছেন। বেশ। আচ্ছা সব বিধায়ক পয়সা খায়? ভদ্রলোক শোভনের চোখে চোখ রাখে।

—কক্ষনো না। সৎলোক আছে বলেই তো দুনিয়া চলছে। শুনুন মশাই আমি ছোটবেলায় অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর কোলে উঠেছি। ভবানী সেনকে রাস্তার টিউবকলে স্নান করতে দেখেছি। অবশ্য তিনি তো··হ্যাঁ সোমনাথ লাহিড়ী জ্যোতি ভট্টাচার্য্য, সুবোধ ব্যানার্জী মন্ত্রী থাকার সময়ও ট্রামে চড়তেন। আচ্ছা সব ডাক্তার কি পয়সা খায় সবাই ধান্দাবাজ—সবাই—স-ব্বা-ই??

ভদ্রলোক ছেলেটির হাত ধরে উঠে পড়েছিলেন। শোভন ড্রয়ার খুলে একটা ওষুধ, ছেলেটির হাতে ধরিয়ে বলল—বাবা একচামচ দিনে দু'বার। ভদ্রলোক দেখলেন কিছু বললেন না।

এক মিনিট বলে ছেলেটাকে দাঁড় করিয়ে, জামা তুলে পেটটা দেখে আবার শুইয়ে পেটটা টিপে টিপে দেখেও নিল শোভন।

ভদ্রলোক দেখলেন কিছু বললেন না।

শোভনসুন্দর বলল, কোন ভয় নেই মিস্টার মুখার্জি, আমি আপনাকে অ্যাসিওর করছি··· •

ভদ্রলোক একবার মুখ তুলে শোভনকে দেখলেন, কিছু বললেন না··ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন নেপথ্য থেকে শোভন যেন শুনল প্রাক্তন বিপ্লবীর সুপ্রতিষ্ঠিত বিধায়ক সন্তান কেটে কেটে বলছেন আমি কিন্তু কিছুই অ্যাসিওর করছিনা··ডাক্তার···

ফ্ল্যাট-এর দরজাটা আটকে যদিও একচোট হেসে নেয় শোভনসুন্দর, ক্লান্তি সে তাড়াতে পারেনা। বড় ধ্বস্ত লাগছিল নিজেকে। চাকরির পরিমণ্ডল দিনকে দিন কি হয়ে উঠছে। ইমার্জেন্সীতে মরণাপন্ন বিছানা পাবে না। দালালরা, কিছু জি. ডি এ পেসেন্ট ভর্তি করিয়ে পয়সা মারবে। ট্রলি বিক্রি হবে চড়া দামে। হাসপাতালের ওয়ার্ডে মরণাপন্ন রুগী ফেলে দিয়ে অ্যাটেনডেন্টরা সাপ লুডো খেলবে। সেদিন পুরোনো এক সহকর্মীর স্ত্রীকে দেখতে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে ঢুকে শোভন স্তম্ভিত হয়ে গেছিল-সবে রাত সওয়া নটা হয়েছে। এক বৃদ্ধা রুমা রুমা করে বোধ হয় তাঁর মেয়েকে ডাকছেন—স্ট্রোক—চার হাত পা বাঁধা—তার মুখ দিয়ে একটা বড় রাউণ্ড ওয়ার্ম বেরিয়ে গলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে, বৃদ্ধা বাঁধা হাত পা নিয়ে অস্বস্তিতে ছট ফট করছেন বাঁধা ডান হাতটা মুখের কাছে আনতে চাইছেন—আর একজনে এই কিছু দেনা, পেচ্ছাপ পেয়েছে বলে কাঁদছে···

মাসীরা সাপ লুডো খেলছে। বিছানার পাশে এক কোনে মেঝেতে। অন্য-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই···সিস্টার সিস্টার করে খানিক চেঁচিয়ে-শোভন বাঁহাত দিয়েই বৃদ্ধার রাউণ্ড ওয়ার্মটা গাল থেকে টেনে ফেলে দিল। বৃদ্ধার ছটফটানি তখন কমে যায় খানিকটা—মাসি বারো নম্বরের কাছে কে আছে—

—আপনি কে?

কে একজন বলল—এই হাসপাতালের ডা···

আর একজন বলল—তো কি হয়েছে আমার গুটি সাপের মুখে পড়েছে বল?

শোভন নেমে এল। হাত ধোয়ার জন্য মেডিক্যাল ওয়ার্ডে সাবানও জোটেনি।

এত লোক মরছে, তবু শালা সামনের খাটিয়া বেচা লোকটা গয়েন চুলকোতে চুলকোতে ওদের শুনিয়েই রোজ বলবে লেকিন দিমাক বহুৎ খারাপ। বহোৎ খারাপ। মানুষ তেমন মরছে না। আর খৈনি টিপতে টিপতে হাসবে। সেদিন যেমন মৃগাঙ্ক খাটিয়াঅলার পাশে দাঁড়িয়েই খবরটা দিয়েছিল—সুশান্ত একটায় ভর্তি করতে পেরেছিল। আর একটা পনেরোয় সৃষ্টিধর মারা যায়।

শোভন সেই বইটা বুক সেল্ফ থেকে নামিয়ে আনে। ইট রঙের পকেট বই। বিস্কুট রঙের জ্যাকেট। কত কি আছে তাতে।

পুকুর জলের ডুবুরি, সিঁদেল চোর থেকে—কম্পাউণ্ডারবাবু।

শোভনের সেই জোড়া অশ্বত্থতলা স্কুলের সহপাঠী কথাশিল্পীকে একটা অনুরোধওতো করেছে শোভন।

সেই পোড়া ইট রঙের, বিস্কুট রঙের জ্যাকেট মোড়া 'লুপ্ত জীবিকা'র দ্বিতীয় সংস্করণে বন্ধু কিন্নর রায় কি আর একটা জীবিকার কথা লিখবেন?

এটুকু নিশ্চিত, স্থির নিশ্চিত এ ব্যাপারে শোভন তাকে খুব সাহায্য করতে পারে।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

[লালগোলা প্যাসেঞ্জার দিনে বেশ কয়েকবার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ছাড়ে। নাম এক হলেও ট্রেনগুলি ভিন্ন। সকাল দুপুর সন্ধ্যা সবসময়ই শিয়ালদহ থেকে শেষ স্টেশন লালগোলায় পৌঁছায়।

তাই কাব্যনাটকের কুশীলবরা ২.১০ মিনিটের লালগোলা প্যাসেঞ্জারের যাত্রী। চরিত্রগুলির নাম সঙ্গতকারণেই দেওয়া হয়নি। নাট্যকারের কাছে তারা অপরিচিত। তাই প্রথম যাত্রী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাত্রী হিসাবে উল্লেখিত। একটি নববিবাহিত দম্পতি। তারাই এই নাটকের কেন্দ্র। তাদের যথাক্রমে কৃষ্ণা ও অরুণ নামকরণ করা হলো। অরুণ মানে আলো। কৃষ্ণা সাধারণ অর্থে অন্ধকার। আলো অন্ধকার পাশাপাশি থাকুক এই ভেবেই এই নামকরণ।

যাত্রীরা নানান রকম মন্তব্য করবে। বলাই বাহুল্য সেগুলি লেখকের ব্যক্তিগত মতামত নয়। তবে কিছু কিছু মন্তব্যে সায় আছে।]

প্রথম যাত্রী : কি রে? আজও অফিস কাটলি?

দ্বিতীয় যাত্রী : কি করবো ফাইনালে আজ ব্রেজিল ইটালি।

প্রথম যাত্রী : আজ না হয় ফাইনাল

কিন্তু গতকাল?

রোজ রোজ অফিস পালাবি, দুঘণ্টাও করবিনা কাজ, এ সরকারতো আমাদেরই সরকার, ফাঁকিবাজ কাজ না করে মাইনে নিস—লজ্জা করেনা।

খালি এ ভাতা সে ভাতা বাড়াও, ঘেরাও—না

তোরা দেখছি এ রাজ্যের বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বিনা।

দ্বিতীয় যাত্রী : নাম জ্ঞানদাস, তা তুই এই দুটো-দশে কেন?

প্রথম : আমিতো ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য ছুটিতেই আছি, আহা জানিস না যেন!

তৃতীয় যাত্রী : (প্রথম যাত্রীকে উদ্দেশ্য করে) তবে কলকাতায় এসেছিলি কেন

ওই মীরা না ধীরা কি নাম যেন মেয়েটার
তাকে কি লাইন মারছিস এখনো।
যাকগে, তুই তো কোয়ালিফাইড খাস-নি এখন একটা শাদা ছাড়!

প্রথম ঃ বৎস জানোনাকি ধূমপান গাড়িতে বারণ
তা ছাড়া ধূমপান ক্যানসারের কারণ,

তৃতীয় ঃ (সহযাত্রীরা হেসে উঠল)

প্রথম ঃ তোদের যে কি হবে ভাবি
দেড় ঘণ্টার পথ রাণাঘাট, সিগারেট তোকে দিচ্ছি
কিন্তু নেমে গিয়ে খাবি
শালা! বেশি সিগ্রেট খেলে লাংসে ক্যান্সার, কিন্তু হায়
না খেলেতো ক্যান্সার হতে পারে শরীরের যে কোন জায়গায়···

প্রথম ঃ (আবার দ্বিতীয় যাত্রীকে বলে) আজ কি বলে কার্টলি বাওয়া,

দ্বিতীয় ঃ কাকে বলবো, বলবার কেউই ছিলনা
রাইটার্সে গেলে দেখতিস ফাঁকা ঘরে হাওয়া
খুঁজছে অফিসার, স্যার, সেক্রেটারি
কাউকেই যাচ্ছেনা পাওয়া
আর আমিতো কেরাণীগিরি করি।
তার ওপর ডেইলি প্যাসেঞ্জার, আসতে যেতেই ছয় ঘণ্টা
প্রতিদিন ডাউন সাতটা-তেত্রিশ ধরি।

সোদপুর থেকে দুজন কিশোর ফেরিওয়ালা উঠল।

প্রথম ফেরিওয়ালা ঃ এইযে বাবু ব্রাজিলের রোমারিও পেড়া
মুখে দিলেই গলে যাবে, আজ নির্ঘাৎ ইতালির হারা।

দ্বিতীয় ফেরিওয়ালা ঃ বাবুরা বলছি আমি জিতবেই ইটালী
বাজি রেখে টাকায় আটটা দিচ্ছি, দেখুননা বাক্স প্রায় খালি। এইভাবে ব্রাজিল ইটালির ঝগড়ায় টাকায় পেড়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তেই থাকে— পেড়াগুলি একেকটা আধুলির মতো ছোট। সামান্য বুদ্ধিতেই বোঝা যায় আগেই থেকেই এরা নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করেই ট্রেনে উঠেছে। তবে এদের সেন্স অফ হিউমার ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়।

শুরুতেই আমরা যে দম্পতির নামকরণ করেছি তার পুরুষটি পশ্চিম বঙ্গ

সরকারের পরিবেশ দূষণ নিবারণ দপ্তরে কাজ করে। অফিসার। অধ্যাপিকা স্ত্রীকে নিয়ে এই প্রথম মা বাবার কাছে পৈত্রিক বাড়ি বহরমপুরে যাচ্ছে।

অরুণ : উঃ মানুষ এত কথা বলতেও পারে।
তারপর ফেরিওয়ালার চীৎকারে
কানে তালা, কৃষ্ণা, তুমি খরচের ভয় করে
ফার্স্টক্লাস কাটতে দিলেনা,
এত ভীড়ে একটু পড়তেও পারছিনা।

কৃষ্ণা : গতস্য শোচনা নাস্তি, ভীড়ের কামরায়
খুব ভাল একলা হওয়া যায়
একসঙ্গে সকলেই কথা বলছে অথচ কেউ কারো
কথা শুনছেনা, ধরো
আমি যদি বলি, যত বেশি কথা
ততই ব্যর্থতা।

অরুণ দেখলেতো এই ছেলেদুটো ব্রাজিল ইটালী করে কতোই চেঁচালো, কত সুন্দর করে বললো কিন্তু কেউ কি কিনলো?

অরুণ : তুমি মাঝে মাঝেই হঠাৎ কেমন যেন
দার্শনিক হয়ে যাও! শোনো
তুমি কি উঠে এসে এই জানলার পাশে
বসবে, আমি তবে উঠে যাচ্ছি ওপাশে।

প্রথম থেকেই অরুণ জানলার পাশে বসেছিল। স্ত্রী কৃষ্ণার পাশের বসা ছেলেটি মাঝে মাঝেই অন্যমনস্কতার ভানে—উরুতে চাপ দিচ্ছিল। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ছেলেটি এবার একটু সরে বসে যেন কিছুই হয়নি ভাব দেখিয়ে একটা চার্মস ধরালো।

অরুণ : সিগারেটটা নিভিয়ে দিন। জানেননা
ট্রেনে ধূমপান নিষেধ, যদি মানা
না শোনেন, তবে চেন টানবো
আর গার্ডসাহেবকে ডেকে নামিয়েই দেবো।
জানেন না সিগারেট যে খায়
তার আশেপাশে বসা যার যার নাকে সেই ধোঁয়া যায়

তাদেরই ক্ষতিটা আরো বেশি
অন্তত তিন তিনটে সায়ান্স জার্নালে পড়েছি।

কৃষ্ণা : (চাপা স্বরে) তোমাকে নিয়েতো দেখি মহা মুস্কিল হলো যেখানেই
যাবে দূষণ দূষণ করে ঝগড়া বাধাবে।
ওগো পরিবেশ বাবু সবসময় এভাবে
পরিবেশ ক্ষেপা হলে কি অফিস তোমাকে তাড়াতাড়ি প্রমোশন দেবে ?

অরুণ : (আরো নিচু গলায়) আস্তে কথা বল, কৃষ্ণা লোকের কানে গেলে
কি ভাববে ! যার জন্য চুরি করি সেই চোর বলে !

কৃষ্ণা : রাগ করোনা অরুণ, কথায় কথা বাড়ে
রাগে বাড়ে রাগ, এ পৃথিবীতে দূষণ বাতাসে গেছে ভরে
এটাতো সকলেরই জানা, বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে
তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলকারখানার ধোঁয়ায় ভরে উঠছে
সমস্ত পৃথিবী, করবো করবো, করছি, এই করলাম, ধরনের বক্তৃতা পড়ি
নেতা ও পুলিশ আশ্বাস দেয় অথচ তো আজো কলকাতার রাস্তায় যত গাড়ি
তার অর্ধেকেরই ইঞ্জিন খারাপ
যেন কালো ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছয়লাপ
অন্ধকার হয়ে যায় পথ দিয়ে গেলে, পেট্রোল ডিজেলময়
মনে হয় এরা গাড়িগুলি কয়লায় চালায়
অরুণের মুখে এখন প্রসন্ন আবেগমিশ্রিত গলায় কৃষ্ণা বলে চলে

কৃষ্ণা : সব জেনেও এ কোন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে
এগিয়ে চলেছি, অরুণ আমরা যে নতুন শিশুকে
পৃথিবীতে আনবো সে যদি বলতে শিখে
বলে ওঠে "মা"
এ কোন নরকে আনলি মা
তাকে কি উত্তর দেবো ?

অরুণ : (আলতো করে কৃষ্ণার হাত স্পর্শ করে)
ওগো দার্শনিকা, তবে এতক্ষণ
সকলের সামনেই কেন আকর্ষণ করছিলে চরণ দুখানি ?
ভাগ্যিস কেউ শুনতেই পায়নি।

কৃষ্ণা : দার্শনিকা কিন্তু শুধু বাঙলা নয়, তা কি

জানতেনা। তার চেয়ে এসো জানলার বাইরের ঐ প্রকৃতি দেখি
দ্যাখো দ্যাখো কি সুন্দর একটা বাচ্চা চড়াচ্ছে মহিষ
গায়ে কিছু নেই—ইস্
যদি ঠান্ডা লেগে যায়।

অরুণ ঃ এদের লাগেনা ঠান্ডা কথায় কথায়,
আট দশ বছর অব্দি এরা প্রায় কিছুই দেয় না গায়
পয়সা কোথায়? এরাই প্রকৃত প্রাকৃতিক
আমরা নকল, আমরা ঠিক
স্বাভাবিক বাতাসকে আর বিশ্বাস করিনা. তাই
যখন তখন ফ্যান খুলে নিচে বসে যাই।
ট্রেন নৈহাটি স্টেশনে দাঁড়ালো ভীড় অনেকটাই কম। সাধারণত কৃষ্ণনগরের
পর ট্রেন একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়।

কৃষ্ণা ঃ কলকাতায়, অথবা বড় যে কোনো শহরে
অম্লজানময় তেমন বাতাস কোথায় পাবে, মনে পড়ে
সেই যে—বিয়ের আগে তুমি আমি গিয়েছিলাম ডায়মন্ড হারবারে
পিকনিক স্পটের খানিকটা বাদিকে গঙ্গার ধারে
ভাঙা যে লাইটহাউসটা, নির্জনতাকে সোনা করে,
সেখানে আমরা গিয়ে বসেছিলাম, প্রায় কোনো কথাই বলিনি,
আঃ সে কি আদিগন্ত বাতাস বাতাস সর্বক্ষণ,
শাড়িটারি ভাল করে সামলাতেই পারছিনা, খসে যাচ্ছে বুকের বসন
কিন্তু আমরা তো পুরোপুরি অযোবা তখন
তুমি বললে, আমার আদরতো ভবিষ্যতে
বহুভাবে পাবে, এখন এই ভূমধ্যপৃথিবী বাতাস তোমাকে আদর করতে
ছুটে আসছে তাকে তার যা ইচ্ছে করতে দাও।—তখন আশ্বিন মাস
আমাদের তিনদিকই ঘেরা উঁচু উঁচু কাশ
একমাত্র খোলা দিকে জলচঞ্চলা নদী, তুমি বললে এসো কৃষ্ণা নাচি
এসো খানিকক্ষণ আমরা ঈশ্বরসমান হয়ে বাঁচি,
সেদিন—আমরা কেউ কাউকে স্পর্শ করিনিতো,
আমরা গান শুরু করলাম উজ্জ্বল শিশুর মতো
যেন গুরুকবিকে শোনাতে চেয়েই সেই গান

"আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ ;"
হঠাৎ উঠলো জোর ঝড়ো হাওয়া
খুলে উড়ে গেল শাড়ী, অনেকটাই উঠে গেল শায়া
ভাগ্যিস কাশবন ছিল,
ওখানেই শাড়িটা জড়িয়ে গেল
শাড়ি ফিরে গেল পাওয়া।
অরুণ তখন কি বলেছিল তোমার মনে আছে
বলেছিলে এমন অসভ্য হাওয়ার পাশে
আর বলা যাবে ? এত হাওয়া যে কোত্থেকে আসে !
আর আজ ! শুদ্ধ বাতাসের জন্য তুমি যখন তখন রুদ্ধ
পথে ঘাটে; এমনি ট্রেনেও তুমি দূষণের প্রতিবাদ করো, কিন্তু শুধু রুদ্ধ
হয়ে কি তুমি করতে পারো ?
দেশনেতা, সমাজপ্রধান, রাজনীতিবিদ—এদিকেতো তেমন কারো
সত্যিকার মন আছে বলে মনেই হয়না !

অরুণ : বাঃ তুমিতো ভালই বলতে পারো আমার বিশ্বাস
বললে এবিষয়ে লিখে দিতে পারো পূজাসংখ্যায় উপন্যাস !
তবে জানো কৃষ্ণা, হচ্ছেনা হবেনা
ভেবে কি থাকবো বসে, সাধ্যমত প্রতিবাদ করবোনা ?

কৃষ্ণা : প্রতিবাদ করলেতো সবসময়
শুধু প্রতিবাদই করতে হয়
ট্রামে বাসে অফিস কাছারি, সংবাদপত্রের সংবাদ
সর্বত্রই প্রতিবাদ,
ওইসব প্রতিবাদের আসল উদ্দেশ্য হলো অন্যকে সরিয়ে
নিজের কাজটি নেওয়া আখেরে গুছিয়ে
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া
আজ যেন আর কিছু করার নেই ? স্বাধীনতার আগে আমরা
দেশকে বাসতাম যতো ভালো
তার আজ অবশিষ্ট নেই একতিলও
শুধু বিষকুম্ভ ধোয়া, কালো আর কালো
এদেশের তাবৎ মানুষেরই যেন সর্বনাম কালো।

অরুণ ঃ ঠিকই বলেছো আমি পরিবেশদূষণ দপ্তরে কাজ করি
কিন্তু তুমিতো আজ আমার চেয়েও বেশি দরকারী
কথা বলে দিলে। সত্যি কৃষ্ণা, মানুষকে যত ভালবাসা
যায়, প্রকৃতির মানুষকে ভালবাসা
তার চেয়ে লক্ষগুণে বেশি মহনীয়।
খাদ্য পরিধেয় পেয়ে
সবই ধরিত্রীধাত্রী প্রকৃতির।
বাইরে তাকাও কৃষ্ণা, ঐযে হাওয়ায় দুলেছে ধন্য ধানবন, ওপরে নিবিড়
অকম্প বৃক্ষের সারি আশীর্বাদের মতন
আমাদের সঙ্গে চলেছে, আমরা যে আজো বেঁচে আছি, বুকের স্পন্দন
এখনো যে যায়নি থেমে, সব ঐ বৃক্ষদেবতার
অপার করুণা, তবু বারবার
প্রতিমুহূর্তেই জানা-অজানায় আমরা তাদেরই সংহার
করি, বানাই রমনপালঙ্ক থেকে দাউ দাউ জ্বালানি!
জানো পরীক্ষা করেই পন্ডিতরা জেনেছেন গাছও অভিমান করে,
তারো আছে শোক সেই সবুজ অশ্রুতে অশ্রু, মানুষের সাদা চোখ
দেখতেই পায়না। আমরা যে, এখনো আছি
বিষাক্ত কার্বন হাওয়ায় বাঁচি
তা এই বৃক্ষসমাজেরই যোগফল উদ্ভূত।

কৃষ্ণা ঃ (ট্রেন পলাশী স্টেশনে এসে দাঁড়ালো)
এ স্টেশনের নাম দেখছি পলাশী, বানানটা লিখেছে অশুদ্ধ,
আমাদের স্বাধীনতা এমনই অশুদ্ধ
অরুণ! এখানেই তো হয়েছিল ইংরেজ-সিরাজ যুদ্ধ?

অরুণ ঃ ওগো পরিবেশবাণীময়ী এবার কি ইতিহাস নাকি?
খাবারটাবার যে সঙ্গে এনেছো, সেগুলো কি
শ্বশুর আর শ্বাশুড়িকে নিয়েই খাওয়াবে, নাও
এবার টিফিনবাস্কটা খোলো, তুমি নাও, আমাকেও দাও।

কৃষ্ণা ঃ (খাবার বের করে অরুণকে দিতে দিতে)
আরে আরে! আস্তে খাও, খাবারতো পালিয়ে যাচ্ছেনা।
এমন গোগ্রাসে খাচ্ছ, দেখলে লোকে নিন্দা করবেনা।

অরুণ ঃ কেউ করবেনা, আমাদের আশেপাশে এখনতো কেউ নেই
যাত্রী সব নেমে গেছে পাগলাচণ্ডীতেই,
এখন তোমাকে যদি ডায়াবেটিসের ভয়হীন মিষ্টি চুমু খাই,
সেই অধরনন্দিত কর্ম কেউ দেখবার নেই,
তবে কিনা ক্ষিদের সময়,
খাদ্যকেই সবচেয়ে বেশি অধরের যোগ্য মনে হয়,
দাও, লুচি আরো গোটা কয়।

কৃষ্ণা ঃ মানুষ পণ্ডিতই হোক, হোক মূর্খ বিপ্লবী দারুণ
একসময় সকলকেই খিদের কাছে ফিরে আসতে হয়, অরুণ
তুমি এত দ্রুত খাচ্ছো কেন ? হায়
খাদ্য বা খাদক কে যে কাকে খায় !
অসাধারণত্বগুলি হয়ে ওঠে সব
মুঠোর ছোট্ট গ্রাম, শব্দও হারায় তার অর্জিত গৌরব।

অরুণ ঃ নিন্দা করোনা বউ, দেখ এসে গেছে বেলডাঙা, এরপর ভাবতা
তারপর সারগাছি, তারপরই আমাদের যাত্রা
শেষ হয়ে এসে যাবে বহরমপুরে
কিন্তু কৃষ্ণা তুমিতো তেমন কিছুই নিচ্ছোনা ? তোমার শাশুড়ী শ্বশুরো
পৌঁছুলেই কি তোমার সামনে ধরে দেবে থালা
তেমন ভেবোনা কিন্তু, প্রথমেই বরণডালা
কপালে ছোঁয়াবে, দেবে উলু, সমুদ্রশঙ্খে ফুঁ দিয়ে তুলবে ধ্বনি
এসব স্ত্রীআচার পুরুষ হয়েও আমি জানি।
তাই চেটে পুটে খেয়ে নাও যা আছে—সবখানি।
রাত্রে সুযোগ পেলে না হয় ভালবাসাও খাওয়া যাবে
দারুণ অব্যয়ীভাবে।

কৃষ্ণা ঃ তুমি কি করে যে এমন একই সঙ্গে এত অসাধারণ, কবি,
আবার নিতান্তই অতি সাধারণ হয়ে যাও, আমি মাঝে মাঝে ভাবি।
বিবাহ কি ভালবাসার শেষ, অরুণ আমার শোনা
সেই কলকাতা থেকে পাশে বসে আছি, একবারওতো হাত ধরলে না।

অরুণ ঃ বা ! এই যে তোমার হাত থেকে আলুর দম নিলুম।
তাকে কি ছোঁয়া, বলবেনা,

ইস। আগে বললে হাত কেন আরো কত কিছু ছুঁতেই পারতুম।

এবার হাসতে হাসতে দুজনেই উচ্ছিষ্ট হাতেই

দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে। মাত্র এক-লহমা তারপরই কৃষ্ণা বলে ওঠে

কৃষ্ণা : ছাড়ো ছাড়ো ওগো পরিবেশ দূষণ বিরোধী

দুজনেরই হাত এঁটো, শাড়িতে তা লেগে যায় যদি

বিতিকিচ্ছিরি হবে, এটাতো বিয়ের বেনারসী, যদি নোংরা কর—তবে

ট্রেন থেকে নেমেই তা ধুতে দিতে হবে।

অরুণ : (কৃষ্ণাকে ছেড়ে দিয়ে) চল হাত ধুয়ে এসে বসি, একটু পরেই

বহরমপুর এসে যাবে, এই

স্টেশনের পরের স্টেশনই বহরমপুর জংশন।

ভাগ্যিস তোমার পাশের বদমাশ লোকটা তখন

সিগ্রেট ধরিয়েছিল, তাইতো এইসব হাওয়া বাতাস

গাছপালার কাব্যকথা হলো, অন্তত আমরা কিছুক্ষণ শ্বাস

নিলাম সত্যের, যে সত্য জল্লাদ হয়ে

বড় হচ্ছে সর্বক্ষণ, আমরা যা দেখেও দেখছিনা ভয়ে!

আচ্ছা কৃষ্ণা, আমাদের কি উচিত হবে কাউকে এ পৃথিবীতে আনা,

বলো কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা কোনো উত্তর না দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। লালগোলা প্যাসেঞ্জার

আস্তে আস্তে বহরমপুরে প্লাটফর্মে ঢোকে।

কৃষ্ণা : এই কুলি ইধার আও,

দুটো সুটকেশ আছে—আস্তে নামাও

অরুণ এ্যাটাচিটা তুমিই নাও

টিফিন বাক্সটা আমি কাঁধের ঝোলায় নিচ্ছি, এখানেতো ট্রেনের মাত্র চার মিনিট থামা

চলো নামি, ট্রেনে ওঠাও যেমন শক্ত, সমান শক্ত হলো নামা।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এসে মালপত্রসহ রিক্সায় ওঠে। খাগড়ার একপ্রান্তে

অরুণদের বাড়ির রাস্তায়তো দুটো রিক্সা অতি কষ্টে মাত্র

যেতে আসতে পারে

কৃষ্ণা : এই তবে তোমাদের বহরমপুর!

মোগলপরাস্ত ভারতের বাসী ইতিহাস এই সব ভঙ্গুর

ইমারত দালানগুলি রেখেছে বাঁচিয়ে! ধুর

এর তো নাম হওয়া উচিত ছিল বহর-কমপুর।

পুরুষার্থ, কিরাতার্জুনীয়

সিদ্ধেশ্বর সেন

তবে কী ঘনিয়ে এল, অনিবার্য,
শতঘ্নীর কাল

যার ধূমে দেখা যায়, আচ্ছাদিত
তুষাগ্নির মতো—

সত্যও—ক্রম-দিক্ গ্রাসী, মায়া না
প্রতিভাস—

উত্তুঙ্গ, অনতিক্রম্য, সে-ও তবে
প্রহেলিকাময়

এ-সব অতীত
যা ঘটেছে, সে কার প্রমাদ—

ভবিষ্যৎ—
ছায়াচর, ভ্রাম্য, মহাপ্রস্থানে বর্তায়—

কিন্তু, পুরুষার্থ আজ—তাই চেয়ে নিলে
পাশুপত

শিঙা ও শিকারী, ফের
আরণ্যক—
কোলাহল ধায়

ধেয়ে আসে পশু, চণ্ড,
দানবিক—

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে, অনুবন্ধে
কে যেন আবার
টঙ্কারে জাগাতে লয়—

কিরাত ও অর্জুনের
পূর্বকৃতি ॥

এই নাও শস্য

কৃষ্ণ ধর

হাত পাতো তোমার জন্য এনেছি শস্য
তোমার ক্ষিধে মেটাবে
অনেকদিন তোমাকে দাক্ষিণ্য দেখায় নি
এই প্রাচীন পরিচিত মাটি
খরায় তার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল

এখন তোমাকে দেবে বলেই
চেয়ে দেখো প্রান্তর জুড়ে কী সবুজের সমারোহ
এর প্রতিটি দানার ভেতরে রয়েছে
সৃষ্টির আশ্চর্য প্রতিভা
এসো আমরা সবাই মিলে শস্যের স্তবগান করি
ক্ষুধার্ত বসুন্ধরার হতভাগ্য সন্ততিদের জন্য

এই শস্য কে মাটির গর্ভ থেকে তুলে এনেছে
এদেরই পূর্বপুরুষ
তাদের মুখ থেকে যারা কেড়ে নিচ্ছে শস্যের আস্বাদ
তারা দেখুক, শস্যকে ঘরে তোলবার জন্য
সারা পৃথিবী জুড়ে পাহারা বসিয়েছে ক্ষুধার্তরা
শস্যের জন্য তাদের সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ
মাটি ও আকাশের সূর্য তাদের সাক্ষী

শস্যের সঙ্গেই তাদের রাত্রিদিন বসবাস
এমন একটি স্বপ্ন তারা অনেকদিন বুকের ভেতরে
পুষে রেখেছে সংগোপনে
এসো, ওদের স্বপ্নের দরজায় আলতো ছোঁয়া দিই
এখন ক্ষিদে নিয়েই ওরা জেগে উঠবে
শস্যের স্বপ্ন ওদের চোখে লেগে আছে।

বিনিময়

সুনীল কুমার নন্দী

কথার চাতুরী জানো, জানো না তো
বুকের গভীর থেকে উঠে আসা
রক্তের উষ্ণতাবহ ভাষা কাকে বলে।

তোমার স্বভাবে তাকে কত ব্যথা
দিয়েছ, তা ভুলে যেতে চায় যেন
বিনিময়ে বুক থেকে টেনে এনে ঘৃণা—

তা কিনা রয়েছে মিশে, রাত্রিদিন
রাগে-অনুরাগে গড়া তুলির ভাষায়।

কথোপকথন

পূর্ণেন্দু পত্রী

শুভঙ্কর

আমার নির্মান-কাজে আর কেন পাইনা তোমাকে ?
আমার নির্মান-কাজও তাই বেঁকে গেছে অন্য মুখে।

রথের চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছো ?
শুনতে পাচ্ছো ভাঙা হাড় কাৎরাচ্ছে কেমন ?
রথের চাকার ডাকে এখন শুয়েছি রাজ পথে।
এ সময় অস্থিহীন
তাই তার অন্য এক দধীচিকে চাই।

তোমাকে দিয়েছি সব,
দিইনি কেবল
এই অস্থিখণ্ডগুলি, যা বজ্রের স্বরলিপি জানে।
বৃহৎ বিশ্বের জন্যে
এ আমার সামান্যই দান।

নন্দিনী

কী করে যে এত বদলালে।
তোমার আগের ভাষা হারিয়ে গিয়েছে।
তুমিও বয়স্ক হলে,
নত হলে জরার শাসনে ?

অথচ আমার চোখে
এখনো মুকুট-পরা তুমি।
তোমার মাথার পরে রাজছত্র টাঙানো এখনো।

যে-সব নক্ষত্র আজো পূর্বপুরুষের
মনস্বীতার আলো নিজেদের হাড়ে-মাসে জীইয়ে রেখেছে
শালিকের চড়ুয়ের মতো তারা উড়ে উড়ে ছুটে ছুটে আসে
তোমার চোখের মধ্যে
স্থায়ী কোনো ঠিকানার ঘর বাড়ি গড়বার টানে।

শুভঙ্কর, কেন তুমি বেছে নিলে এই নির্বাসন ?
কেন এত অভিমান ?
কি পাওনি যে এত অভিমান ?

শুভঙ্কর

কোনো বীজ না রেখেই
আমি চাইবো বড় হোক আমার নিজস্ব অভিমান।

এই জঙ্গলের দেশ
বিশল্য করনীহীন দেশ
আরো রক্তক্ষত হোক কাঁটায় কাঁটায় বিষে বিষে
চাইবো না কখনো।
কোনো বীজ না রেখেই
চলে যাবো, অত্যন্ত গোপনে
যেখানে মহান সব বৃক্ষ কিংবা ওষধিলতারা
বিশ্বভুবনের জন্যে জেবলে যাচ্ছে নক্ষত্র-প্রদীপ।

নন্দিনী

সর্বস্বের উপহার দিলে যদি এই ধ্বংসস্রোত
রোখা যেত, অবশ্য দিতাম।

আমার সর্বস্ব আর আগেকার রাজবাড়ী নেই।
কোঅপারেটিভ সব ফ্ল্যাটের মতন
সেখানে অসংখ্য অংশীদার।
এইটা স্বামীর আর ঐগুলো
শিশু সন্তানের।
এটা বৃদ্ধা শাশুড়ীর
এদিকের-ওদিকের আরো সব কুঠরি-কোঠর
আত্মীয়-স্বজনে ভাগাভাগি।

দ্রৌপদীর মতো আমি
যদিও তা ভিন্ন অর্থে, নিশ্চয় বুঝেছ।
তোমাকে আগের মতো সর্ব্বস্ব দেওয়ার সাধ্য নেই।
তবু পারি, তবু পারি,
স্রোতস্বিনী ভাঁটায় মরে না

আমার শরীর থেকে সমস্ত আগুন চুরি করে
একদিন মৃগয়ায় জয়ী হয়েছিলে।
আজ আমি অন্য এক আগুনের ধূপ দীপ সব জেলে দেবো।
কত উর্মিরোল গেলে
বলো তুমি, ভুলবে প্রস্থান ?

শুভঙ্কর

কেউ কি আমাকে চায়,
আমি কি কারোর প্রয়োজন ?

শতাব্দীর অর্ধেকেরও চেয়ে বেশি সময় একাকী
অকাল গড়ে গেছি উৎসবের যথাযথ সাজ।
লাল নীল সবুজের পতাকা কেটেছি কাঁচি দিয়ে

হলুদ ও বেগুনির ঝালর কেটেছি কাঁচি দিয়ে
সোনালি রুপোলি রাংতা
চাঁদমালায় এঁটে গেছি রাত জেগে জেগে।

যেসব উঠোন ফাঁকা,
তার জন্যে মাদুরি বা চাটাই বুনেছি।
সে সব বাগান ফাঁকা
গোলাপের, মশান্ডার, মালতীর, রজনীগন্ধার
টব এনে সাজিয়ে দিয়েছি।

সেই সব আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিনি কখনো
যেখানে পদক নেই,
পরিবর্তে দংশণ রয়েছে।
কবে কোন ঝড়ে আমি ছুটে যাইনি বলো
উল্কা হয়ে, অভিমন্যু হয়ে?

অথচ আজকে আমি কারো নই,
অসংখ্য ভ্রূকুটি যেন মাথার উপরে জ্বলছে
ঝাড়লণ্ঠণ।

নন্দিনী

ছিঃ শুভঙ্কর।
তুমি বুঝি শোকাতুর নগদ বিদায় পাওনি বলে?

এত জেনে, এত সব ইতিহাস পড়ে,
কী করে ভাবতে পারলে সার্থকতা কিংবা দিগ্বিজয়
ঘাস ফড়িংয়ের মতো তুড়িলাফে হাঁটে?
দুটো-একটা সমুজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়তো রয়েছে,
আর্ষ প্রয়োগের মতো তারা ঠিক নিয়মে আসে না।

ইতিহাস চিরদিন মানুষের পেরেকের গর্ত গুনে গুনে
মানব চিনেছে
এও ভুলে গেলে?

মুক্তি মুক্তি

তরুণ সান্যাল

মাদামোয়েজেল এই বাঙ্কারে গুটিশুটি বসে ওরা তিন হুন
দেদার ফিতা থেকে বুলেট করাচ্ছিল
দিলাম সপাটে ঝেড়ে কোমরবন্ধ থেকে খুলে গ্রেনেড
তিন নম্বর ফ্রিৎস্‌টি দু'হাত মাথার উপরে তুলতে না তুলতেই
পাঁজরে গেঁথে দিলাম বেঅনেট···ও ও ও গট···

এমনি আমরা হাঁচোর পাঁচোর নেমেছিলাম নরম্যাণ্ডিতে

নীচের দিকে তালগোল পাকিয়ে নেমে আসা মেঘের মধ্যে
কয়েক ঝাঁক বোলতা আর ভিমরুল গুঁজে দিয়েছিলেন আর্টক
ক্ষুদে ফাইটার স্পিট ফায়ার আর বম্বারে

মাদামোয়েজেল আমরা গুটিশুটি মেরে ব'সে সে দিন
টিপটিপ বৃষ্টি খাঁড়িতে হাওয়ার হানা ছুরি বেঁধাচ্ছিল যেন
আমাদের মনে ছিল ভাইবেরাদারদের জ্যোৎস্নারাতের ডান-কার্কে
আসল দুষমন ছোটোজাতগুলোতো আছে পূর্বদেশের সেই আইভানরা
হঠাৎ বেলাভূমিতে হামলা
আমাদের মেসিনগানের ফিতায় বন্দী বিষ হুলে মৌমাছিরা
ঝাঁপিয়ে পড়ছিল নিরুপায়
আমাদের পথ নেই সামনে আমাদের পথ নেই পিছনে
সমুদ্র তখন ক্বাথ থিক থিক কালো লোহায়
বালি মেশানো মরিচা লাফাচ্ছিল ল্যান্ডিং রাফ্‌ট
গা ঘিন ঘিন এক পিছল অজগর মুখ ঢোকাচ্ছিল গুহায়
ওরা বেঅনেট বেঁধাবার মুহূর্তেই খুব কাছেই কাটালাম
জিলেটিন লাঠি·· তারপর···ও ও ও গড।

মাদামোয়েজেল এই বাঙ্কারে কজন ছিল আমরা জানি না
কারা এসেছিল দখলে তাও জানি না
তবে দু কোটি মানুষের হাড়, মাংস হেজে মজে আছে স্তেপিতে

বনের মধ্যে নিরপরাধ বার্চের পাড়ায় জমে আছে
গ্যাস চেম্বারের কালো ছাই পুরু হয়ে
একেকটা শীত শুধু বরফ এনেছে
আর শীতের শেষেই বেরিয়ে এসেছে ক্রমে এখানে ওখানে
দশ আঙুলের টান করে ধরা পাঞ্জা
খোকা খুকুর লাল জুতো
রাইফেলের বাঁট
তারপর কদিন এপার ওপার ভোলগায় ধুধুমার
তারপর হঠাৎই বরফগলা জলে প্যাঁচপেঁচে কাদায়
ছন্দমেলানো বুটের শব্দ ছপছপ
দিন নেই রাত নেই
ঘর্ঘর চাকা আমাদের লরির ট্যাঙ্কের মোটরবাইকের পশ্চিমমুখো
বলতে পারো দ্বিতীয় ফ্রন্ট না খুললে
নরম্যাণ্ডিতক পৌঁছে যাবার হক ছিল আমাদের
রূপসী প্যারী তো দেখা হলো না
তাড়াহুড়ো আইকের বাহিনী ছুটেছিল তখন এসবের দিকে
পাছে বর্বর পুবের সৈনিকরা পৌঁছে যায় পশ্চিমে

মাদামোয়েজেল ওরা যখন ডি-ডের উৎসব করছিল
আমাদের ডাক পড়েনি
আমরা জার্মান চেক পোল
আমরা ম্যাগিয়ার ফরাসী ইতালীয়
আমরা···আমরা···আমরা পার্টিজান যারা

—এই ঠাণ্ডা বালি আমাদের হাড়গুলিকে ধুলোয় ধুলো বানিয়ে
মাটি করবে কবে

—এই লোনা জলের তলায় চোরা স্রোতের গা ঘেঁষে
আমাদের হাড়-পাঁজরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় চাঁদামাছের ঝাঁক
সেখানে অন্ধ অ্যান্টেনার চোখে আলো খোঁজে জলজ উদ্ভিদ
আমরা মাটি হবো কবে

—এই বরফের অনেক নীচে ঘুমিয়ে আছে
মরশুমী শীত-গমের স্বাস্থ্যের আলস্য
লাফিয়ে উঠবে তার সবুজ লক লক জিব
আমাদের মাংস-মিশল সারে ওদের নশ্বর দেহ
আ আমাদের শিশু
আমরা রুশ তাতার কাজাখ আজারবাইজানী
আমরা কবে হবো মাটিতে মাটি এক দেহ

আরেক ডি-ডের জন্যে ওরা শুয়েই রয়েছে বাল্যবেলায়

জলের তেতো ঘরে আর তৃণভূমির অবাধ বারান্দায়
পা জড়িয়ে আছে এই পৃথিবীর শিকড়বাকরের পিছুটান
মাদামোয়াজেল মাদামোয়াজেল মাদামোয়াজেল

মানুষ তুমি একটি জীবন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পথ দেখানো সোজা, কিন্তু পথটি ভোলাই কঠিন,
মানুষ তুমি একটি জীবন তেমন কাজ করে বেড়ালে !
ভালোই ছিলো মাটির জীবন, ভালোই ছিলো কালো,
মানুষ তুমি বদল চেয়ে সেই কথাটি মনে রাখোনি ।

তুমি ভীষণ আলাভোলা, তুমি ভীষণ, ভয়ংকরী,
তুমি মানুষ বদলে হলে পাথর, পথে পড়ে রইলে—
তুমি নদীর ভিতর গেলে, নাইতে নেমে কই ভেজালে
শরীর তোমার, পোড়া শরীর ? এখন নাওয়া ঠিক হলো কি ?

কলকাতার এলিয়ট

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

শুনেছি ফ্যাসিস্ট তুমি. বিশ্বাস করিনি, তবু মার্কসবাদী
তোমাকে তাই-তো বলে, যখন রিল্‌কেকে বলে হাজি মাস্তানেরা,
তুমিই কি কীট্‌সের ঠান্ডা গ্রামগীতি, নাকি বিবাদী সংবাদী
দুই স্বরে, ঘুরঘুরে পতঙ্গ যেন, রাত্রিদিন অর্ধ-পোড়া দেহ,
গোঁফ প'রে দাঁড়ি কামাবে কি কামাবে না। কে বল'তে পারে?
কখন কীভাবে তুমি কবি হ'লে অর্বছাগ মানুষপশুরে
নাকি তা হও কি তুমি? গীতাভাষ্য, হাস্যপরিহাসে
যে গান চড়ান আপনি তার তান কতো? ঘোর বনিয়াদী
বন্টন খাদির জলে কেন দিয়েছিলে. ওগো ভূত,
তারপর মগ্‌ডোলের কানে তুমি রামঠাকুরের মন্ত্র দিয়েছিলে তুমি,
আমরা খুঁজেছি, সবুজে সেই নতুন মুকুল, তার কানে সাদা দুল।
বরং শিকড়, কাঁষিত স্বর, পুরনো দিনের বিনোদনে,
এনে কতোজনা এই জ্যোৎস্নার কিছু শিসে
আমরা কবিতা লিখি, পঠনপাঠন করি ব'সে
যা বধ্য, তা সদ্য নয় ভাবি, বেশি নয়, বেশি কিছু নয়—
তুমি নিশ্চিতভাবে সাঁসেডে পাগল ছিলো কিছুদিন
আর বাঙালীরা সেই থেকে সম্পূর্ণ উন্মাদ—রোগ কখন মারে না।

এ বছরের গল্প

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনাভা-বসানো বাংলা। আধ-নেবা অন্দরে
রক্‌ আর কম্মুরের যুগল বন্দি। দরজায়
বারোশিশু মীনপুচ্ছ ধরে উঠছে বাড়ি!
একবার দম নিতে থামল শহরোপান্তের
ফাস্টফুড রেস্তরাঁয়—খাড়া পায় লাঞ্চ খাওয়া।
দু-ধারি নিপাত জল-সারাখেত। চারকোলে

ভেজা নেতা বেলা। করুণাময়ী প্রকৃতি,
নিষেধে সেন্সরে স্কাড মিসিলেও এত
শক্তি নেই। সিল্‌ক্ যান। দু পকেটে ডোল।
ছোটো স্ক্রিনে ফেটে পড়ে মিকি মাউসের
মূক নাট। কত রঙ শূন্য থেকে দেখা
দেশ দ্বীপান্বিতা জল মেখলার। এখন
পুঞ্জ বেঁধে উঠছে সব জাতপাত ঘোচানো
সফ্‌ট্‌ওয়্যারের জালে—ভাবতে ভাবতে
সাইক্লোন-দুর্গতদের প্রান্তিক অপেক্ষা
সরঙে কাঁপ হয়ে যায় ফ্যাক্‌স্ যন্ত্রে। তারও
এত আঁচ কেন গায়ে? তিতিক্ষা ভুখায়
বারোশিঙ মুড়িয়ে পড়ছে। টোল খেয়ে ওঠে
অখণ্ড দুনিয়াদারি গ্যাট্ বাণিজ্যের!
ট্রাজেডি নির্যাতিন নিয়ে পদ্যের মৌরুসি
ফের হয়ে গেছে। আজ অচ্ছিন্ন হওয়া চাই
নেট্‌ওয়ার্ক। প্রযুক্তি চাই হারা মাঠ দিয়ে।
স্বচক্ষে দেখে এসো টিভি পূর্ত বিজ্ঞান
যায় নি যেখানে—স্বেচ্ছা রক্ত কিড্‌নি বেচে
দিন যায় বুভুক্ষু পাল। ক্রেডিট কার্ডের
আগে তুলে দাও শিশুজননের পাশ···
সিল্‌ক্ যান। নরম চারকোলে ভেজা বেলা।
ছোটো স্ক্রিনে ফেটে পড়ে মিকি মাউসের
মূক নাট। দম নিতে থামা শহরোপান্তের
পিংসা আর বিট্‌ল্ গানের ঝোঁকটাতে···

বিনষ্টি সমাচার

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

তুমি আমার মুখে একচামচ মদির জ্যোৎস্না তুলে দিতে চাও,
দরকার নেই।
তুমি আমার আধখানাকে অন্ধকার স্যাঁত স্যাঁতে পাতালে
চালান করে দিয়ে
বাকি আধখানাকে পক্ষীরাজে বসিয়ে
দেশদেশান্তর ঘোরাবার ছলে
তোমার পরিকল্পিত স্বপ্ন দেখাও—
প্রয়োজন নেই।
তুমি আমার শতচ্ছিন্ন শরীরে
তোমার মাপের একটা জামা পরিয়ে
চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়া দিয়ে
মাদারির খেল্ দেখাও—
সেটাই স্বাভাবিক।
তুমি আমাকে নিয়ে জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে
লোফালুফি খেলতে খেলতে
একপাশ নেচে নাও—
অবশ্যই তুমি তা পারো।
আমি কিন্তু ছুঁয়ে আছি
স্কুলছুটির পরে মা'র জন্য দাঁড়িয়ে-থাকা শিশুটির দুচোখের পলক,
আমি স্পর্শ করে আছি—
সুদূরে নীহারিকা মণ্ডলীর প্রখরতম জ্যোতিষ্কটির জঙ্গম জ্যোতির্বলয়,
আমি জেগে আছি
নদীর চোখের জল উপচে-ওঠা একটি ছোট্ট ভেলার উপরে,
সারাটি রাত।
তাই, আমার সীমানার বাইরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে
তোমাকেই আমি
ভোট দেবো,
যাতে তুমি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাও।

আত্মসমীক্ষা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অফুরান সুখ ? সেও তো গল্প কথা।
আছে কি কোথাও তোমার আমার পৃথিবীর সীমাস্বর্গে ?
এতো জীবনের বৈভব, এতো বাণীর প্রগল্‌ভতা !
জীবনানন্দ দেখেছেন, কার হৃদয় জুড়োলো সর্গে।

মর্গে কি তার জুড়োলো হৃদয় ; কে জানে—পেয়েছে শান্তি ?
ঘরে যার ছিল বধূ আর শিশু, প্রয়োজন মতো বিত্ত ;
কোন বিপন্ন বিস্ময় সেই যুবকের আনে ক্লান্তি ?
মনে হয়েছিলো মৃত্যুই পথ, এ জীবন উদ্‌বৃত্ত ?

প্রশ্ন শুধু কি প্রশ্নই থাকে ? মেলে না খুঁজেও উত্তর ?
আমার ঠাকুমা ঘুমপাড়ানিয়া গানটি যখন গাইতেন
আমি ঢুলতাম ঘুমে তার কোলে, সেদিনো তো মন্বন্তর।
তবু মুখে তার কিসের তৃপ্তির নিখাদ নিটোল মগ্ন ?

ছিলো না কি তার বঞ্চনা ব্যথা, নিরাময়হীন দুঃখ ?
স্বামীর অকাল মৃত্যু, তিনটি নাবালক অপোগণ্ড
শিশুদের নিয়ে পৃথিবীর এই কঠিন কঠোর রুক্ষ
পথ পার হ'তে হয়েছে। স্বস্তি ছিলো তার একখণ্ড ?

বাঁকুড়ার পথে দেখেছি আকাশমণি, শাল তাল বৃক্ষ
নীরস পাথর ফাটিয়ে বাঁধার জন্যেই করে সংগ্রাম ;
তাকে প্রাণ দিতে উৎসুক মাটি বাতাস অন্তরীক্ষ,
তেমনি কঠোর সহজ-সাধনা ঠাকুমা করেছে অবিরাম।

বাবা হয়েছেন জেরবার শুধু জোটাতে দু'মুঠো অন্য,
দুর্ভিক্ষের দিনগুলি তিনি কাটাতেন উৎকণ্ঠায় ;
কোনো তল নেই পার নেই, দেখে হতেন কি অবসন্ন ?
কী জ্যোতি জ্বলতো তাঁর চোখে বসে জপে তপে প্রতিসন্ধ্যায়।

মৈনুদ্দিন চাচীকে দেখেছি, কী সুখ পড়ছে উছলে,
কালো গাইটাকে আদর করছে, দু'চোখে আরাম তৃপ্তি।
দারিদ্র তার সঙ্গী, ভাবেনি—কি হবে দুঃখ ঘুচলে,
খোদাই জানেন, বিশ্বাসে তার চোখের মণিতে দীপ্তি।

ওদের যা ছিলো, আমাদের নেই। ভাসছি পদ্মপত্রে।
বিস্ময় নেই। স্বপ্ন মরেছে, ঈশ্বরও নিষ্ক্রান্ত।
বিক্ষোভ আর বিষাদ, আমারি কবিতার প্রতিছত্রে ;
বিশাল খাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমরাও বিভ্রান্ত।

শুধুই ভাঙছে। নির্মাণ নেই। কোথাও বাতিস্তম্ভ
দেখি না। শুধুই উত্তাল ঢেউ। আমার জাহাজ টলছে।
কম্পাস নেই। দিগভ্রান্তই, শূন্যে নিরাবলম্ব।
সারাটা সান্ধ্য আকাশ জুড়েই শত শত চিতা জ্বলছে।

ভাইসব

কমলেশ সেন

ভাইসব, আমরা মরে মরে সব ফতুর হয়ে গেলাম
কার পকেটে কতোটুকু আত্মা কতোটুকু চোখের জল কতোটুক ভয় আছে
কে জানে।
যখন আমার জন্ম হয়েছিল
আমার মা আমার মুখে পুরে দিয়েছিলেন তাঁর স্তন
আমার মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর সবটুকু
দুধের উষ্ণতা।

ঘোড়ার বাচ্চার মতো আমি টগবগ করতে করতে
বড় হয়ে উঠেছিলাম
মা বলেছিলেন, এ-সংসারে ঘোড়ার চালের মতো
পা ফেলিস, বাছা।

বাছা, কিছুই বোঝেনি।

জ্ঞানের ভাণ্ডার তার অতো বিরাট ছিল না
এক রত্তি জ্ঞান নিয়ে
সে তার মাথার ওপর চাঁদের মতো আকাশ ধরতে চেয়েছিল
পকেটের শূন্যতার মধ্যে রাখতে চেয়েছিল
পাথরের ভাঙা-শব্দ পাখির কোলাহল।

আমি ভালোবাসতে গিয়ে বারবার হেরে গিয়েছি
জং-ধরা তরোয়ালের মতো নিজেকেই নিজে খেয়ে ফেলেছি
ঝুরঝুরে করে ভেঙে পড়েছি
মাটির ওপর।

শুধু একটা চাঁদ নিয়ে কী
পৃথিবীর এতো দিনের অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে
ছায়ার মতো ধরে রাখা যায়।

এ-হাত থেকে ও-হাতে রাখছি পতাকার গাঢ় রঙ
একটা পতাকার নিচে কতো মাথা আশ্রয় নেবে
কতো বুকের কথা উজাড় করে দেবে।

ফাঁসীতে যাওয়ার আগে খুন হওয়ার মুহূর্তে বন্দীজীবনের
ক্ষণে
বারবার মনে পড়ে যায় মার কথা।

মুখ-ভর্তি বুক-ভর্তি দুধের কী স্বাদ।

সবুজ ঘাস ছেয়ে গেছে আমার সারা শরীরে
সবুজ বৃক্ষের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে
আমার একান্ত মরণ।

মুক্তোর মতো চোখের জল
খোলা কলমের মুখে জ্বল জ্বল করে উঠছে

আর কতো দিন পৃথিবীর দখল নেয়ার জন্যে
কবিতা লিখবে ভাই,
জীবনটা পাত করে দেবে!

যে কোনো

ভাস্কর চক্রবর্তী

যে কোনো খবর আমরা খেয়ে ফেলি দু দশ মিনিটে
যে কোনো মানুষ আমরা ভেঙে দিই খেয়ালবশত
যে কোনো শহর আমরা কেড়ে নিই দুটো তুড়ি দিয়ে
যে কোনো নারীকে আমরা ভালোবাসি রাক্ষসের মতো।

বসন্তবাতাস আজো ঠিকঠাক বসন্তঋতুতে
চড়ুই পাখিটা এসে খড়কুটো নিয়ে যাচ্ছে ঘড়ে
কাদের মেয়ে গো তুমি ফুটপাথে ধুলো মাখছো একা
শান্তি চাই শান্তি চাই শান্তি গড়বড়ে।

যে কোনো নরকে-আমরা বসে থাকি হাত—পা গুটিয়ে
যে কোনো আকাশ আমরা আঙুল হেলিয়ে করি ছাই
যে কোনো কুমারী আমরা কিলোদরে চাপাই পাল্লায়
আচ্ছা বেশ, বলি তবে : সামান্য অভদ্র হতে চাই।

কেউ যদি

রত্নেশ্বর হাজরা

দুঃখ নিয়ে কেউ যদি উপহাস করে
দুঃখ নিজেও তাকে আদর করে না—
তার জন্য কোনো ছায়া লুকিয়েও রাখে না বাগান
মাদার গাছের লাল ফুল
তার জন্য নয়—শীতকালে।
হঠাৎ যদি বা আসে অতিথির মতো
জল বা আসন তাকে দেয় না সংসা —
তার জন্য বানায় না শিখরের হিম দিয়ে পাখা
রবিবার গ্রীষ্মের দুপুরে—

দুঃখ নিয়ে কেউ যদি উপহাস করে
দুঃখ নিজেও তাকে আত্মীয় ভাবে না।

তাকে খেয়া পার হতে ডাকে না বিকেলবেলা মাঝি
সব নৌকো অন্য পাড়ে যায়—
সমীহ করে না তাকে স্রোত।
তার জন্য পুকুরের জলটুকু ঘোলা হয়ে ওঠে
সবুজের খুব জ্বর হয়—
তার জন্য সমাজের ভিতরে ভিতরে
অপরাধবোধ বাড়তে থাকে
তার জন্য ভালোবাসা থাকে না নিজের পোষা টিয়া পাখিটারও—

ক্ষমা

গণেশ বসু

তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া বাকি
আমার কাছে তোমার কিছু দুঃখ জমা
তোমার মুখে ছড়িয়ে থাকে উদাস অমা
নিজের মুখ নিজের কাছে লুকিয়ে রাখি।

আমার কাছে ছন্দ খোঁজো, ছন্দ নেই;
তোমার কাছে অসীম আমি মিলবিহীন।
চিতার চোখে দুপুর জ্বলে, রাত্রিদিন
বেহাগ বাজে শরীরময় সংগীতেই।

তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া বাকি
হারিয়ে যাই হারিয়ে যাই ভীষণ ভয়
পৃথুল স্মৃতি ভরেই থাকে তোমার জয়
পরাজয়ের অন্ধকারে এ-মুখ ঢাকি।

তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া বাকি।

মাছের কাহিনী

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সাঁতার কাটতে কাটতে কবে যে মাছ হয়ে গেছি, জানি না—
জল কি সে-কথা জানে ?
আমার যা কিছু, ভাসিয়ে দিয়েছি লৌকিক সাম্পানে।
প্রতি রোমকূপে ঘাই মারে পুঁটি, পোনা,
পরিণামহীনতায়
অশ্রু আমার মিষ্টি জলের পুকুর করেছে নোনা।

জন্মাভটের টান লাগতেই যেই ভাবি—দেখে আসি,
কালবউশের লেজের ঝাপটে অমনি তীক্ষ্ণ বাঁশি
তর্জনি তুলে শাসায়,
তরল আগুনে পুড়েছে আমার ঘরে ফিরবার আশা।

একে স্নান বলে ? এই কি প্রক্ষালন ?
যেদিকে তাকাই, শ্যাওলা-দামের ঘনিষ্ঠ বন্ধন
মেলেছে সবুজ মায়া,
রৌদ্রদিনের বাসনা ঢেকেছে দীর্ঘ সজল ছায়া।
প্রিয় নদী কাঁদে,
শ্রবণ বিছিয়ে সে-কান্না শুধু শোনা—
ঢেউয়ের লহরে লহরে
অশ্রু আমার মিস্টি জলের পুকুর করেছে নোনা।

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

অভ্র ঘোষ

'স্বদেশী সমাজ' গঠনের জন্য একটি সংবিধান রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে। সেই অনুষ্ঠানপত্রে লেখা হয়েছিল, '...আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব-মোচন ও কর্তব্য-সাধন আমরা নিজে করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে-সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।' আত্মশাসনের এই প্রতিজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতার চিন্তায় কেন্দ্রীয় বিষয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার ক্ষেত্রেও তিনি অ্যাজিটেশনমুখী রাজনীতির চাইতে আত্মশক্তিচর্চার নিবিড় আয়োজনের একান্ত পক্ষপাতী। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পূর্বে কিংবা গান্ধিযুগে অসহযোগ-আইন অমান্য আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ গঠনাত্মক আন্দোলনের কথাই বারবার বলেছেন, হাতে কলমে করে দেখিয়েছেনও নিজে। শিলাইদহ পতিসরে গ্রামীণ পুনর্গঠনের বহুমুখী পরিকল্পনা যেমন ছিল, পরবর্তীকালে তেমনি গড়ে উঠেছিল শ্রীনিকেতন প্রকল্পের ব্যাপক আয়োজন। এইসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর 'স্বদেশী সমাজ'-এর ধারণাটির কথা, আত্মোদ্বোধনের নিরন্তর চর্চা করে কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, তার কথা। তাঁর সমকালে কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবেরা ও অনুরাগী মানুষজনের কেউ কেউ নিশ্চয়ই এসব কাজে এগিয়ে এসেছিলেন নিঃশর্তভাবেই, কিন্তু সেসব মানুষের সংখ্যা কখনোই বিপুল ছিল না। বরং রাজনৈতিক মহলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মশক্তিচর্চা-সংক্রান্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে ধিক্কৃতই হয়েছেন প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে। তাঁর লালিত প্রতিজ্ঞা-বিশ্বাস, তাঁর একান্ত সহযোগী বন্ধুরাও সব সময়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। বন্ধুদের মনে হত এসব নেহাতই কবির রোমান্টিক মনের ভাবনা, অবাস্তব ইউটোপিয়া। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ, শ্রীনিকেতনের পল্লী-উন্নয়নচিন্তা, কিংবা শিলাইদহ পতিসরের সমবায় আন্দোলন, যৌথ খামার বা কৃষি ব্যাঙ্কের নীতি-প্রকল্প বাইরে থেকে বাহবা পেলেও দেশবাসীর সক্রিয় সমর্থন পেয়েছে, তা কখনোই বলা যাবে না।

'স্বদেশী সমাজ' গঠনের এইসব কথাবার্তার অবতারণা কেন হঠাৎ—এ প্রশ্ন জাগতে পারে পাঠকের মনে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গঠনের চিন্তাতেও যে এই স্বদেশী সমাজের ধারণা যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল, সেকথা মনে রাখা দরকার। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটিকে, তার বৃত্তান্ত যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে স্বদেশী সমাজের ধারণাটির কথা আমাদের বারবার মনে পড়বে।

১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাহিত্য পরিষৎ। তার বছরখানেক আগে ১৮৯৩-এ তৈরি হয়েছিল বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার, লুই লিওটার্ড নামে একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী সাহেবের উৎসাহ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ও প্রসারের জন্য লিওটার্ড প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল অ্যাকাডেমিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন দেশীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, যেমন, শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি। সম্পাদক হিসেবে এই সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন আরেক বাঙালি, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী।

বাংলা ব্যাকরণ, অভিধান ও ভাষাচর্চা বিষয়ে উৎসাহী বিভিন্ন বিদেশী পণ্ডিতেরাও বেঙ্গল অ্যাকাডেমি গঠনে উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। জন বিমস, ম্যাক্সমূলার, হান্টার, বার্ডউড, মনিয়র উইলিয়ামস প্রমুখ বিদগ্ধজনেরা এই অ্যাকাডেমির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন এবং কীভাবে এই অ্যাকাডেমি বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার মূল্যবান কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে, সেবিষয়ে নানা পরামর্শ পাঠাতেও শুরু করলেন। জন বিমস তাঁর রচিত বাংলা ব্যাকরণের খসড়া-প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য পেশও করেছিলেন এই সভায়। কয়েক মাসের মধ্যেই অ্যাকাডেমি বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং মাসে মাসে তার এক জার্নালও প্রকাশিত হতে শুরু করল। বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রাসাদেই অ্যাকাডেমির অফিস তৈরি হল, মাসিক সভা-আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রও হয়ে উঠল রাজবাড়ি। বলা বাহুল্য, বিনয়কৃষ্ণ দেবই ছিলেন অ্যাকাডেমির সভাপতি।

বেঙ্গল অ্যাকাডেমির কাজকর্ম হত ইংরেজি ভাষায়, তার জার্নালের ভাষাও ছিল মূলত ইংরেজি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য অ্যাকাডেমির এই ইংরেজি নির্ভরতার বিরুদ্ধে কয়েক মাসের মধ্যেই এক আন্দোলন তৈরি হল। আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন প্রবীণ বাঙালি ভাবুক রাজনারায়ণ বসু। ইংরেজি

ভাষায় কেন লেখা হবে অ্যাকাডেমির কার্যবিবরণ. জার্নালের প্রবন্ধ-নিবন্ধের ভাষাই বা কেন হবে ইংরেজি. আর সদস্যরাও কেন অধিকাংশ আলাপ আলোচনা করেন ইংরেজি ভাষায়—এইসব আপত্তির কথা জানালেন রাজনারায়ণ বসু চিঠি লিখে। রাজনারায়ণের সমর্থনে এগিয়ে এলেন উমেশচন্দ্র বটব্যাল. প্রস্তাব করলেন 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমির' পরিবর্তে এর নামকরণ করা হোক 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'। এই রকম নানান প্রস্তাব আর আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে লিওটার্ডের বেঙ্গল অ্যাকাডেমির মূল চেহারা পরিবর্তিত হল অনেকটাই। ১৮৯৪-এর ২৯ এপ্রিল সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ দেব পরিষৎ পুনর্গঠনের জন্য এক সাধারণ সভা আহ্বান করলেন। এই সভাতেই বিনয়কৃষ্ণ সভাপতির পদ থেকে সরে এলেন এবং নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। লিওটার্ড অবশ্য তখনও পর্যন্ত পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু দু-তিন মাসের মধ্যেই তিনি পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

১৮৯৪-এর ২৯ এপ্রিলে নতুন কর্মসমিতি গঠন করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য এক অনন্য কেন্দ্র হিসেবে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পেল। সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে নতুন কর্মসমিতিতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। কিন্তু পরিষদের রীতি-অনুযায়ী সহ-সভাপতি পদে একজন নন, থাকতে হবে একাধিক ব্যক্তিকে। সেই কারণে ১৭ জুন আরও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বস্তুত এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিষদের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের সূচনা। বেঙ্গল অ্যাকাডেমির সদস্য হিসেবে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না ইতিপূর্বে। যদিও পরিষদের মুখপত্রের অষ্টম সংখ্যায় (১০ মার্চ, ১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধ তিনটি ছিল 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'কর্ত্তব্যনীতি', 'বিনি পয়সায় ভোজ', 'ইংরাজের আতঙ্ক'। অ্যাকাডেমির মুখপত্রে তাঁর রচনার সমালোচনা হলেও রবীন্দ্রনাথকে অ্যাকাডেমির সদস্য হতে কখনো বলা হয়েছিল কি না, এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। যদি বলা হয়েও থাকে রবীন্দ্রনাথ যে সে-আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, কারণ ১৮৯৪-এর জুন মাসের সভাতেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথ সহ-সভাপতি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন প্রথম. তার আগে অ্যাকাডেমির সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের কোন যোগাযোগ ছিল না।

সাহিত্য পরিষদের প্রথম বাৎসরিক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হল ১৮৯৫-এর ৬ ও

৩ই এপ্রিল। ৬ই এপ্রিলের বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার সহ সভাপতি নির্বাচিত হলেন নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে এবং রমেশচন্দ্রও সভাপতিপদে বৃত রইলেন। তার পরের দিন ৭ই এপ্রিল বাৎসরিক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় শোভাবাজারের রাজবাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। পরিষদের কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে, "...বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ধ্বজা পতাকা, পত্র পুষ্পমালায় পরিশোভিত হইল। প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গৃহসমূহ সুন্দর কার্পেট, সুন্দর চেয়ার, সুরঞ্জিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় চারিশত লোক সভাস্থল পূর্ণ করিয়া বসিলেন।' সভার সূচনায় পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট অনুপস্থিত সদস্যের চিঠি পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং তারপর সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যে-নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য'। কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে আরও যে, '...তাহার পর সভাস্থ সকলেই প্রাঙ্গণের সম্মুখবর্তী সুসজ্জিত, প্রশস্ত ও দীপালোক সমুজ্জ্বল গৃহে উপস্থিত হইয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া সাহিত্যালাপ করিতে লাগিলেন। সেই গৃহের এক পার্শ্বে প্রীতিভোজনেও সামান্যরূপে ব্যবস্থা ছিল; ...ইতিমধ্যে বিখ্যাত চণ্ডীগায়ক শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ স্বর্ণকার প্রাঙ্গণ মধ্যে স্বদলের সহিত গানারম্ভ করিলেন। এদিকে গৃহের ভিতর হারমোনিয়ম সংযোগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সুকণ্ঠ গায়কগণ সংগীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।' রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবসভায় কী কী গান করেছিলেন, তার কোন উল্লেখ এই কার্যবিবরণীতে নেই, রবীন্দ্রজীবনীকারেরাও তার কোন হদিশ দিতে পারেন নি এখনও। তবে রাত্রি দশটা পর্যন্ত এই মজলিশে যে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে পরিষৎ-কর্মীরা গান-বাজনা করেছিলেন, তা কার্যবিবরণী পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। বিনয়কৃষ্ণের প্রাসাদে পরিষদের কাজকর্ম চলতে থাকুক, এরকম ব্যবস্থা সদস্যদের অনেকেরই পছন্দ হচ্ছিল না। পরিষদের বয়স যখন প্রায় ছ-বছর তখন, অর্থাৎ ১৯০০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, পরিষদের সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি লিখলেন সমিতির কিছু কিছু মাননীয় সদস্য। তাঁরা লিখলেন, 'সবিনয় নিবেদন, পরিষদের অধিবেশন ও কার্য্যালয় যাহাতে কোন সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত হয়, তাহা ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং তৎসম্পর্কে নিয়মাবলীর আবশ্যিক পরিবর্ত্তন করিবার জন্য, আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র পরিষদের

একটী বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করেন, আমাদের এই বিনীত অনুরোধ জানিবেন।' এই চিঠিতে যাঁদের সই ছিল তাঁদের মধ্যে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ এগারোজনের নাম। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবের পক্ষে যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাও অনুমান করা যায়, কেননা চিঠির প্রথম স্বাক্ষরদাতা ছিলেন তিনিই। তাছাড়া এই চিঠির দাবি অনুযায়ী পরিষদের স্থান পরিবর্তনের জন্য যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল ১৯শে ফেব্রুয়ারিতে, সেই সভাতেও রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন, '...পরিষদের কার্য্যালয় কোন সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত হউক, পরিষদের অধিবেশন সেখানেই হইবে।...পরিষৎ যদি আপনার শক্তিতে আপনি স্বতন্ত্র স্থানে স্থানান্তরিত হইতে পারে, তবে তাহাতে তাহার হিতার্থী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সকলের অপেক্ষা অধিক আনন্দ ; আর তিনি যখন শুনিবেন যে অদ্যকার এই আলোচনার নানা ব্যক্তিগত কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইবেন। তবে আশা করা যায়, বঙ্গসাহিত্যের মুখ চাহিয়া আমরা এসকল ভুলিব।. পরিষৎ সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার সময় আসিয়াছে। এই বিশ্বাসে আমি ত পূর্বেও একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু সমর্থন করার পর সভায় তীব্র বাদানুবাদের সূচনা হয় এবং বিরুদ্ধবাদীরা সভা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পাবার পর রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরের দিন অর্থাৎ ১৯০০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি পরিষৎ ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে উঠে আসে। এই স্থান পরিবর্তনের সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের কাঁধে করে যে পরিষদের বই-পুস্তক নতুন ভাড়াবাড়িতে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সেকথা জানতে পারছি সজনীকান্তের এক বক্তৃতা থেকে। পরিষৎ সভাপতি সজনীকান্ত তাঁর এক বার্ষিক বক্তৃতায় বলেছেন, '...৩ ফাল্গুন ১৩০৬, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০০, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরদিনই অর্থাৎ ৪ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার পরিষৎ স্বাধীনভাবে ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কাঁধে করিয়া পরিষৎ-গ্রন্থাগারের পুস্তক বহন করিয়াছিলেন।' সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণে উল্লেখিত তারিখের সঙ্গে সজনীকান্তের দেওয়া তারিখের গরমিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তবে এক্ষেত্রে কার্যবিবরণীকে নির্ভর করাই বোধহয় যুক্তিসিদ্ধ হবে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হলেন ২৯শে জুলাই ১৮৯৪ সালে। কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ ১৮৯৪-এর ডিসেম্বরেই তিনি অন্যতর সম্পাদক পদে বৃত হলেন। আর ১১০৪ সালে তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যার ব্যাপ্তি ছিল ১৯১১ পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে. সাহিত্য পরিষৎকে বাংলা ভাষাচর্চার সর্বপ্রধান কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে তাঁর উদ্যম, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক প্রতিভাই ছিল সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পরিষদের বহুমুখী কাজকর্মের বিস্তার ঘটাবার আয়োজন করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর এবং তাঁর একনিষ্ঠ সেবা ও পরিশ্রমের জন্যই সম্ভব হয়েছিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে পরিষদের নিজস্ব ভবনে পরিষৎকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা। বস্তুত এই পরিষৎ-মন্দির নির্মাণ ও পরিষদের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের কান্ডারী রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুগামী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাবগত নেতৃত্বের জোরেই তিনি ওই সব কর্মকাণ্ডের সফল রূপকার হতে পেরেছিলেন। কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে (১৩২০, ২৭-২৯ চৈত্র) বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্য পরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধ হইতে ঢাক নামাইয়া পরিষদের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা এবং অন্যের উপদেশ গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি, তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি।'

রবীন্দ্রনাথই প্রস্তাব করেছিলেন যে সাহিত্য পরিষদের কার্যক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তৃত হওয়া দরকার। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞাতব্য থাকতে পারে সাহিত্য পরিষৎ যদি সেই বার্তা সংগ্রহ করে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে পারে, তাহলেই পরিষৎ-নির্মাণ সার্থক হবে। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাই রূপ পেয়েছিল বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে শাখা পরিষৎ গঠন, বাৎসরিক সাহিত্য সম্মিলন আয়োজন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

প্রায় তিরিশটি শাখা পরিষৎ তৈরি হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। এবং ওই শাখাগুলি তাদের আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার নানা সম্পদ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেশকে জানবার বুঝবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই শাখা-পরিষৎগুলিকে সঠিক কী কাজে ব্রতী করতে উদ্যোগী করা হয়েছিল, তার এক স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যাবে শাখা-পরিষদের উদ্দেশ্য বিষয়ে পরিষদের সংবিধান

থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করলে। বলা হয়েছিল, 'বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতি সাধনই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রধানতঃ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের আলোচনার সহিত শাখা-পরিষৎসমূহ বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিবেন—(ক) স্থানীয় প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং ইহার বিবরণ প্রকাশ। (খ) স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থাকারদিগের জীবনচরিত, প্রতিকৃতি ও অন্যান্য স্মৃতিনিদর্শন সংগ্রহ। (গ) গ্রাম্য সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, উপকথা, গীত, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ। (ঘ) স্থানীয় ভাষায় চলিত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ এবং তৎসহ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, গৃহসজ্জা, উদ্ভিদ, জীব প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ। (ঙ) সর্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির উত্তর বিভক্তিযোগে প্রাদেশিক রূপভেদ সঙ্কলন। (চ) স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ। (ছ) স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ এবং তৎসহিত তীর্থস্থান, মন্দির, দুর্গ প্রভৃতির ছায়াচিত্রাদি সহ বিবরণ সংগ্রহ। (জ) স্থানীয় ধর্ম-সম্প্রদায়েব ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার ব্যবহার ইত্যাদির বিবরণ সংগ্রহ।'

শাখা-পরিষৎগুলি প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও ছোট বড় রিপোর্ট ইত্যাদিতে কিছু যে কাজ হয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এবং এই কাজগুলি করা যে কত জরুরি, পারিপার্শ্বিককে না জেনে আপন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ না করে যে সামাজিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতার এতোটুকু বিস্তার ঘটানো যায় না, তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি এখনও। রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, 'দেশকে ভালবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্ত্তব্য দেশকে জানা—এই কথাটা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে উল্লেখমাত্র করাই বাহুল্য।···না জানিলে দেশের কাজ করা যায় না—এই জানিবার চর্চাই ভালবাসার চর্চা। দেশের ছোট বড় সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আমার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। নইলে দেশহিত সম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে সকল বড় বড় কথা বার্ক-মেকলের ভাষায় আবৃত্তি করিতে থাকি, সেগুলো বড়ই বেসুরো শোনায়।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরিষৎকে দিয়েছিলেন তাঁর সংগৃহীত ৮২টি সংস্কৃত পুঁথি, লিখেছিলেন ছেলে ভুলানো ছড়া বা মেয়েলি ছড়া বিষয় নিবন্ধ, আর বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত নানা সমস্যা-বিষয়ে

প্রবন্ধ-নিবন্ধ। 'বাংলা শব্দ দ্বৈত,' 'বাংলা 'ধন্যাত্মক শব্দ,' 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত,' 'শব্দ চয়ন,' 'বাংলা ভাষা পরিচয়ের ভূমিকা' ইত্যাদি তার নমুনা।

দেশের সমগ্র সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠুক সাহিত্য-পরিষৎ—এই চিন্তা থেকেই বাংলাদেশের জেলায় জেলায় বাৎসরিক মিলনোৎসব করার পরামর্শও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার থেকেই বাৎসরিক সাহিত্য সম্মিলনের উৎপত্তি। দেশের সাহিত্যিক-শিল্পী-বিজ্ঞানীরা একে অপরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলুন, ভাব বিনিময় করুন—এমনটাই ছিল এইসব সাহিত্য সম্মিলনীর লক্ষ্য। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত খুব সমারোহ করেই পরিষদের উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সাহিত্য সম্মিলন বছরে বছরে। প্রথম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭–১৮ কার্তিক, ১৩১৪ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজারে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মূল সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তথ্য হিসেবে এইটি প্রথম সম্মিলন বটে, কিন্তু তা নাও হতে পারত। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন কর্জনের আইন বাংলাদেশকে দু-টুকরো করে দিলে রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর রাখীবন্ধনের ও অরন্ধন পালনের ডাক দিলেন বাঙালিকে, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল কলকাতায় মিলন মন্দির বা ফেডারেশন হলের, জাতীয় ঘোষণা পত্র পাঠ করে বাঙালি জাতীয় শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করল। ওই বছরের শেষে সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী পরিষদের বার্ষিক সম্মিলন রংপুরে আয়োজন করার আমন্ত্রণ পাঠালেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অন্য রকম। ১৩১৩-এর বৈশাখে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সমিতির বৈঠক বসবে বরিশালে। সেই উপলক্ষে পরিষদের সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হোক বরিশালে—এরকম এক প্রস্তাব এল লাখুটিয়ার তরুণ জমিদার দেবকুমার রায় চৌধুরীর মারফৎ। প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু হতে কি পারল সেই অধিবেশন? লেফটেনান্ট গবর্ণর ফুলারের তাণ্ডবে পণ্ড হল রাজনৈতিক অধিবেশন। নিষেধাজ্ঞা জারি হল সাহিত্য-সম্মিলনের বিরুদ্ধেও। রবীন্দ্রনাথ-সহ বহু কবি শিল্পী-সাহিত্যকেরা পৌঁছে গিয়েছিলেন বরিশালে, ফিরে আসতে হল তাঁদের। যে-ভাষণটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই সম্মিলনের জন্য, সে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন বেশ কয়েক মাস বাদে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আরেক সাহিত্য সম্মিলনে। ইণ্ডিয়ান মিরর-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের স্থায়ী সভাপতিত্বে 'সাহিত্য সম্মিলন' নামে এক প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওই সভা ১৩১৩-এর ৫ মাঘে।

পরিষদের উদ্‌যোগে সাহিত্য-সম্মিলনের পরবর্তী অধিবেশন আহূত হয়েছিল ১৩১৩ বঙ্গাব্দের শেষে বহরমপুরে। আহ্বায়ক ছিলেন মনীন্দ্রচন্দ্র, সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মনীন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে সেই সম্মেলনও স্থগিত রাখা হল। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং 'সাহিত্য পরিষদ' নামক সেই প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩১৩)। এইভাবে পর পর দুবার সম্মিলন পরিত্যক্ত হওয়ায় কাশিমবাজারের সম্মিলনটিই প্রথম সম্মিলনের মর্যাদা পেল।

লোকসাহিত্য-পুরাবৃত্ত ইত্যাদির উপাদান সংগ্রহের জন্য জনবল যেমন দরকার, স্বায়ত্তশাসনের বোধ নির্মাণের জন্যও কলেজ-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে কাজ করান দরকার। পরিষদের দরবারে রবীন্দ্রনাথ এরকম এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন ৬ চৈত্র ১৩১১ বঙ্গাব্দে। পরিষদের কর্মসমিতির বৈঠকে প্রস্তাবটি উৎসাহের সঙ্গেই গৃহীত হল এবং আরও এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে ছাত্রদের আহ্বান করে এক বিশেষ সভা ডাকা হবে যেখানে রবীন্দ্রনাথ তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। এই প্রস্তাবানুসারে ১৭ চৈত্র ক্লাসিক থিয়েটার হলে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' পাঠ করলেন। তৈরি হল এক ছাত্রসভা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোতে। কিছু কিছু কাজ যে করেছিলেন এই ছাত্রসভা তার প্রমাণ আমরা পাই পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণী গুলিতে। যেমন, ১৩০৭-র কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে, 'আলোচ্য বর্ষে ৫ জন নূতন ছাত্রসভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ শক্তিপুর হইতে একখানি নবাবিষ্কৃত লক্ষণ সেনের তাম্রশাসন সংগ্রহ করিয়া উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নদীয়া ও যশোহর জেলার সন্ধিস্থল হইতে নানা কীর্ত্তন গান, পালা ছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার অন্যতম সংগ্রহ 'নিমাই সন্ন্যাসের পালা' 'পরিষৎ-পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে···এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের রামচরিতের অনুবাদ বিষয়ে উঁহার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কাজ করিতেছেন।' নমুনা হিসেবে এক বছরের এই খবরটুকু দেওয়া গেল, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার যে সঠিকভাবে চালনা করতে পারলে সর্বস্তরের ও সব বয়সের মানুষকেই উজ্জীবিত করে তোলা যায় সদর্থক গঠনাত্মক নানা কাজে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেছেন আত্ম-শক্তিচর্চার এই আনন্দময় ব্রতে। সাহিত্য-পরিষদের আঙিনাতেও তার সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন।

১৩৩৮-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসবে রবীন্দ্রনাথ পরিষদে সশরীরে উপস্থিত হতে পারেন নি, পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সূচনাকালে তাহাকে দেখিয়াছি। তখন নব-নিঃসৃত নির্ঝরের মত সে ছিল ক্ষীণ-ধারা, বনস্পতির প্রসাদচ্ছায়ায় তাহার প্রবাহ বহিত। অবশেষে একদা পূর্ণতা লাভ করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্যে যখন সে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও তাহাকে দেখিলাম। কিন্তু সেদিনও মনের মধ্যে আশঙ্কা ছিল। কেননা, বাংলাদেশের পলিমাটিতে যেমন কোন কীর্তিমন্দির স্থায়ী হয় না, তেমনি মিলনী শক্তির অভাবে আমাদের দেশে কোন জনসংসদ পাকা হইয়া টিকিতে পারে না, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দলবিরোধের দুর্বার বীজ তাহার ভিত্তিতে ভিত্তিতে গ্রন্থিবিদারণকারী বিনাশকে পরিপুষ্ট ও প্রসারিত করিতে থাকে। বোধ করি একমাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভাগ্যেই এরূপ দুর্যোগ ঘটে নাই। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা শক্তিশালী পুরুষ। তথাপি তাঁহাদের নিজের শক্তিই ইহাকে সন্ধিভেদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। বস্তুত বাঙ্গালীর চিত্ত ইহাকে গভীরভাবে রক্ষা করিয়াছে। সাহিত্য বাঙ্গালীর সত্য সম্পদ, সাহিত্যে বাঙ্গালী আপন গৌরব উপলব্ধি করে। বাংলাদেশে সাহিত্য পরিষৎ আপন স্বাভাবিক প্রশ্রয় পাইয়াছে।'

১৯৩০-এর যুগের গোড়ায় অর্থাৎ ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই কথাগুলি। হরপ্রসাদের যুগ শেষ হয়ে পরিষদের নেতৃত্ব তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু প্রমুখের হাতে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিজগতে তখনও সাহিত্য-পরিষৎ উজ্জ্বল কেন্দ্রস্থল। কিন্তু 'দলবিরোধের দুর্বার বীজ' কি সাহিত্য পরিষৎকেও স্পর্শ করে নি? করেছে অবশ্যই তবে পরিষৎ ভাঙেনি, 'বাঙালির চিত্ত' তাকে রক্ষা করেছে। পরিষৎ যখন গড়ে ওঠার স্তরে অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ার দশকে রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখছেন, '···সাহিত্য পরিষদের যতদিন পাকা বাড়ি ও অর্থসামর্থ্য ছিল না, ততদিন কাজ করিবার লোক জুটিত না। নিষ্করুণভাবে অপরের অর্থ দোহন করিয়া জিনিসটা যেই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, অমনি এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত কর্মকর্তা জুটিতেছেন যে, বুঝি তাঁহাদের রেষারেষিতেই পরিষৎ ভাঙিয়া পড়েন। জীবদ্দশাতেই পরিষদের সমাধি দেখিয়া যাইব কি না উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়াছে।' (২৯শে ভাদ্র, ১৩১৭)। এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে, তা দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করা দরকার : 'সাহিত্য পরিষৎ:

ক্রমশ ঃ এমন সকল লোকের দ্বারা আবিষ্ট অভিভূত হয়ে পড়চে যাঁরা খুব ভাল লোক, বুদ্ধিমান লোক, কৃতী এবং সামর্থ্যশালী কিন্তু তাঁরা সত্যভাবে সারস্বত নন—এতে করেই পরিষদের সাত্ত্বিকতার লাঘব হয়ে আসচে সুতরাং নিত্য তার গভীরতম মূলে আঘাত পড়চে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে দারিদ্র্যটা কোনো মতেই সাংঘাতিক নয় কিন্তু সরস্বতীর পদ্মবনে যখন বড় বড় লোহার চাকাওয়ালা বহুমূল্যবান দমকল বসে তখন জয়েণ্ট স্টক কম্পানী খুশী হয়ে ওঠে কিন্তু দেবীর চরণরেণু প্রত্যাশী মধুকরের দল প্রসাদ গণ্‌তে থাকে। আমাদের দেশে সর্বত্রই রাজসিকতার স্থূল হস্তাবলেপটা নূতন এই জন্যে তার প্রতাপটা অপরিমিত এবং কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে সাহস করে না। পূর্বকালে নবরত্ন সভায় রাজা একজন মাত্র ছিলেন সুতরাং নবরত্নকে আচ্ছন্ন করতে পারতেন না ; এখন রাজা এত রকম বেরকম, তাদের সংখ্যা এত বেশি, তাদের ফরমাস এত বিচিত্র, তাদের মেজাজ এত অনিশ্চিত, তাদের ঔদার্যের এত অভাব অথচ দৌরাত্ম্যের এতই প্রাদুর্ভাব যে আসল জিনিসকে আর দেখবার জো থাকে না। আসল কথা কোনো জিনিসকে চালাতে হলে তার সামনেকার পথটাও ছেড়ে দিতে হয়—আমরা কিছুতেই কাউকেই পথ ছাড়তে পারি নে—ঘোড়া ও সারথীর সামনে সবাই মিলে জড় হয়ে আমরা এমনি হুড়োহুড়ি করতে থাকি যে মনে করি তাতেই বুঝি অগ্রসর হবার খুব সাহায্য হচ্চে। অথচ উপায় ভেবে পাইনে—আজকাল সকল কাজেই মালমসলা এত বেশি গুরুতর হয়ে পড়েছে যে তার খাতিরে সকলেরই কাছে আসল জিনিসটাকে আগাম বন্ধক রেখে কাজ সারতে হয়—সে বন্ধক আর উদ্ধার হয় না—চিরকাল বিকিয়ে থাক্‌তে হয়। বাড়ি গড়বার জন্যে যে রাজমিস্ত্রিকে ডাকা যায় অবশেষে সেই বাড়িটি দখল করে ধুমধাম করে বাস করে আর গৃহস্থ চিরদিন দ্বারের বাইরে বসে গৃহকর্তার ভাণ করে কাষ্ঠহাসি হেসে রৌদ্রে জলে লোককে অভ্যর্থনা করবার ভার নিয়ে থাকে।'

এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ পরিষৎ সম্পাদককে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি লিখে প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন যে পরিষদের সভাপতি পদে জগদীশচন্দ্র বসু এবং সহকারী সভাপতি পদে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে নির্বাচন করা হোক (১৫ই মাঘ ১৩১৭)। পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রবল রেষারেষির কারণেই রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে ওই প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে এই মনোনয়নপত্র পেশ করা হয় নি। দেখা যাচ্ছে ১৩১৮ সালে পরিষদের সভাপতি পদে সারদাচরণ মিত্রই থেকে যাচ্ছেন।

১৩১২ থেকেই তিনি এক নাগাড়ে ওই পদে রয়েছেন, আর সহসভাপতি হিসেবে আসছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

জগদীশচন্দ্র বসু সভাপতি হিসেবে মনোনীত হলেন ১৩২৩ সালে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যখন প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার পাঁচ বছর বাদে। কিন্তু পাঁচ বছর বাদেও যে জটিলতা ছিল না, তা বলা যাবে না। ১৩২৩-এর বর্ষশেষে সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবসর গ্রহণ করে প্রস্তাব করলেন, 'শুনিলাম, যোগ্যতর ব্যক্তি সভাপতি হন, ইহাই কাহারও কাহারও ইচ্ছা। আমি বর্তমান বর্ষের জন্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম সভাপতির পদে প্রস্তাব করিয়া অদ্যকার সভাপতিত্ব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।' কার্য বিবরণীতে এর পরে লেখা হয়েছে : 'অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি আই ই মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করিলেন। ঐ পত্রে ডাঃ বসু মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হউন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ওই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রতিবাদের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যখন দেখিলেন যে, অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, সি, এস ই এম; এ, ডি, এস. সি মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে ২৩শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতির পদে নির্বাচিত হইলেন।'

দলাদলি; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নবীন-প্রবীণের বিরোধ-বিদ্বেষ যথেষ্টই প্রবল হয়ে উঠেছিল এই পর্বে। ১৩২৪-এর বার্ষিক সভায় জগদীশচন্দ্র কর্মীদের মধ্যে এই মত দ্বৈধের দূরীকরণের জন্য তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'সাহিত্য পরিষদের ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পরিবর্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় সেজন্য বিবিধ চেষ্টা' তিনি করেছেন এবং 'সদস্যগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যশীল সভ্য নির্বাচিত করেন তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে' ইত্যাদি আরও নানা কথা।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে এক

সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন কবির গুণমুগ্ধ বিশিষ্ট কয়েকজন বাঙালি মনীষী-বুদ্ধিজীবী। ওই অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁর সাহিত্য-পরিষৎ। কিন্তু সে-অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গিয়েও পরিষদের নেতৃত্বকে এক বিরুদ্ধ আন্দোলনের মুখোমুখী হতে হয়েছিল। এমনই এক বিশ্রী পরিস্থিতি তৈরি করে তুলেছিল বিরুদ্ধবাদীরা যে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে চিঠিতে লিখছেন, 'আপনি জানেন আমি সংসারের জনতা হইতে সরিয়া আসিয়াছি আজ আমাকে এই গ্লানির মধ্যে কেন টানিয়া আনিলেন? অন্তর্যামী জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি না এই সম্মানের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই আমি আমার পক্ষে কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান করি।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার টাউন হলে, কিন্তু চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল নাগরিক মহলে বিরুদ্ধবাদী চিন্তকদের এই উৎপাত যথেষ্ট শংকা তৈরি করেছিল।

এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর-হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের চেষ্টায় পরিষৎ বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ক্ষমতা আহরণ করেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে-আকারে এবং আত্মকর্তৃত্বের যে-দর্শনের বিত্তিতে একে পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, তা চিন্মোহন সেহানবীশের ভাষায় 'আকাশকুসুমই' থেকে গেল। আর স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সংরক্ষণ শক্তির দৈন্য ও স্বদেশ বিষয়ে নেতিমূলক রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তা সাহিত্য-পরিষৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ক্রমাগত দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলেছে, রাবীন্দ্রিক আদর্শ সেক্ষেত্রে শৌখীন তত্ত্বকথা মাত্র।

রমেশচন্দ্র ঃ সভা সমিতি ও সৃষ্টি

প্রবীর সেন

রমেশচন্দ্র সেনকে নিয়ে, কিছু লেখা আমার পক্ষে বেশ একটু দুরূহ। ঘরে বাইরে বাধা, বাধা অন্তর্নিহিত। যে-মানুষগুলিকে নিয়ে লেখার প্রয়োজন, ঔচিত্য এবং ইচ্ছে তিনটেই বোধ করি, রমেশচন্দ্র সেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু লেখা হয় না। নিষ্ফল রঙিন কল্পনার ছকেই আটকে থাকে।

এঁদের কয়েকজনের সংগেই বর্তমান কলমচির নিকটতম ব্যক্তিগত সম্পর্ক। যেমন, এই নিবন্ধের একমেব লক্ষ্য রমেশচন্দ্র তার পিতার জ্যেষ্ঠাগ্রজ। ভাইপো ভাইঝিদের জ্যাঠামণি। সম্পর্কটা একই সংগে সৌভাগ্যের এবং প্রতিবন্ধেরও। সেটা মামুলি নয়। কারণ বাধাটা আন্তরিক সংকোচের। ও'দের সূত্রেই পাওয়া। যাঁরা আত্মপ্রচার তথা প্রতিষ্ঠার গরজে কস্মিনকালেও তৎপর ছিলেন না। তাঁদেরই অনুকূলে যদি কিছু অসংগত দাবি পেশ করে বসি। —সংকোচ এইখানে।

রমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে আত্যন্তিক এই চারিত্র ছিল—সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো। এক্ষেত্রে, আমাদের কালে, এমনকি সমবয়সীদেরও নতশির শ্রদ্ধা-আকর্ষণকারী দীপেনকেই প্রিভি-কাউন্সিল মনে করি। তাঁর কথাই শোনা যাক—"বছরের পর বছর চোখের সামনে তিনি দেখেছেন কত মামুলী লেখক ও মানুষ কি সোনার কাঠির স্পর্শে দিগ্বিজয়ী হয়। রমেশচন্দ্র অল্পখ্যাত,দরিদ্র ও বিড়ম্বিতই থেকেছেন। কোনোদিন তাঁকে একটু ক্ষুব্ধ, বিচলিত ও প্রলুব্ধ হতে দেখা যায় নি।' —পরিচয়, জুন ১৯৬২।

অপরিহার্য কারণে, এই ঐতিহাসিক পত্রের বর্তমান সম্পাদকের তরফে কিছু লেখার দায় নিতে নির্দেশ-মেশা অনুরোধ এসে, সঠিক বল জুগিয়ে দিলে। বর্তমান সম্পাদকের মতে রমেশচন্দ্র 'তিমিরবিনাশী' লেখক।

এই বৎসরটি—শতাব্দী-কুরপালা-কাজল—এই অসামান্য উপন্যাসত্রয়ী এবং ডোমের চিতা, তারা তিনজন, সাদা ঘোড়া, যৈবন, মৃত ও অমৃত, খোসা, মানরক্ষা, কাশ্মীরী তুষ, টাইম টেবল, প্রেত, হারাণী, একফালি জমি, অন্তর ও বাহির, রাজার জন্মদিন, ভাত প্রভৃতি অনবদ্য ছোটগল্প স্রষ্টা, অধুনা বিস্মৃত রমেশচন্দ্র সেনের জন্মশতবর্ষপূর্তি।

তাঁর জন্ম বাংলা ১৩০১ সনের ৭ই ভাদ্র, ইংরিজি ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ২২শে আগস্ট। সদ্য বিগত বংগীয় চতুর্দশ শতাব্দীর সমবয়স্ক তিনি। ঈষৎ-নূন আটষট্টি বছরের আয়ুষ্কাল অতিবাহিত তাঁর—মধুময় এই পার্থিব ধূলির সংস্পর্শে। জীবনদীপ নির্বাপিত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, ইংরিজি ১লা জুন ১৯৬২ খৃস্টাব্দ—রজনীর প্রথম যামে।

তাঁর আদি বাসভূমি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তঃপাতী ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া পরগণার—মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও বংগবন্ধু মুজিবুর রহমান-খ্যাত—গোপালগঞ্জ সাবডিভিশনের 'পিঞ্জরী' গ্রাম। এই পিঞ্জরীই তাঁর 'শতাব্দী'তে 'মঞ্জরী'। 'কুরপালা' উপন্যাসের নাম পিঞ্জরীরই সংলগ্ন গ্রামের নামে।

রমেশচন্দ্র অবশ্য জন্মেছেন উত্তর-কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলে। জীবনের শেষ স্বল্প কয়েকটি মাস ছেড়ে, বসবাসও এই অঞ্চলেই। ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছাকাছি বিভিন্ন বাসাবাড়িতে। ২০১ মুক্তরামবাবু স্ট্রীটের বাড়িতেই দীর্ঘতম কাল—দু দফায় মিলিয়ে, পঁচিশ-তিরিশ বছর। মুখ্য সৃষ্টিগুলি তো বটেই, একেবারে প্রাথমিক কিছু রচনা বাদে—তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্মই এই বাড়িতে। এখান থেকেই ১৯৬১-র নভেম্বরে, উত্তর-শহরতলী বরাহনগরের নপাড়ায়—২৪ ড. নীলমণি মিত্র স্ট্রীটে উঠে যান। সেখানেই মহাপ্রয়াণ। অন্তিম সংকার কাশীপুর মহাশ্মশানে।

পিতা ক্ষীরোদচন্দ্র সেন। কবিরত্ন। মাতা বরদাসুন্দরী দেবী। কৈশোর যৌবনের সন্ধিকাল থেকে ক্ষীরোদচন্দ্রের কলকাতাবাস। বিনা উল্লেখ, রমেশচন্দ্র যে 'বাঙাল' এটা বোঝা বনেদি কলকাতাবাসীদের পক্ষেও সম্ভব হতো না। দেশের বাড়িতে দুর্গা পুজোয় মোষ বলি ছিল। কবিরত্ন মহাশয় বলি তুলে দেন। নিয়মিত গতাগতি ছিল পুজোয় ও রোগজীর্ণ কারো স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে। সেখানে একরকম স্থায়ী-বাস ছিল রমেশচন্দ্রের জ্যাঠাইমার। রমেশচন্দ্রদের একার্থে দ্বিতীয় মাতা। ও'রা ডাকতেন—বড়মা। বালবিধবা এই মহিলা "পরমাশ্চর্য মানব-প্রজাতির এক অপার রহস্যময়ী দৃষ্টান্ত। গুটি আট-দশেক গাঁয়ের মধ্যবিত্ত মাতব্বরেরা এ'র সামনে তটস্থ থাকতেন। সে কাহিনী অবশ্যই এখানকার নয়। তাঁর নাম দিনমণি। সার্থকনাম্নী।

রমেশচন্দ্রেরা চার ভাই, দু বোন। পত্নী বনলতা দেবী। এ'দের পাঁচ পুত্র ও নয় কন্যা। দুটি অকালে প্রয়াত। মধ্যমা ও জ্যেষ্ঠাকন্যাও পরবর্তী কালে

প্রয়াত। মেজমেয়ে সুষমা অকালে—১৯৫৪ এবং বড়োমেয়ে তথা প্রথম সন্তান জয়ন্তী পরিণত বয়সেই ১৯৮০ সালে। পুত্রকন্যারা প্রায় সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত, কয়েকজন বিলক্ষণ কৃতী। দুই বোনের বিবাহই ক্ষীরোদচন্দ্র দিয়ে যান। দুই বোনের সূত্রে দুটি ভাগ্নে। উভয়েই আকৈশোর বিপ্লবী। পরবর্তীকালে নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট হিসেবেও অসামান্য প্রীতি ও মর্যাদার অধিকারী। ঢাকুরিয়া অঞ্চলের সুখ্যাত ননী সেনগুপ্ত এবং শিক্ষক আন্দোলনে সর্বভারতীয় মর্যাদায় অধিকারী মহারাজ অমিয় দাশগুপ্ত। কৃতী লেখিকা শান্তি দাশগুপ্ত ভাগিনেয়ী। ছ ভাই বোনের মাত্র কনিষ্ঠভ্রাতাই জীবিত। প্রফুল্লচন্দ্র।

ক্ষিরোদচন্দ্রের খ্যাতি ও পশার ছিল অবিভক্ত বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন তাঁর আচার্য। গণনাথ সেন সমসাময়িক। গুরুতর হৃদব্যাধির কারণে, নিতান্ত অকালে, মাত্র ৫৩ বছর বয়েসে প্রয়াত। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল ড. ক্যালভার্টসন ক্ষীরোদ চন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে 'হ্যাটস-অফ' করে যান। সংস্কৃত পন্ডিতেরা, মুদ্রিত আমন্ত্রণপত্র-সহযোগে, তাঁর স্মরণ-সভা সংগঠিত করেন। কবিরত্ন মহাশয় উল্লেখযোগ্য মর্যাদা এবং অসামান্য চরিত্রসম্পদের অধিকারী ছিলেন।

কবিরাজির প্রাথমিক শিক্ষা পিতার কাছে পেলেও, রমেশচন্দ্রের পরবর্তী গুরু পন্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ। সংস্কৃত তাঁর এমন সহজ আয়ত্ত ছিল যে, মাত্র ২৪-২৫ বছরের যুবক, ১৯১৮-১৯এ মাদ্রাজের নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে সংস্কৃতে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন! সম্মেলন থেকেই পান 'বিদ্যানিধি' উপাধি। চিকিৎসাক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র পিতার গৌরবময় নাম অম্লান রাখেন। প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ড. জে. সি. গুপ্ত জার্মানীতে ডক্টরেট করতে যাবার আগে, রমেশচন্দ্রের কাছেই এ সংক্রান্ত—আয়ুর্বেদীয় অধ্যায়টির পাঠ গ্রহণ করেন।

আযৌবন মিত্র পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কথিত : 'বিংশ শতাব্দীর বাংলায় বোধহয় একমাত্র টুলো সাহিত্যিক' রমেশচন্দ্র ইংরিজিতেও প্রাগ্রসর। হাতিবাগানের টোলে পড়া চলছে, তারই মধ্যে প্রাইভেটে এন্ট্রান্স দিলেন। ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ.। বাংলাসাহিত্যপত্রে প্রথম। সেটা ১৯১৭ সাল। এম. এ. পড়া শুরু হলো, শেষ হলো না—পিতার অকাল বিয়োগে। সেটা ১৯১৯, রমেশচন্দ্রের বয়েস পঁচিশ—বিরাট সংসারের ভার নামলো কাঁধে। এই সময়ে এমনো দিন গেছে, এবং বেশির ভাগ দিনই, ডিসপেন্সারিতে গিয়ে—একটি রুগী এসে, ফীর টাকা

বাসায় পাঠালে তবে দোকান বাজার, ছেলেমেয়ের মুখে ক্ষুধার অন্ন। বস্তুত, কবিরাজিকে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করতে—তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

আমাদের সৌভাগ্যে এমনতরো কেনো-কোনো বাধ্যবাধকতাই সামাজিক কল্যাণের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। রমেশচন্দ্র কবিরাজ হওয়ায়, বাংলাসাহিত্য কোনো একটি বিশেষক্ষেত্রে পুষ্পিত হয়েছে।

যেহেতু, সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন—গভীরতম অর্থেই সত্যকে ও সৌন্দর্যকে, জীবনের ছবি সাজিয়ে, অপরূপ বাঙ্ময় করে গেছেন—সেহেতু, বিস্মৃতি-মেঘ হটিয়ে তাঁকে লোকমানসে পুনর্জাগারিত ও প্রতিষ্ঠিত করবার সামান্য প্রয়াসও অনিন্দ্য গৌরবের। — লাভটা ষোল আনাই আমাদের। সাহিত্যিক ও সামাজিক।

প্রকাশিত উপন্যাসের হিসেবে চতুর্থ, কিন্তু কারো-কারো মতে তাঁর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক-নির্মাণ 'কাজল' পাঠকসমাজ ও রসবেত্তা সমালোচকের দরবারে এসে দাঁড়াবার আগ-পর্যন্ত, তদানীন্তন সুধীবর্গ তাঁর সৃষ্টিসমূহের সূত্রে কী অভিমত ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করছেন, সেটা এখানেই মিলিয়ে নেয়া সমীচীন হবে।

এইসূত্রে যে-স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন তথা স্বীকৃতি পাঠকেরা দেখবেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, পরবর্তী বিস্মৃতি বিস্ময়কর কিনা সেটা তাঁরাই ভাবুন। সেই বিস্মৃতি-জাল ছিঁড়ে এমন এক প্রতিভাধর, জীবনরসিক সত্যনিষ্ঠ শিল্পীর পুনরুত্থানও সাহিত্যিক এবং সামাজিক কারণেই কাম্য কিনা, সে বিচারের ভারও রসিক পাঠকের 'পরেই থাকছে।

উধৃতিসমূহ—

'...অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি। ...বিস্মিত করিয়াছেন। এই উপন্যাস একটি সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। ইহা বাংলা কথাসাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবে...। আপনিই নবযুগের নবজীবনের সহজ ছন্দটি ধরিতে পারিয়াছেন —একেবারে বাংলার বাঙালির নবজীবন। ...অন্যে অনেক লিখিয়া একটাতে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করে, আপনি একটাতেই তাহা করিয়াছেন।' — মোহিতলাল মজুমদার : শতাব্দী

'These stories are rich with the pathos and the humour whose subtle intermingling makes the human character. He has an uncanny flair for striking the depths of emotion and passion and a remarkable economy of words that places

him in the front rank of Bengali story tellers.'—A. B. P. :

মৃত ও অমৃত

'সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের অনুভূতি যেমন গভীর, অভিজ্ঞতাও তেমনই বিচিত্র।'—যুগান্তর : ঐ

'বাঙালি সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরের ছোট ছোট ঘটনা ও কাহিনীগুলিকে লেখক নিপুণ শিল্পীর মতন ফুটিয়ে তুলেছেন প্রত্যেকটি ছোটগল্পে।' — বসুমতী : ঐ

'রমেশবাবু ইতিমধ্যেই বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছেন।··· তাঁহার লেখা পড়িতে গেলে রুশ সাহিত্যিক শোলোকভের কথা মনে পড়ে···। গ্রামের সংগে যাহাদের পরিচয় আছে প্রত্যেকের চরিত্রই তাহাদের নিকট স্বাভাবিক বোধ হইবে।'—ভারত : কুরপালা

'শতাব্দী, মৃত ও অমৃত, চক্রবাক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'কুরপালা' পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি।··· রমেশবাবুর উপন্যাস 'কুরপালা' বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে।'— দেশ : ঐ

'এরা হয়ে রইল রক্তেমাংসে গড়া খাঁটি বাংলাদেশের মানুষ। 'কুরপালা'র এই চরম দান।··· কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। তাঁকে আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আদিগন্ত কাশে ঢাকা বিলান জমি, খালের ধারের জংলি ঘাস ও 'রূপমতী' গাঙের দুরন্ত স্রোতের অবিস্মরণীয় ছবির জন্যে। বাংলার মাটির বাংলার জলের এই চিরন্তন ছবি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কোনো বন্যায় বিলুপ্ত হবে না।'— পরিচয় : ঐ

'··শরৎবাবুর পর এ জাতীয় চরিত্রসৃষ্টি অত্যন্ত বিরল··বাংলার উপন্যাস মরুভূমিতে 'কুরপালা'কে মরুদ্যান বললেও অত্যুক্তি হবে না।'—প্রভাতী (পাটনা) : ঐ

'কুরপালা সার্থক সৃষ্টি।'—সজনীকান্ত দাস

'এ বৎসরের (১৩৫৫) শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৃষ্টির কথা বলতে গেলে বলতে হবে 'চিহ্ন'র কথা, 'কুরপালা'র কথা, আর 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র কথা।—একেবারে অন্য জগৎ রমেশ সেনের 'কুরপালা'।'—গোপাল হালদার

'সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সম্বন্ধে লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পূর্ণতা প্রতিটি কাহিনীকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।'—যুগান্তর : কয়েকটি গল্প

'গল্পগুলির পরিণতি অনিবার্য কিন্তু অভাবিত। শিল্পীর এই একটা বৈশিষ্ট্য।'—পশ্চিমবংগ পত্রিকা ঃ ঐ

'বাংলা কথাসাহিত্যে 'শতাব্দী' 'কুরপালা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়াছেন।··গ্রন্থকারের সৃষ্ট গল্পগুলি সাবলীল এবং প্রাণধর্মে সার্থক হইয়াছে।'—আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ঐ

এবং 'কাজল' বিষয়ক —

১৯৪৯ সালে 'কাজল' প্রকাশিত হয়। পাঠকসাধারণ ও সুধীবর্গ, উভয় ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত মতবিনিময় ঘটে। দুর্ভাগ্যত কোনো মুদ্রিত আলোচনা আমাদের হাতে নেই। প্রকাশের অল্প পরেই 'সাহিত্য সেবক সমিতি' 'কাজল' নিয়ে এক আলোচনাসভার ব্যবস্থা করে। ১৯৫০-এর ৯ জুলাই কফি-হাউসের 'রেনেসাঁ' হলে 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থের লেখক সুখ্যাত 'সোনার বাংলা' সম্পাদক বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত। আলোচকদের মাঝে ছিলেন ঃ সভাপতি শ্রীগুহ, পবিত্র গংগোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ত্রিপুরা শংকর সেনশাস্ত্রী, ড. সুধাংশু সেনগুপ্ত, অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রলাল সাহা, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সুনীলবাবু লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক সাহা ভিন্ন বাকি সকলেই উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। একমাত্র বিরোধিতার বিনম্র উত্তরে লেখক 'কাজলের কৈফিয়ৎ' লেখাটি পাঠ করেন। এই সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের মতামত অনুধাবনযোগ্য ঃ 'আমি মনে করি লেখকমাত্রেরই দেশের প্রতি ও সমাজের প্রতি একটা কর্তব্য আছে। এই কর্তব্যের প্রেরণাই আমার উপন্যাস 'শতাব্দী' ও 'কুরপালা'র উৎস। এই প্রেরণায়ই 'সাদা ঘোড়া' ও 'প্রেত' লিখিয়াছি। কাল 'গৌরীগ্রাম' শেষ করিলাম। 'কাজল'ও ঐ একই কারণে রচিত হইয়াছে। ···'কাজল' পড়িয়া পতিতাজীবনের বিরাট সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি যদি আকৃষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে রচনাশৈলী, ভাষার চমৎকারিত্ব প্রভৃতি অন্যসব গুণাবলীর জন্য আপনারা 'কাজলে'র প্রশংসা করিলেও, আমি মনে করিব—ইহা আমার ব্যর্থ সৃষ্টি।'—কাজলের কৈফিয়ৎ

কিন্তু, এমন এক সমাদৃত লেখকেরও প্রয়াণ-পরবর্তী দীর্ঘকালের ছবিটাই বেতরো রকম উল্টোপাল্টা হয়ে গেলো। প্রকাশক নেই, আলোচক নেই, পাঠক তো নেইই। এ যেন সেই কুখ্যাত মার্কিনী Conspiracy of

silence! যে 'নীরবতার চক্রান্তে'র সর্বব্যাপী দাপটে মার্ক টোয়েন ও জ্যাক লণ্ডন হেন বিশ্বমানের স্বমহিম্ন-স্রষ্টাকেও দীর্ঘকাল পাঠকসমাজ থেকে আঁধারে রাখা যায়!

ফলে, পরিচয়ের গ্রন্থ-সমালোচক উক্ত—'রক্তেমাংসে গড়া খাঁটি বাংলা দেশের মানুষ' এবং 'বাংলার মাটির বাংলার জলের এই চিরন্তন ছবি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কোনো বন্যা' বিহনেও, দীর্ঘসময়ের জন্য 'বিলুপ্ত' হলো! বিস্মৃতিগ্রস্ত হলেন 'শতাব্দী' স্রষ্টা।

এই বিস্মৃতি প্রকৃত-প্রস্তাবে এখনো দূর হয়নি। প্রসংগত স্মরণে রাখা জরুরি, ভুলে আমরা মাত্র রমেশচন্দ্রকেই যাই নি, আরো বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লেখককেও, অবিমৃষ্যকারী আমরা ভুলে আছি।

এমত পরিস্থিতিতে প্রকাশিত—Bengali FictionA Panoramic View, বিজন ঘোষ ও প্রবীর সেন, ১৯৭৫। এই অতি-সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে রমেশচন্দ্র উপস্থিত অবশ্যই, কিন্তু লেখকদের সংকোচ নিয়েই। এরপরে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অরিত্রে'র বিশেষ ছোটগল্প সংখ্যায় ড. পল্লব সেনগুপ্তের ভাবনাসমৃদ্ধ আলোচনা ঃ 'রমেশচন্দ্র সেনের গল্প'। সামান্য বাদেই মিহির আচার্যের 'লেখক সমাবেশে'র একটি সংখ্যা উৎসর্গিত রমেশচন্দ্র স্মরণে, জুন ১৯৮৩ (জুন ১৯৮৬ নয়)। উক্ত সংখ্যাতেই প্রবীর সেনের 'জনৈক বিস্মৃত বরেণ্য' প্রকাশিত। এরপরে ক্রমে, ১৯৮৬ থেকে হাল আমল অব্দি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বিষয়ে কিছুকিছু নিবন্ধ, গুটিকতক সাক্ষাৎকার, কয়েকটি পুস্তক সমালোচনা এবং চিঠিপত্রও বেরুতে থাকে। যেগুলির সর্বমোট সংখ্যা ষাটের নিচে। যার মাঝে এক তৃতীয়াংশই একটি সংকলনে—অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এবং এই সময়' পত্রিকার 'রমেশচন্দ্র সেন ঃ কিছু আন্তরিক পর্যালোচনা' সংকলনে, ১৯৮৭।

এই সংকলনটির কিছু আগেই 'প্রথমত' পত্রিকাগোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত ঃ 'রমেশচন্দ্র সেনের গল্প'—সম্পাদনায় সমীর রায়-সমর চন্দ। এবং পত্রিকার একটি বিশেষ-সংখ্যা, ১৯৮৬। দু বছর বাদেই এঁরা প্রকাশ করলেন ঃ 'অগ্রন্থিত রমেশচন্দ্র'—সম্পাদনায় সমর চন্দ। ১৯৯০ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্যিকী' পত্রে বেরলো, আবু বকর সিদ্দিকের 'বিস্মৃতপ্রায় এক অবিস্মরণীয় কথাসাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন'। দু বছর পশ্চাতে ১৯৯২ প্রকাশিত তাঁর 'রমেশচন্দ্র সেন' কেবলমাত্রই তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ। —বাংলা একাডেমী, ঢাকা। বিভিন্ন সময়ে, লেখক ও সম্পাদকগণের আরো প্রায়

বিশটি গ্রন্থে রমেশচন্দ্র অল্প-বিস্তর উল্লেখিত। সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বাংলার পাঁচজন ঔপন্যাসিক' গ্রন্থেই রমেশচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র আলোচনা পাই। এটি ১৯৫০-এ প্রকাশিত। ১৯৬০ সালে 'কতকথা' প্রকাশিত রমেশচন্দ্রের 'শ্রেষ্ঠগল্প', সম্পাদনায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর ভূমিকা 'রমেশ সেন প্রসংগে' অপরিসীম মূল্যবান একটি আলোচনা। ড. পল্লব সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী সুব্রতী চট্টোপাধ্যায়ের রমেশচন্দ্র সংক্রান্ত গবেষণা সবিশেষ উল্লেখ্য। জন্মশতবর্ষপূর্তির আনন্দসন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে প্রসারিত তিনটি প্রকাশনাও এইসূত্রে বিলক্ষণ উল্লেখের দাবি রাখে। —১ কাজলের কৈফিয়ৎ ও অন্য প্রবন্ধ : রমেশচন্দ্র সেন, সম্পাদনায় অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক জন্মশতবার্ষিকী সমিতি ; ২ রমেশচন্দ্র সেন, লেখক পাঁচু রায়, প্রকাশক—পশ্চিমবংগ বাংলা আকাদেমি ; এবং ৩. প্রথমত : রমেশচন্দ্র সেন জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, সম্পাদক সমর চন্দ। বিবৃত সকল প্রয়াসের সূচনা সত্তরেব দশকে 'পরিচয়' কর্তৃক।

তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক প্রসংগ যেখানে ছেড়ে আসি, সেখান থেকেই ফের শুরু করা যাক।

ক্ষীরোদচন্দ্র ও বরদাসুন্দরীর ছটি ছেলেমেয়েই বড়ো হয়েছিলেন, মুখ্যত তাঁদের বড়মা দিনমণি দেবীর স্নেহ, শাসন ও পরিচর্যায়। তাঁরি নির্দেশাত্মক আগ্রহাতিশয্যে—বরাবর প্রথম স্থানাধিকারী টোলের গৌরব—রমেশচন্দ্রের ইংরিজি শিক্ষা অর্জন। আবাল্য টোলে পড়ুয়ার বাংলায় প্রথমস্থান—বি. এ.—তেমন আশ্চর্যের নয়—যতোটা বিস্ময়ের ইংরিজিতে অনার্স করা। সংস্কৃত-বাংলা-ইংরিজি তিনটে ভাষাতেই রমেশচন্দ্রের গমনাগমন একান্ত অনায়াস।

রমেশচন্দ্রের নষ্ট চোখটি, আজন্ম নষ্ট নয়। নিতান্ত শৈশবে শরীর ছেয়ে অগুন্তি বড়ো-বড়ো বিষাক্ত ফোঁড়া বেরয়। বাঁচার আশা ছিল না। পিতার চিকিৎসা ও বড়মার শুশ্রূষায় রক্ষা পান। সেই থেকে বাঁ চোখটি সম্পূর্ণ নষ্ট। পরবর্তী যাট-পঁয়ষট্টি বছর তাঁর দৃষ্টি-সম্বল ডান চোখটি। জীবনের শেষবর্ষে ছানি পড়ে। অপারেশন অস্তে সেরেও উঠেছিলেন। অধিবেশন ডেকেছিলেন সমিতির। নূতন করে প্রীতিদৃষ্টি মেলে সবার সাথে মিলিত হবেন, পরামর্শ করবেন 'সুবর্ণজয়ন্তী'র বিষয়ে। কিন্তু, বিধি বাম। রমেশচন্দ্রের শেষ, সংগত এবং প্রবল অভিলাষটি পূর্ণ হলো না। কোন মানুষের এমন একটা সাধ পূর্ণ হলো না? না, যিনি বয়ঃসন্ধি থেকে জীবনের অন্তিম ঘাটে পা রাখা পর্যন্তই

ছিলেন ঃ অহমিকা-বর্জিত একান্ত সেবকের ভূমিকায়। কেবল সাহিত্যের নয়, সাহিত্য সেবক সমিতির এবং সেইসূত্রে আগত নবীন লেখককুলেরও।

এমন নিপাট সেবকের মন ঘড়ি-ঘড়ি মেলার নয়. তখনই ছিল অংগুলিমেয়—সুতরাং, হালফিলের কথা না তোলাই ভালো। দুর্ভাগ্যত গিরীশ চক্রবর্তী—দীপেন্দ্রনাথ-ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়-চিত্ত সিংহ প্রমুখেরা আজ নেই।

এই প্রতিভাময় সেবক মানুষটি—তখন তিনি সপ্তদশবর্ষীয়—পিতার কয়েকটি কবিরাজি ছাত্রকে সাথী করে, প্রতিষ্ঠা করেন 'সাহিত্য প্রচার সমিতি'। একজন ছাত্র রিপন কলেজের। দ্বিতীয় অধিবেশনেই নাম-বদল —দম্ভের স্থানে এলো বিনয়। প্রথম সম্পাদক অনাদিনাথ ভট্টাচার্য। রমেশচন্দ্র সহসম্পাদক। প্রতিষ্ঠাতাগণই সভাপতি, সহ-সভাপতি। ওড়িয়াভাষী ছিলেন একজন—নারায়ণচন্দ্র মহাপাত্র। একজন চাটগাঁর বৌদ্ধ। অপূর্ব বড়ুয়া। দ্বিতীয় বর্ষেই সভাপতি—ব্রাহ্মসমাজের আচার্য অধ্যাপক ললিতমোহন দাস। মাত্র দুটি মাস যেতেই সদস্যসংখ্যা চল্লিশের সমীপবর্তী। তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত কোনো চাঁদা ছিল না। যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে ক্ষীরোদচন্দ্র। চতুর্থ—ষষ্ঠ বর্ষে সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ইনিই চাঁদা চালু করেন। মাসে দু আনা।

সপ্তম-অষ্টম বর্ষে কান্তিচন্দ্র সেন ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—নীরদরঞ্জন—প্রমোদরঞ্জন—সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত ভ্রাতৃত্রয়—সুরেশচন্দ্র সেন-সুশীলচন্দ্র মিত্র এবং সোমনাথ মৈত্র—'প্রভৃতি তরুণ সাহিত্যরসিকগণ সমিতিতে একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন।' —সমিতির ইতিহাস ঃ রমেশচন্দ্র

মৌলিক সৃষ্টিমূলক রচনার পাশাপাশিই বিচিত্র বিষয়ে অসংখ্য সন্দর্ভও সমিতিতে পঠিত। মূল কার্যালয়ের বাইরেও নানা সময়ে ঘুরে-ঘুরে অধিবেশন বসতো। সেও অগুন্তি। তার মধ্যে মজিলপুরে দত্তদের বাড়ি এবং সবিশেষ, রমেশচন্দ্রের সহপাঠী-সুহৃদ গোপেন মিত্রের বাড়ির কথা না বললে, গুরুতর ত্রুটি হবে। তাঁর সুখ্যাত পুত্র ঋষিণ মিত্রের প্রযত্নে সেই বাড়িতেই 'জন্মশতবার্ষিকী' সমিতির কার্যালয়। বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের এই বাড়ির সম্মুখভাগে আজো সমিতির প্রতীক-চিহ্নটি সগৌরবে লাঞ্ছিত। সোজা কথা। দীর্ঘ অর্ধ শতক। বাংলা ১৩১৮ সনে, ইংরিজি ১৯১১, স্থাপিত সমিতির সুবর্ণজয়ন্তীকালীন সদস্যসংখ্যা দেড়শর কাছাকাছিই হবে অনুমান করি। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল বাদে এখানে কারা আসেননি, সেই তথ্যটা পেশ করাই বহুগুণে সহজতর। বিগত শতকের প্রবীণতম

শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নিয়ে, বিগতপ্রায় শতকের মধ্যাহ্নকালীন তরুণতম লেখককুল—বিশাল এক নক্ষত্রমণ্ডলী।

'দাদাদের চেষ্টায় আমাদের বাড়িতেই একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই পাড়ার চায়ের দোকানে না গিয়েও আমাদের দিন বেশ সানন্দে সরবে কেটে যেত। সাহিত্যচক্রে আমাদের ভূমিকা ছিল ফাই-ফরমাস খাটা, মিটিঙের চিঠি বিলি করা, দোকানে চায়ের বা তেলেভাজার অর্ডার দেওয়া। তবে সমিতির দৌলতে, অনেক বড় মাঝারি ছোট সাহিত্যিক সুধী মনীষীকে বেশ কাছাকাছি দেখার ও তাঁদের আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা শোনার সুযোগ ঘটেছে। এ'দের অনেকেরই চালচলন, ভাষা, বাচনভংগী, এলোমেলো বেশভূষা, তৈলবিহীন অবিন্যস্ত চুলের বোঝা আমাদের হাসির খোরাক জোগাত, একথা স্বীকার করতে আজ কোনো বাধা নেই। ···আজকাল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মরশুম চলেছে। প্রতিটি অলিগলির চায়ের দোকানে ব্যক্তিস্বাদের প্রতীক ইন্টেলেকচুয়ালদের ছড়াছড়ি। ···দাদাদের আড্ডায় এ'রা ছিলেন মুষ্টিমেয়। তাই এ'দের মধ্যে মতের তীব্র বিরোধ, কণ্ঠের তীব্রতর উত্তেজনা, ভাষা উগ্রতম হলেও মতান্তর স্থায়ী মনান্তরে পরিণত হতো না। আধ ঘণ্টা আগে যে বাক-প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তিষ্কে 'গোময়ে'র প্রাচুর্য সমন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে, তার সংগে হাসিমুখে তেলেভাজা উপভোগ করার কোনো বাধা ছিল না।' —মুখবন্ধ, বাস্তবের পটভূমিতে রবীন্দ্রসাহিত্য : ইন্দ্রনাথ রায়। [সুরেশচন্দ্র]

কেবল, 'হাসিমুখে তেলেভাজা উপভোগ'ই নয়, সাহিত্যের যথার্থ রসোপভোগ ও প্রাসংগিক শিক্ষার একটি জীবন্ত ওয়ার্কশপ রূপে সমিতি অনবদ্য প্রাণস্পন্দন নিয়ে দীর্ঘ অর্ধশতক সক্রিয় থেকেচে। বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ ছাড়া, এ সৌভাগ্য অন্যকোনো সাহিত্যসভাই জীবিত অবস্থায় অর্জন করতে পারে নি, ইতিপূর্বে।

কীভাবে এটা সম্ভব হয় তার একটি অব্যর্থ সত্য কারণ, অতি সম্প্রতি জানিয়েছেন—সূচনাপর্ব হতে সমিতির সংগে দীর্ঘকাল নিবিড়ভাবে জড়িত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুখ্যাত তনয়—গৌতম চট্টোপাধ্যায় : 'বিভিন্ন মতবাদের লেখকদের একমঞ্চে রাখার জন্য ঔদার্যের প্রয়োজনীয়তা আমাদের বিগত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে প্রতিভাত হয়নি। যে কারণে প্রগতি লেখক সংঘের আয়ুষ্কাল ছিল স্বল্প। কিন্তু কংগ্রেস কিংবা কমিউনিস্ট কোনো পার্টির অনুমোদন ছাড়াই সাহিত্য সেবক সমিতিকে যে রমেশবাবু দীর্ঘ একান্ন বছর জীবন্ত রেখেছিলেন তার অন্যতম কারণ রমেশবাবুর ঔদার্য।' —১০ই জুন, '৯৪, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের, রমেশচন্দ্র সেন স্মরণ-সভায় উক্ত।

ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত এই ঔদার্য, কেবল সমিতির সূত্রেই নয়, তাঁর সমগ্র জীবন বৃত্তান্তেই উদ্ভাসিত দেখি।

রমেশচন্দ্র রচিত 'সমিতির ইতিহাস' প্রসংগ উল্লেখিত না হলে, গুরুতর ফাঁক থেকে যাবে। গল্প- উপন্যাসের বাইরে তিনি প্রায় কিছুই লেখেননি। না লিখে কতোদূর ক্ষতি করেছেন আমাদের—তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইলো এই 'সমিতির ইতিহাস'। মৃত্যুর সামান্য আগে এটি রচিত। সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর, চৌষট্টি পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনি প্রায় সানুপুংখ উদ্ঘাটিত করেছেন সমিতির দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিবৃত্ত। সে ইতিবৃত্ত মাত্র সমিতিরই নয়—সেই কালপর্বের বাংলার সাহিত্যসাধনারও ইতিবৃত্ত। সমিতির প্রেক্ষাপটে।

রমেশচন্দ্রের আত্মীয়সমাজটি সুবিশাল। আপন সংসারের সীমায় বড়ো হতে-হতে, ক্রমান্বয়ে, তিনি সেই আত্মীয়সমাজকেও তন্নতন্ন করে পড়েছেন। চিকিৎসকজীবনের সূত্রেও সুযোগ পেয়েছেন, অসংখ্য মানুষকে জানবার, বুঝবার। নিজের সূত্রে তো বটেই, পিতার সূত্রেও। দেখেছেন পূর্ববংগের এবং কলকাতার টিপিক্যাল মানুষগুলিকেই শুধু নয়, তাদের পরিবারগুলিকেও। অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন, বিগত শতকের বিরাট সাধনার ধারক-বাহক যাঁরা তখনো বিদ্যমান, অনবদ্য সেই মানুষগুলির। নিয়ত অবগাহন করেছেন সংস্কৃত-ইংরিজি- -বাংলার শাস্ত্র ও তবংগসংকুল ত্রিবেণীসংগমে।

শরীরের নিরিখে রমেশচন্দ্রের চোখ একটিই ছিল বটে—কিন্তু, বিপুল-বিশাল জীবনক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, মানুষকে দেখার ব্যাপারে—একচক্ষু হরিণীর ত্রুটি তাঁকে লেশমাত্র স্পর্শ করেনি। কোথাও তিনি একপেশে নন। নিদেন মহৎ সৃষ্টি-গুলিতে। সেখানে তিনি নির্মায়িক, নির্মোহ—একান্তভাবেই নৈর্ব্যক্তিক।

সাহিত্যিক হিসেবে যা তাঁর মৌল প্রকৃতিতে অবশ্যই ছিল : চিকিৎসক হওয়ায় তা বহুগুণে বিকশিত, দৃঢ়তর হয়েছে। পেয়েছে নির্ভুল রোগনির্ণয়, সঠিক ব্যবস্থাপত্র এবং ঔষধ প্রয়োগে ও প্রস্তুতিতে পৌরাণিক মাত্রাবোধ, আর সর্বোপরি অনিবার্য সহানুভূতি।

কলকাতায় প্রায় সমগ্রজীবনের বাস হলেও, তাঁর রচনায় পূর্ববংগ আপন খাল বিল নদী নালা নিয়ে উল্লেখযোগ্য রকম প্রাণবন্ত। বিশেষত ওপার বাংলার মানুষ। তদুপরি তাদের মুখের বুলি—ডায়ালেক্ট। রমেশচন্দ্রের আপন অঞ্চলই এক্ষেত্রে প্রায় একমেব স্থান জুড়ে আছে তাঁর লেখায়।

রমেশচন্দ্রের সর্বোত্তম উপন্যাস তিনটি একেবারে তিনটি ভিন্ন স্বাদের রচনা।

সুতরাং তিনটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতেই এদেরকে দেখা সমীচীন। পূর্বনির্ধারিত প্রত্যাশা বা প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টিভংগি নিয়ে কোনো গ্রন্থপাঠই কাম্য নয়। উঁচুজাতের রচনার ক্ষেত্রে তো কখনোই নয়।

যেকোনো শ্রেষ্ঠ লেখকের মতোই রমেশচন্দ্রও তাঁর তিনটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, 'শতাব্দী—কুরপালা—কাজল' সূত্রে আমাদের আভ্যন্তরীণ পাঠকটিকে জাগিয়ে তোলেন। জাগরণের পরে, পাঠকের যাবতীয় ওতপ্রোত অভিনিবেশ সন্নিহিত হয়ে যায়, লেখকের সৃষ্টির অবয়বেই মাত্র নয়—তার অন্তর্নিহিত সত্তার গভীরেও। যতো বড়ো স্রষ্টা ততোই গভীরতর এই সন্নিহিতি।

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নমঃশূদ্র যুবক রাজেশ্বরের পরম অভিলাষ চাঁপাকে বিবাহ করে। কঠিন সংসারের বিচারে এ তার বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার ইচ্ছে। সে অনাথ চালচুলোহীন একলা মানুষ। পরন্তু নির্ধন। অন্যদিকে, চাঁপা অগ্নি মন্ডলের একমাত্র কন্যা। একান্ত স্নেহের ধন। অগ্নি মন্ডল আপন সম্প্রদায়ের প্রধান। সর্বজনমান্য, শ্রদ্ধেয়। পরন্তু ধনী। বহুদিবসের আয়াসে, বহুলাংশে দ্বিধা-মুক্ত রাজেশ্বর, সাহসে ভর করে মন্ডলের কাছে কথাটা পেড়েই ফেলে। অগ্নি মন্ডলও রাজেশ্বরকে পছন্দ করতেন। সৎ ও পরিশ্রমী বলেই তিনি যুবকটিকে জানেন। কিন্তু, প্রাণাধিক প্রিয় আত্মজার জন্য সঠিক-পাত্র নির্বাচনে কোন পিতাই বা কবে সহজে দ্বিধাশূন্য হতে পেরেছেন! উপরন্তু সে আত্মজা যদি হয় চাঁপা। অন্যদিকে, সংসারের নজরে যে-পাত্রের এতোগুলি খুঁত? অথচ সকারণেই রাজেশ্বরকে মন্ডলের মনে ধরেছে। তাই, তাকে বাজিয়ে নিতে, তিনি শর্ত আরোপ করেন। সেই সুকঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে জিতে নিক সে, তার দুলালীকে। রাজেশ্বর চাঁপাকে জিতেই নিলে। সম্পূর্ণ সসম্মানেই।—রাজেশ্বরই চাঁপারও সুপ্তমনের ইচ্ছাপুরুষ। সেই থেকে ছেদহীন উত্থানের সূচনা।

ক্রমে তাকে পূর্ববংগের মাটির টান ছিন্ন করতে দেখি। দেশ ছেড়ে সে আসে কলকাতায়। সে জীবন কলকারখানার। কোটি অংকের মালিকানার। অবশ্যই 'এই মাত্র' নয়। অসংখ্য ঘটনারাশির তরংগশীর্ষে, অগণিত মানবমানবীর নিকট ও দূর সান্নিধ্যে, রমেশচন্দ্রের এই মানসপুত্রের জীবনব্যাপী সাধনা, কালে—পাঠকের চিত্তে, একটা সময়ের বাঙালির জীবনসাধনারই প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে—একদা প্রায়-সর্বহারা—রাজেশ্বরের জীবনে বিরোধের সূত্রপাত, নিবিত্তশ্রেণীর সংগেই। প্রতিপক্ষের নেতৃত্বে তাঁরি কনিষ্ঠপুত্র, তাঁরি অমলা। একান্ত বেদনাবিদ্ধ রাজেশ্বর তাদেরকে শুভেচ্ছাজানান। আশীর্বাদ করেন।

'শতাব্দী' এপিক উপন্যাস। এপিসোড-বহুল। কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্যই রাজেশ্বর। তার জীবনের আনুপূর্বিক উন্মোচনই লেখকের আন্তরিক অভীষ্ট। প্রায় যৌবনের সূচনা থেকে বার্ধক্যের উপান্ত অবধি, নায়কের জীবনের ও চরিত্রের অনিবার্য বিকাশ রমেশচন্দ্র ধাপে ধাপে মেলে ধরেছেন। এমন দীর্ঘ সুবিস্তীর্ণ সময়ের ও জীবনের পরিসরে সম্ভবত আর-কোনো নায়কের উপস্থিতি আমরা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে পাই নি। বিশেষ, ইতিহাসের এমন ঘটনাবহুল প্রেক্ষাপটে—সেই ইতিহাসের শরিক হয়েই যে-নায়কের অগ্রগতি ও চূড়ান্ত পরিণাম।

এই উপন্যাসে নায়ক রাজেশ্বর, তার চাঁপা, চাঁপার পিতা অগ্নি মণ্ডল বাদেও, স্বভাবতই আরো অসংখ্য চরিত্রের আনাগোনা। তারা নিছক নায়ক চরিত্রের চারদিকে ভীড় জমাতেই আসে না। সবটা মিলেই একসূত্রে গাঁথা একটা অপূর্ব মানবমাল্য। আশ্চর্য করা মানবিকলীলার বহু 'সূক্ষ্মকোণ' এখানে লক্ষণীয় তাৎপর্যে উপস্থিত। চাঁপা-টগর-জবাকে নিয়ে রাজেশ্বরের এবং তাকে ঘিরে ওদের 'মনস্তত্ত্ব বিকাশে 'শতাব্দী'র সিগ্ধ সিম্বলিক মাত্রা অর্জন করেছে। উপন্যাসের ভাষা এবং শৈলী একান্তভাবে 'শতাব্দী'রই ভাষা শৈলী। সমাপ্তিপর্ব একটু দ্রুত ও সংক্ষেপিত বলে, প্রাথমিকভাবে মনে হতেও পারে। কিন্তু, 'শতাব্দী'র নিজস্ব লজিকের নিরিখে সম্পূর্ণ সঠিক অবস্থান লেখকের। সুদীর্ঘ জীবনের ক্লান্ত অবসন্ন বিষাদময় গোধূলিবেলায় ব্যক্তি রাজেশ্বর এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের সদ্য-বিকচোন্মুখ শ্রমিক-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, একমাত্র সংগতিপূর্ণ সমাপ্তি—ঠিক ওইখানে, ওইভাবেই হতে পারে।

প্রকাশিত তৃতীয় উপন্যাস 'কুরপালা'। 'শতাব্দী'র পরে বছর না ঘুরতেই এমন একটা বিপরীত থীম ও শৈলীর উপন্যাস অত্যন্ত বিস্ময়কর। বিস্ময়ের বড়ো কারণ উপন্যাসের 'নায়ক'-প্রশ্নে নিহিত। 'শতাব্দী'তে নায়ক জনৈক ব্যক্তি। রাজেশ্বর। কারণ, মানুষের সম্মিলিত সত্তাটা মাত্র সেদিনও তেমন ভাস্বর ছিল না। 'কুরপালা'য় আমরা পেলাম গোষ্ঠী-নেতৃত্বকে। নেতৃত্বের অর্থাৎ নায়কত্বের সামাজিক অভিব্যক্তি। ঘটনাটা বাংলাসাহিত্যে সে পর্যন্ত সম্পূর্ণ নজিরহীন। অবশ্যই প্রধানচরিত্র এখানেও পাই—যেমন শংকর ও হাস্য। কিন্তু, সামগ্রিক অর্থে 'কুরপালা'র কাহিনীবিন্যাসে নায়কত্বে আসীন—যূথবদ্ধ গোষ্ঠীমানুষ।

'শতাব্দী'তে আমরা দেখেছি, একক মানুষ, নায়ক রাজেশ্বরের সূত্রে—গাঁয়ের জীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন অন্তে—নবীন প্রাণরসে অভিষিক্ত শিল্পসভ্যতা তথা পুঁজির উত্থানচিত্র। সেই পুঁজির সূত্রেই জাত শ্রমজীবীশ্রেণীকেও দেখেছি,

পরগাছাতন্ত্রের অন্তিম পূর্ণচ্ছেদ টানতে যার ভূমিকা অপরিহার্য—সেই শ্রেণীর সকল সীমাবদ্ধতা নিয়েও উজ্জ্বল অভ্যুদয়-সূত্রে 'শতাব্দী'র সমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক। কিন্তু, 'কুরপালা'য় পাচ্ছি সামন্ততন্ত্রের পতনের সাথে চিমনির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় গ্রাম গঞ্জের নীল নির্মল আকাশবাতাস দূষিত করে কল প্রতিষ্ঠার দানবীয় কান্ডকারখানা। উঠতি পুঁজির মহনীয় রূপ দেখেছি 'শতাব্দী'র রাজেশ্বরে। তার যারপরনেই হিংস্র নখদন্ত-বিকাশ দেখলাম 'কুরপালা'র বংকিম কুন্ডুতে। সে হিংস্র ও শঠ এবং নির্বিবেক। যে-চাষীকুল কারখানা স্থাপনের প্রাক্কালে, বাস্তব কারণেই, বংকিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়—পরাভূত সেই চাষীরাই শেষতক, পেটের তাগিদে, লাইন দিলে সেই কারখানারই গেটে। ভূমিহীন কৃষকের শ্রমিকে পরিণত হবার মর্মন্তুদ উপাখ্যান বাস্তবোচিত উজ্জ্বলতা নিয়ে, রমেশচন্দ্রের বলিষ্ঠ লেখনীসূত্রে, সমৃদ্ধ বাংলাসাহিত্যে ঠাঁই করে নিলে। এই কারণেও 'কুরপালা' স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য।

উঠতি পুঁজির বর্বরতা দেখাতেও রমেশচন্দ্রের লেখনী যেমন অবিকম্পিত, ঠিক তেমনি, পতনোন্মুখ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটার প্রতিও তাঁর কোনো নস্ট্যালজিক মায়া নেই। নিঃস্বমানুষগুলির প্রতি আন্তরিক মমতা থাকলেও, তাদের অনিবার্য পরাভব প্রদর্শনেও সত্যসন্ধ শিল্পী হিসেবে তিনি নির্মায়িক। এখানেই শ্রেষ্ঠের মহত্ব। পরাভব সত্ত্বেও, লেখক বা পাঠক কারো কাছেই যে তারা আদৌ করুণার পাত্র নয়, এই চিন্তারই অভিব্যক্তি নারায়ণ চরিত্র। নারায়ণের মাধ্যমে 'কুরপালা' স্রষ্টা সেই আপাত-পরাভূত মানুষগুলি যে, পুনরায় সংগ্রামের সরণীতে এসে দাঁড়াবে—এই ইংগিতই দিলেন। নারায়ণের সূত্রে তার শ্রেণীর সংগ্রামী স্বরূপটাই উদ্ভাসিত হতে দেখি। শংকর হাস্য রমেন্দ্র রায় বংকিম কুন্ডু নারায়ণ ইন্দুপ্রকাশ সরোজিনী জাহ্নবী প্রমুখ বহু চরিত্রের এক বিশাল মিছিল যেন চলমান রূপমতীর দুই তীর ঘেঁসে। সে মিছিলও সংগঠিত অংশগ্রাহী প্রত্যেকটি মুখ, উত্তোলিত বাহু ও পদক্ষেপের একান্ত যুক্তিনিষ্ঠ সম্মিলনে। নিজেদের অজান্তেই কখন যেন আমরাও সেই স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে সামিল হয়ে যাই। এই উপন্যাসেও বেশকিছু এপিসোড আছে। মূল উপাখ্যানের বহির্বর্তী হয়েও এই পার্শ্ব-কাহিনীগুলি শেষ পর্যন্ত আর বাইরে থাকে না। সবটা মিলেই দাঁড়ায় একটি একক ঃ অপরাজেয় মানুষের সাময়িক পরাভবের গভীর বেদনা। 'কুরপালা' প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর নির্মোহদৃষ্টি অথচ অন্তিম সহানুভূতির স্পর্শে সুগভীর ব্যঞ্জনা মন্ডিত।

'কাজল' রমেশচন্দ্রের চতুর্থ প্রকাশিত উপন্যাস। 'শতাব্দী' ও 'কুরপালা'র মাঝখানে, তিনটি নারীকে ঘিরে এক 'অসাধু'-হয়ে-যাওয়া পুরুষের ও সেই রমনীত্রয়ীর জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপাখ্যান 'চক্রাবাক'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্সাময়িক ছিন্নমূল মধ্যবিত্ত বাঙালি-মনের চিত্র। 'শতাব্দী' গরিষ্ঠ অংশে, 'কুরপালা' প্রায় সবটাই এবং পরবর্তী কালে রচিত আরো কয়েকটি উপন্যাসের ভাষা পূর্ববাংলার—কারণ, চরিত্রগুলি প্রায় সর্বাংশেই ওপার বাংলার। 'কাজলে'র পূর্বে এক্ষেত্রে 'চক্রাবাক' সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। কলকাতার দক্ষিণে যখন বালীগঞ্জ গড়ে উঠছে, মোটের 'পরে সেই সময়ের' কলকাতার কয়েকটি চরিত্র উপজীব্য 'চক্রবাকে'র—ভাষাও সুতরাং এখানকারই।

পূর্ববংগের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রীতীরবর্তী কোনো গাঁয়ের অসহায় পিতার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে থাকা, বালবিধবা কাজল। তার এই জীবন উপন্যাসের, একটু বেশি সাড়ে ৩০০ পৃষ্ঠার, মাত্র ৫-৬ পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এই কাহিনীর ভাষা প্রায় আদ্যোপান্ত কলকাতার।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা—কাজল, তাকে ঘিরেই তামাম বৃত্তান্তের আবির্ভাব। হাজারো সমস্যা ও সংকটে দীর্ণ মানবসমাজের গভীরতম সংকট ও কুৎসিততম ব্যাধি যে-বিন্দুতে উদগ্র রকমে প্রকট সেই বিন্দুটির সামাজিক অভিধা : পতিতা।

মাতৃত্বের দুর্মর বাসনায় রীতিমতো তাড়িত কাজল। তার দাদার বন্ধু পাঁচু, অনটনের সংসারে, নানা খুচরো 'অনুদানে'র ছলে ঢুকে পড়ে। অভিনয়পটু পাঁচু ক্রমে ঘরের ছেলে বনে যায়। ক্রমে সে কাজলকেও দুর্বল করে। কলকাতায় গিয়ে বিদ্যেসাগরী মতে বিয়ের প্রলোভন দেখায়। জমিদার ষোড়শীবাবু কাজলের অসহায় পিতা রামলোচনকে সত্যমিথ্যায় জড়িয়ে সমাজের নামে শাসান। মায়ের হৃদয়হীনতা তীব্র তীক্ষ্ম হয়ে দাঁড়ায়। অসহায় পিতার নীরবতা, মাতৃত্বের জন্য অধীর—বিংশতিপ্রায় কাজলকে, পাঁচুর হাত ধরে বাড়ির বার হতে বাধ্য করে। পাঁচু তাকে এনে তুললে উত্তর কলকাতার কুখ্যাত পতিতাপল্লী সোনাবাগানে।

এইখানে 'কাজল' কেন্দ্রিক একটি ধাঁধার কিনারা মেলা ভারি জরুরি। রমেশচন্দ্র বারনারীদের নিয়ে গোটা একটা উপন্যাস রচনার তাগিদ অনুভব করলেন কেন? কোনো একটি বা একাধিক রমণীর বিয়োগান্ত পরিণাম কি তাঁর প্রেরণার মূলে সক্রিয়? নাকি তাঁর প্রেরণার উৎসে কোনো ঐতিহাসিক পুরুষের সংঘটিত কোনো উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনা?

আমাদের সাহিত্যে এই-মেয়েদের নিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখনী সঞ্চালন শরৎচন্দ্রের। তাঁর চন্দ্রমুখী-সাবিত্রীরা সেই নমস্য প্রয়াসের সাহিত্যিক মূর্তি। তিনিও সামগ্রিক সৃষ্টির কথা ভাবেন নি। ভাবেন নি কারণ, তিনি অধিকারী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু, তাঁর অধিকার ছিল না এও নির্ভুল। শরৎচন্দ্রের আগেপরে রবীন্দ্রনাথ-সুবোধ ঘোষ সহ গল্প অনেকেই লিখেছেন—উপন্যাস কেউই নয়। রমেশচন্দ্রের আগে। তাই ধাঁধা—উনি কি নিছকই সমাজসচেতনতার কারণেই লিখলেন ? সমাজের সর্বাপেক্ষা শোষিত, সবার অধিক নির্জিত, সবার আগে এবং সবার ওপরে অসম্মানিত—এককথায়, নানাভাবে চরম উৎপীড়িত এই গভীরতম মানবিক ক্ষতস্থানে তাঁর চিকিৎসকের চোখটি পড়েছিল এ তো সংশয়হীন তথ্য। কিন্তু, এই কি সব ? কোনো মহত্তর প্রেরণা ছাড়াই এমন উদ্যোগ, হঠাৎ কি নেয়া যায় ? তাহলে, সেই প্রেরণাটা কী ? উৎসটা কোথায় ? আমার একটা নির্দিষ্ট ভাবনা আছে—যদিও নিছক আনুমানিক। তাই, কাজলের সন্ধানেই এগনো যাক।

সোনাবাগানের জীবনে—একটু একটু করে কাজল ঢুকে পড়ে। কখনোই স্বেচ্ছায় নয়। তাকে গর্ভিনী অবস্থায় ফেলে এক সময়ে পাঁচু কেটে পড়ে। এরপরে রমেশচন্দ্র ঘটনার পর ঘটনার সূত্রে উন্মোচন করেন, বীভৎস লোলুপতার করুণ শিকার একটা সর্বস্ব অসহায় মেয়ে—কীভাবে পংকিল-জীবনের জালে জড়িয়ে পড়লো।

সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার উপন্যাসে, করুণতম কলুষিত জীবনে, অধঃপতনের সংগে সংগ্রাম—আপস—হারজিতের ভীতিজনক অগ্নি-পরীক্ষায় বিধ্বস্তপ্রায় কাজল যখন চূড়ান্ত পতনের মুখোমুখি, সেই কঠিনতম সময়ে, তার জীবনে আসে রথীন।

রথীনের আবির্ভাবের আগের সময়টা মোটের পরে, পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ভেতরেই সমাপ্ত। পরবর্তী শতখানেক পৃষ্ঠায় আমরা কাজল—রথীনের যুগলবন্দী লক্ষ্য করি। সময়টা অবশ্যই খুব বেশি দীর্ঘ নয়। রথীন মারা যায়। ফ্ল্যাটের জীবন ছেড়ে ফের সোনাবাগানেই ফিরে আসে কাজল। কেবল বাড়িউলি মাসি বদল হয়। প্রমীলা থেকে কুসুম। পরবর্তী দুশ পৃষ্ঠা মতো ঘটনা ও কালের পরিসরে আমরা দেখি কাজলের সংকট কঠিনতর, গভীরতর। এবারে, এখানেই শুরু হয়ে যায় তার সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর্বটি।

এখন আর কোনোকিছুই যথেষ্ট কলুষ বলে ভাববারই অবকাশ নেই তার জীবনে। ইতিমধ্যে রথীনের জীবিতকালেই পাঁচুর ঔরসে তার সন্তান মীনার জন্ম হয়েছে। আবার আগের পাড়ায় উঠে আসার পরবর্তী জীবনে, ক্রমে-ক্রমে সে

মহল্লার প্রধানা। তার নেতৃত্বে পুজো হয়। বাদবিচার শূন্যে এই সময়ের জীবন। নিয়মিতই সে বাবু বসায়। এবং একদিন, ঘটনাপুঞ্জের অনিবার্য পরিণামে—প্রহৃত কাজল এসে দাঁড়ায় ফুটপাথে। তার শরীর বেয়ে গড়াচ্ছে রক্ত। তখন গভীর রাত। প্রবলভাবে কাজলের মাথা ঘুরতে থাকে। মনে হয় যেন গোটা দুনিয়াটাই ঘুরছে। সর্বস্ব-খোয়ানো কাজল—ঘোরের মধ্যেই ভাবতে থাকে: 'মীনাকে সে ওই ঘূর্ণির মাঝখানে পড়তে দেবে না।' মীনাকে নিয়ে দ্বিতীয়-পর্ব রচনার ইচ্ছে ছিল 'কাজল'-স্রষ্টার। কাজল কি মীনাকে সুস্থ জীবনে স্থিত করতে পারতো? জানিনে। রমেশচন্দ্র কাজলকে পারেন নি। যে মেয়েটি নির্মল থাকতে চেয়েছিল, হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও, সে পরাভূত। তার সকল শুভ্র শুভ ইচ্ছাই চুরমার হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। পরাজয়ের এই গভীর বেদনাই তো ওই মেয়েদের জীবনের চূড়ান্ত বাস্তব! একটি—আধটি হয়তো বা ক্বচিৎ ফিরতে পারে।

সংযম আলোচ্য স্রষ্টার সমগ্র জীবনব্যাপী সকল রচনারই গৌরবময় দিক। এটা তাঁর সকল শ্রেষ্ঠরচনারই বিশিষ্ট সম্পদ তো বটেই, এমনকি তা প্রায় প্রতিটি রচনারই সত্য-অংগ। কোথাও যেন মাত্র একটা শব্দও অপরিহার্য না হলে, ব্যবহার করতে তিনি নারাজ। কিন্তু 'কাজলে'র ক্ষেত্রে সেই সংযম সত্যি যেন অনেকগুণেই বেশি বিস্ময়কর লাগে। কারণ, সেই জীবনটাই যে আগাপাশতলা অসংযমের!

অজস্র ঘটনাজালে সমাচ্ছন্ন কাজলের জীবনকাহিনী। অগণিত চরিত্রের আসা যাওয়া। কতো বিচিত্র এবং জটিল টানাপোড়েন। পাঁকের বিবিধ চরিত্রচিত্র। নিরন্তর কালির মাঝেও কখনো বা, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতোই, শুভ্র-নিরঞ্জনের আবির্ভাব। কেবল চরিত্রগুলির বিচিত্র স্বকীয়তাই বুঝিবা অবাক হয়ে অনুভব করবার মতো। চরিত্রগুলির অদ্ভুত কিন্তু যথার্থ সব নামকরণ, নানা জনের নানান জাতের আচরণ, বারবধূসমাজের উপভাষা, প্রমীলা ও কুসুম বাড়ি-উলির বনেদিআনা নিয়ে প্রতিযোগিতা, ভালোবাসার জন্য আকুলতা, একনিষ্ঠ প্রণয়ের বিয়োগান্ত পরিণাম, দরজায় দাঁড়াতে কোনো মেয়ের তীব্র আপত্তি—সবটা নিয়েই পাঠককে স্তম্ভিত করে! — মদ-মাংস-মেয়েমানুষ-বাড়িউলি-দালাল-বাবু ইত্যাদিতে পরিকীর্ণ এই সমাজ, এই জীবন যা মানুষের সভ্যতারই কলংকিত পরাজয়ের চরম চিহ্ন—তাকে সমগ্র 'কাজল'চিত্রে, রমেশচন্দ্র অসামান্য এক বাস্তবসম্মত ক্লাইম্যাক্সে উত্তীর্ণ করেছেন। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের 'ক্লেদজ কুসুম' অভিজ্ঞানটি 'কাজল' সম্পর্কে লাখ কথার একটি।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত চারটি বাদে, রমেশচন্দ্রের প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকায় আরো পাই—গৌরীগ্রাম, মালংগীর কথা, পূব থেকে পশ্চিমে, সাগ্নিক, নিঃসংগ বিহংগ, অপরাজেয়, পূর্বরাগ, দীপক এবং সেলিরানা। অর্থাৎ সর্বমোট তেরোটি উপন্যাস। গল্পের বই—মৃত ও অমৃত, কয়েকটি গল্প, তারা তিন জন, শ্রেষ্ঠগল্প—পবিত্র গংগোপাধ্যায় সম্পাদিত, রমেশচন্দ্র সেনের গল্প—সমীর রায় ও সমর চন্দ সম্পাদিত, অগ্রন্থিত রমেশচন্দ্র—সমর চন্দ সম্পাদিত ঃ এই গ্রন্থে 'দীপক' উপন্যাসটিসহ ১১টি গল্প গ্রন্থিত। — মোট এই ছটি গল্পগ্রন্থ। এবাদে, রমেশচন্দ্র ও শৈলজানন্দ সম্পাদিত গ্রন্থ—'সেরা সেরা লেখকের ছোট গল্প'। তাঁর বহুল প্রচারিত গল্প 'সাদা ঘোড়া' তর্জমা হয়েছে একাধিকবার। হিন্দিতে দুটি ও ইংরিজি এবং চেকভাষায়। ইংরিজি অনুবাদক অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থিত এবং প্রকাশিত কিন্তু অগ্রন্থিত গল্পের সংখ্যা একশকুড়ি-পঁচিশ। অন্যান্য রচনা যৎসামান্য। তার মাঝে 'সমিতির ইতিহাস, নানা কারণেই অসামান্য।

বাস্তব কারণেই, এখানে তাঁর ছোটগল্প নিয়ে কোনো আলোচনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নিতান্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, আলোচিত মাত্র তিনটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'চক্রবাকে'র সামান্য উল্লেখ আছে কেবল। বাকি নটি উপন্যাস প্রসংগ সম্পূর্ণ অনুত্থাপিত। অসামান্য বিবেচনায় যে-পনেরটি গল্প উল্লেখিত তা বাদেও আরো অন্যূন পনের-বিশটি উচ্চমানের গল্প তিনি লিখেছেন। বাদবাকি নটি উপন্যাস বিষয়ে সংক্ষেপে এই বলা যায়—পূর্বরাগ ও দীপকে প্রাথমিক রচনার দুর্বলতা যথেষ্ট। সাগ্নিক, নিঃসংগ বিহংগ, অপরাজেয় ও সেলিরানা, তাঁর সমাপ্তি পর্বের এই রচনাগুলির সূত্রে—তিনি আপন সৃষ্টিপ্রতিভা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি সুবিচার করেন নি। নির্বাপিতপ্রায় প্রতিভার সাক্ষ্য গ্রন্থগুলি পাঠে চিত্তকে বিষণ্ণ করে। অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকের এরচেয়েও দুর্বল রচনা পাঠক সমাজে সমাদৃত, এটা কোনো যুক্তিই হতে পারে না। একথা গৌরীগ্রাম, মালংগীর কথা বা পূব থেকে পশ্চিমে—প্রসংগে আদৌ বলা যায় না। এই তিনটি উপন্যাসের গুরুত্ব নানাদিক থেকেই অবশ্যস্বীকার্য। এবং এই তিনটি ও 'চক্রবাক' নিঃসন্দেহে, সর্বশ্রেষ্ঠ 'শতাব্দী-কুরপালা-কাজলে'র সমকক্ষ না হলেও, বিশিষ্ট সৃষ্টি বটেই।

অনেকে, বিভিন্নসূত্রে, রমেশচন্দ্রের সম্বন্ধে বিলক্ষণ তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। তাঁদের মাঝে সাধারণ ও অসাধারণ দুরকম মানুষকেই পাই। সেগুলি

থেকে একটিমাত্র প্রণিধানযোগ্য কথাই এখানে নিবেদন করবো। সাধারণভাবে সেইসূত্রে রমেশ-প্রতিভার মহত্ব সম্পর্কেও লেখকের মৌলিক বিশ্বাসের স্থানটি অংশত নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কথাটি পেয়েছি, বর্তমানের অন্যতম প্রতিভাময়ী লেখিকা, মহাশ্বেতা দেবীর 'সতী' উপন্যাসে।

—'ও বলত বিভূতিভূষণ, জগদীশ গুপ্ত, রমেশ সেন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—কার মত লিখতে পারি?' পৃ. ৯৭

সংলাপটি সতী বলছে তার লেখক স্বামীর জবানিতে। মহাশ্বেতার নিজের উক্তি নয়। পাকা কিছু ধরে নেয়াটা ঠিকও না। এই প্রসংগে শ্রদ্ধেয়া লেখিকার অভিমত কী তাও আমাদের জানা নেই। সম্পূর্ণ বিপ্রতীপও হতেই পারে। আমার কথাটা পাঠক বিবেচনা করে দেখতে পারেন—এখানে সতীর লেখক-স্বামীর মতের সংগে 'সতী' উপন্যাসের লেখিকাও কি মূলত একই ভাবে ভাবিত নন? নইলে, ওই সংলাপটি কি যথার্থ ওইভাবেই গঠিত হতে পারতো?

দীর্ঘ আলোচনার মাঝে তথ্যগত কয়েকটি ত্রুটি শুধরে নিতে চেষ্টা করেছি। রমেশচন্দ্র সংক্রান্ত নথি ও পত্র, যাকে আমরা সাবুদ বলি—তার দুর্ভাগ্যজনক অপ্রতুলতাই বুঝিবা ভুলগুলি ঘটিয়ে থাকবে। স্বয়ং সংশোধনকারীই হয়তো এই লেখায় কোথাও গুরুতর প্রমাদ ঘটিয়ে বসেছে। আশা করে থাকবো, সেটা অন্যেরা শোধন করবেন।

এখন, সমাপ্তিতে পৌঁছে, যে ভুলটির কথা তুলছি, সেটা কেবল তথ্যগতই নয়, সত্যের নিরিখেও নিতান্ত বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী।

রমেশচন্দ্রের সত্য মূল্যায়নে এ ধরনের ভুল মারাত্মক বিঘ্নের ভূমিকা রচনা করবে এবং এ জাতীয় বক্তব্যে তাঁর মহত্ব বিন্দুমাত্র বাড়ে বলেও বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং, খণ্ডন জরুরি অনুভব করি।

'Like many of his contemporaries Ramesh Chandra's deep humanism led him to Marxism. In his work we see him use Marxist analyses in the novels of social change. Ramesh Chandra also believed in the possibility that Marxism could create a better future where the dignity of man's life is assured'.—Bengal's Maxim Gorky : Nilanjana Gupta, The Statesman, 28. 8. '94.

নীলাঞ্জনা দেবী এমন বিচিত্র তথ্য কোথায় পেলেন, আমাদের জানা নেই। জীবনের কোনোপর্বেই রমেশচন্দ্র মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন নি। কার্ল মার্কসকে গভীরতম অর্থেই মহামতি বলে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেছেন—এইমাত্র।

বরং মূলত ও প্রধানত যথেষ্ট বিরোধিতাই ছিল। নিঃসন্দেহে এই মানুষটির চিত্তে মার্কসবাদ বা মার্কসবাদীদের সম্পর্কে—বনফুল-প্রবোধ সান্যাল-বুদ্ধদেব প্রমথনাথ বিশী প্রমুখের তুল্য—কোনো গূঢ় বিতৃষ্ণা আদপেই ছিল না। তাঁর কমিউনিস্ট মিত্রের সংখ্যাও বড় অল্প ছিল না। স্বদেশের ও বিদেশের কমিউনিস্টদের নানা বক্তব্য ও কর্ম যেমন সমর্থন করেছেন, ঠিক তেমনি, উল্টোটাও। কোনো সন্দেহই নেই যে, তাঁর সৃষ্টির মাঝে আমরা ব্যক্তি সমাজ শ্রেণী ও ইতিহাসের বাস্তববাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই পাই। পাই বলেই তো তিনি মহৎ। বস্তুবাদী বা মার্কসবাদী ব্যাখ্যাতা বলে নয়।

বস্তুত রমেশচন্দ্র ছিলেন একজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নিখাদ দেশ-প্রেমিক, যাঁর অকুণ্ঠ মানবতাবাদী সত্তা পরিণামে তাঁকে অবহেলিতজনের দীপ্ত লেখক করে তুলেছে। নিষ্ঠার সংগে, আন্তরিকতার সংগে, স্বধর্ম পালন করেছেন বলেই তিনি মার্কসবাদী হয়ে গেলেন? বালজাক প্রসংগে মার্কস এবং টলস্টয় প্রসংগে লেনিনের বিশ্লেষণ অবশ্যই শ্রীমতী গুপ্তের অজ্ঞানিত নয়—তবু, এমনতরো ভ্রান্তি কেন ঘটে, সেটাই ভারি বিস্ময়ের। রমেশচন্দ্র 'বাংলার গোর্কী'হতেই পারেন—এবং সেটাও মার্কসবাদী না হয়েও পারেন। এই জাতীয় তথাকথিত মার্কসবাদী ব্যাখ্যারই সকরুণ ও হাস্যকর পরিণাম 'ডোমের চিতা'র 'চুল্লী' নাট্যরূপ।

নানাদিক থেকে বাংলাসাহিত্যে রমেশচন্দ্রের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমশ্রেণীর সৃষ্টিপ্রতিভার অধিকারী তিনি। ব্যক্তি-চরিত্রের মহত্ত্বেও মানুষটি অগ্রগণ্য। জনসমাজের প্রায় সকল অংশই তাঁর রচনায় এসে থাকলেও, সেখানে অবহেলিত মানুষেরই বিপুল সমাবেশ। তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাদের স্থান দরদ মিশ্র সম্মানের। কেন তিনি 'জনপ্রিয়' নন—ভাবতে হবে, কেনই বা তাঁকে ধীমান সমালোচকেরা সাহিত্যের কুলপঞ্জিতে ব্রাত্য করে রাখেন—সেটা দুর্ভাবনার বটে। একটা ভুলকে শোধরাবার তাড়নায় যেন আরেকটা ভয়ানক ভুল না করি! অনুক্ষণ যেন মনে রাখি, ইতিহাস নির্মম—সে কারো বাড়াবাড়িই শেষ অব্দি সহ্য করে না। জীবনভর যে-স্রষ্টা অবহেলিতদের নিয়েই মগ্ন রইলেন—নিজের জীবনে সেই মানুষটিই রয়ে গেলেন অবহেলিত। কী নিদারুণ অসংগতি!

দিগন্তদর্শী স্রষ্টা রমেশচন্দ্র অনন্তকাল মেঘাবৃত থাকবেন না বলেই লেখকের একান্ত বিশ্বাস। 'নীরবতার চক্রান্তে'র বলে, কোনো মহৎ গুণীকেই চিরকাল লোকমানসের বাইরে 'অন্ত্যজ' করে রাখা যায় না। 'সাহিত্যে'র ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যের কারণেই এই বিশ্বাস নিয়ত অটুট রাখবো : রমেশচন্দ্র এবং সমগোত্রীয় বিস্মৃত লেখকেরা হৃতমর্যাদা ফিরে পাবেনই।

নষ্টরাত্রির গান

বাসুদেব দেব

নিঃশব্দে এসেছে রাত হাওয়া
নিঃশ্বাস ফেলেছে ঘুমন্তকে
কেঁপে ওঠে ভিতর জগৎ
পোষা পাখি বলে 'প্রবঞ্চক এ'

রাত ভর করে ন্যাড়া গাছে
পাথরে শিকড় ঠেকে যায়
ডালপালাপাতায় কী ধুলো
নিচে ধর্মকুকুর ঘুমায়

এত কথা জানে রাত হাওয়া
ভুলে যাওয়া এত সব কথা
এত দুঃখ কী করে লুকোলে
এত শব্দ জানে নীরবতা

ফুটপাথে ভিখিরি সংসার
গেটবন্ধ ফ্ল্যাট বাড়ি কাঁদে
পোকাকাটা মানুষেরা সব
মৃত্যু মানে বিনা অপরাধে

মাঝরাতে নষ্টমেয়ে আর
নক্ষত্রেরা মজা করে নাচে
তখনই তো উড়ে আসে পরী
রাত হাওয়া নামে ন্যাড়া গাছে

স্থাপত্য

প্রকাশ কর্মকার

রাত কম্‌থমে হলে শুধু জেগে থাকে ভাত
ঠিকানা ও প্রকল্পের হিরোসিমা, অক্ষর ও পংক্তির স্বাদে
শঙ্খলাগা বস্তীর উচ্ছেদের অবিরাম ক্রমদোলানো,
হুশ করে ছুটে যাওয়া গাড়ি আর ছাপাখানা শব্দের
চেতনার সর্বস্ব তুমি অক্ষরবিহীন

মানুষের দলিলে নয় শোন ঐ পাখির শব্দ, শোন—
আজোবধি ধ্বংসের সংলাপে তোমার স্থাপত্যের নিবিড় ছায়ায়
নীরবতার মৌন মিছিলের জলতরঙ্গ

এসবই লিপিহীন অথচ অক্ষর কঙ্কাল হেঁটে যায় কাগজে কাগজে
প্রসববেদনার যুগ্ম ভালবাসায় তখন
শুধু জেগে থাকে ভাত

বরাত

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

পাখিদের ডাকাডাকির অভ্যেসে
রাত কেটে সকাল হয়ে যায়
আবার পাখিদেরই ঘরে ফেরার অভ্যেস মিলিয়ে
সন্ধে হতে হতে রাত।
এ ভাবেই শতাব্দীর বছর গুলোকে
ফালা ফালা করে সময়ের করাত্।

দিন ও রাতের সাথে ঘুরে ঘুরে
সময়ের রঙ ফেরতা হয়
সরকারী হাসপাতালে বেডের
অনবরত চাদর বদল হয়;
এ হাসপাতাল ও হাসপাতাল হয়ে
ডাক্তারের ফি বাড়তে বাড়তে
ছাদের মাথা ছাড়ায়।

অসুখে শুয়ে আছি
নিরাময়হীন, বেহুঁস পড়ে আছি
অসুখে, বিসুখে, এমনই বরাত্।

সামাজিক

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

লেখার টেবিলে ওষুধের শিশি. ফল, থার্মোমিটার
টেবিলের নিচে বেডপ্যান. মগ. ডেটল, সাবান
কবিতা ওঘর থেকে নির্বাসিত বেশ কিছুদিন
চেয়ারে পা তুলে গভীর নিদ্রায় ডুবে রাত্রির আয়া

যেহেতু রোগিণী, দরজায় অহরহ 'প্রবেশ নিষেধ'
অক্ষ কলম, চলন্তিকা, প্যাড ও রিফিল, ওই ঘরে অন্তরীণ
কবিতার অভ্যস্ত চেয়ারে পা তুলে নিদ্রিত আয়া
অভ্যাসের মায়াবী টেবিলে রোগিণীর খাদ্য ও পানীয়

ফিকে হতে হতে মেঘে রাশি রাশি রুপো
সমস্যা-জর্জর হাওয়ায় আপাতত আত্মসুখী টান
কেউ তুলি কেউ কাগজ কলমে নিবেদিত
ঝাড় পোঁছ সেরে প্রেসে প্রেসে রেসের ঘোড়ার পা-ঠোকা

কবিতার চেয়ে ডেটল ঈথার বেশি সামাজিক
মধ্যরাতে রোগিণীর কাতরোক্তি বেশি সামাজিক
এসময়ে কবিতার স্বপ্নাদ্য চেয়ারে কার অধিকার
সে কি কবি, কিম্বা শ্রান্ত রাত্রির আয়া।

বজ্রের আওয়াজ

তুলসী মুখোপাধ্যায়

নিয়মিত প্রভাতী ভ্রমণে
মুখোমুখি কয়েকটি সহাস্য বিনয়
মৃদুভাষে বলে
আপনার খামার বাড়ি
মহারাজ দখল করেছে।
মহারাজ? কে মহারাজ?
খুব ঘোর সাইরেনে
ডুবে যায় আমার আওয়াজ।

বৈকালী স্নিগ্ধ আসরে
আচমকা ঘরে ঢুকে
সেইসব প্রভাতী মুখোস
মৃদু হাস্যে বলে —
মহারাজ অসম্ভব সৌন্দর্য পিপাসু
আপনার ফুলের বাগান তার চাই।
মহারাজ ? কোন্ মহারাজ ?
পলক ফেলার আগে দেখি কেউ নাই।

মধ্য নিশীথে
ঘুম থেকে তুলে এনে দুরভাষ বলে —
আপনার অন্তর-প্রতিমা
কাল থেকে রাজার সেবাদাসী।
কে রাজা ? কে সে মহারাজ ?
রাজাহীন এ রাজত্বে
কে ছোঁড়ে চন্ড এই বজ্রের আওয়াজ।

ইউ, এস, জিতে

শুভ বসু

'এদিকে আসুন, স্বয়ং দেখুন নিজের চোখেই ইউ, এস, জিতে
অনাগত ঠিক কেমন রয়েছে ভ্রূণাবস্থায়, দেখতে পাবেন'
বলে, ডাক্তার হাত লাগালেন যন্ত্রে, এবং সেই মুহূর্তে
পর্দায় ফোটা রেখাগুলো দেখে বললেন 'এই দেখুন পাঁজর,
এখনো অসম্পূর্ণ, তবুও, বোঝা যায়, বেশ মজবুত হবে'

আহা ধুকপুক প্রাণ আমাদের বাঁচিয়ে চলেছি সেতো পাঁজরেই

•

'এবার দেখুন ইনটেসটাইন, নর্মাল আছে, গড়বড় নেই,
ওইতো স্টমাক, দাঁড়ান একটু, লিভার দেখাবো ঠিক এর পরেই'

অক্ষয় আর নির্মল হোক পাকস্থলি ও অন্ত্রের পরিচর্যা

'এবার ওখানে কী দেখছেন তা বলুনতো দেখি, ওটাইতো ব্রেন,
জাতক বুদ্ধিমন্ত হবে, তা জানলে সিওর ভরসা পাবেন'

আহা ওরই প্যাঁচে কৌশল, ল্যাং, জয়পরাজয়, সুখসফলতা
ওটাকেই বাগ মানানো, সেটাতো বহু প্রজন্মে আমাদের প্রথা

'এইবারে যেটা দেখাচ্ছি, সেটা আরো ভাইটাল, —মেরুদণ্ডটা
দেখুন কেমন ঋজু ও সটান দেখাচ্ছে, যেন প্রতিবাদী হবে"

সটানইতো থাকে, নুয়ে যায় অভিজ্ঞতার প্রভাবে

হঠাৎ পর্দা জুড়ে ভেসে ওঠে একটি সুঠাম পায়ের প্রতিমা,
নড়ে ওঠে আর অনির্দেশ্য কার দিকে যেন লাথি ছুঁড়ে দেয়—

'দেখুন, পাদুটো শক্তই হবে, তেজিয়ানও হবে, দেখাই যাচ্ছে'

এওকি সত্যি ? একটি মানুষ জন্মাবে তার মেরুদণ্ডের নীচ বরাবর
শক্ত সুঠাম আঘাতকুশলী রোমারিওবৎ সাবলীল পা—ও ?

পাখির সঙ্গে কথা

জিয়াদ আলী

যেতে গিয়ে থমকে যাই
আলগোছে দেখে নিই নিজেকে আবার
পাখিরাও ভালোবেসে শূন্য ঘরে দর্পণে নিজের ছায়া খোঁজে,
মরা নদী বেঁচে ওঠে পুনর্বার
নয়াচরে সংসারের টুকটাক উপাচার নিয়ে।
নকসা আঁকা বিছানা চাদরে
বালিশে ছড়ানো সুখ ধানকাটা মাঠের মতোন ছেড়ে গেলে,
বেহায়া চড়ুই এসে নরম তোষকে ঠিক
ঠোঁট ঘষে যাবে।
পাখিরা কি কথা জানে ?
মানুষের মতো ঠিক মানুষের ভাষা !
তাহলে তাকেই ডেকে বলা যেত হলদিভবনে

ফাঁকা ঘরে তুই শুয়ে থাক,
প্রেমিক নারীর মতো গোপন নগ্নতা তুই চেটেপুটে খা
এতে কোনো লজ্জা নেই
পাপ নেই
তুই গ্যালিলিও
পৃথিবীর আবর্তন তোরই জন্য অপেক্ষায় ছিল।

নার্সিং হোমের গল্প

সুরজিৎ ঘোষ

মনে আছে সোমনাথ, 'প্রিয়' শব্দটার জন্য একদিন কীরকম আকুলতা ছিল।
তখন ভাবিনি এত ভালো করে লক্ষ্যও করিনি
অলক্ষ্যে কখন কার বাঁকানো ধনুক থেকে তীর
ছুটে এসে আমাদের বন্ধুতার দিনগুলো গেঁথে দিয়ে যাবে মাঝমাঠে।

সেই থেকে মাইগ্রেন, সেই থেকে ব্যর্থ অ্যালোপাথি,
নার্সিং হোমের দিন লম্বা হতে হতে শুধু বিরক্তি ছুঁয়েছে,
ভিজিটিং আওয়ারের বেল এত আস্তে বাজে শোনাই যায় না,
অথচ তখনই ঠিক জিরো আওয়ারের মতো আলো জ্বলবে,
অন্তত সেরকম কথা ছিল, বন্ধুরা সবাই আসবে ঘরে —
সোমনাথ সত্যি বল্ তোরও কি সেকথা মনে পড়ে?

ও ভিখিরি, ও ফলঅলা

কালীকৃষ্ণ গুহ

কে কোনদিকে যাবে আমরা জানি না। কে দৌড়তে দৌড়তে
সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে সূর্যাস্তের পথে যাবে, তার কিছুই
জানি না। আমরা এসেছি প্রান্তদেশ থেকে, যা যুগ-যুগ ধরে
অন্ধকারে ঢাকা ছিলো।

ফুটপাথের সংসার চলেছে পূর্ণতার দিকে। ভাত আনন্দ
মৃত্যু—সবকিছু মিশে রয়েছে' সেখানে। শংকরাচার্যের
সংসার চলেছে পূর্ণতার দিকে। তাকে লাথি দেখিয়ে
বিধবা রমণীর সংসার চলেছে পূর্ণতার দিকে।

'কতোরকম পূর্ণতার কথা জানো তুমি, ও ভিখিরি, ও
ফলঅলা, ও রাতজাগা হতবুদ্ধি কবি ও ফুটপাথের পঙ্গু
দার্শনিক?' এই প্রশ্ন শুনে চমকে উঠি। রাত্রি শেষ
হয়ে আসে। এই প্রশ্ন শুনি বারবার। চমকে উঠি।
রাত্রি ভোর হয়।

ফিদেল

নবারুণ ভট্টাচার্য

ধরে নেওয়া যাক
জন্মলগ্নে জমক ও জাঁক
এর মধ্যেই ফাঁক ছিল

তাই এই অবাধ বাণিজ্যের হাইওয়ে
এই ওয়ে ওয়ে
এই ইও ইও
হে বন্ধু হে প্রিয়

এই শতকের সর্বাধিক
হাস্যকর রচনা হল
শিশুতীর্থ
কারণ নবজাতকও নেই
চিরজীবিতও নেই
অতএব শিশুও নেই
কোন তীর্থও নেই

অমল একাই মরে যায়

ধরে নেওয়া যাক
এখনি হাভানার কোন ডাকঘরে
ফিদেল একাই বসে থাকে
কারণ, কিউবায় কোন মানুষ নেই
সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে
যেখানে ওয়ে ওয়ে
অবাধ বাণিজ্যের হাইওয়ে

তখন হঠাৎ নৌকা বেয়ে
নোয়ার মতো সাদা চুল দাড়ি নিয়ে
এসে বলে ফিদেলকে
তুমি এত বিমর্ষ কেন হে যুবক ?
তুমি কি আমাকে চেন ?
আমি হেমিংওয়ে।

মৃত্যুর তোরণে দাঁড়িয়ে

রাণা চট্টোপাধ্যায়

আজ আমি দাঁড়িয়েছি পাঁচশো ডিগ্রী ফারেনহাইটের ভেতর
তবু কিছুই পুড়ছে না, তবু কিছুই হারাচ্ছে না
হাসছি পাগলের মতন, দোল খাচ্ছি প্যারালাল বারে
তুমুল শোরগোল তুলেছে ঝড়, আছড়ে পড়ছে যেন
সাঁড়াসাড়ির বান কলকাতার গঙ্গায়

এইতো জেগে উঠার সময়, এইতো ভাঙচুর করার দিন
মিছিল এসো চুরমার করি ওই মজবুত সৌখিন দুর্গ—
এসো সংঘর্ষ, এসো সংগ্রাম, এসো সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস
এসো টাইফুন, এসো ভিসুবিয়াস আজ প্রাণ জেগে উঠেছে,
এই মুহূর্ত ধ্বংসের মুহূর্ত, মৃত্যুর তোরণে দাঁড়িয়ে
আমি তো নির্মাণের কথা বলছি।

কিছুদিন

অনন্ত দাশ

কিছুদিন সুখে থাকি
কিছুদিন দুঃখে থাকি
কিছুদিন কাটে অশ্রুপাতে
কিছুদিন রোগে ভুগি
কারও শোকে ভেবে মরি
শ্রাবণের অজস্র প্রপাতে

কিছুদিন আড়াআড়ি
সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ি
কিছুদিন থাকে অর্থাভাব
কিছুদিন ভালোবাসা
চুরি করে চুমু খাওয়া
নষ্ট হয়ে গিয়েছে স্বভাব

কিছুদিন দূরে থাকি

কিছুদিন কাছে আসি
সুখ-দুঃখ সমান সমান
তবু যত দিন যায়
ভালোবাসা জীর্ণ হয়
মায়া বাড়ে, বাড়ে ব্যবধান ···

দিনরাত্রি

নন্দদুলাল আচার্য

হো নীলাকাশ, হো গর্জমান সমুদ্র
হো সজল কাল মেঘ
হো দীর্ঘতম বনাঞ্চল
হো কুষ্ঠরোগী
হো মুগ্ধ চোখের তারা
হো পিটমাইন, খোলামুখ খনি
হো ইস্পাত নগরী
হো বারানসীর গঙ্গা
হো রোগজীর্ণ মা
হো আসক্তি আর নিরাসক্তির যৌথটান
হো চন্দনচর্চিত পুরোহিত
কালিঝুলিমাখা খনিশ্রমিক
হো প্রভাত আর সন্ধ্যা

কেন একটি শব্দের জন্য রাত্রিময় হোম
অনিদ্র কশাঘাতে কদমকেশরে ভরা শরীর
কিসের টানে ছুটে চলা উত্তেজনা
খ্যাপাটে রক্ত অধীর করে কোন দৈবী অসন্তোষ
কোন কুমারীর ঊরুতে বসে এই তন্ত্রচর্যা
এই কঙ্কালসার কবির নিশিপাওয়া দিনরাত্রি।

আমাদের থাকা না থাকা নিয়ে
নীরদ রায়

আপনাদের হেসে খেলে ঘুরে বেড়ানো সন্ধেবেলাগুলির সামনে
কোনোদিন হাজির করিনি জোড়া খুনের আর্তনাদ,
সাজিয়ে রাখিনি রাত্রির নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী নর্দমার নোংরা কাদা
অপুষ্টিজনিত সরু সরু হাত-পার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা
খুক খুক কাশির জনগণমন-য় ছিঁড়ে যাওয়া মশারির নবীন ঘুম
এসবও কখনো লিখে রাখিনি এক দুই করে—
লিখে রাখিনি শরৎকালের আকাশ আপনাদের সুস্বাদু পানীয় হলেও
আমাদের ক্ষেত্রে তা যেন শুধুই দূরে থেকে দেখার রঙীন ছবি,
আপনাদের আজ ও আগামীকালগুলির জেলাসদর যেমন
কলকাতাকে, কলকাতা তেমনি ঘন ঘন ফোন করে দিল্লিকে—
যদিও আমাদের ভালো থাকার অর্ধেকটা ভেসে গেছে গত বন্যায়
আর অর্ধেকটা এখন শ্যামবাবুর রাইস মিলের
পাঁচ টাকার দিন হাজিরার শিশু শ্রমিক,
আমরা কিন্তু আজো কখনো প্রশ্ন তুলিনি আপনাদের দিনগুলি
এতো লম্বা ও ফর্সা হয় কেন, আর রাত্রিগুলির কি কোনো শীতকাল নেই ?

তবু আমাদের থাকা না থাকা নিয়েই আপনাদের দ্বিধা ও সংশয় ?

পড়াশোনা
ব্রত চক্রবর্তী

কারুর পাশে দাঁড়াই
কারুর পা মাড়াই

ধাক্কা দিয়ে ফেলে
যারাই গেছে চলে
মানি তাদের গুরু

হাত-পা ছোঁড়ার শুরু
তাদের থেকে আমার
ধাক্কা থেকে উঠে
হাঁটতে শিখে গেলাম
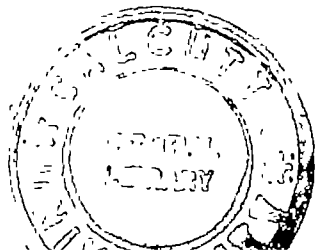
ভালবাসায় ছিলাম
থাকতে ভালবাসি
আরশিখানি সবার
মুখ দেখা যায় আমার

কিন্তু মুখে যারা
ছেটাচ্ছিল কালি
তাদের মাথাগুলি
হাঁড়িকাঠে দিলাম

যারা আমার ঘর
ভস্ম করার পর
কুশল জানতে আসে
মুখগুলি সব চেনা

মানি তাদের গুরুত্ব
সাবধানতার শুরু
তারা যাওয়ার পর
বাঁধি নতুন ঘর

হন্তারক প্রিয় সখা

কৃষ্ণা বসু

কে চেয়েছে পরিত্রাণ সমূহ কষ্টের থেকে মহানিষ্ক্রমণ ?
আমি তো চাইনি, সখা. এই দূর পরবাস, এই নিমজ্জন,
এইভাবে ডুবে যাবো একা একা অন্ধকার দমবন্ধ জলে,
নিমজ্জন কালে আমি কুটোটিও ধরব না অন্তিম সম্বলে,
এরকম ভাবো নাকি, হন্তারক, প্রিয় সখা সুশীতল আলো ?
প্রথম রাত্রির দিকে মহার্ঘ আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকালো।
বনস্পতি জেগে ওঠে আলুথালু দুর্দান্ত অকথ্য হাহাকারে,
কে কাকে কোথায় বাঁধে, ভিতরে ভিতরে কাকে চমৎকার মারে,
মার খেয়ে হতবাক মুখ থুবড়ে মুচড়ে পড়ে আছে মেয়ে,
চারিপাশে বৃক্ষের বন্ধুরা আছে রুদ্ধশ্বাসে অপলক চেয়ে ;
চেয়ে আছে অসহায় করুণায়, চেয়ে আছে অনন্ত মায়ায়,

কে যে কাকে ভিতরে ভিতরে মারে, কে যে কাকে ভিতরে কাঁদায়,
কতবার মরবি তুই ? কতবার রক্তাক্ত ক্ষরণে যাবে ভরে ?
আয়ুষ্কাল জুড়ে রক্ত পড়ে, হৃদপিন্ড ফুটো করে শুধু রক্ত ঝরে,
রক্ত ঝরার শব্দ বৃষ্টি পড়ার চেয়ে জানি ঢের ফিসফাস,
প্রাণের গভীর থেকে উঠে আসে উন্মথিত চাপা দীর্ঘশ্বাস।
ঐ যে বিক্ষত নারী রক্ত ক্ষতে ব্যথা পেয়ে থুবড়ে আছে মুখ,
আহত রক্তাক্ত শিকারের কাছে ফিরে আসে শিকারীর সুখ।

ভাগাভাগি

অমরেশ বিশ্বাস

মোড়ের ঐ ঢাউস বাড়িটার চারতলায়

রেক্সিন-মোড়া হুইল্ চেয়ারে যে-মহিলা
এ বাড়ির বাগান ছাদ অসুখ-বিসুখের ইজারা
তাকেই দেয়া ছিল ;
আমার বিশ বছর বয়সের চালানি বিষ।
তখন ছিল
ছোঁয়াছুত্ আর বাছাবাছির কাল
তাই আমাকে তোলা হয়েছিল
মুদ্রানাগরের চড়া নীলামে।

তুই আমার মেয়ে
কো-এড-এর বাতাসের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে
সূর্যের আলো তোর দু চোখের মণিতে
জলোচ্ছ্বাসের কালে পাথর চেনাচিনির বালাই নেই।

দেয়াল নিয়ে তবু তোদের বিস্ফোরক ভাগাভাগিতে
ঠাকুরদারও লজ্জা।

যে-পথে তুমি, সুন্দর

শ্যামল সেন

ঘুরে ঘুরে সেই তুমি,
পঞ্চাশ বছর পরে মনে মনে মন্বন্তরে।

সভাঘরে প্রদর্শনী কাঁপে
দৃষ্টিকাতর দুর্ভিক্ষের চারুকলা।
স্বচ্ছল নারীপুরুষেরা
মেতে ওঠে আধুনিক দঃখের রঙ্গশালায়।

এইভাবে দেখা দেবে চিত্রল কষ্ট নিয়ে?
চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল' আবেদিন চোখে
ব্যাপ্ত হয়ে যায় চারপাশ, সংসার—
রাষ্ট্রীয় অনাচার।

তুমি, শুধু তুমি দীর্ঘ শূন্যতার পর
ভেসে ভেসে অন্তরালে আমাকে জড়াও।
'ফ্যান দাও, ফ্যান'—প্রতিধ্বনি থেকে
উঠে আসে পাঁচ দশকের
রুগ্ন ভালবাসা, আমাদের সম্মিলিত ভাষা।

গোপালপুর অন সি

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

তাহলে অন্য ভুবনের কথা বল
সেইসব মেয়েদের কথা, যারা আঁশ-গায়ে
জল থেকে উঠে আসত ভোরবেলা
যখনই ফিরতে বলেছি সংসারে
কী পিচ্ছিল হাসি হেসে এড়িয়ে গিয়েছে
এমনকি প্রেশারকুকারের সিটি শুনতে পেলে
লালচোখে তাকিয়েছে
এই জলচরদের মধ্যে তোমার প্রথমা পত্নী
বর্তমান বলে তুমি জেগে বসে আছ
আর সূর্য প্রতিভাত হলে চুলে, ওরা

বালির ওপরে শুয়ে থেকে-থেকে
সন্ধেয় সমুদ্রে নেমে গেছে

কিন্তু কেন নুলিয়াব হাত ছেড়ে দিতে দিয়ে
ঢেউ হয়ে গিয়েছিল, সে-উত্তর আজও অজ্ঞাত
শুধু এ নতুন জন্মবৃত্তান্ত
পুরুষের অজানা লিপিতে
শুনেছি, ডুবোপাথরের গায়ে লিখে রাখা আছে

ভোর

অমিত চক্রবর্তী

সমুদ্র ললাটে ভেসে নৌকগুলো বাড়ি ফিরে আসে
কখন দেখবে তারা মুখরিত কোলে ওঠা মু

সিঁথির দুপাশে ঘন বন, ওড়ে সিলুট পাখিরা
মেঠো পথে তুলিপটে কার অপেক্ষায় টানে লাল রেখা

জল ফাটে দৃশ্য কাতরতা নিয়ে নীল বৈঠাগুলো
অধৈর্য মোহনাকে চুমু খায় গাঢ় সূর্যটিপ।

বাধ্যতামূলক জলসেচন

নমিতা চৌধুরী

সোনালী ধান থেকে ধুপ করে
ঝরে পড়লো জশ
নীলাভ জমিতে
কাঁদছে ফসলের মন কাঁদছে
মা নয় এই মাটি তার
উটের পিঠে বহিত এইসব শস্যবীজ।
মরুদেশ পেরিয়ে এখাণে এসেছে
নোনা মাটির গন্ধে
কুঁকড়ে যায় আস্তরণ

জলসেচন কীটনাশকের ভ্রূকুটিতে
বাধ্যতামূলক প্রসব বেদনা
বীজের জঙ্ঘায় রক্ত ফুটিয়েছে !

আগামীকাল

প্রদীপচন্দ্র বসু

আগামীকালের কথা ভাবি,
কিরকম হবে দেয়ালে ঝোলানো দিনপঞ্জীর আগামীকাল ?
আগামীকাল কি সূর্য উঠবে ঘড়ির কাঁটা ধরে
প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের জন্য ফাঁকা রাস্তায় বাতাস বইবে মৃদুমন্দ,
আলো ফুটবে, ঘাম হবে না রোদে
আগাছার জঙ্গলে হাসবে গন্ধরাজ বা নয়নতারা,
আগামীকাল কি ভোর হবে আহির ভৈঁরোর সুরে ?
আগামীকাল কি দশটা দশের ট্রেনে আজকের মতো আমরা অফিস যাবো
বেলঘড়িয়া ষ্টেশনে লাফিয়ে ধরবো ব্যারাকপুর লোকাল,
ভাঙাচোরা বি বি গাঙ্গুলি ষ্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে লালবাড়ির দিকে মুখ করে
রাস্তার দুপাশে ফুটপাথে দেখবো অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষ
ভাতের স্বপ্ন নিয়ে যারা শহরে এসেছে,
দেখবো ঠক মানুষ, চোর মানুষ, বদ মানুষ, মন্ত্রী-মানুষ···ঐ ভাতের জন্য
সব ভিন্ন ভূমিকার অভিনেতা—
আগামীকাল কি সব অভুক্ত পেটে জুটবে নুনভাত ?
মিছিলের পতাকা কি এত লম্বা হবে যা দিয়ে বানানো যাবে জনতা পোশাক ?
বর্ষা ও শীতের ফুটপাথে উলঙ্গ শরীরে ঘুমিয়েছিল যে শিশু :
আগামীকাল কি তাকে দত্তক নেবে কোন নিঃসন্তান দম্পতি ?
আগামীকাল কি ইজ্জত ফিরে পাবে পৃথিবীর সব ধর্ষিতা ?
আগামীকালের কথা ভাবি,
কিরকম হবে দিনপঞ্জীর অনিবার্য আগামীকাল ?
আগামীকাল কি আমরা ডান ও বাঁ হাতের মধ্যে বাঁধাবো জাত পাতের লড়াই
অথবা ধর্ম নিয়ে অন্ধের দাঙ্গা,
আগামীকাল কি কলেজষ্ট্রিটের মোড়ে অকারণে পুলিশ চালাবে গুলি,
লণ্ডার থেকে ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়বে কাশ্মীরের উগ্রপন্থী ?
আগামীকাল কি চাষীর ক্ষেতে নেমে আসবে অভিশপ্ত খরা ?

একের পর এক লকআউটের তালা ঝুলবে কল-কারখানায়, অথবা এমন হবে
আগামীকাল চাষীর খামার ভরে উঠবে সোনালি ফসলে,
কল-কারখানায় দিনশেষের ভোঁ বাজলে ঘরে ফিরবে ঘর্মাক্ত শ্রমিক ?
কিরকম হবে দেয়ালে ঝোলানো দিনপঞ্জীর আগামীকাল,
মুখোশ খুলে আমরা কি দেখাতে পারবো আমাদের প্রকৃত মুখচ্ছবি ?
এইডস, দূষণ, ক্যানসার, অর্থনৈতিক বিপর্যয়—এসব কাটিয়ে উঠে
আগামীকাল কি বলতে পারবো, আমরা এ পৃথিবীর যোগ্য অধিবাসী ?

দাগ

বিকাশ গায়েন

আমার বোনকে নিয়ে বড় ভয়
আমার মেয়েকে নিয়ে বড় ভয়
ওদেরও বেরোতে হয় পথে
পথের অবস্থা ভাল নয়।

ফুলের সুবাসে কেউ নেবে ডেকে
জরির ঝলকে নেবে কেউ ডেকে
ওরা তো বোঝেনা কূট চাল
কিসের ফিকিরে কারা থেকে
বাড়ালে কনুই তর্জনী
জ্বলেছে কঠিন সংকোচে।

কখনও অসহ্য হলে থাপ্পড় কষায়
আমারও দুগালে তার দাগ বসে যায়।

পাখি

সুব্রত রুদ্র

—ও আমার সাধারণ কান্না, কৃপাদৃষ্টি পিছন দিকে এগিয়ে যায়।
ছাগল শিশুর দাঁড়ানো স্নেহ
একেবারে পৃথিবী ছেড়ে পালালো ?

রয়লার মুরগী মুণ্ডিত ভাষা
কোন সময়ে কীভাবে ডাকে
তাও মনে পড়ে যাবে।

নিষ্ঠুরতার শিউরে ওঠা একটা পাখি
বেঁচে থাকবে মেঘলা আকাশে

অংশত গরু বিষয়ক

বাহারউদ্দিন

প্রিয় গরু
গরুর ধর্ম কেন ভুলে যাস
তুই তো সবার আগে
গ্রিকদেরও আগে
ম্যাট্রিক পাস

আমার মাংস খাবি
বুকের রক্ত ঘাস ?
খা, তবে পেট ভরে খা
বিলেত ফেরত হাড় খিট খিটে
লাশটাকে ছাড়্

না হলে তো
নিজেরই সববনাশ

যে পুরুষের সঙ্গে থাকি

নন্দিতা চৌধুরী

বেশ তাহলে নিজের কথা বলো
নিজের কথা বলা মানেই তো
বন্দুকের ইচ্ছাগুলোকে বজ্রমুখ করে তোলা।
এসময় নৌকোর নির্জনতায় নদীর
টানাপোড়েন আর ভালো লাগে না
ভালো লাগে না প্রেমের চিঠির নাক্ষত্র ক্ষিপ্রতা
কিংবা তাঁবু পোড়ানোর স্থাপত্য।

যে পুরুষের সঙ্গে আমি থাকি
সে প্রত্যহ মৃত্যুকে ছুঁড়ে মারে সয়তানের শুঁড়িখানায়
তবু বেঁচে থাক সবুজের বিস্মরণে
গোলাপের গভীর রক্তপাত।
তবু স্তব্দতায় হবো না পারাপার
রূপালী ঝর্নার মতন কোন হরিণীর নির্বাণে।

আয়ু, স্বাস্থ্য আর লাবণ্যের ঘ্রাণ

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

রাত্রি পলায়ণপন্থী চিরকাল।
নিদ্রা সংক্রামক ব্যাধি।
স্বপ্নগুলি সঙ্গীতপ্রধান।

এইভাবে
বৃক্ষের কোটরে কোটরে বার্তা—
সংকেত হারিয়ে গেলে মণীষার দ্যুতি
ফিরে পায় হিরণ্য শুদ্ধতা।

বৃক্ষ কি কখনো ঠিক পুরোপুরি নাগরিক হন।
অথচ আধুনিকতা শারীরিক মুদ্রাগুলি চেনে,
আর জানে
ছলকরা অভিমানে আবেগের স্পর্শ যতোটা,
রাত্রি ঠিক ততোটুকু বাঁচে।
থেকে যায় এই আয়ু, এই স্বাস্থ্য আর এই লবণের ঘ্রাণ।
নির্জন উড়ালপুলে অনির্দিষ্ট তামাশায় হেসে ওঠে বৃদ্ধ ভবঘুরে।

অথচ সঙ্গীত, বলো, কতোদূর স্বপ্নের নিয়ন্তা হতে পারে,
পেতে পারে কতোখানি রপ্তানিযোগ্যতা।

সূর্য ওঠে—আপাদমস্তক পেশাদার।

এই আয়ু, এই স্বাস্থ্য আর এই লবণের ঘ্রাণ রয়ে যায়।

ছক

সুজিত সরকার

গাছ আছে, পাখি আছে, শিকারীও আছে।

শিকারী পাখিকে হত্যা করে, গাছকেও, নিজেকেও।

ফের জন্ম নেয় গাছ, ফের পাখি আসে, শিকারীও।

এইভাবে চিরদিন গাছ থাকে, পাখি থাকে, শিকারীও থাকে।

যদি চাও

জীবেশ দাস

যদি চাও—
মলাট খুলে দিতে পারি—
ফর্মা মিলিয়ে দেখে নিতে পারো গ্রামীণ সংস্কৃতি—
নুন ও ভাতের ব্যবস্থা যথাযথ আছে কিনা,
বন্যা খেয়েছে গতবছর এবার খিলানের মৌনে খরার লম্ফঝম্ফ,
কাজের হদিসে বাবা শহরে গেলে—
সড়ঙ্গের কিনারে কুঁকড়ে থাকে মেয়েটির পনেরো বছর,
মলাটের চারপাশে আজ দুমিনিটের নীরবতা—
ঘরামীর কাজ শেষ, বৃষ্টি কি এখনো হাইওয়ের ওপারে ?

এই বৃষ্টিপাতে

সলিল ভট্টাচার্য

এখন সারাদিন বৃষ্টিপাত
নীরবে অবিরল অশ্রু ঝরে যায়
কবরে ফাঁকা মাটি স্মৃতিতে দীর্ণ
শ্মশানে সুবাসিত চিতার পোড়াকাঠ
এখন সারাদিন বৃষ্টিপাত

দরজা হাট করে বসে থেকে
ঘুমোতে ভুলে গেছে কারা যেন
আঁতুড়ে কেঁদে ওঠে বংশধর

হাঁড়িটা খাঁ খাঁ করে ফোটে নি ভাত
এখন সারাদিন বৃষ্টিপাত

তুমি কি তাকে খুব ভালোবেসে
কবরে কবে দিলে স্মৃতিটাকে
শ্মশানে কেন গেলে আনমনে
মাঝি যে হয়রান মেলে না ঘাট
এখন সারাদিন বৃষ্টিপাত

এখন সারাদিন বৃষ্টিপাত
পুরনো বীজ খোঁজো গোলা যে শূন্য
প্রিয় সে জলছবি কারা যে মুছে যায়
রক্তমেঘে ফুল আকাশে তোলে হাত
এখন সারাদিন বৃষ্টিপাত

তবু এ বর্ষণে জেগে থেকে
করেছে মাঠে যারা গর্ভাধান
পুরনো ভাঙা ঘাটে জোয়ারে টলমল
তারাই শেষ বাজি লাঙ্গলে করে মাৎ
এখন সারাদিন বৃষ্টিপাত

বোকা

শ্যামল জানা

এখনো সেই জন্মকথা ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে।

আমি ভাঙার শিল্প বুঝিনা
তাই, নদীর বাঁকের থেকে, প্রত্যাখ্যান থেকে,
জেগে উঠি। আর কী অপূর্ব অন্ধকার···

শুধু বন্ধুদের কথা মনে এলে
কৈশোর থেকে আগুন চুরি করে
জ্বালিয়ে দি ডালপালা।

গূঢ় হাওয়া আসে, সঙ্গে দু-একটা অক্ষর ;
পড়ে ফেলি, আর তৎক্ষণাৎ বিস্ফোরণ···

কী যে হয়। হাওয়া সমেত ভাঁজ করে ফেলি
অক্ষরগুলো চিঠির মতো···

এখন বন্ধ খামের ভেতর জেগে আছে নীরবতা।

আর বাইরে, তুমুল বৃষ্টিপাতে ভিজে যাচ্ছে সংস্কৃতি
ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কয়েকটা মুখ।

তারপর, মিছিল শেষে দু-একটা ইতস্তত চটির মতো
এই জন্মকথা···

আর কী বোকা দ্যাখো—
ভাঙার শিল্প বুঝতে
আমি কেমন নদীর কাছে যাচ্ছি।

টুপি

নাসের হোসেন

ধোঁয়া-সংকেত উঠে যাচ্ছে আকাশে।
চোরাবালিতে ডুবে আছি, আর তাই সংকেত দূরের বন্ধুদের।
যদি তারা আসে, যদি তারা উদ্ধার করে আমাকে।
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
ছোট্ট ছোট্ট মানুষেরা
চটপট একটি গাছে উঠে নুইয়ে দিলো ডাল
বললো ধরো হাত বাড়িয়ে।
কতদূরে যুদ্ধক্ষেত্র কতদূরে দাবানল!
তবু আমি সেইখান থেকেই এসেছি
এই দ্যাখো শরীরে আমার ঝলসানো দাগ।
হাত বাড়াও হাত বাড়াও কিছু একটা ধরো
নইলে চোরাবালি এখুনি গ্রাস করবে তোমাকে।
একটু আগে বেশ কিছু গুণগ্রাহী তাদের শেষশ্রদ্ধা জানিয়ে
মাথার টুপি ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।
সেইসব টুপি জড়ো করে কোনমতে আগুন জেলেছি।
যদি ধোঁয়া ওঠে, যদি সংকেত ঠিকমতো যায়,
যদি সেই সংকেত পেয়ে ছুটে আসে বন্ধুরা আমার।
আমি জানিনা ঠিকমতো সব হচ্ছে কিনা
সংকেত সত্যিই যাচ্ছে কিনা। জানিনা—কেননা
বারুদস্ফুলিঙ্গে আজ আমি অন্ধ হয়ে গেছি।

উডপ্রিণ্ট

তাপস রায়

আসলে আর কোনো আকর্ষণ নেই। আমাদের সাদা মাথায় যে রেডক্রশ ঝুলে আছে—
যে মাংসল আচ্ছন্ন স্রোতে ভেসে আছে আমাদের যাবতীয় লাশ
সেখানে আর কোন ভালোমন্দ চিঠি হয়ে উড়ে যেতে পারে!
শনাক্ত ইচ্ছাও চলে যায়. লাশ কাঁপে আরো একবার ফ্যাকাশে ছুরির জন্য।

আজ ইতিহাস ঘেরাটোপে টুকরো হয়ে আছি. আমাদের শ্রেণীগড় কীভাবে
মাতৃপ্রতিমায় কাঠকাঠামোয় ঢুকে ঝুঁকে আছে চিনতে পারিনা
মোষের সিং-এর মত পটুয়ারা ছুটে গেলো আর্টকলেজের দিকে
ভাবো, এই দৃশ্যে আমাদের অনুরাগী হাত কতখানি বাইজীনাচের দিকে যাবে!

শব্দ, জল, আদিগন্ত ডাক

সুমন গুণ

পৃথিবীর আদিম মরশুমে তোমায় চিঠি
লিখেছে, মহল পরায়ণ
পুরুষ, এই
চিঠি তোমার নির্ভুল বৈদূর্য হয়ে উঠুক।

এই চিঠির সবক'টি শব্দে, কয়েকটি
বিরতিদাগে, দু'টি একটি অক্ষরের
অস্পষ্টতায়, শেষ শব্দটির পরে যে
অসমাপ্ত ও নির্জন লাইন
তার পরের সাদা লাইন, তার পরে, পুরো
পাতায়, গোটা গোটা শব্দের ভঙ্গিতে
যে-সর্বস্ব ঢেউ, প্রচুর
অন্ধকার, শব্দ, জল, যে-আদিগন্তময় ডাক

তার কিনার ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে
সন্ধ্যার বেদনাময় জল

বিচূর্ণ কবিতা

তুষার চৌধুরী

বিচূর্ণ কবিতা তুমি ওড়াও বাতাসে
কেননা নক্ষত্র যত জানা ও অজানা
ধরা আছে তোমার মুঠোয়
যতগুলো সত্য শিব সুন্দর চিহ্নিত করা গেছে
সবার আস্তানা আজ ভ্রমের বিবরে
বেহাল বিবেক, দেহ রতিক্লান্ত, প্রেম নেই, ঘৃণা বেহদিন
উম্মাদ হৃদয়ে শুধু পাতালের শস্য ফলে আছে
জেগে আছে দৈবী বিশৃঙ্খলা

জানালার নার্সিসাস, জানো না কি ভালোবাসা জন্ম নেয় চৌকাঠ পেরোলে
অন্ধকারে খেলাধুলো, অনুমানও দ্রৌপদীনির্ভর, দ্যূতক্রীড়া
জুয়া জুয়া, অন্তত এগারো ক্রোশ কবির দখলে, সান্দ্রী ঘোরে
সাইকিডেলিক আলো সুন্দরী ও কুক্কুরীকে নিয়ে খেলে সুকার-লিরিক

নীলিমার হাতে ছিল ক্লোরোফিল-ছোপানো রুমাল
রেস্তোরাঁর আবছায়ায় সে দিয়েছে তপ্ত ঠোঁট, উগ্র বৃন্ত, আর্দ্র লিলি, তার
হৃদয় প্রবাল তুমি দেখোনি, ক্রৌঞ্চ না ক্রৌঞ্চীর রক্ত, লাল
চিরায়ু বাসর, তবু ঘুরেছিল হাতঘড়ি, উঁকি মেরেছিল ওয়েটার
তোমার দেবার মত ছিল না কিছুই সাথে, ফচকে ছোঁড়া প্রতারণা সার
তাতে কি ! হীরের জেবঘড়ি নীলিমার বুকে গুঁজে দিয়ে গেছে মহাকাল

আগুন, সমীপেষু

সব্যসাচী সরকার

ঠিক মনে পড়ে না একদিন বীজের ভেতর কেমন
আগুন ছিল, কেমন ছিল গন্ধ, অথচ সেই অগ্নিবীজ
যা যুবকের দুর্লভ চোখের প্রথম আলো ;—একদিন
তাকে ছুঁয়ে দেখলাম, আর তারপর···

আগুন, তুমি আর ডেকো নাকো শুধু এই বিষন্ন,
বুক জুড়ে, আবার আসিব ফিরে আগুনের শীর্ষ কিনারে

যখন শার্টের নীচে লুকোনো থাকবে ঝলসানো প্রথম প্রহর,
আর নির্জন-যন্ত্রণায় জন্ম নেবে যৌবনের প্রথম বহ্নি।
আগুন, তুমি কেমন করে পুড়িয়েছো যুবকের বুক ? তুমি
জানো না নিশিদিন মেঘের জন্য ব্যাকুল ছেলেটি কি
উৎসুক, তার ভালোবাসা কেমনতরো ভুল ?

পাঁচজন তোমাকে নিয়ে পাঁচকথা যতই বলুক, চৌকশ
ভূমিকার যতই ঠেলে দিক তুমি মেট্রোপলিটন থেকে
মফস্বল ঘুরে আবার ফিরে এসো সুড়ঙ্গময়
জীবনের চারপাশে···

আগুন, তোমাকে খুলে দেখবো আজ, আজ লিখবো
আমার আগুন, তুমি শাদা সকালের জন্য ঘুম ভাঙিয়ে
দিও, আর ওইসব লোকেদের বলে দিও—
তোমার রঙ একদিন ছিল প্রিয় কবিতার প্রথম লাইন !

চল্লিশ দশক ঃ কমিউনিস্ট কর্মীদের জীবনচর্যা ঃ কিছু স্মৃতি

রঞ্জন ধর

[এই লেখা 'পরিচয়' তিরানব্বুই-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "চাতলের কৃষক আন্দোলন—সূচনা পর্ব থেকে তেভাগা" শীর্ষক স্মৃতিচারণার পরিপূরক।]

পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশেষ করে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের ইতিহাস যতই বেদনাদায়ক হোক, এর পিছনে নিশ্চয়ই অনেক কারণ রয়েছে ; সেই কারণগুলো জানা এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে এই ধরনের বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতেও ঘটতে বাধ্য। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে আমার মনেও অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত নানা দিক নিয়ে। খোলামনে সেইসব নিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, বিপর্যয়ের কারণ শুধু তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ভুলভ্রান্তি আর বিচ্যুতির মধ্যে নিহিত নয়, প্রধানত নিহিত রয়েছে কমিউনিস্টদের ব্যক্তিগত জীবন-চর্যায় ভোগবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির মধ্যে, যা শেষ পর্যন্ত জনগনের সমস্যা আর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাদের উদাসীন করে তোলে এবং পরিণত করে ক্ষমতালোভী স্বার্থপর মানুষে। গত সতের-আঠার বছর সরকারি ক্ষমতা ভোগের পর এ-দেশের কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীদের জীবনে এর কিছুটা চেহারা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না ? এই নিয়ে কাগজে কতরকম লেখালেখি হচ্ছে, তার সবই মিথ্যে বা কুৎসা নয়। তা ছাড়া জনগণ সত্যিমিথ্যে যাচাই করতে অভ্যস্ত তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তো মিথ্যে বা কুৎসা প্রচারের 'মিডিয়া' ছিল না, তবু সেখানকার জনগণের কাছ থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্যুতিগুলি শতরকম চেষ্টা সত্ত্বেও কি গোপন করে রাখা সম্ভব হয়েছিল ? হয়নি বলেই তাদের অনাস্থা আর ঘৃণা ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত হয়ে একদিন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কমিউনিস্টরা যে মহৎ আদর্শের প্রবক্তা, তা স্বাভাবিক কারণেই মানুষের মধ্যে যে-ধরনের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে তার ফলে তারা ব্যক্তিমানুষ হিসেবে কর্মে ও মননে এবং জীবনচর্যায় এক ভিন্ন প্রকৃতির উচ্চ-মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষরূপে কমিউনিস্টদের দেখতে চায়। প্রকৃতপক্ষে সে-রকম

না হলে কি একজনের পক্ষে কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব? এই 'প্রকৃত কমিউনিস্ট' হওয়া থেকে কি আজকের কমিউনিস্টরা অনেক দূরে সরে যায় নি? সরে গিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্টরাও। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন বা আছেন, সেই মুজফ্ফর আমেদ. নাম্বুদ্রিপাদ, পি. সি. জোশী, রাজেশ্বর রাও. ভুপেশ গুপ্ত প্রমুখ, তাঁদের জীবনের দিকে তাকিয়ে আজ কজন ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় তাঁদের মত 'প্রকৃত কমিউনিস্ট' বলে দাবি করতে পারেন? অথচ চল্লিশ দশকে কিন্তু তাঁদের মত নিষ্ঠাবান প্রকৃত কমিউনিস্টের অভাব ছিল না, নেতৃত্ব থেকে শুরু করে নিচের তলার বর্মীবাহিনী পর্যন্ত। আজকের মত এত বই-পত্র পড়ার সুযোগ ছিল না তখন। পার্টির ক্লাশ আর নেতাদের জীবনাদর্শই ছিল শিক্ষার মাধ্যম। একটা কথা কর্মীরা বুঝতে পেরেছিল. কমিউনিস্ট হতে গেলে আদর্শ মানুষ হতে হবে. ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে। এই লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য, নতুন প্রজন্মের সামনে সেইসব কমিউনিস্টদের কিছু টুকরো স্মৃতি তুলে ধরা, যাদের কথা কেউ কোনদিন বলবে না কিম্বা জানবে না। যাদের স্মৃতি আজ প্রায় লুপ্ত। অথবা 'ব্যাকডেটেড' বলে কথিত।

১৯৩৮-৩৯ সাল। ন বছর কারাবাসের পর সদ্যমুক্ত আমার মেজদা হেমজা-রঞ্জন ধর একদিন কিশোরগঞ্জ শহরে যাবেন তাঁর কারামুক্ত কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। এখানেই প্রথম দেখা নগেন সরকার ও ক্ষিতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে। একটা বিশাল গুদাম ঘর—টিনের ছাউনি ও বেড়া। পাটের মরশুমে পাট রাখা হয়, এখন ফাঁকা। ওয়ালীনেওয়াজ খানের চেষ্টায় এখন এটাই নগেনদা ও ক্ষিতীশদার আস্তানা, কারামুক্তির পর থেকে। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একধারে পাতা রয়েছে দুটো তক্তপোষ। আর কিছু কাপড় জামা। কারাবাসের পূর্বে এঁরা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে ছিলেন, এখন কমিউনিস্ট —জনগণের হৃদয় জয় করে তাদের সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। সঙ্গীসাথি সংখ্যায় তেমন নেই। গ্রামোফোনের একটা চোঙা মেঝেতে পড়ে রয়েছে. এটা মুখে লাগিয়ে তাঁরা পাড়ায়-পাড়ায় প্রচার করেন। গল্পে-সল্পে অনেক বেলা হয়ে গেলে হঠাৎ নগেনদার খেয়াল হয় খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। ভান্ডারে যা রসদ রয়েছে তাতে চারজনের কুলিয়ে উঠবে না। পয়সারও টান। মেজদা কিছু দিলেন। তারপর ক্ষিতীশদা বেরিয়ে গেলেন এবং ফিরে এলে গুদাম-ঘরের একদিকে একটা উনুন ধরিয়ে রান্না করলেন নগেনদা। ভাতের সঙ্গে আলু-ঝিঙের একটা পাতলা ঝোল। এই রকমই ছিল শুরুর দিনগুলি। তাঁরা বেকার। চাঁদা

কড়ি দেবার মত লোকজনও খুব ছিল না। শুনেছি, অনেক বেলা তাঁদের না খেয়ে থাকতে হয়। চা খেয়ে শুয়ে থাকেন। শুনতে আমাদের কষ্ট হলেও বলার মধ্যে নগেনদার কণ্ঠস্বরে সামান্যতম দুঃখের ছাপ নেই। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি এমন সরস ও মজাদার। খুব হাসাতেন। তিনি যখন জনসভায় বক্তৃতা দিতেন, তখনও বক্তব্য রাখতেন সরস ভঙ্গিতে—নানারকম গল্প-কাহিনী, উপমা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ইত্যাদি মিশিয়ে। তাঁর বক্তৃতা সাধারণ মানুষের কাছে ছিল দারুণ উপভোগ্য। তাঁকে দেখে যে-কেউ মনে করবে একজন কংগ্রেস নেতা—চিরকাল তাঁর পরনে খদ্দর, মাথায় খদ্দরের গান্ধী-টুপি। লম্বা চেহারায় খুব মানাত। ক্ষিতীশদা দেখতে ছিলেন সাধারণ, কিন্তু খুব সিরিয়াস। ভিতরে ছিল আগুন, তিনি যখন কথা বলতেন সেই আগুনের আঁচ অনুভব করা যেত। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় পার্টি গঠনের গোড়ার দিনগুলিতে এই দুজনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সদ্য কারামুক্ত আরো অনেক সহকর্মী—ওয়ালী-নেওয়াজ খান, ডাঃ রবি চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ রায়, প্রবীর গোস্বামী, নরেশ রায়, হেমজা ধর, জগদীশ ভট্টাচার্য, অজিত রায়, ক্ষীরোদ রায়, যতীন কর প্রমুখ কমরেডগণ। এঁদের ত্যাগ ও জীবনাদর্শ এবং সাম্যবাদের নতুন বার্তা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের যুবকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। খুব অল্পদিনের মধ্যে সংগঠনের মজবুত ভিৎ গড়ে উঠল সারা মহকুমায়, যার ফলশ্রুতি উনচল্লিশ সালের জেলা কৃষক সম্মেলন। কিশোরগঞ্জে এই সম্মেলনের পর পার্টি ও তার গণসংগঠন 'কৃষক সমিতি' দ্রুত প্রসারিত হতে লাগল বিভিন্ন এলাকায়। সর্বক্ষণের কর্মীর সংখ্যাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেল, এবং সাংগঠনিক প্রয়োজনে মহকুমা শহরে খুলতে হল কমিউন।

একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, তখনকার দিনে কর্মীদের নৈতিকতা ও আদর্শবোধ ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। পার্টির দিক থেকে এসব বিষয়ে ছিল খুবই কড়াকড়ি। তাছাড়া তখনকার পরিস্থিতিতে কর্মীদের সামনে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার মত কোন সুযোগ বা প্রলোভন ছিল না বললেই চলে। কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা কাজ করত। আজকের মত তখন সর্বক্ষণের কর্মীরা মাসিক ভাতা পেত না। অধিকাংশ কর্মী বাড়িতে খেয়ে কাজ করত। শুধু কয়েকজন মহকুমাভিত্তিক সংগঠকের স্থায়ী আস্তানা ছিল কমিউনে। কিশোরগঞ্জ শহরের আখড়াবাজারে দুটি বাড়িতে ছিল পার্টির অফিস ও কমিউন।

কর্মীদের কাছে কমিউন ছিল এক নতুন ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি। পারস্পরিক একাত্মতাবোধের প্রতীক। যেন ক্ষুদ্রতর পরিবার-জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে এক বৃহত্তর পরিবারবোধে উত্তরণ। স্থায়ী সংগঠকরা ছাড়াও জেলা সংগঠকগণ ও গ্রামাঞ্চলের কর্মীরা পার্টির কাজে শহরে এলে কমিউনে খেত ও থাকত। গ্রামের কর্মীরা সাধারণত সঙ্গে করে চাল-ডাল নিয়ে আসত। কিংবা টাকা। প্রতি বেলা কুড়ি-পঁচিশজনের খাবার ব্যবস্থা করতে হত। মিটিং থাকলে সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশে গিয়ে ঠেকত। কমিউনের স্থায়ী ব্যবস্থাপক ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি নিজে বাড়িতে খেতেন। এতবড় একটি সংসার দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে হিমসিম খেতে হত। রোজ ভোরে বাড়ি থেকে এসে চাল-ডালের স্টক দেখেই তিনি বেরিয়ে পড়তেন অর্থ সংগ্রহের কাজে। এ ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না। কি ভাবে তিনি বছরের পর বছর এই দায়িত্ব পালন করেছেন, এটা একটা বিস্ময়। অবশ্য খাওয়ার আয়োজন বলতে ভাতের সঙ্গে ডাল আর একটা সব্জীর ঘ্যাট। মাছের কোন ব্যাপার নেই। রান্নার দায়িত্ব থাকত বিশেষ কয়েকজন কর্মীর ওপর। মহিলা কর্মীরাও সাহায্য করতেন। সদরা-রসিদপুরের হেম দে ও তাঁর স্ত্রী কমিউনে থেকেছেন বহুদিন। জেলা কমিটির সদস্য ও পরে সম্পাদক ক্ষিতীশ চক্রবর্তীর স্ত্রী বীণাদিও প্রায়ই এসে কিছুদিন করে থাকতেন। ক্ষিতীশদার বাড়ি বেতাল গ্রামে, সেখানে তাঁর পৈত্রিক ভিটেতে একটা কাঁচা ঘর থাকলেও বাসযোগ্য ছিল না। অসুবিধাও ছিল অনেক। বীণাদি নেত্রকোণার কমরেড শচীন চক্রবর্তীর বোন। শুনেছি, জেলা নেতৃত্বের ইচ্ছাক্রমেই তাঁর সঙ্গে ক্ষিতীশদার বিয়ে হয়। এর পর থেকে বীণাদির মূল আস্তানা হয়ে ওঠে ময়মনসিংহ শহরের বা কিশোরগঞ্জ শহরের কমিউন। মাঝে মাঝে কিছুদিন করে কোন কোন কমরেডের বাড়িতেও তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হত। আমাদের বাড়িতেও এসে থাকতেন। আমার মা-কাকীমা এবং বাবা ক্ষিতীশদাকে খুব স্নেহ করতেন। ক্ষিতীশদা আমার মাকে মা বলেই সম্বোধন করতেন। তাঁর এই ছন্নছাড়া জীবনের জন্য তাঁর প্রতি ছিল তাঁদের বিশেষ সহানুভূতি ও মমতা।

কমিউনের জীবন আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করত। আমার ইচ্ছা ছিল স্থায়ীভাবে ওখানে থেকে কাজ করার। একদিন নগেনদার কাছে প্রস্তাবটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা বাতিল করে দিয়ে বললেন, 'চাতলের সংগঠনটাকে বুঝি শেষ করে দিতে চাও ?' তবু মাঝে মাঝে কাজে-অকাজে এসে একদিন-দুদিন কমিউনে

না কাটিয়ে গেলে আমার ভাল লাগত না। বাইরের কাজকর্ম সেরে চান-খাওয়ার জন্য সবাই ফিরে এলে বসত আড্ডা। অবশ্যই নগেনদা মধ্যমণি। আড্ডা যেমন হয়, তেমনি। রাজনীতি থেকে শুরু করে সব রকমের টপিকস। আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম নগেনদার কথা শোনার জন্য। তাঁর মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত কথার ভাণ্ডার। আর সরস বলার ভঙ্গি। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জীবন সম্পর্কে বা মানুষ সম্পর্কে কোন তিক্ততাবোধ ছিল না তাঁর। এমন কি দু'দিন না খেয়ে থাকার ঘটনাও তিনি এমন সরস ভঙ্গিতে বর্ণনা করতেন যেন এটা একটা মজার ব্যাপার। আমরা না হেসে পারতাম না। সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা কাজকর্ম সারার পর আবার আড্ডা বসত। সন্ধ্যার আড্ডায় যোগ দিত শহরের অধ্যাপক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, উকিল ইত্যাদি নানা পেশার সঙ্গে জড়িত কমরেডগণ। হালকা বিষয়ের সঙ্গে অনেক সিরিয়াস টপিকস। চলত রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত।

কমিউনের স্থায়ী সদস্য ব্রজ গোস্বামী ছিল পত্রিকা ও সাহিত্য বিক্রির দায়িত্বে। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল একটু ভিন্ন মাত্রার। সাহিত্যের প্রতি আমাদের দুজনেরই ছিল বিশেষ অনুরাগ। সে শহরের পাঠাগার কিংবা অধ্যাপকদের কাছ থেকে বইপত্র সংগ্রহ করে পড়ত। আমাকেও পড়তে দিত। ভাল-লাগা বই নিয়ে আমরা সারারাত জেগে আলোচনা করতাম। ভাল সিনেমা এলে আমরা দুজনে মিলে দেখতাম। নগেনদার 'স্লিপ' নিয়ে গেলে পাশ পাওয়া যেত। এই সুযোগটাকে আমরা মাঝে মাঝে কাজে লাগাতাম। কর্মী হিসেবে ব্রজ ছিল খুব সিরিয়াস, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে একই রকম ছিল। কিন্তু তার জীবনে একটা প্রেমের ঘটনা ঘটে গেল। যেহেতু তখন আমরা তরুণ বয়সের কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে আসন্ন বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর, প্রেম বা বিয়ের মত ব্যাপারগুলো ছিল খুব অবাঞ্ছিত। তবু এর দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে ব্রজকে অনেক বুঝিয়েও নিরস্ত করা যায়নি। কিছুদিন বাদে মেয়েটির কাছ থেকে প্রস্তাব এল, ব্রজকে কলকাতায় গিয়ে চাকরি করতে হবে, তবেই তাদের বিয়ে হতে পারে। এবার ব্রজ ধাক্কা খেল। তার গ্রামের বাড়ির অবস্থা ভাল, সে ভেবেছিল বিয়ে হলে বউ বাড়িতে থাকবে, সে নিজের মত পার্টি করবে। কিন্তু মেয়েটি রাজি হয়নি। ব্রজও পার্টি ছেড়ে কলকাতায় যাবে না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিই কলকাতায় চলে গেল এবং অন্য একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হল। এরপর ব্রজ কিছুদিন খুব মনমরা হয়ে থেকে আবার এক সময় চাঙা হয়ে উঠল। বেশ কিছুদিন ব্রজর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। চাতলের তেভাগা আন্দোলন নিয়ে তখন আমি খুবই ব্যস্ত। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে। আন্দোলনের

একেবারে শেষ পর্যায়ে লুকিয়ে শহরে আসতে হল বিশেষ কাজে। সেদিন কলকাতা ও ময়মনসিংহ শহরে পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ চলছিল। রেলগাড়ি চালাতে দেওয়া হবে না—রেল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাত্ররা ও আমাদের কর্মীরা। ব্রজও আছে। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের দু'তিন ফুট দূরত্বের মধ্যে সারি বেঁধে খোলা বেয়োনেটসহ বন্দুকধারী পুলিশ-বাহিনী। যে-কোন মুহূর্তে অ্যাকশান শুরু হতে পারে। চরম উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা। এস. ডি. ও. রিজভী সাহেব নিজে উপস্থিত। ঠিক সেই সময় সবার নজর পড়ল পিছনে আকাশের দিকে—ঘন কালো মেঘের মত রাশি রাশি ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে—আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বুঝতে কষ্ট হল না, একটা ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। দেখামাত্র রিজভী সাহেব তাঁর বাহিনী নিয়ে ছুটলেন ঘটনাস্থলের দিকে। সবাই কিছুটা বিমূঢ়। পরক্ষণে আমরাও ছুটতে শুরু করলাম। পথে জানা গেল বড় পোস্টাপিস ও আর কয়েকটি সরকারি অফিসে আগুন লাগানো হয়েছে। কাছাকাছি যাওয়ার পর দেখা গেল হঠাৎ লোকজন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে পালাচ্ছে। রিজভী নাকি তাঁর পুলিশবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন। তারা লোকজনকে বেধড়ক পেটাচ্ছে, বেছেবেছে সন্দেহজনকদের গ্রেপ্তার করছে। আমি ও ব্রজ একসঙ্গে রয়েছি। এ-বাড়ি ও-বাড়ির আনাচ-কানাচ দিয়ে লুকোচুরি করে পার্টি-অফিসের প্রায় সামনে চলে এসেছি, ঠিক সেই সময় রিজভীর জিপটি এসে আমাদের মুখোমুখি। চাতলের কৃষকরা বেশ কয়েকবার রিজভীর মোকাবিলা করে তাঁকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তিনি অপরাধীতালিকাভুক্তই করে রেখেছিলেন হয়ত। জীপ থেকে নেমেই রিজভী সাহেব ও এস. পি আমাদের দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিল-ঘুসি-লাথি সমানে চলতে লাগল। আমার চশমাটা ভেঙে চৌচির, কাঁচের টুকরো ঢুকে গিয়েছে চোয়ালের কাছে। ভীষণ রক্ত ঝরছে। তারপর আমরা চালান হলাম হাজতে। একরাত্রি কিশোরগঞ্জের জেলবাস। পরদিন বহু বন্দীর সঙ্গে চালান করা হল ময়মনসিংহ জেলে। জেল তখন কয়েকশ' রাজনৈতিক বন্দীতে ঠাসা—এর মধ্যে ছিল সবগুলি বাম-অবাম দলের কর্মী ও সমর্থক। শুধু মুসলিম লীগ বাদ। জেলজীবনের কাহিনী অন্য ইতিহাস।

কিছু কিছু কমরেড ছিলেন, যাঁরা খুব আর্থিক সংকটের মধ্যে থেকেই পার্টির কাজ করতেন। সরারচরের আন্দামানফেরৎ ক্ষিতীশ রায় ও তাঁর ভাই সুবোধ রায়। দু'জনই সর্বক্ষণের কর্মী। সুবোধদা জেলা-কমিউনে থাকেন। ক্ষিতীশ

রায়-এর সামান্য জমিজমা ছিল, যার আয় থেকে কয়েক মাসের খোরাকিও জুটত না। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে প্রায়ই তাঁকে উপোস করতে হত। তিনি বলতেন এ-সব নাকি তাঁদের অভ্যেস হয়ে গেছে। দেশভাগ হবার অল্পদিনের মধ্যে পাকিস্তান সরকার দুভাইকেই গ্রেপ্তার করে আবার জেলে পুরেছিল, সেই সময়টায় ক্ষিতীশদার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের জীবনে গেছে চরম দুঃসময়। পার্টিও তখন ছত্রভঙ্গ অবস্থায়। কোন সাহায্য করার মত সুযোগ ছিল না। বিখ্যাত পল্লীগীতিকার নিবারণ পণ্ডিতকেও অত্যন্ত আর্থিক সংকটের মধ্যে কাজ করতে হত। আংশিক জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে, অতুল মজুমদার ও মহম্মদ মুসলিমকে নিয়ে গঠিত গানের স্কোয়াড নিয়ে, গান গেয়ে ট্রেনে ও হাটে-বাজারে-মেলায় তাঁর লেখা গানের ছোট-ছোট বই ছাপিয়ে বিক্রি করতেন। তাঁর নতুন চেতনা-সৃষ্টিকারি অজস্র গান তখন গ্রাম-গঞ্জের মানুষের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে। চাতলের টুনু দাস, শচীন দাস, চারিগাতির সিদ্দিক—এরা ছিল দিনমজুর। রোজ কাজ না করলে উপোস। পার্টির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকদিন তারা রুজির কাজে যেতে পারত না। এজন্য তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কোন্ কাজের গুরুত্ব বেশি, সেই চেতনা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত তো কত রয়েছে। সারা মহকুমা জুড়ে টুনু, শচীন বা সিদ্দিক অনেক আছে, যারা শোষণ-দুঃখ-কষ্টপীড়িত সমাজে নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে এক কঠিন সংগ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছে। মানুষকে তৈরি করছে।

তখনকারদিনের কর্মীদের ডেডিকেশন, ত্যাগ ও নৈতিকতাবোধের সঙ্গে আজকের কমিউনিস্ট কর্মীদের সাধারণভাবে মেলানো যায় না। আজ কর্মীদের কত ত্রুটি-বিচ্যুতি পার্টিগুলির নজরে এলেও তা উপেক্ষিত হয়। তখন তা সম্ভব ছিল না। মোহিনী পাল ছিল একজন সর্বক্ষণের ভাল কর্মী। কমিউনে থাকত। চুয়াল্লিশ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাদেশিক কমিটির মাধ্যমে তাকে চিকিৎসা ও চেঞ্জের জন্য বেজোয়াদায় পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার পার্টির তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সে ফিরে আসে। সেই মোহিনী পাল একদিন, হয়ত বা মুহূর্তের বিভ্রান্তির ফলে, একটা কুকাণ্ড করে বসল। কমিউনে অন্য সবার অনুপস্থিতির সুযোগে একজন মহিলা কমরেডের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার অভিযোগে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। চাতলের এতবড় সংগঠন গড়ার পিছনে জব্বরের অবদান সবচেয়ে বেশি, এ নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু তাকে নিয়েও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল নৈতিকতার

প্রশ্নে। জব্বরের দাদু ও বাবা ছিলেন সারা মহকুমার বিখ্যাত জুয়াড়ি। এটা তাদের একরকম বংশগত পেশা। নানা জায়গা থেকে পয়সাঅলা লোকজন জুয়া খেলতে আসত তাদের বাড়িতে। জব্বর সেই পরিবেশে থেকে নিজেও ভাল খেলতে শিখেছিল। শহরে হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার সময় নগেন সরকারের প্রভাবে মুসলিম লীগ ছেড়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে তাঁর চিঠি নিয়ে আমাদের কাছে এলে, আমরা খুব আতঙ্ক বোধ করেছিলাম। পরদিনই আমি নগেনদার সঙ্গে দেখা করে জব্বরের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেখলাম তিনি সব জানেন। জব্বর নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে কোনদিন জুয়া খেলবে না। অতএব তাকে সুযোগ দিতে বাধা নেই। অল্পদিনের মধ্যে জব্বর কৃষক আন্দোলনের একজন প্রধান সংগঠকে পরিণত হল। তবু একদিন আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কোটা পূরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ শেষ মুহূর্তে সে একগাদা টাকা দিয়ে কোটা পূরণ করে দিল। টুনু দাস, শচীন দাস, সিদ্দিক ওরা রুজির কাজে যেতে না পারলে জব্বর তাদের সাহায্য করেছে। মহকুমা কনফারেন্স বা জেলা কনফারেন্স উপলক্ষে সব সময় তার ব্যক্তিগত চাঁদা সংগ্রহ সবাইকে ছাড়িয়ে যেত। দৈনন্দিন সাংগঠনিক কাজেও টাকার প্রয়োজন হলেই ত্রাতার ভূমিকায় জব্বর। এসব কারণেই সন্দেহটার জন্ম। জুয়ার টাকায় পার্টি চলবে এটা মোটেই অভিপ্রেত নয়। পার্টি ইউনিটের বিশেষ মিটিং ডেকে প্রশ্নটা তার সামনে রাখা হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে স্বীকার করল। নিজের প্রয়োজনে একদিনও নয়, সংগঠনের প্রয়োজন মেটাতে মাঝে-মধ্যে সে খেলেছে। বেশির ভাগ সময় তাকে টাকা দিয়েছেন তার মা। জব্বরকে আবার জুয়া খেলতে নিষেধ করে দিয়ে ছমাসের জন্য পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হল।

পার্টি-সভ্য নয়, কিন্তু পার্টির খুব কাছাকাছি, এমন কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল, তারা প্রায়ই তাদের স্ত্রীদের ধরে বেদম প্রহার করে। এ ধরণের অমানুষিক অভ্যাস ত্যাগ করাবার জন্য দিনের পর দিন তাদের বোঝানো হত। অন্যায়-অত্যাচারহীন সমাজ গঠনের আদর্শ ছোট-বড় সব সভায় সব সময় তুলে ধরা হত। স্ত্রীকে প্রহার করার রেওয়াজ তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কৃষক ও গরীবদের মধ্যে চালু ছিল। কর্মীদের কাছে অনেক মহিলা এই অভিযোগ করত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মীরা গিয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে। সামাজিক ন্যায়ের নামে কর্মীরা যেখানেই সম্ভব ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এ-সব বিষয়ে

প্রতিকারের চেষ্টা করেছে। এর ফল পাওয়া গেছে তেভাগা আন্দোলনের সময়। পলাতক জীবন যাপন করতে গিয়ে কর্মীরা মহিলাদের কাছ থেকে যে-ধরনের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছে, তার তুলনা নেই। আপনজন বলে গ্রহণ না করলে তা সম্ভব হয় না। তারা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল কমিউনিস্টরা অন্য ধরণের মানুষ।

চল্লিশ দশকের গ্রাম-জীবনে ছোঁয়া-ছুঁয়ির সংস্কার ছিল প্রবল। এসব ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণের অঙ্গ। কত যুগ ধরে চলে এসেছে। এসব অনুভূতিপ্রবণ বিষয়ে জোরজবরদস্তি চলে না। তাতে উল্টো ফল হবার ভয়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকের বাড়িতে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু মুনিস ও মুসলিম মুনিসরা কাজ করত। তাদের উঠানে বসিয়ে কলা-পাতায় খাবার দেওয়া হত। বাইরের বৈঠকখানা ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশাধিকার ছিল না। আমি আমাদের পাড়ার নাথ সম্প্রদায়ের একজনকে হাত ধরে টেনে একদিন আমাদের ঘরে ঢুকিয়েছিলাম বলে আমাকে বাবা-মা-এর কাছে ভীষণভাবে তিরস্কৃত হতে হয়েছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলমানের ঘরে ভাত খাওয়া তো ছিল অকল্পনীয়। আবার উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের হিন্দুর কাছে মুসলমানরা ছিল একেবারে অছ্যুৎ। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে, নিজেরা সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, প্রথম যুগে কমিউনিস্ট কর্মীদের কাজ শুরু করতে হয়েছে খুব সতর্কভাবে। সব সময় খেয়াল রাখতে হয়েছে মানুষ কতটা মেনে নেবে। সামাজিক ভেদাভেদ যে কমিউনিস্টরা মানে না, ধীরে ধীরে এ ধারণা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা নিম্নবর্ণের হিন্দুর ঘরে যেমন খেয়েছে, তেমনি মুসলমানের ঘরেও খেয়েছে। তবে খুব প্রকাশ্যে নয়। মনে আছে, একদিন সিরাজদের বাড়িতে তক্তপোষের ওপর বসে 'নাস্তা' খাচ্ছিলাম, এমন সময় পাড়ার একজন মুরুব্বি ঠাকুরদা এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। আমাকে 'নাস্তা' খেতে দেখে তো তাঁর চোখ ছানাবড়া! একটিও কথা না বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে আমাকে পাড়ার বহু লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে এর জন্য। অবশ্য কৈফিয়ৎ একটাই—'আমরা এসব অর্থহীন ছোঁয়াছুঁয়ি মানি না।' আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা আর ঠিক হবে না। দীর্ঘকালের নিপীড়িত মানুষের মন থেকে হীনমন্যতাবোধ দূর করার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটা খুব জরুরি। আমরা ক্রমশ বিদ্রোহের পথ বেছে নিলাম।

তেতাল্লিশের মহাদুর্ভিক্ষের পটভূমিতে গ্রামবাংলার সামাজিক জীবনে এক

বিরাট পরিবর্তন সূচিত হল। ক্ষুধার ভয়াবহ বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল লঙ্গরখানার খাদ্যের লাইনে। মানুষ ভুলে গেল জাত-পাত-ধর্ম ও সংস্কার। একই পংক্তিতে বসে খিচুড়ি খাচ্ছে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ। এমন কি প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে উচ্চবর্ণের ক্ষুধার্ত মানুষরাও। একবার বাঁধন ছিঁড়ে গেলে আর সঙ্কোচ থাকে না। আগে দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে সম্মেলন উপলক্ষে হিন্দু-কৃষকরা আলাদা সারিতে খেতে বসত। অবশ্য সবাই নয়, যারা সংস্কার মানে শুধু তারা। এর পর আর এই সমস্যা ছিল না। সবাই মিলেমিশে এক সারিতে বসে খেয়েছে। অবশ্য এই মানসিক পরিবর্তন সীমাবদ্ধ রয়েছে সেইসব এলাকায় যেখানে কৃষক-আন্দোলন ছিল। এই সব আন্দোলনের মূল সংগঠক যারা ছিল তাদের অনেকে আজ নেই, যারা বেঁচে আছে, তারাও ছিন্নমূল হয়ে কে কোথায় ছিটকে গেছে জানা নেই। স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে এলেও মনে পড়ে অনেকের কথা। বাণীগ্রামের অপূর্ব গোস্বামী, বোধ হয় পঁচাত্তর অতিক্রম করেছেন, মাঝে মাঝে এসে একদিন-দুদিন করে থাকেন। দুজনে মিলে চলে পুরনো দিনের স্মৃতিচারণা। তাঁর মধ্যেও দেখা দিয়েছে এক রকমের শূন্যতাবোধ। আজকের দিনের কর্মী ও তাদের কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে মেলাতে পারা যায় না—একটা দূরত্ব ও বোঝাবুঝির অভাব থেকেই যায়। নগেন সরকার ক্ষিতীশ চক্রবর্তীর মত নেতাও কি আজকাল খুব বেশি সংখ্যায় পাওয়া যাবে, যাঁরা সমগ্র সত্তা দিয়ে পার্টির সঙ্গে নিজেদের জীবনকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। কেউ জানবে না, নগেন সরকার তাঁর তরুণ বয়সে কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে খিদিরপুরে ডক শ্রমিকদের নিয়ে যখন ইউনিয়ন গঠনের কাজে নেমেছিলেন, তখনও কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়নি। সেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা, আর কোনদিন ঘরে ফেরা হয়নি। সারাটা জীবন বারবার জেলের ভাত আর কমিউনের ডাল-চচ্চড়ি খেয়েই কাটিয়ে দিলেন। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এক অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে। ক্ষিতীশদাও আজ আর বেঁচে নেই।

তখনকার দিনে, পুরনো বিপ্লবীদের বাদ দিলে, অধিকাংশ কর্মী ছিল বয়সে তরুণ। এই বয়সের অধিকাংশ তরুণ যখন অভিভাবকদের কড়া শাসনের বাইরে যাবার কথা ভাবতে পারত না, তখন কমিউনিস্ট কর্মীরা অভিভাবকতন্ত্রের বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ করেই কাজে নেমেছিল। কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের পিতা-মাতা চাননি তাঁদের ছেলেরা জাত-ধর্ম অগ্রাহ্য করে নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলিকে নিয়ে দিনরাত মেতে থাকবে। তাছাড়া তাঁদের বিরূপতার পিছনে রাজনৈতিক কারণও

ছিল। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের বিরুদ্ধতা, সুভাষ বোসকে কুইসলিং বলা, মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বকে জনযুদ্ধ বলা, সর্বোপরি জোতদার-জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটিয়ে কৃষকদের হাতে জমি দিতে বলা—এসবই তাঁদের বিরূপতার প্রধান কারণ। অতএব বাড়িতে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করেই কর্মীরা কাজ করত। প্রকৃতপক্ষে বাড়ির সঙ্গে অধিকাংশ কর্মীর সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল শুধু খাওয়ার। দুবেলা খাওয়া আর রাত্রে শোয়ার জন্য বাড়িতে ঢুকতে হত। তবে কর্তারা বিরূপ হলেও বাড়ির মহিলাদের সহানুভূতি ও সমর্থন অনেকে পেয়েছে। হাত খরচের অর্থও জুগিয়েছেন তাঁরাই। আমার নিজের কথা বলতে পারি, বাড়িতে অনেক কিছু ঘটেছে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কিন্তু তিনি কখনো সোচ্চার হয়ে বাধা দেননি আমাকে, একমাত্র তেভাগার আন্দোলনের সময় ছাড়া। মা-এর কাছে তিনি রেগে অনেক কথা বলতেন, কিন্তু আমাদের তিন-ভাইয়ের অসংখ্য রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধব বছরের পর বছর আমাদের বাড়িতে খেতেন এবং থাকতেন, এটা তাঁর পছন্দ না হলেও কোনদিন এমন কোন মনোভাব প্রকাশ করেননি যাতে তারা অপমানিত বোধ করতে পারে। তবে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল একান্ত ঠান্ডা। তিনি আরো বেশি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলনে আমার বড়দা মনোরঞ্জন ধর আবার গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাবার পর। বাবার কাছ থেকে আমার হাত খরচ পাওয়া অনেকদিন থেকেই বন্ধ। যখন যা প্রয়োজন, পেয়েছি আমার কাকীমার কাছ থেকে। এমন কি মায়ের কাছ থেকেও নয়। বাবার সামনা-সামনি তিরস্কার কখনো আমাকে শুনতে হয়নি। এটাও সম্ভব হয়েছে শুধু কাকীমার জন্য। আরো ছোট বয়সে দেখেছি, কোন কারণে বাবা আমার ওপর রেগে গিয়ে তিরস্কার করতে উদ্যত হলেই কাকীমা মাথায় ঘোমটা টেনে এসে আমার হাত ধরতেন। এর পর বাবা একেবারে নীরব। বাবার আচরণে বাঙালি পরিবারের এই ঐতিহ্য একদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হতে দেখিনি। আমার কাকীমা খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর দাদারা তাঁকে তাঁদের বাড়িতে স্থায়ীভাবে নিয়ে যেতে চাইলে আমার বাবা ও মা তাঁকে নিতে দেননি। তাঁরা সন্তানের মত স্নেহ-মমতা ও মর্যাদার সঙ্গে নিজেদের কাছে তাঁকে রেখেছেন। আমরা ভাইরা, বিশেষ করে আমি, একান্তভাবে তাঁর হাতেই মানুষ হয়েছি। ছোট বেলার যত আবদার অত্যাচার সব তাঁর ওপর। বড় হবার পরও এর বিরাম ঘটেনি। যতবার পার্টির কোটা পূরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তিনিই অর্থের ব্যবস্থা করেছেন। মনে আছে, 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ফান্ড সংগ্রহ করা নিয়ে আমরা

যখন দিশেহারা, তখন একদিন বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কাকীমা গোলাঘরের দরজা খুলে দিলেন, আর আমরা কয়েকমন পাট সরিয়ে নিলাম। মা নিঃশব্দে দেখে গেলেন শুধু। এমন ঘটনা কতবার ঘটেছে। বাইরে থেকে যত কমরেড আমাদের বাড়িতে আসত, তাদের সেবাযত্ন দেখাশোনা বিশেষভাবে কাকীমাই করতেন। তাঁরাও খুব ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর বাদে পবিত্রশঙ্কর রায়-এর সঙ্গে দেখা হলে তিনি প্রথমেই খোঁজ নিয়েছিলেন কাকীমার। আরো অনেকে তাই করেছেন। মনি সিং যেবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি জানতাম, আমাদের বাড়ি থেকে মেজদা বাদে আর একজনই মাত্র তাঁকে ভোট দেবেন—তিনি কাকীমা। আমাদের পার্টি নানাভাবে তাঁর কাছে ঋণী, অথচ তিনি পার্টির কেউ ছিলেন না। এই জন্যই বিশেষ-ভাবে তাঁর উল্লেখ।

উনপঞ্চাশ সালে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলাম। বেণী দত্তও এসেছিল। তখন জব্বরের চিঠি থেকে জানলাম, ওয়ালীনেওয়াজ খান, নগেন সরকার প্রমুখ আরো অনেক কমরেডকে পাকিস্তান সরকার গ্রেপ্তার করেছে। ওয়ালীনেওয়াজ খানের প্রেস 'সীল' করে রেখেছে। এটা ছিল তাঁর পারিবারিক প্রেস, এখান থেকেই পার্টির সমস্ত লিফলেট ও বইপত্র ছাপানো হত। আর কোন প্রেস পার্টির কাগজপত্র ছাপাতে সাহস করত না, বিশেষত পাকিস্তান হবার পর থেকে। জব্বর এ-ও জানাল আমরা যেন প্রকাশ্যে সরাসরি গ্রামে না ঢুকি। নেতৃস্থানীয় সবাই আণ্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও তখন 'রণদিভে পিরিয়ড' চলছে। ধরপাকড় এখানেও কম ছিল না তখন। জব্বরের চিঠি পেয়েই আমি শ্রীরামপুরে গিয়ে বেণী দত্তর সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে নিয়ে স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে এলাম রাখালদার সঙ্গে পরামর্শ করতে। রাখাল দত্তরায় তখন বেকার রোডে স্নেহাংশু আচার্যর বাড়িতে বাইরের দিকে একটা দোতলাঘরে থাকতেন। রাখালদার প্রচেষ্টায় তিন-চারদিনের মধ্যে ময়মনসিংহের কিছুসংখ্যক কমরেডের একটা মিটিং ডাকা হল স্নেহাংশু আচার্যর বাড়িতে। জব্বরের চিঠির ভিত্তিতে আমি আগেই একটা লিফ্‌লেটের খসড়া তৈরি করে রেখেছিলাম। সেটা মিটিং-এ পড়ে অনুরোধ করলাম অন্তত হাজার তিনেক কপি ছাপিয়ে দিতে, আমরা সেগুলো নিয়ে ফিরে যাব। এখন যে ওখানে প্রকাশ্যে আর কাজ করা যাবে না এবং লিফলেটও ছাপানো সম্ভব নয়, সেটা আমরা বুঝেছিলাম। ঠিক তিনদিনের মধ্যে লিফলেট পাওয়া গেল। এখন সমস্যা, কেমন করে এতগুলো লিফলেট নেব? দুজনের

বুকে-পিঠে প্রায় অর্ধেক লিফলেট জড়িয়ে সরু সুতলি দিয়ে এমন করে পেঁচানো হল যেন পড়ে না যায়। দুই উরুতেও একই পদ্ধতিতে আরো বেশ কিছু সংখ্যক নেওয়া হল। শীতকাল ছিল বলে রক্ষে। গায়ে চাদর জড়িয়ে গেলে টের পাওয়ার কথা নয়। বাকি লিফলেটগুলো মাঝখানে রেখে দুদিকে বই দিয়ে কাপড় জামা পেঁচিয়ে বোচকা করা হল দুটো। সারা রাস্তা আমরা ট্রেনে জড়সড় হয়ে একজায়গায় বসে এসেছি। আগেই ঠিক করা ছিল কিশোরগঞ্জ স্টেশনে নেমে আমরা দুজন দুদিক দিয়ে বেরিয়ে যাব। বেণী দত্ত বেরিয়ে গেল মেন-গেট দিয়ে, আর আমি বেরুচ্ছিলাম রেল-লাইন বরাবর। টিকিট জমা দিয়ে পঞ্চাশগজ এগিয়ে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে চ্যালেঞ্জ। দুজন এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। নাম-ধাম এবং নানারকমের প্রশ্ন শুরু হল। জবাব দিতে হল সব উল্টোপাল্টা। শেষে তারা দেখতে চাইল আমার বোচকা। বুঝতে পারলাম রক্ষে নেই। বেপরোয়া হয়ে বললাম, এভাবে প্যাসেঞ্জারদের হয়রাণ করার কী মানে? লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। তারাও সহানুভূতি দেখিয়ে আমার কথায় সায় দিল। আমি তখন বোচকাটা লোকদুটির সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম—বেশত, দেখতে চান, আপনারাই খুলে দেখুন। খুব বাঁচোয়া, লোকজনের আমার প্রতি সহানুভূতির জন্যই হোক কিম্বা যে কারণেই হোক, ওরা বোচকাটা আর খোলেনি। দুদিক থেকে হাত ঢুকিয়ে বুকে নিল শুধু বই, তখন আমাকে বলল—যান। আমি বোচকা উঠিয়ে সোজা ওয়ালীনেওয়াজ খানের বাড়িতে এসে তাঁর স্ত্রীকে ওটা দিয়ে বললাম সরিয়ে ফেলতে। আমি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। রাত্রে নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে আমি ও বেণী দত্ত রওয়ানা দিলাম বাণীগ্রামের দিকে। প্রায় বারো মাইল হেঁটে গভীর রাত্রে হাজির হলাম প্রবীর গোস্বামীর বাড়িতে। শুনলাম, জব্বর ও আমাকে ধরার জন্য টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। আনসার বাহিনীর লোকেরা ওত পেতে রয়েছে। অতএব চলল পলাতকজীবন। এর পরের কাহিনী আমার আগের লেখায় বর্ণিত হয়েছে, অতএব পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে একটা কথা স্বীকার করা দরকার। যদিও এই স্মৃতিচারণার মধ্যে আমি শুধু কমিউনিস্টদের জীবনচর্যার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি, এর মানে কিন্তু এই নয় যে, অন্য দলের কর্মীদের জীবনচর্যা বা নৈতিকতাবোধ সেই সময়ে নিম্নমানের ছিল। তা মোটেই ছিল না। কংগ্রেস, আর-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দলের কর্মীরাও যথেষ্ট নিস্বার্থপরায়ণতা ও ত্যাগের

মনোভাব নিয়েই কাজ করেছেন। আসলে চল্লিশ দশকে যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, নেতৃত্ব থেকে সাধারণ কর্মীপর্যায় পর্যন্ত, তাঁদের সকলের কাছে নৈতিক মূল্যমানের বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচিত হত। স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে সেই মূল্যবোধ নষ্ট হতে হতে শতাব্দীর প্রান্তে এসে নিতান্ত গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কম-বেশি সব রাজনৈতিক দলই বোধহয় এই ব্যাধির শিকার। ফলে সাধারণ মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়ছে। একটা কথা এখন অনেকের কাছেই শোনা যায়—'রাজনীতি এখন অসৎ ও সুবিধাবাদী লোকদের জন্য।' চল্লিশ দশকের রাজনৈতিক কর্মীদের নৈতিকতাবোধ সম্পর্কে কিন্তু মানুষের এধরণের অশ্রদ্ধা ছিল না।

গ্যাস চেম্বার

অমর মিত্র

বেলগাছিয়ায় তাদের পুরোন ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে ছিল খোলা মাঠ। মাঠের ওদিকে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া শিরিষ আকাশমণির ছায়া, অন্ধকারে কোথাও একটা কদম গাছ ছিল। বারোবছর আগের খবর। বারোবছর আগে এক বর্ষার দিনে সেই খবর এনেছিল কৃষ্ণেন্দু। বাদল দিনের প্রথম কদমফুল একটি একটি করে তার কোষবদ্ধ দুহাতে তুলে দিয়েছিল, একটা তোমার, আর একটা তোমার, আর একটা তোমার··পাঁচটাই তোমার, এতদিন জানতামই না এদিকে কদম ফুল ফোটে, তোমার জন্য জানতে হলো।

সেই বৈশাখেই ওই পুরোন ফ্ল্যাটবাড়িতে বউ হয়ে এসেছিল সুদামা। শ্বশুর শাশুড়ি তখন বেঁচে। তিন ঘরের সেই ফ্ল্যাট বাড়ির ভালো দুটি ঘর ছিল কৃষ্ণেন্দুর মা বাবা আর উপরের ভাই অর্ধেন্দুর দখলে। সে পেয়েছিল প্রায় অন্ধকার বাতাসহীন স্যাঁতসেতে ঘরখানি। জানালা খুললে পাশের বাড়ির ময়লা দেওয়াল, পাশের বাড়ির রান্নাঘরের ধোঁয়াকালি গন্ধ। তাদের ঘরে বসে বাদলাদিন টেরই পাওয়া যেত না। না বাদল না বসন্ত না শীত না গ্রীষ্ম, এমনিই ছিল ঘরখানি। ঘরটিতে সারাদিন আলো জেবলে রাখতে হতো। ধূপ জ্বালাতে হতো প্রায় সময়। এখন মনে হয় বারোবছর আগের সেই ঘর যেন সত্য ছিল না। এই বারোশো স্কোয়ার ফুটে অঢেল আলো অঢেল বাতাসে বসে ওই ঘরের কথা মনে হয় অসত্য, অন্য এক জন্মের কথা।

কী আশ্চর্য দিনই না গেছে তখন। তারা তো বছর সাত এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে কৃষ্ণেন্দু। আর কখনো ফিরতে হবে না ওখানে। এখনো যায় সুদামা মাঝে মধ্যে। অর্ধেন্দু আছে। শ্বশুর শাশুড়ি এক বছরের ব্যবধানে দু'জন গেছেন। এখন অর্ধেন্দুরও জায়গার কষ্ট নেই। সে কৃতজ্ঞ, সুদামা কৃষ্ণেন্দু তাকে ওই ভাড়াটে বাড়ির দখল ছেড়ে দিয়ে এসেছে বলে। তখন তো কষ্ট ছিল সকলেরই। তারা ছিল নবদম্পতি। ওই আলো আঁধারি ঘরখানা ছাড়া নবদম্পতির আশ্রয় ছিল না আর। যত গোপনীয়তা ওই ঘরে। ঘরেই বা গোপনীয়তা ছিল কোথায়?

সরাদিন তো অর্ধেন্দুর ছেলে তার ঘরে। শ্বশুড়ি তার কাছে। একা একা যে কৃষ্ণেন্দুর কথা ভাববে সে অবসরও ছিল না যেন! পরস্পরে ছোঁয়াছুঁয়ি কথাবার্তা সব হতো তো সেই রাত এগারোটার পরে। সেবার বর্ষায় শ্বশুর-শাশুড়ি দিন সাতের জন্য পুরী, সঙ্গে অর্ধেন্দুরাও গেল। পুরীর রথযাত্রা দেখতে তাকে কম লোভ দেখায়নি বড় জা অনিতা। সে যায়নি। তার লোভ হয়েছিল, অন্তত দিন সাতের জন্য পুরো ফ্ল্যাটটা তো তাদের। ছুটি নিয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু! তিনটি ঘরের ফ্ল্যাটে তারা দুজন মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছিল ওই ক'দিন। এতকাল বাদে সেই ঘনবর্ষার কথা মনে পড়ে গেল সুদামার, সেই বাদল দিনের কথা। আশ্চর্য, তাদের জন্যই বোধহয় ওই ক'দিন আকাশ থেকে মেঘ সরেনি। তারা দখল করেছিল শ্বশুর শাশুড়ির ঘর। জানালা দিয়ে, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দুজনেই দেখেছিল কীভাবে মেঘ ঢোকে এই শহরে। সুদামা তো ডালিমতলা থেকে বউ হয়ে এসেছিল বেলগাছিয়ায়। ডালিমতলা মধ্যকলকাতায়। সেখানে বসতি খুব ঘিঞ্জি। বাস ট্রাম ধোঁয়া ধুলোর ভিতরে আকাশ ছিল অদৃশ্য। সুদামা তার ওই বাইশ বছরের জীবনে সেই প্রথম বোধহয় ভালো করে মেঘ আর আকাশ দেখেছিল। সাতদিনই ভোরবেলায় বর্ষার ভিতরে বেরিয়ে কদম্ব সংগ্রহ করে ফিরত কৃষ্ণেন্দু, আরো চাই তোমার? আরো?

হ্যাঁ চাই, আরো প্রেম চাই। আরো ভালোবাসা। বৈশাখ থেকে ভালোবাসার কাঙাল হয়ে আছি আমরা। মেঘ বর্ষা ভেজা বাতাস, ছায়াময় সকাল, কদম্বপুষ্প প্রেম যেন সীমাহীন হয়ে উঠেছিল ওই সাতদিন। কৃষ্ণেন্দু, মনে পড়ে?

এই বালির মাঠ, লবণহ্রদেও তো গাছ-গাছালি বড় হয়ে উঠেছে এখন। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার লাল হলুদ এখানেও দেখা যায়। এখানে আকাশ আরো উদার। এখানে মেঘ আসে বেশি। কোথাও কি কদম্ব ফোটেনা এদিকে? কৃষ্ণেন্দু খবর রাখে কি?

সুদামা সেই বেলা দশটা থেকে একা। একা এতবড় ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরেই তার বেলা যায়। দশ বছরের ছেলেটা থাকলেও ঘরে যেন অনেক মানুষ। সুদামা বিছানায় উপুড় হয়ে শোয়।

কদম্বের গন্ধ কীরকম? ভুলেই গেছে সে। এতদিন বাদে হঠাৎ যে কেন মনে পড়ল সেই দিনগুলোর কথা। সুদামা উঠে বসল। নাকে কীরকম একটা গন্ধ আসছে। বিছানা থেকে নামল। গ্যাসের। কাঁচা পেট্রোলিয়াম গ্যাসের। দৌড়ে গেল সুদামা কিচেনে। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সিলিন্ডারের নব ঘোরায়নি,

ওভেনের নব আধখানা ঘোরানো। অল্প অল্প গ্যাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিচেনে গন্ধটা আরো বেশি। সে ঝপ করে দুটো নব বন্ধ করে একজস্টফ্যান চালিয়ে দিল। তার মুখে হাসির রেখা। আজ সকাল থেকে মেঘ করে আছে। কৃষ্ণেন্দু অফিসে বেরোনর পর, কী যে হয়েছে তার, ঘুরে ফিরে সেই কদম্ব শিহরিত দিন। তা হোক ভুল করেছিল বলেই না উদ্বিগ্ন হওয়ার সুযোগ এল। তাকে দৌড়ে আসতে হলো বেডরুম থেকে এতটা। এখন জানালা সব খুলে দেওয়া দরকার। কাঁচা গ্যাসের গন্ধটা খারাপ লাগছে না। ঘরের ভিতরে ওই গ্যাসের সামান্য অংশও ভাসছে। মিলিয়েও যাবে। তবু সুদামা জানালাগুলো খুলে দিতে লাগল। এ ঘরের ও ঘরের। জানালা খুলতে বেশ লাগে। মনে হয় ভোর হয়েছে। তাদের ডালিমতলার বাড়ির একতলাতে থাকত তারা। গলির ভিতবে। ও পাড়ায় ছেঁচড়া চোরের উপদ্রব বেশি। তাই ভরা গ্রীষ্মেও জানালা বন্ধ করে শুতে হতো। তার ভোর হতে না হতে সুদামা নিজেই উঠে সব জানালা ধাক্কা মেরে মেরে খুলত। আহ কী বাতাস। সুদামার মুখে ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া। আরো মেঘ আসছে এই নগরের আকাশে।

জানালা খুলে দিয়ে সুদামা আবার বিছানায় এসে শোয়। আচ্ছা সে যদি টের না পেত। গ্যাসে ভর্তি হয়ে যেত এই ফ্ল্যাট। একটা সিলিন্ডারে কত গ্যাস ধরে। কৃষ্ণেন্দু কৃষ্ণেন্দু, আমার দুহাত ভরে গিয়েছিল কদম্বে। ভাগ্যিস সকলে পুরী গিয়েছিলেন। আমাদের ওই ফ্ল্যাট তখন কত বড়! তিনটে ঘরে কেউ নেই, তবু আমরা দরজা বন্ধ না করে শুতে পারতাম না। মনে হতো যেন কেউ আছে। রান্নাঘরে আমাকে চুম্বন করতে চাইলে তুমি, আমি সরিয়ে দিলাম, কেউ আছে, ঘরে চলে এলাম দৌড়ে। মনে আছে সেসব। এই বারোশো স্কোয়ার ফুটে কিন্তু কখনোই মনে হয় না কেউ আছে। কিন্তু বারোটা বছরও যে চলে গেছে। সুদামা উঠল বিছানা থেকে। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েও সরে এল। ঘাড় বাঁকিয়ে খোলা জানালা দিয়ে মেঘ দেখল। বেশ ঘন, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, আসছে তো আসছেই। ধীরপায়ে সে ব্যালকনিতে গেল। ঠান্ডা বাতাস শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টি নেমেছে বোধহয় শহরের কোথাও। কৃষ্ণেন্দু বসে আটতলায়। তার ডানদিকে মস্ত জানালা, কাচ দিয়ে ঢাকা। চেয়ারে বসেই কৃষ্ণেন্দু শহর দেখতে পায়। গঙ্গা দেখা যায়, এমনকি খিদিরপুর ডকে দাঁড়ানো জাহাজের মাস্তুলও। কৃষ্ণেন্দুর ঘরের জানালা বোধহয় মেঘের প্রলেপে অন্ধকার হয়ে গেছে। সুদামা ব্যালকনিতে বুকের ভার রেখে দূরের আকাশের দিকে তাকায়। এটা কোন মাস?

শ্রাবণ পড়ে গেছে? নাকি আষাঢ় চলছে, আজ জুলাই-এর কত? পনেরো হয়ত। নাকি চোদ্দ? আচ্ছা কদম্বগাছে ফুল ফুটে গেছে! আষাঢ় শেষ হতে গেল, ফুল ফোটেনি? কৃষ্ণেন্দু কি জানে? সুদামা ঘরে ঢুকে টেলিফোন তুলে ডাক দিল কৃষ্ণেন্দুকে। রিং হয়ে যেতে লাগল। অনেক বাদে ধরল একজন? হ্যাঁ কৃষ্ণেন্দুই। কোথায় ছিলে তুমি? তোমার ফোন কেউ ধরে না?

কে বলছেন?

আমি গো আমি।

আমি মানে কে?

আমিইই। টেলিফোনে মেঘের ডাক শুনতে পায় সুদামা। গুরু গুরু মেঘ ডাকছে কৃষ্ণেন্দুর জানালার ওপারে। জানালা কি খুলে রেখেছে? শুনছো তোমার ঘরের বাইরে মেঘ ডাকছে, জানালা খুলে রেখেছো? বৃষ্টি কি শুরু হলো?

আপনি কে বলছেন?

সুদামা বলল, এক্ষুনি বাড়ি চলে এসো, এক্ষুনি।

এতক্ষণে চিনলো যেন কৃষ্ণেন্দু, তুমি! গলাটা একদম ধরা যাচ্ছে না, এতো ভারী ভারী কেন সুদামা, কী হয়েছে?

সুদামা বলল, তুমি চলে এসো, এসে শুনবে।

কী হয়েছে বলবে তো?

ফোনে বলা যাবে না, তুমি চলে এসো। বলতে বলতে সুদামা আবার শুনল মেঘের ডাক। গুরু গুরু গর্জনে সারা শহরে ভেসে বেড়াচ্ছে কালো মহিষের দল। সুদামা মেঘের ডাক শুনতে শুনতে রেখে দেয় টেলিফোন। ওপারে তখনো ধরে আছে কৃষ্ণেন্দু।

দুই

কৃষ্ণেন্দু বলল, তারপর বারচারেক চেষ্টা করেছি, এনগেজড, তোমার ফোন বোধহয় ঠিক করে রাখা ছিল না।

সুদামা কথা বলছিল না। আজ যত মেঘ জমেছিল, এত ডাকা ডেকেছিল, বৃষ্টি সেই অনুপাতে হয়নি কিছুই। সুদামা সেই দুপুর থেকে, এই এতটা সময় অপেক্ষা করেছে কৃষ্ণেন্দুর জন্য! এখন সাড়ে সাতটা।

বিরক্ত কৃষ্ণেন্দু বলল, ফোনটা ঠিক করে রাখবে তো।

রাখলে কী হতো ?

আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে পারতাম। আসতে পারছি না।

আসোনি তো৷

আসবো কী করে ? হঠাৎ দিল্লি থেকে জরুরি ফ্যাক্স, জবাব তৈরি করতে হলো। কৃষ্ণেন্দু বলতে থাকে দেড়টার পর সে কীরকম ব্যস্ততায় কাটিয়েছে আজ।

আমি তো আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না। সুদামা অস্ফুট জবাব দেয়।

আমি বলছি, এমনিই বলছি, টেলিফোন রাখার সময় দেখে নেওয়া উচিত, যতবার ডায়াল করি, এনগেজড টোন।

শুনেছি তো, একই কথা বারবার বলছো কেন ? আসোনি, মিটে গেছে।

কৃষ্ণেন্দু পায়জামা পাঞ্জাবি পরে টিপয়ের উপর পা তুলে বসেছে, জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছিল তোমার, ডাকছিলে কেন ?

ছ ঘণ্টা কেটে গেছে। সুদামা বিড়বিড় করতে করতে ধীর পায়ে ব্যালকনিতে চলে যায়। বাইরে ঘন মেঘে অন্ধকার নিশ্ছিদ্র। সামনের রাস্তার আলোটা আজ নেভা। সুদামা নিশ্চল অন্ধকারে, গ্রহতারাহীন আকাশের দিকে মুখ তোলে।

কী হয়েছিল বলবে তো, আমি ভাবলাম লোক পাঠাই।

স্যাৎ করে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের দিকে ফিরেছে সুদামা, তার মানে ?

টেলিফোন এনগেজড, তুমি বলছো বাড়ি ফিরতে··· কৃষ্ণেন্দু বলতে থাকে।

কেউ তো আসেনি।

আসবে কে ? অর্ডারলি পিয়ন গোপাল সাতদিন আসছে না, বউ-এর অসুখ, ও রান্না করছে। বউ-এর সেবা করছে। বলতে বলতে হাসতে থাকে কৃষ্ণেন্দু।

বউ এর অসুখ হলে কী করবে ? সুদামা জিজ্ঞেস করল।

কী করবে তা কী জানি, কিন্তু তার বদলে অফিস কামাই।

বাড়ি ও থাকবে অফিসেও যাবে, তা তো হয় না।

হয় না তা সবাই জানে, কিন্তু কথায় কথায় এরা অফিস কামাই করে, জামাই-ষষ্ঠী, ছুটি চাই, বউএর হাঁচি হয়েছে, ছুটি চাই, দুজনে মিলে থিয়েটার দেখতে যাবে, তাও ছুটি চাই, দুজনে মিলে মধুপুরে মামাশ্বশুর বাড়ি যাবে। পিয়ন বটে, কিন্তু রঙ আছে ষোলো আনা।

থাকা উচিত নয়। সুদামা বলল।

খেয়াল হলো যেন কৃষ্ণেন্দুর। না না তা বলছি না, কিন্তু এই জন্য এদের কিছু হয় না. কোনো কোনোদিন দরকার হয় অফিসে থাকার, মানে ছটার পর আরো দু ঘণ্টা, সে থাকে না, কিছুতেই না, থাকলে এক্সট্রা কিছু পেত, টিফিন অ্যালাউন্স তো কম নয়। কিন্তু গোপালকে থাকতে বলে কে? আসলে ওর বউও তো কিছু করে।

কিছু করে মানে?

হাতের কাজ নাকি চমৎকার, গোপাল বলে, দশ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো ওর মুখে শুধু ভারতী ভারতী ভারতী, ভারতী ওর বউ-এর নাম। কিন্তু তোমার কী হয়েছিল?

ছ ঘণ্টা তো হয়েই গেছে।

তাহলে ডাকলে কেন?

সুদামা বলল, এখন শুনে কী করবে?

উদ্বিগ্ন হলো এবার কৃষ্ণেন্দু, কী ব্যাপার বলো দেখি, কেউ এসেছিল?

কে আসবে?

আজকাল তো দিন দুপুরে ফ্ল্যাটে ডাকাতি হয়।

সুদামা হাসল, ডাকাতি যে হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

না, না, ব্যাপারটা কী? অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?

এখন দেখে কী মনে হচ্ছে? বেঁচেই তো আছি। বিড়বিড় করল সুদামা।

কৃষ্ণেন্দু আবার রাগ করল, কিন্তু ডাকলে কেন, কেন বলো দেখি?

কারণ তো ছিলই।

তেমন জরুরি কিছু নয়। কৃষ্ণেন্দু ডাকল তাকে, চা খাওয়াবে?

সুদামা ব্যালকনি থেকে ঘরে। ঘর থেকে কিচেনে। চায়ের সরঞ্জাম সব গুছিয়ে গ্যাসে দেশলাই ঠুকতে গিয়ে দ্যাখে নেই। আছে কিন্তু কোথায় রেখেছে মনে পড়ছে না। তার এক হাত সিলিণ্ডারের নবে নেমে আসছিল। মনে হচ্ছিল তার অন্য হাতে দেশলাই কাঠি প্রজ্বলন্ত। সিলিণ্ডারের নব ঘুরিয়ে দিল সুদামা। এবার তার সেই হাত ওভেনের নবে। দেশলাই কাঠি জ্বলছেই। ওভেনের নব ঘুরিয়ে খেয়াল হলো সুদামার। সে নাকে গ্যাসের গন্ধ পায়। ধীরে সুস্থে ওভেনের নব ঘুরিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নাকে গ্যাসের গন্ধ নিতে থাকে। সামান্য গ্যাস বাতাসে ছড়িয়েছে। তা ধীরে ধীরে মিলিয়েও যেতে থাকে। কী যে হলো সুদামার। মনে হলো আবার নাকে পায় গ্যাসের

গন্ধ। হাত বাড়িয়েছে ওভেনের নবের দিকে। তখন ডাকল কৃষ্ণেন্দু, তুমি কোথায় ?

সুদামা জবাব দেয় না। কৃষ্ণেন্দু উঠে এসেছে। নাকে সে গ্যাসের গন্ধ পেয়েছে, গ্যাস লিক করছে ?

সুদামা কিছু বলল না। দেশলাই এর জন্য বেরিয়ে এল অপরিসর কিচেন থেকে। কৃষ্ণেন্দু নাক টানছে, হ্যাঁ গন্ধ রয়েছে।

তেমন কিছু নয়, তুমি ঘরে যাও। সুদামা দেশলাই হাতে আবার ফিরে এসেছে কিচেনের দরজায়, বলল, কাঁচা গ্যাসের গন্ধ আমার ভালো লাগে।

ভালো লাগে মানে ?

ভালো লাগে মানে ভালো লাগে। সুদামা চট করে ওভেনের নব ঘুরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরল ওভেনের ওপর। গ্যাস জ্বলে ওঠে। নীল শিখা গোল হয়ে জ্বলতে থাকে। সুদামা চায়ের সসপ্যান চাপায়। কৃষ্ণেন্দু দাঁড়িয়ে থাকে দরজায়, জিজ্ঞেস করে। গ্যাস লিক করছে না তো।'

সুদামা জবাব দেয় না। নীল শিখার দিকে দৃষ্টি স্থির করে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, ডেকেছিলে কেন ?

সুদামা বলল, এলে জানতে পারতে।

ওভাবে ডাকতে হয় ?

সুদামা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়, কেন ?

জরুরি তো কিছু ছিল না

তুমি বুঝলে কী করে ?

কৃষ্ণেন্দু বলল, এর ভিতরে জরুরি ব্যাপারটা মিটে গেল ?

সুদামা নিশ্চুপ। জল ফুটতে থাকে। বাইরে বোধ হয় বৃষ্টি এল। দূরে মেঘ ডাকল। কৃষ্ণেন্দু জানালা বন্ধ করতে ঘরে ছুটে যায়। সুদামা অনেকটা সময় নিয়ে চা তৈরি করে। চা এনে টিপয়ে রেখে ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরের অন্ধকার দ্যাখে। ঠাণ্ডা ভেজা বাতাসের ঝাপটা লাগে ওর মুখে। বৃষ্টি নেই প্রায়। ছিরছিরে দু এক ফোঁটা উড়ে আসছে বাতাসের সঙ্গে।

কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, তোমার কী হয়েছে ?

দরজা বন্ধ করে সুদামা ফিরল কৃষ্ণেন্দুর দিকে, তুমি এলেনা, যদি আমি মরে যেতাম, তুমি তো আশ্চর্য মানুষ।

কৃষ্ণেন্দু বোধ হয় চাইছিল সুদামা কিছু বলুক। তার দম যেন বন্ধ হয়ে

আসছে ফেরার পর থেকে, বলল; আটকে গেলাম, গোপালও নেই, কাকে পাঠাই।

আমি তো কাউকে পাঠাতে বলিনি, আমি তো বলেছিলাম তোমাকে আসতে।

আসতে বললেই তো আসা যায় না, আমার ঘাড়ে তো দায়িত্ব আছে।

দায়িত্ব আছে বলেই তো আসতে বলেছিলাম। সুদামার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কঠিন।

আহা তুমি রাগছো কেন, কী দরকার হয়েছিল তাতো ফোনেই জানাতে পারতে তুমি তো ফোনটা রেখে দিলে, তারপর থেকে এনগেজড। আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি।

সুদামা বলল; তুমি এলে না, আমি যদি মরে যেতাম।

হাসে কৃষ্ণেন্দু, খামোকা মরতে যাবে কেন?

সুদামা বলল, আমার সত্যিই যদি কিছু হতো। আমার আমার···।

কৃষ্ণেন্দু বলল, হয়নি তো, ওভাবে ডেকো না, কী হয়েছে বলো দেখি তোমার, ডাকছিলে কেন? এসে আমি কী করতাম?

সুদামা চুপ করে থাকে। কৃষ্ণেন্দু ওঠে, আমি একটু ঘুরে আসছি।

কোথায় যাবে?

সিগারেট নেই, যাই, কিছু আনতে হবে তো বলো।

সুদামা বলল, আমি যদি পুড়ে মরে যেতাম।

কী যা তা বলছো। কৃষ্ণেন্দু ফোনের কাছে যায়। পটপট ডায়াল করতে থাকে, চঞ্চল বলছিল পুজোয় নর্থ ইন্ডিয়া যাবে, যেতে বলছে।

দু বার গেছি।

আর একবার না হয় যাই।

আমি কোথাও যাবো না। সুদামা হিস হিস করে ওঠে, আমি বাপ্পাকে নিয়ে ডালিমতলা যাবো।

হা হা করে হাসে কৃষ্ণেন্দু, হাসতে হাসতে হঠাৎ তা থামিয়ে ফোনে ডাক দেয়, চঞ্চল আছে নীতা?

·········। সুদামা জানে চঞ্চল না থাকলেই ফোন করতে উৎসাহী হয় কৃষ্ণেন্দু।

নীতা এই পুজোয় নর্থ ইন্ডিয়ার কথা বলছিল চঞ্চল···কী বলছো, যাবে না, সাউথে···আচ্ছা চঞ্চলের সঙ্গেই কথা বলবো, আমরা তো ছ মাস আগে সাউথ থেকে এসেছি, নর্থে চলো, যাক সে, তুমি কেমন আছো নীতা···না না মিসিসিপি মশাল্লা

দেখা হয়নি, সময়ই হয়নি, হ্যাঁ সুদামা বলছিল বটে, আমি বলেছিলাম ওকে দেখে নিতে, সুদামা ভালো আছে, সুদামাকে দেব ?

সুদামা বলল, বলে দাও আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, বলে দাও আমার জ্বর।

তিন

কৃষ্ণেন্দু হঠাৎই বেরিয়ে গেছে টেলিফোন শেষ করে। সুদামার মনে হলো তার কথা হয়ত নীতার কানে গেছে। কৃষ্ণেন্দু শার্ট প্যান্ট পরে বেরোল যখন ঘড়িতে আটটা দশ। এখন দশটা বেজে গেছে। সুদামা টেলিফোনের সামনে বসে। সে ভাবছিল ডাকবে নীতাকে। ওকি চঞ্চলদের ওখানে গেল ? সুদামা দুবার ডায়াল করেও শেষ পর্যন্ত ফোন রেখে দিয়েছে। এ ঘর ও ঘর করতে করতে অবশেষে অন্ধকার ব্যালকনিতে একা। আরো অনেক পরে ট্যাক্সি দাঁড়ালো ফ্ল্যাটের সামনে। ঈষৎ স্খলিত পায়ে ট্যাক্সি থেকে নামল কৃষ্ণেন্দু।

কৃষ্ণেন্দু ভিতরে ঢুকে বলল, তোমার কথা শুনতে পেয়েছিল নীতা।

ওদের ওখান থেকে এলে ?

দুপেগ, ছাড়ল না চঞ্চল, আচ্ছা তোমার কী হয়েছে বলো দেখি। জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণেন্দু।

আমি তো যাবনা কোথাও পুজোয়।

কেন যাবে না, আমি বলছি, যেতে হবে তোমাকে। গর্জে উঠল কৃষ্ণেন্দু। সুদামা হাসে, তুমি বললেই যেতে হবে ?

সবাই যাবে।

সবাই আর কে ? চঞ্চল আর নীতা।

ওরাই তো যায় আমাদের সঙ্গে।

আমি না হয় না গেলাম।

তোমার কথা শুনে অপমানিত হয়েছে নীতা, তুমি আবার ফোনটা ঠিক করে রাখোনি, চঞ্চল তোমাকে ডাকছিল ফোনে, এনগেজড সাউন্ড। জড়ানো গলায় কথাগুলো বলতে বলতে কৃষ্ণেন্দু ফোনের কাছে গেল, ক্রেডল-এ ঠিকমত রাখা ছিল না রিসিভার, ও দেখায় সুদামাকে, এই দ্যাখো। তুমি কি ইচ্ছে করেই··· ?

সুদামা বলল, হ্যাঁ।

কেন ?

এমনি, আমার ফোন মানে তো হয় নীতা না হয় চঞ্চল, না হয় তোমার অফিসের মিঃ সেন, তুমি না থাকলে ফোন করে, তোমার বস, আমার সঙ্গেই কথা বলতে চায়, আমার কারোর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না।

তা বলে ফোন এইভাবে রেখে দেবে ?

কী হয়েছে ?

আমিও তো ফোন করতে পারি।

তুমি কেন ফোন করবে ?

এমনি, আমার তো ইচ্ছে হতে পারে, বাইরে তো আমার কিছু হয়েও যেতে পারে।

কী হবে ?

অ্যাকসিডেন্ট। জুতো খুলে শার্ট প্যান্ট পরা অবস্থায় বিছানায় চিত হলো কৃষ্ণেন্দু, ফোন কেন বন্ধ হয়ে থাকবে ?

থাকলে থাকবে। সুদামা বলল, জামা কাপড় ছেড়ে খেয়ে নাও।

খেয়ে এসেছি, আমি তো ফোন করতে পারি, দুপুরে চেষ্টা করেছি, এখনো এই একটু আগে, নীতা হাসতে হাসতে বলছিস তুমি তোমার বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলেই যাচ্ছো। বলেই যাচ্ছো। হা হা হা। উঠে বসল কৃষ্ণেন্দু, নীতা খুব রসিক, কী দারুণ কথা বলে!

সুদামা শক্ত হলো, আমি ওসব রসিকতা পছন্দ করি না।

তুমি কী পছন্দ করো। বলো দেখি, তোমার কিছু একটা হয়েছে, তুমি বলছো ডালিমতলায় যাবে পুজোর সময়, নর্থ ইন্ডিয়া যাবে না। তুমি টেলিফোন উল্টে রেখে দিচ্ছো, খামোকা দুপুরে ডাকছো আমাকে।

সুদামা মেঝেয় বসে পড়েছে। কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনতে শুনতে সে নিঃঝুমতায় আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, বাপ্পা থাকলে তবুও হতো, তাকে কৃষ্ণেন্দু দিয়ে এসেছে পুরুলিয়ার হোস্টেলে। সুদামা কাল দুপুরে পালিয়ে যাবে পুরুলিয়া। কৃষ্ণেন্দু অফিসে বেরিয়ে গেলে টেলিফোনে বলে দেবে, চলে গেলাম পুরুলিয়ায়। নাকি তা–ও বলবে না, শেষে কৃষ্ণেন্দু না তাকে পথ থেকে নিয়ে চলে আসে। টেলিফোনটা ক্রেডল থেকে নামিয়ে রেখে সে উধাও হয়ে যাবে। কৃষ্ণেন্দু আমি কী নিয়ে কাকে নিয়ে থাকবো বলতো, সকাল থেকে সন্ধে। সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত।

কৃষ্ণেন্দু উঠল। পাশের ঘরে গিয়ে জামা প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে আবার এল এই ঘরে, তোমার জন্য আমার ভয় করছে সুদামা।

সুদামা কথা বলে না।

তুমি তো নীতাদের ওখানে যেতে পারো।

সুদামা নিশ্চুপ।

তুমি দুপুরে ডেকেছিলে কেন ?

সুদামা মাথা নামিয়ে বসে আছে। কেন ডেকেছি তা শুনে তো তুমি হাসতে আরম্ভ করবে, অথবা বিরক্ত হবে। প্রতিটা দিন একরকম একরকম। প্রতিটা দুপুর একরকম, প্রতিটা সন্ধে। এভাবে মানুষ বাঁচে।

রাত্রে ঘুমোয়নি সুদামা। কৃষ্ণেন্দু খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্ধে থেকে যে প্রশ্ন বার বার করেছে কৃষ্ণেন্দু, তার জবাব না পেয়েও কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। সুদামার মনে হচ্ছিল সে ওঠে। উঠে গ্যাস সিলিন্ডারে হাত দেয়। কাঁচা গ্যাসের গন্ধ ক'দিন ধরেই তার ভালো লাগছে। কাঁচা গ্যাসে ভর্তি করে ফেলে সে এই ফ্ল্যাট।

সুদামার মনে হচ্ছিল, সে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে ডালিমতলা, ডালিমতলা থেকে ভোরবেলা পুরুলিয়া, বিপুল আকাশের নীচে সে একা হয়ে যাবে। একা, একেবারে একা। আজ দুপুরে তো খুন হয়ে যেতে পারত, আজ দুপুরে কাঁচা গ্যাসের ভিতরে ডুবে আচমকা দেশলাই ঠুকে সে পুড়ে যেতে পারত, খুব জ্বরে বিছানায় পড়ে থাকতে পারত, আচমকা পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে ছ ঘণ্টা। এসব হয়নি, হতে পারত। পারতই, তার যেমন মনে হয় বাপ্পা বোধহয়, কৃষ্ণেন্দু বোধহয়…। কৃষ্ণেন্দুর এসব কিছুই মনে হয়নি। অথচ মনে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। গোপাল নামের সেই পিয়ন অফিসে আসেনি, তাই কর্তব্য করতে পারেনি সুদামার স্বামী, বারো বছর আগের প্রেমিক।

সুদামা তো এমনিই ডেকেছিল। একা লাগছিল তাই ডেকেছিল। মেঘ দেখে কদম্বের কথা মনে পড়েছিল তাই ডেকেছিল। কৃষ্ণেন্দু এলে দুপুরে দুজনে বাপ্পার কথা বলতে বলতে কদম্বের সন্ধানে যাবে বলে ডেকেছিল। সারাদিন একা থেকে, তার তো কখনো ইচ্ছে হতেই পারে সঙ্গ পাওয়ার। বারো বছরে প্রেম নিঃশেষ হয়ে গেছে কিনা তার খোঁজ পেতে চেয়েছিল যেন সে। তলানিটুকুও পড়ে আছে কিনা জানতে চেয়েছিল। না পেরে নিঃঝুমতায় আক্রান্ত হয়ে আবার একবার কৃষ্ণেন্দুকে টানতে চেয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলে গেছো, তুমি কি ভুলে গেছো আমার কপালের ডানদিকে সামান্য একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। খুব নজরে দেখা যায়। তুমিই জানো তা। এখনো কি আছে ?

পরদিন কৃষ্ণেন্দুকে না পেয়ে বলল সুদামা, কদমফুল। এখন তো ফোটে মনে আছে ?

হা হা করে হাসে কৃষ্ণেন্দু, আজ যদি গোপাল আসে, তার হাতে পাঠিয়ে দেব, নিউ মার্কেটে কি না পাওয়া যায়, আমি যাই, তুমি এইজন্য ডেকেছিলে ?

কৃষ্ণেন্দু বেরিয়ে যাওয়ার পর বেলা দশটায় ঘুমিয়ে পড়ল সুদামা। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল গোপাল নামে সেই আধবুড়ো পিয়নটি তাকে ডাকছে, সুদামা সুদামা···। বারো বছর আগের কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণেন্দু বলছে, একটা তোমার, আর একটা, আর একটাও···।

এইভাবেই কেটে যাবে দুপুর বিকেল সন্ধে। এই বর্ষায় গোপাল কেন এদিকে আসবে ? সুদামা প্রতিদিন কাঁচা গ্যাসের গন্ধ নিতে লাগল। এক সময় কদম্বের গন্ধ, এখন লিকুয়িড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের গন্ধ তাকে বাঁচাচ্ছে, তার সঙ্গী হয়ে উঠেছে। গন্ধটা তাকে আচ্ছন্ন করছে একটু একটু করে।

পরিচয়-এর গ্রাহক হোন

নবপর্যায়ে পরিচয় মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী পাঠকের প্রত্যাশা
পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ

গ্রাহক সংক্রান্ত—

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা চল্লিশ টাকা। ডাকযোগে নিলে অতিরিক্ত দশ টাকা।

আপাততঃ পরিচয় প্রতি দুই মাসে যুক্ত সংখ্যা হিসেবে বেরুবে। দাম দশ টাকা। বিশেষ সংখ্যা বা শারদীয় সংখ্যার দাম পনের থেকে ত্রিশ টাকার মধ্যে থাকে, গ্রাহকগণ নির্ধারিত চাঁদার মধ্যে সব সংখ্যা পাবেন।

এজেন্সী সংক্রান্ত—

কমপক্ষে আট কপি নিতে হবে।

কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা।

পত্রিকা ভি-পি-তে পাঠানো হয়।

এজেন্ট নিজে সংগ্রহ করলে ছাড় ৩৩·৩৩ শতাংশ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহক কিম্বা এজেন্সী সংক্রান্ত চিঠিপত্র / রেজিস্টার্ড চিঠি / মনি অর্ডার / ড্রাফট / চেক ইত্যাদি অবশ্যই নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে ঃ

পরিচয়
৩০/৬, ঝাউতলা রোড
কলিকাতা-৭০০০১৭

অন্নদাশংকর রায়ের প্রবন্ধ

অন্নদাশংকর রায়ের ওপর কবীর চৌধুরীর প্রবন্ধ

শিল্পী চিত্তপ্রসাদের পত্রগুচ্ছ

চিত্তপ্রসাদের ওপর বিজন চৌধুরীর প্রবন্ধ

জার্মান সাহিত্য নিয়ে রত্না বসুর প্রবন্ধ

ইতিহাস শ্রমিক আন্দোলনের না শ্রমিক শ্রেণীর

সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর প্রবন্ধ

তিনটি গল্প

নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ

CENTRAL LIBRARY
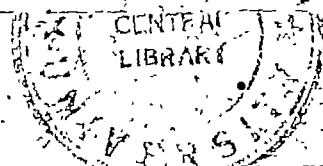
বহুরূপীর নতুন নাটক নিয়ে আলোচনা

পুস্তক-পরিচয় / সাময়িক প্রসঙ্গ / বিয়োগপঞ্জি

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বই

* সফদর হাশমি নাট্য সংগ্রহ— ১৫'০০ টাকা
* ঋষি-নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—কুমার রায় ২'০০ টাকা
* কলকাতার নাট্যচর্চা—প্রবীন চক্রবর্তী ১০০'০০ টাকা
* নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—কুমার রায় ৩'০০ টাকা
* সুকুমারী দত্ত ও অপূর্বসতী নাটক—সম্পাদনা বিজিত কুমার দত্ত ৮'০০ টাকা
* নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা ২০'০০ টাকা

সদ্য প্রকাশিত :

* নট-নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য—
  লেখা—সজল রায়চৌধুরী ৮০'০০ টাকা
  সম্পাদনা—নৃপেন্দ্র সাহা
* নাট্যাচার্য শিশিরকুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য ৪১'০০ টাকা
* আশার ছলনে ভুলি—উৎপল দত্ত ৩৫'০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

নাট্য আকাদেমি দপ্তর—কলকাতা তথ্যকেন্দ্র
১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১০০ ০২০
টেলিফোন-২৪৮-৪২১৪
ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার,
কলকাতা-১০০ ০৭৩
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-১০০ ০৭০—দে বুক এজেন্সি
কলকাতা-১০০ ০৭৩—পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার,
১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-১০০ ০১০

আই. সি. এ ৩৬৬৬/৯৪

প্রত্যেক নবসাক্ষর জাতির গর্ব

বামফ্রন্ট সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রামই সাক্ষর হয়েছে বা হতে চলেছে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রতি মানুষের অক্ষরজ্ঞান প্রয়োজন। আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রতিটি ঘরে সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলি।

সাক্ষরতা প্রসারে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

——আই সি এ / ৩৬৬৬ / ৯৪——

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৪ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০১ ৬৪ বর্ষ ৪—৫ সংখ্যা

প্রবন্ধ

সাক্ষাৎকার

চিঠিপত্র

গল্প

কবিতাগুচ্ছ

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু অমিয় ধর (আমন্ত্রিত সদস্য)

উপদেশকমণ্ডলী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত
ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সেতুবন্ধন

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভারত ভাগ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না, কিন্তু বাংলা ভাগ ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ঘটনাটা একবার ঘটে যাওয়ার পরে তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য গতি ছিল না। বুদ্ধি দিয়ে মেনে নিলে কী হবে, অন্তর দিয়ে মেনে নিতে পারিনি। হৃদয়ে যে বেদনা ছিল সে বেদনা এখনও রয়েছে। আমার ধারণা ছিল তিন বৎসরের মধ্যে দুই বাংলা আবার এক হবে, যেমন আমার বাল্যকালে সাত বৎসরের মধ্যে এক হয়েছিল।

কিন্তু এবার দেখা গেল আর একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। হিন্দুরা সদলবলে চলে আসছেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে, মুসলমানরা চলে যাচ্ছেন পশ্চিম থেকে পূর্বে। এই প্রক্রিয়া যদি চলতেই থাকে তবে তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গ হয়ে যাবে হিন্দু-শূন্য ও পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম। সেইজন্য দুই বাংলা কোনোদিনই আবার এক হতে পারবে না। এক হওয়ার অর্থ হচ্ছে হিন্দু মুসলমান এক রাষ্ট্রে থাকা। যাঁরা দেশ ভাগ ও প্রদেশ ভাগ চেয়েছিলেন তাঁরাও কল্পনা করতে পারেননি, হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মুখ দেখবে না। কাজেই এটা একটা অপূর্ব সুপরিকল্পিত ব্যাপার। এটাকে বাধা দিতে আমি সরকারি কর্মচারী হিসাবে যথাসাধ্য করি, লেখক হিসাবে এখনও করে আসছি। দেশবাসী এখনও পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ হয়নি। এখন তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাস আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, সুরঞ্জন নিরুপায় হয়ে বাংলা দেশকে ত্যাগ করতে চায়, সুরঞ্জন এপারে এলে তার পরিবর্তে একজন মুসলমানও এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। একই মৌলবাদী-শক্তি দুই পারেই কাজ করছে দুই স্বতন্ত্র পরিচয়ে। একটি মুসলমান মৌলবাদ, অপরটি হিন্দু মৌলবাদ। দুই পারে বুদ্ধিজীবীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে দর্শন করছেন।

এই পরিস্থিতিতে আমার কর্তব্য সেতুবন্ধনের জন্য সক্রিয় হওয়া। দেশ যে আবার জুড়ে যাবে সেটা সুদূর পরাহত। তিন বৎসরে তো নয়ই, একশ বৎসরেও নয় বোধহয়। কিন্তু বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য বাংলা সংগীত বাংলার কারুকার্য এক কথায় বাংলার সংস্কৃতি পরস্পরের দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে, নয়ত

আদানপ্রদানের অভাবে দিনকে দিন দরিদ্র হতে পারে। আদানপ্রদান যাতে সুগম হয় তার জন্য পাশপোর্ট ও ভিসা সহজলভ্য হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংস্কৃতি কর্মীদের কাছেও ডলার আশা করা হচ্ছে। ডলার পাবে কোথায়? তাও শুনেছি একদিন থাকতে হলে দশ ডলার নিয়ে যেতে হবে কিংবা নিয়ে আসতে হবে। ইয়োরোপের দেশগুলিতে আজকাল পাসপোর্টও লাগে না, ভিসাও লাগে না, ডলারও নিয়ে যাওয়ার নিয়ে আসার দরকার হয় না। ভারত বাংলাদেশের এইসব সমস্যা হচ্ছে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের অন্তহীন বিবাদের ফল। পাকিস্তান আমলে সেদেশে হিন্দুদের সম্পত্তি হয়েছিল শত্রুসম্পত্তি বলে গণ্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার তেইশ বৎসর পরেও সেই সম্পত্তি আজও শত্রু সম্পত্তি। তার পাল্টা দিতে গিয়ে ভারতও মুসলিম সম্পত্তিকে শত্রুসম্পত্তি গণ্য করেছে। সেটা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বৎসর চার পরে। তখন মুজিবর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

এই যেমন এক পক্ষের আক্ষেপ, তেমনই অপর পক্ষের আক্ষেপ হচ্ছে, ফরাক্কায় বাঁধ নির্মাণের পর থেকে বাংলাদেশের চারটি জেলা পদ্মার পানির অভাবে মরু-ভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। এই অভিযোগ অমূলক নয়। এমন যে হতে পারে তা আমি মুর্শিদাবাদ জেলা-শাসক থাকার সময় ১৯৪৮ সালে ফরাক্কা পরিদর্শনের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রকারান্তরে জানিয়েছিলুম। ভাগীরথী নদীকে বহতা রাখার জন্য যেটুকু জলের দরকার, সেইটুকুর জন্য যা করবার দরকার হয় তাই করতে পারেন, কিন্তু দার্জিলিং আর অসম যাওয়ার জন্য নতুন রেলপথ নির্মাণ করতে হবে, তার জন্য বাঁধ দিতে হবে—এইটা কি না করলেই নয়? কিন্তু কে শোনে কার কথা! পূর্ব পাকিস্তান দার্জিলিং ও অসম যাওয়ার পুরাতন পথ ব্যবহার করতে না দেওয়ার ফলে নতুন পথ তৈরি করতে হল। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের কোনও লাভ হল না। সেই পুরাতন পথে যথেষ্ট যাত্রী হয় না। এখনও বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে রেলপথে দার্জিলিং বা অসম যাতায়াত করা চলে না। কাজেই আমরা ভারত সরকারকে বলতে পারিনে যে এক তরফা ভাবে ফরাক্কা সমস্যা সমাধান করুন। বাংলাদেশ সরকারকেও সেই সঙ্গে বলা উচিত, সে দেশের রেলপথ দিয়ে এদেশের যাত্রীদের চলাচল বাধামুক্ত করুন। আর শত্রুসম্পত্তি সম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনা করা উচিত। ভারত ও বাংলাদেশ কেউ কারও শত্রু নয়। শুনেছি বাংলাদেশে শত্রুসম্পত্তি নামটাকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু শত্রুসম্পত্তি নাম পাল্টাবার পরেও দেখা যাবে জিনিসটা একই। সুতরাং নাম

পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়। চিত্ত পরিবর্তনও চাই। আমরা এক রাষ্ট্র না হতে পারি, কিন্তু এক গোষ্ঠী হতে পারি। যেমন ইয়োরোপে ফ্রান্স জার্মানি আর ইংলণ্ড হতে যাচ্ছে, যদিও তারা ছিল বহু শতক ধরে পরস্পরের শত্রু।

একটা শুভ লক্ষণ হচ্ছে এই যে ভারত বাংলাদেশে পাকিস্তান নেপাল ভূটান শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ মিলে একটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠী গঠন করতে যাচ্ছে। তার থেকে আসবে সংস্কৃতির আদান–প্রদান।

বৈচিত্র্যকে মেনে নিতে তার মধ্যে ঐক্যের অন্বেষণ করতে হবে। ঐক্য বলতে ইউনিফর্মিটি বোঝায় না। আমরা কখনও আশা করতে পারিনে এই সাতটি দেশের জনগণ একটি ভাষায় কথা বলবে বা লেখাপড়া করবে বা সংসদে গিয়ে তর্কবিতর্কে যোগ দেবে। সুতরাং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। একাধিক ভাষা শিক্ষায়ও উৎসাহ দিতে হবে। যাঁরা ঐক্যের উপরে জোর দেন তাঁরা বৈচিত্র্যকে খাটো করে দেখেন। সেটা একটি ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু বৃহৎ দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি শ্রীলঙ্কার মত একটি ক্ষুদ্র দেশেও সম্ভব হচ্ছে না। তাই সেখানে অন্তহীন গৃহযুদ্ধ চলেছে। সিংহলী ও তামিল উভয় ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে। যেমন বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মকে। এরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নিয়ামক নয়।

আজ মহাত্মা লালন ফকিরের তিরোধান দিবস। সীমান্তের উভয় প্রান্তেই লালনগীতির অনুষ্ঠান হচ্ছে। এটাও এক প্রকার সেতুবন্ধন। এবং আরও গভীর স্তরে সেতুবন্ধন।

প্রসঙ্গ : অন্নদাশঙ্কর রায়

কবীর চৌধুরী

বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয় লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়। বস্তুতপক্ষে জীবিত লেখকদের মধ্যে তিনিই আমার সব চাইতে প্রিয়। তাঁর রচনা আমাকে আকর্ষণ করতে শুরু করে অর্ধশতাব্দীরও আগে থেকে। তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। 'পথে প্রবাসে' পড়ে মুগ্ধ হই। ভ্রমণকাহিনী এত সুন্দর হয়! অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে যখন ব্যক্তিগত পরিচয় হয়, প্রথম বারের মত, তখনো আমি কিশোর ছাত্র। তাঁকে ঠিক পরিচয় বলা যাবে না। এক কৌতূহলী কিশোর কুমিল্লায় তাঁর সরকারী বাসভবনে গিয়েছিল তাঁকে এক নজর দেখতে, শ্রদ্ধা ভক্তি জানাতে। তিনি তখন কুমিল্লায় জেলা জজ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ভারী সুপুরুষ। তীক্ষ্ণ নাকচোখমুখ, উজ্জ্বল দৃষ্টি। আদর করে বসিয়েছিলেন, গল্প করেছিলেন। তাঁর বিদেশিনী মার্কিন স্ত্রী শাড়ি পরা লীলা রায়কেও দেখি। লীলা রায়ের চমৎকার বাংলা শুনে বিস্মিত হই।

পরে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। একবার দেখা হয়েছে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে, টাঙ্গাইলে। আমি টাঙ্গাইলে সরকারী চাকুরী করি। অন্নদাশঙ্কর ময়মনসিংহের জেলা জজ। তিনি টাঙ্গাইলে একটা কাজে এসেছেন। তাঁর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটা ঘরোয়া সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। সে সভাতে আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই যোগ দিয়েছিলাম। লীলা রায় স্বামীর সঙ্গে সেবার আসেন নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে তিনি যখন ঢাকায় আসেন তখন বাংলা ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনার সুযোগ ঘটে। এরপর কয়েকবারই কলকাতায় তাঁর আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউ-র ফ্লাটে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, এবং প্রতিবারই তাঁর উদার মানবিকতা, সকল রকম কুসংস্কার, যুক্তিহীনতা, একগুঁয়েমি, জুলুমজবরদস্তি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় দৃঢ় অবস্থান দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

একবার যখন যাই তখন দেখি যে দাউদ হায়দার তাঁর বাড়িতে বাস করছে। দৌহিত্রের মত, রায়-দম্পতির স্নেহ-ভালবাসায় স্নাত হয়ে। বাংলাদেশের মৌলবাদীদের রোষানলে পড়ে, তার কবিতার একটি পংক্তির জন্য, দাউদ তখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত। আরেকবার যখন অন্নদাশঙ্করের বাড়িতে যাই তখন সঙ্গে ছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং দর্শক ও সময়ানুগ পত্রিকার সম্পাদক দেবকুমার বসু। ১৯৮৬ সালের শেষ দিকে একবার গিয়েছিলাম। তখন অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। লীলা রায়ও তাঁর অনুবাদ করা একটি বই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। অশোকবিজয় রাহার কবিতা, বাংলা থেকে লীলা রায়ের ইংরেজি অনুবাদ। বই-র প্রথম পাতায় লিখে দিয়েছিলেনঃ 'টু এ্যান এসটীমড ফ্রেন্ডকবীর চৌধুরী এ্যান্ড ফেলোট্রান্সলেটর উইথ দি কমপ্লিমেন্টস অব দি ট্রান্সলেটর লীলা রায়।' তিনি আজ আর নেই, কিন্তু আমি তাঁকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাই, এবং ওই বই আমার জন্য একটি বিশেষ স্মৃতি হয়ে আছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়কে আরেকবার দেখি ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে। দেখা করার জন্য তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। তখন তাঁর বয়স নব্বইর কাছাকাছি। খুব আস্তে হাঁটেন। বয়সের ভার এবং চারপাশের ক্লেদ ও সহিংসতার দুঃসহ ভার তাঁর উজ্জ্বলতা কিছুটা মলিন করেছে, কিন্তু তখনো তিনি প্রবলভাবে জীবনবাদী, হতাশার কাছে আত্মসমর্পণে গররাজি। তিনি আস্তে হেঁটে বই এর তাকের কাছে গেলেন, একটি বই বার করে আনলেন, তারপর আবার আস্তে আস্তে নিজের আসনে বসে ঈষৎ কাঁপা হাতে লিখলেন, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী শ্রদ্ধাস্পদেষু, অন্নদাশঙ্কর রায়, ১৩/১১/৯২। বইটি তাঁর লেখা "যুক্তবঙ্গের স্মৃতি"। সস্নেহে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে সালাম করলাম।

১৯৯৪ সালের নভেম্বরে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে শেষ দেখা হবার দু'বছর পরে, আবার পশ্চিমবঙ্গে যাবার একটা কথা আছে। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের উপর এক সেমিনারে যোগদানের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবো। তখন ঢাকা ফিরে আসবার আগে কলকাতায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাসায় একবার যাবার ইচ্ছা আছে। তিনি নব্বই বছর পূর্ণ করেছেন। ইচ্ছে ছিল সে উপলক্ষে ঢাকায় আমরা একটা কিছু করব। নানা কারণে তা করে উঠতে পারি নি। সে জন্য নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হয়ে আছি।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিভিন্ন ধরণের লেখা বিভিন্ন কারণে আমাকে আলোড়িত করে। কৈশোরে পড়া তাঁর 'পথে প্রবাসে' আলোড়িত করেছিল ভাষার লালিত্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির সজীবতার জন্য। প্রথম যৌবনে 'আগুন নিয়ে খেলা'য় পাই আরেক ধরনের চমক। পটভূমি, পাত্রপাত্রী, তাদের সংলাপ, প্রেমের আঙিনায় শরীর আর মনের লুকোচুরির খেলা সব মিলে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাসে ঠিক এই স্বাদ মেলে না, যদিও কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরাও কম দুঃসাহসী ছিলেন না। অন্নদাশঙ্কর আরেক চমকে উপহার দেন তাঁর বিশাল ছয়খণ্ডে সমাপ্ত মহাকাব্যিক উপন্যাস 'সত্যাসত্য'-এ। লেখক এই উপন্যাসমালায় স্বদেশ ও বিদেশের মাটিতে অনেক চরিত্র নিয়ে ঘটনাবহুল কাহিনী উপস্থিত করার উপর বিশেষ জোর দেন নি, বরং জীবনের দ্বান্দ্বিকতা ও রূঢ় সত্যগুলি তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত 'সত্যাসত্য' তার গভীরতা ও ব্যাপকতা নিয়ে বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাস সাহিত্যে নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু বিশ্বের চিরায়ত এপিক উপন্যাসের স্তর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি।

কথাসাহিত্যের অঙ্গনে আমি বরং তৃপ্তি ও আনন্দ পাই অন্নদাশঙ্করের ছোট-গল্পে, যার কয়েকটিকে আবার দীর্ঘ ছোট গল্প ও লঙ শর্ট স্টোরি নামেও আখ্যায়িত করা যায়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের গল্পে পাঠককে আকর্ষণ করে লেখকের রুচিশীল মেদহীন ভাষা, প্লটের বৈচিত্র ও চমৎকারিত্ব, নাগরিক শ্লেষ এবং সূক্ষ্ম পরিশীলিত ব্যঙ্গের দ্যুতি। তাঁর ভাষা ও গল্প বলার ঢং প্রমথ চৌধুরীকে মনে করিয়ে দেয়, তবে আমার বিবেচনায় অন্নদাশঙ্কর রায় বীরবলের একান্ত বৈঠকী ঢং-এর বাইরে আরেকটু ভিন্ন ধরণের আমেজ আনতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে সচেতন ভাবে এবং তাতে তিনি সাফল্যও অর্জন করেছেন।

তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যুক্তিবদ্ধ রচনা-বলী আমাদের উপহার দিয়েছেন। কিছু কিছু স্মৃতিচারণমূলক লেখায়ও তিনি এ বিষয়গুলি নিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, গান্ধী জিন্নাহ ফজলুল হক সুহরাওয়ার্দি নাজিমুদ্দীন প্রমুখের প্রসঙ্গ, ভারত-বিভাগ ও পাকিস্তানের সৃষ্টি, কলকাতা লাহোর বিহারের দাঙ্গা, মহাত্মাজীর শান্তি-মিশন প্রভৃতি বিষয়ও স্থান পেয়েছে। সর্বত্রই লক্ষনীয় লেখকের ধর্মনিরপেক্ষ

উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি' গ্রন্থের বহু জায়গায় এর পরিচয় উজ্জ্বল।

তবে ব্যক্তিগত ভাবে 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি' গ্রন্থটি আমাকে আনন্দিত করে অন্য কারণে। এই গ্রন্থে লেখক অবিভক্ত পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের যে সব বিভিন্ন জায়গায় তিনি চাকুরী করেছেন তার কথা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আমার সাতাশ বছর বয়স থেকে ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হয়েছি। ওটাই ছিল আমার জীবনের সব চেয়ে সৃষ্টিশীল কাল। তার সঙ্গে যোগ করতে পারি ময়মনসিংহ-এর দেড় বছর। অকপটে বলতে পারি আমার জীবনের ও যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি কেটেছে পূর্ববঙ্গে।"

অন্নদাশঙ্কর রায় পূর্ববঙ্গে চাকুরী করেছেন রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিং-এ। এসব জায়গায় আমিও চাকুরী করেছি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে। কুমিল্লায় অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমার দেখা হয় খুব সম্ভব ১৯৩৯-এর শেষ দিকে, আমি তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠি নি, খুব সাহস করে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম, কথা বলেছিলাম। কুমিল্লাতে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে পরিচয় হয় 'সংস্কৃতি কথার' লেখক মোতাহার হোসেন চৌধুরীর। এক কালের আই সি এস অফিসার, খাকসার কর্মী, এবং পরবর্তীকালে কুমিল্লা সমবায় প্রকল্পের নির্মাতা-রূপে প্রসিদ্ধ আখতার হামিদ খানের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে কুমিল্লাতে। চট্টগ্রামে তিনি পরিচিত হন জাকির হোসেন, ফজলে করিম ও আলী আসগরের সঙ্গে। আমার সরকারী চাকুরী জীবনে আমি ১৯৫৫-৫৬ সালে ফজলে করিমকে পাই ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রূপে আর জাকির হোসেন ও আলী আসগরকে পাই পাকিস্তান আমলে পূর্বপাকিস্তানের পুলিশের ইংসপেক্টর জেনারেল ও চীফ সেক্রেটারি রূপে। আখতার হামিদ খানের সঙ্গেও আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে ১৯৪৮ সালে। পরে পঞ্চাশের দশকেও তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা ও আলাপ হয়।

চট্টগ্রামে অন্নদাশঙ্করের পরিচয় হয় আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 'মোমিনের জবানবন্দী'র লেখক মাহবুবুল আলম, আশুতোষ চৌধুরী, আবুল ফজল, মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, ব্যারিস্টার আনোয়ারউল আজম প্রমুখের সঙ্গে। 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি' গ্রন্থে লেখক মাঝে মাঝে নানা সরস প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। জাকির হোসেন-গৃহিণীর যে নিজের কন্যাকে সুদর্শন তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলী আসগরের সঙ্গে বিবাহ দেবার সাধ ছিল সে তথ্য আমার জানা ছিল না।

অন্নদাশঙ্করের নিজের বর্ণনায় শুনুন : "আসগর পাঞ্জাবের ছেলে। গৌরবর্ণ. সুপুরুষ, চেহারা দেখলে মনে হয় গ্রীক বংশধর। আর জাকির হোসেনের জন্মস্থান রাঙ্গুনিয়া থানা। চেহারায় মঙ্গোলীয় ধাঁচ। কৃষ্ণবর্ণ বাঙালি। কিন্তু হলে কী হয়, মুসলমান তো। সব মুসলমান এক জাতি। মিসেস হোসেন তাই স্বপ্ন দেখেন যে আসগর বিয়েতে রাজী হবেন। আসগর মাথা খাটিয়ে এর একটি চমৎকার যুক্তি খাড়া করেন, "আমাদের ও দিকে জাতি গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে সাদী হয় না। গুরুজনরা ঠিক করে দেন। আমার হাত নেই'।"

প্রসঙ্গত বলে নিই, আমি যখন প্রথম আলী আসগরকে দেখি, সম্ভবত ১৯৪৪ সালে, তখন আমিও তাঁর মুখ ও দেহশ্রী লক্ষ্য না করে পারি নি। আমি বাবার সঙ্গে যাচ্ছিলাম জলপাইগুড়িতে, পাবনা থেকে। জলপাইগুড়িতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-দের বিভাগীয় সম্মেলন হবে বিভাগীয় কমিশনারের আমন্ত্রণে। বাবা ছিলেন পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। মাঝ পথে বগুড়া থেকে উঠেছিলেন বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলী আসগর। বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে জলপাইগুড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য একটা কাজে। কিন্তু এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক।

চট্টগ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অন্নদাশঙ্কর রায়কে মুগ্ধ করেছিল। "চট্টগ্রামের মতো সুন্দর নিসর্গ কি বাংলার আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়? পাহাড় আর নদী আর সমুদ্র কি আর কোথাও মেলবন্ধন করেছে? সার্কিট হাউস থেকে আমি প্রায় রোজ হেঁটে আদালতে যাই। যে পথ দিয়ে যাই সে পথ গেছে রেলওয়ে অফিসারদের উপনিবেশ দিয়ে। বিদেশী গাছপালার ও ফুলের কী বাহার। মনে হয় ইউরোপের কোন অঞ্চল।"

চট্টগ্রামের কথা বলতে গিয়ে পাঠককে একটা খুব মজার কাহিনী উপহার দিয়েছেন লেখক। সময়টা সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা সংঘটিত বেশ কয়েকটি সহিংসতার ঘটনার পরবর্তী কাল। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক পিস্তলধারী দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্রীরায় লিখেছেন, "শেষের দিকে এমন হয়েছিল যে নদীতে স্নান করতে বা সাঁতার কাটতে হলেও সঙ্গে যেত রিভলবারধারী গার্ড। তার কর্তব্য আমাকে পাহারা দেওয়া। বিলেতে নগ্ন স্নান করেছি। পুরুষদের সঙ্গে পুরুষদের মতো। তা বলে দেশেও কি ওটা চলে? কিন্তু একবার একটা মওকা জুটে যায়। নওগাঁ মহকুমায় এক ডাকবাংলোর অদূরেই নদী। ভোর বেলা বেরিয়ে পড়ি ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে। গোপীদের অনুকরণ করব। বেশীক্ষণের জন্যে নয়, মিনিট পাঁচেকের

মতো। তা আমার গার্ড কি আমাকে সেটুকু সময়ের জন্যও চোখের আড়াল করবে? ফাঁকা মাঠ, সন্ত্রাসবাদীদের নামগন্ধ নেই। কে একটি বুড়ো পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছিল। জল এতই কম। লোকটি যেই অদৃশ্য হয় আমিও যমুনার জলে ঝাঁপ দিই। তখন যদি কেউ আমার বস্ত্রহরণ করত তা হলে গার্ড তাকে আস্ত রাখতো না। কিন্তু গার্ড-এর কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে আমাকে রক্ষা করত কে? তাই তো তাকে একটা অছিলায় একটু দূরে হটাতে হল। কাজটা বেআইনি। কারণ সেই ফাঁকে হঠাৎ কেউ এসে গুলী করতেও পারতো। ক্ষণ-কালের জন্য হলেও আমি দিগম্বর জৈন প্রথায় স্নানও করি, সাঁতারও কাটি। গার্ড যখন হাজির হয় আমি ততক্ষণে শ্বেতাম্বর জৈন।"

যুক্তবঙ্গের স্মৃতিতে অন্নদাশঙ্কর তাঁর ঢাকা জীবনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তাও আকর্ষণীয়। যাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাহমুদ হাসান, সর্বানীসহায় গুহ ঠাকুরতা, মাহমুদ হোসেন, প্রফুল্লকুমার গুহ, সুশীল কুমার দে, মোহাম্মদ শাহীদুল্লাহ, মোহিতলাল মজুমদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। আমার বয়সী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এঁদের চেনেন, এঁদের অনেকেই তাঁদের প্রত্যক্ষ শিক্ষক। আমি মাহমুদ হাসানকে পেয়েছি ইংরেজি বিভাগের প্রধান এবং পরে উপাচার্য হিসেবে। যখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে ঢুকি তখন উপাচার্য হিসাবে পাই রমেশচন্দ্র মজুমদারকে। পরে মাহমুদ হোসেনকেও উপাচার্য হিসেবে দেখি। যেমন পন্ডিত তেমনি সজ্জন। ভারতের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও পরে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের ভাই। বাংলা আমার বিষয় না হলেও দু'একদিন মোহিতলাল মজুমদারের ক্লাসে বসেছি। আর প্রফুল্লকুমার গুহের কাছে তো সরাসরি পড়েছি। তিনি শেক্সপিয়ার পড়াতেন, প্রায়ই নাটকের সংলাপ উচ্চারণের মত করে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বইতে এঁদের প্রসঙ্গ আমার মনে একটা ভিন্ন ধরণের অনুরণন তোলে, সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা নেই, কিন্তু তবুও ব্যক্তিগত ভালোলাগার কথাটা অনুক্ত বা রাখি কেন।

তাঁর ঢাকাবাস-প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর একটি ঘরোয়া সাহিত্য গোষ্ঠির কথা বলেছেন। "বারোজনা" তাঁরই নাম দেওয়া। সদস্য বারো জনের প্রায় সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। "বারোজনা"র কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। বারো জনের বেশী কেন সদস্য করা হবে না এ নিয়ে কারো

কারো চিত্তে ক্ষোভ জমে। শ্রী রায় লিখেছেন ঃ "কিন্তু ঐ যে আমাদের নিয়ম। বারোজনের বেশী নেওয়া হবে না। তবে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতে পারেন যাঁরা চান বা যাঁদের আমরা চাই। এতে মনোমালিন্য বাড়ে বই কমে না। এমনিতেই অধ্যাপকে অধ্যাপকে আদায় কাঁচকলা। তার উপর এক নতুন উপলক্ষ। এছাড়া আরেক উপদ্রব আমাদের একজন সদস্যের অবিবেচনা। তিনি আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে কথা বলবেন, যদিও আমি সে দিনকার বক্তা ও আমার বক্তব্য অসমাপ্ত।"

আরেকটি সাহিত্য সভার কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে ওইসভার সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ শাহীদুল্লাহ। অন্নদাশঙ্কর রায় একজন বক্তা। তাঁর ভাষাতেই শুনুন ঃ "সভাটা এমন এক বেয়াড়া সময় যে টেনিস খেলে এসে আমি কাপড় ছাড়ার সময় পাই নে। এক পেয়ালা চা খাওয়া তো দূরের কথা। যদি জানতুম যে আমার পালা আসবে সব শেষে তাহলে ধীরেসুস্থে যেতুম। সভাপতিকে যতই বলি, 'আমাকে ছেড়ে দিন,' তিনি ততই আমাকে আটকান। বলেন, 'আপনাকে এখন ছেড়ে দিলে সভায় আর কেউ থাকবে না। আপনি আমার হাতের পাঁচ'।' যেমন হয়ে থাকে। সভা চলে অনন্তকাল ধরে।"

সেদিনের পূর্ববঙ্গ, যা আজকের বাংলাদেশ, তার অঞ্চল ও মানুষের প্রতি অন্নদাশঙ্কর রায়ের যে একটা আন্তরিক মমত্ববোধ ছিল ও আছে—সে পরিচয় শুধু তাঁর স্মৃতিচারণমূলক রচনায় নয়, তাঁর একাধিক ছোট গল্পের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। ১৯৪৭-এ ও উপমহাদেশের বিভক্তি, বিশেষ ভাবে বাংলার বিভক্তি, তাঁকে গভীর পীড়া দিয়েছিল। স্বতন্ত্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মৌল অবিভাজ্য চরিত্র সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবিচল বিশ্বাসী। দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট যন্ত্রণা ও তার সঙ্গে ব্যঙ্গমাখা তাঁর সেই বিখ্যাত ছড়াটির কথা কে না জানে, যার প্রথম ও শেষ স্তবক দুটি হল নিম্নরূপ।

প্রথম স্তবক ঃ

"তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা ?"

আর শেষ স্তবক ঃ

"তেলের শিশির ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো,
তার বেলা ?"

হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যলালিত বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অন্নদাশঙ্করের গভীর অনুরাগ নজরুলকে নিয়ে রচিত একটি ছড়ায় উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। ছড়ার নাম 'নজরুল'। তিনি লিখেছেন ঃ

"ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক
বাঙালি বলতে একজন আছে
দুর্গতি তার ঘুচে যাক।"

১৯৭৬ সালে আগস্ট মাসের শেষ দিকে ঢাকায় নজরুলের মৃত্যুর পর কিছু ঘটনা এবং নজরুলকে একান্তভাবে বাংলাদেশের কবি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কবি রূপে তুলে ধরবার চেষ্টা অন্নদাশঙ্কর রায়কে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আমরা সেই ক্ষোভেরই প্রকাশ দেখি নজরুলকে নিয়ে রচিত তাঁর আরেকটি ছড়ায় ঃ

"কেউ ভাবল না ইতিহাসে ফের
ভুল হয়ে গেল বিলকুল
এত কাল পরে ধর্মের নামে
ভাগ হয়ে গেল নজরুল।"

অবশ্য নজরুল ভাগ হন নি। কিছু ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের কাছে নজরুল বাংলা ভাষার মহৎ বাঙালি কবি রূপেই বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন।

বাংলাদেশের নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অন্নদাশঙ্কর রায় হৃদয়গ্রাহী ছড়া রচনা করেছেন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করে তিনি রচনা করেছেন তাঁর 'একুশে ফেব্রুয়ারী' শীর্ষক ছড়াটি ঃ

"গুলির মুখে দাঁড়ায় রুখে
অকাতরে হারায় জান
রক্তে রাঙা মাটির 'পরে
ওড়ে ওদের জয় নিশান।"

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিণতিতে যে পাকিস্তানী সমর নায়কদের পরাজয় ঘটবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে অন্নদাশঙ্কর একটি ছড়া রচনা করেছিলেন ঃ

"কপাল কী আছে লেখা জানে সবজানতা
বাংলায় হারবেই মিলিটারি জানটা।
জাঁদরেল বাঁদরেল ছয় জন জাঁদরেল
বাংলা বিষম ফাঁদ সেখানে ফুরাবে খেল।"

বাঙালি জাতির সংগ্রামী ঐতিহ্যের জয়গান গেয়েছেন তিনি সোনার অক্ষরে লেখা ছড়াটিতে ঃ

"ইতিহাসের কালি মুছে সোনার রঙে রাঙালি
বাঙালি।"

তবে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কে সব চাইতে বেশি আলোড়িত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা তাঁর অনবদ্য ছড়াটি যা সবার জানা ঃ

"যত দিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।"

১৯৮৫ সালে তাঁর অশীতিপূর্তি উপলক্ষে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ৩রা মার্চ তারিখে অন্নদাশঙ্কর রায় নিজের সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমার এই অগোছালো লেখা গুটিয়ে আনবো। তিনি বলেছিলেন ঃ "আমার মধ্যে অনেক গুলি ব্যক্তি এক সঙ্গে বাস করছে। তাদের একজন হচ্ছে আর্টিস্ট বা কবি-কথাসাহিত্যিক। আরেকজন হচ্ছে

ভাবুক। আরো একজন আছে সে হচ্ছে ধ্যানী বা স্বপ্নদ্রষ্টা বা মিস্টিক। আরো একজন আছে সে হচ্ছে রসিক বা প্রেমিক। সে মানুষকে ভালোবাসে, মানুষের ভিতর দিয়ে ভগবানকে। আরো একজন আছে যে সৌন্দর্যের পশ্চাদ্ধাবন করছে তাকে ধরতে পারছে না। আরো একজন আছে যে ন্যায় অন্যায় তৌল করে। আরো একজন আছে যে বিভিন্ন পাবলিক ইস্যুতে লেখনীক্ষেপ করেছে। জনপ্রিয়তার দিকে তাকায় নি।"

আরো কয়েকটি কথা বলার পর তিনি সব শেষে বলেছিলেন :

"আয়ুষ্কালকে অযথা প্রলম্বিত করে কী হবে? আমি বিশ্বাস করি যে মানব জীবনই শেষ জীবন নয়, এই অনাদি অনন্ত জগতে কত কী দেখবার আছে, দেখতে হবে। করবার আছে করতে হবে। হবার আছে হতে হবে। এই জীবনটা পুরোপুরি নিখুঁত না হলেও নিতান্ত অসার্থক বা অচরিতার্থ না হলেই আমি তুষ্ট। নামটা মুছে গেলেও খেদ থাকবে না। এখনো কিছু দেবার আছে। দিয়ে যেতে পারলেই আমি ধন্য।"

এ-উচ্চারণের পর দশ বছর কেটে গেছে। তিনি এই সময় নিষ্ক্রিয় থাকেন নি, বেশ কিছু দিয়েছেন, এখনো দিয়ে চলেছেন। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে জোরালো মন্তব্য রেখেছেন, রাখছেন। ভাবুক, মিস্টিক, রসিক, সৌন্দর্যপিপাসু, বিবেকবান, বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় আমাদের মধ্যে রয়েছেন এ আমাদের জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি আরো অনেক দিন আমাদের মধ্যে থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, —কায়মনোবাক্যে এই কামনা করি।

একজন জার্মান লেখক : অন্য চোখে তৃতীয় বিশ্ব

রত্না বসু

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জার্মান লেখক হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ (Hans Christoph Buch) বলেন, 'আসলে তিনি হচ্ছেন একজন ভব-ঘুরে, আর হ্যাঁ বুদ্ধিজীবী ; স্বাদেশিকার সংকীর্ণতা তাঁর নেই, পৃথিবীর সব দেশ ও তার মানুষকেই আপন মনে হয় তাঁর।' স্বদেশ বিদেশের সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্-এর মুখে একথা অবশ্যই মানিয়ে যায়।

জার্মানির হেসেন্-প্রদেশে তাঁর জন্ম ১৯৪৪ সালের ১৩ই এপ্রিল। সে-সময়ে তাঁর বাবা ছিলেন রোয়খ্লিং-শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অছি। যুদ্ধশেষে তাঁর বাবা হেসেন্-এর স্বরাষ্ট্র দপ্তরে মন্ত্রীপদে যোগ দেন। এর আগে কিছুদিন ভেৎসলার-এ মেয়রও হয়েছিলেন তিনি। কিছুদিন মন্ত্রী থাকার পর তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির পররাষ্ট্র দপ্তরেও দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন তাঁর বাবা। তখন তাঁর কর্মস্থল তৎকালীন রাজধানী বন্। তাই হান্সের ছেলেবেলার স্কুলশিক্ষা ভেৎস্লার্-এ হলেও বন্-এর 'বেঠোফেন্ গিম্নাসিউম' থেকে উচ্চতর স্কুল শিক্ষার সমাপন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের লেখাপড়া শুরু ১৯৬৩ সালে। বন্-বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ও রুশ সাহিত্য নিয়ে মাত্র ছ-মাস পড়ায় পরে হান্স্ ক্রিস্টফ্ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। গল্প বা আখ্যান-সাহিত্যে গবেষণা-নিবন্ধ শেষ করে তার জন্যে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন ১৯৭২ সালে।

স্কুল ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার সময় থেকেই হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ বিভিন্ন সাহিত্য-সভা ও সম্মেলনে যোগ দিতে থাকেন, আর দেশের বাইরে পা বাড়ানোর শুরুও তখন থেকেই। ১৯৬৩তে সাউল-গাউ-সাহিত্যসভায় যোগ দিলেন, সেই শুরু ; তার পরের বছরই, ১৯৬৩-তে বার্লিনের সাহিত্যসভা ; তখন তিনি সবে প্রথম বর্ষের ছাত্র, আলাপ হল পেটার বিখ্সেল, হুবার্ট ফিখ্টে, পেটার রুমকর্ফ, এর্ন্স্ট্ ব্লখ্, হান্স্ মাগ্নুস এন্ৎসেন্স্বের্গার প্রমুখ বিশিষ্ট জার্মান কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে। (এঁদের মধ্যে পেটার বিখ্সেল্ সুইৎ-

সারল্যান্ডের নাগরিক।. ১৯৬৪-তে সুইডেনের একটি সাহিত্য সম্মেলনে অংশ নেবার দু-বছর পরে ১৯৬৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন, নিউ জার্সিতে সাহিত্যসভায় যোগ দেওয়া - বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৭-৬৮-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি নিয়ে হান্স্ ক্রিস্টফ্ সেখানকার এক 'লেখক-কর্মশিবির'-এ যোগ দিয়েছিলেন ; এশিয়ার লেখকদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত এখান থেকেই ; এখানেই অন্যান্য এশীয় লেখকদের সঙ্গে বাঙালী কবি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল। দিনপঞ্জীর শৈলীতে লেখা রম্যরচনা "Der Herbst des grossen Kommunikators" 'মহান্ সংযোগসাধকের শরৎঋতু'-তে হান্স্ ক্রিস্টফ্ এবিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন।

ভব-ঘুরে হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশের লেখক-সংঘের আমন্ত্রণে বিদেশে গিয়েছেন। যে-সব দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ঘটেছে তার মধ্যে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন (তিনবার), ব্রাজিল, বিশেষ করে রিও-ডি-জানেইরো, কারাকাস, কানাডার টোরোন্টো ; ১৯৮৫ সালে চীন, তার আগেই ১৯৮৪ সালে সান্ডিনিস্ট্ সরকারের আমন্ত্রণে নিকারাগুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে। জার্মানির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারকেন্দ্র গ্যোটে ইন্স্টিটিউট্ তাঁকে একাধিকবার বৃত্তি দিয়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছে—তার মধ্যে আছে সেনেগাল, আইভরি কোস্ট্, ঘানা, টোগো, নাইজিরিয়া, জাইর, ক্যামেরুন্।

দেশভ্রমণ করে এসে সাধারণ ইউরোপীয় বা জার্মান লেখকের মতো হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ কোনো মামুলি ভ্রমণকাহিনী লেখেন নি। কোনো অদ্ভুত ভয়ালো রোমাঞ্চের এড্ভেঞ্চার-কাহিনী, আলো-আঁধারি স্বপ্নাদির বিবরণ-পঞ্জীও লিখতে বসেন নি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশের প্রাকৃতিক ও মানব-সম্পদকে নিয়ে। এবং ঠিক উল্টো। ঐ ধরণের কথাশিল্প রচনা করে নিজের দেশের মানুষকে ভিন্-দেশের মানুষ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখার তিনি কঠোর সমালোচক। তাঁর বক্তব্য, এতে নিজেদের অজ্ঞতার অন্ধকার তো থাকেই, তার ওপর নিজেদের মূর্খতার কারণে ভিন্‌দেশের মানুষ ও তার পরিবেশ বা সংস্কৃতির অবমূল্যায়ণ ও অবমাননা করা হয়। এসব কথা কখনও অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিশ্লেষণাত্মক রচনার মধ্যে তিনি ব্যক্ত করেছেন, কখনও বা তীক্ষ্ম বিদ্রূপের সঙ্গে নানা সাক্ষাৎকারের অবকাশে। এধরণের কিছু নমুনা এই আলোচনার শেষাংশে নিবেদিত হবে।

যে মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনার তাগিদে হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আঘাত-হানা ১৯৬৮-র ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন, যে মানসিকতা নিয়ে তিনি বারবার ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের প্রতিবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁর লেখকের মতাদর্শগত স্বকীয়তা পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চলে। তাই ছাত্র জীবনের শেষে সেই মানবতাবাদী প্রয়াসে ভাটা পড়েনি কখনও। ১৯৮৭-তে আফ্রিকার ডাকার-এ বর্ণবৈষম্য বিরোধী সম্মেলনে তিনি অকুণ্ঠভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর নানা রচনার মধ্যে তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন, ভিন্-দেশ ও তার মানুষ সম্পর্কে যেমন অমূলক অবজ্ঞা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখা ঠিক নয়, তেমনি কোনো আলগা ওপর-ভাসা স্বপ্নিল রোমান্টিকতাও ঠিক নয়। তিনি নিজে চেষ্টা করেছেন, ইতিহাসের ধারাবাহিকতার মধ্যে বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে কোনো দেশ বা তার সংস্কৃতিকে বুঝতে, তার মানুষের মূল্যায়ন করতে। অন্যথায়, এক সময়ের ভ্রান্ত ধারণা বাস্তবের অভিঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, ইউরোপীয় চিত্ত তখন হতাশার শিকার হয়।

অন্যদিকে এসব কথা তিনি নিছক লঘু স্তরের সাময়িক উত্তেজনার বশে বলেন নি। তাঁর সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধাবলিতে বা অধ্যাপনার অবকাশে তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তা ও দৃষ্টিকে সুচিন্তিত সাহিত্য বিচারের প্রেক্ষিতে ও তাত্ত্বিক আকারেও ধরে রেখেছেন। উল্লেখ্য, হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ শুধু সৃষ্টিশীল লেখক বা প্রাবন্ধিক নন, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনাও করেছেন, বিষয় সাহিত্যতত্ত্ব, এমন কি মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব পর্যন্ত।

লাতিন আমেরিকার অনেক দেশের সঙ্গে পরিচয় হলেও হাইতির সঙ্গে বুখ্-এর পরিচয় একটু স্বতন্ত্র. সেখানে আক্ষরিক অর্থেই তাঁর রক্তের সম্বন্ধ বা নাড়ীর টান রয়েছে। হান্স্ ক্রিস্টফের ঠাকুর্দা ওষুধ-ব্যবসায়ী হিসেবে হাইতি গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি একজন হাইতি দেশীয় মহিলাকে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তৃতীয়-বিশ্বের নানা দেশ নিয়ে বহু সময়ে কাজ করলেও হাইতি-র ব্যাপারে তাঁর দিক থেকে বিশেষ আবেগেরও সংশ্লেষ ঘটেছে। লেখকের বহু রচনা ও গবেষণার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে হাইতি, তার বিচিত্র দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস ও বর্তমান। ১৯৬৮ সালে তাঁর হাইতিতে প্রথম পদার্পণ, তখন দেশটি স্বৈরতন্ত্রী শাসক ড. ফ্রাঁসোয়া ডুভালিয়ের্-এর শাসনাধীন, যিনি পাপাডক্-নামেই বেশি পরিচিত। ১৯৬৮-সালে তিনি আবারও হাইতি-তে

যান। তখন পাপোডক্-এর পুত্র স্বৈরতন্ত্রী শাসক জাঁ ক্লোদ্ ডুভালিয়ের-এর সদ্য পতন ঘটেছে। বলে রাখা ভালো, ইনি বেবি-ডক্-নামেই বেশি খ্যাতি লাভ করেছেন। এ ছাড়াও আরো বহুবার হাইতিতে গিয়েছেন লেখক বুখ্। তৃতীয়-বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর যে-মনোভাব গড়ে উঠেছে, তার অনেকাংশের মূলে রয়েছে নিঃসন্দেহে হাইতি-সম্পর্কে তাঁর নিবিড় অভিজ্ঞতা। রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বা চিন্তাভাবনা এবং সাহিত্যচেতনাকে বুখ্ একই বৃন্তের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। সেইখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

এই প্রসঙ্গে হয়তো তাঁর রচনার পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না, শুধু শিরোনামগুলোও অনেক-সময় লেখকের সমাজ সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দেয়।

১) Die Hochfeet von Port-an-Prince, হোখ্‌ৎসাইট্ ফন্ পোর্ট্-ও-প্র্যাঁস্, 'পোর্ট-ও-প্র্যাঁসে বিবাহ'—এটি উপন্যাস, পটভূমি হাইতি।

২) Die Scheidung von San Domingo? ডি শাইডুং ফন্ সান্ ডোমিংগো,—এটি হাইতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য-বিবরণ।

৩) Kritische Waelder, ক্রিটিশে ভেল্ডার্, 'বিপন্ন বনানী'—এটি প্রবন্ধ সংকলন।

৪) Aus der neuen Welt, আউস্ ডের্ নয়েন্ ভেল্ট্, 'নতুন দুনিয়া থেকে'—সংবাদ ও কাহিনী সংকলন।

৫) Das Heavortreten des Ichs aus den Woertern, ডাস্ হের্‌ফোরট্রেটেন্ ডেস্ ইখ্‌স্ আউস্ ডেন্ ভ্যোর্‌টের্ন্, 'শব্দাবলির মধ্যে অহং-এর আত্মপ্রকাশ'—সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলি।

৬) Bericht aus den inneren Unruhen, বেরিখ্ট্ আউস্ ডেন্ ইনারেন্ উন্‌রুহেন্, 'আন্তর অশান্তির বিবরণ'—দিনপঞ্জী।

৭) Karibische Kaltluft, কারিবিশে কাল্‌ট্‌লুফ্‌ট্, 'ক্যারিবীয় শৈত্যপ্রবাহ,'—রিপোর্টাজ।

৮) Der Herbst des grossen Kommnikators, ডের্ হের্ব্‌স্ট্ ডেস্ গ্রোসেন্ কোমোনিকাটোর্‌স্, 'মহান্ সংযোগসাধকের শরৎ ঋতু'—রম্যরচনা।

৯) Hriti cherle, হাইতি শেরি, 'প্রিয়তমা হাইতি'—উপন্যাস।

১০) Waldspafiergang, ভালড্‌স্পাৎ সিয়েরগাঙ্, Unpolitische Betrachtengen fur Literatur und politik, উন্‌পোলিটিশে-বেট্রাখ্‌টুঙেন্ ৎসুর লিটেরাটুর উন্ড পোলিটিক, 'বনানীতে পদচারণা, সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে অ-রাজনৈতিক বীক্ষণ।

১১) Die Naehc unt die ferne. Bäusteine fu einer Hoetic des Rolonialen Blicks, ডি নেহে উন্ড্ ডি ফের্নে, বাউস্টাইনে ৎসু আইনের পোয়েটিক্ ডেস্ কোলোনিয়ালেন ব্লিক্‌স্, 'কাছে ও দূরে, উপনিবেশবাদীর দৃষ্টিতে সাহিত্যতত্ত্বের গঠনগত উপাদান।'

১২। Unerhoerte Begebenheiten, উন্‌এরহ্যোর্‌টে বেগেবেন্‌-হাইটেন্, 'অশ্রুতপূর্ব ঘটনাবলি'।

১৩। Zumwalds Beschwerden Eine Schmutzige Geschichte, ৎসুমভালড্‌স্ বেশ্বের্‌ডেন্, 'ৎসুম্‌ভালড্-এর যন্ত্রণা একটি নোংরা গল্প'।

১৪। Neue Aufzeichnungen eines wahnsinnigen, নয়ে আউফ্‌ৎসাইথ্‌নুঙেন্ আইনেস্ ভান্‌সিনিগেন্, 'পাগলের প্রলাপ'।

এছাড়াও হান্স্ খ্রিস্টফ্ বুখ্-এর নির্মিত দুটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমটি ১৯৭২ সালে করা, শিরোনাম Die Sprache der Revolution, 'বিপ্লবের ভাষা'; দ্বিতীয়টি ১৯৬৮-র ছাত্র-আন্দোলনের পরবর্তী তরুণ কবি-লেখকদের নিয়ে, শিরোনামটি প্রচলিত চিন্তাকে খোঁচা দিয়ে দেওয়া—'সাহিত্য নিশ্চয়ই বিপজ্জনক'—Literature muss gefachrlich sein; এটি ১৯৭৫ সালে নির্মিত।

সাহিত্য, সাহিত্যবিচারের দৃষ্টি, দেশ-বিদেশী সাহিত্য-সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে হান্স্ খ্রিস্টফ্ বুখ্-এর মননশীলতা এক অসাধারণ মাত্রাসহ অত্যন্ত ঋজু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধসংকলন D e Nache und die Fernc-বইটিতে। কয়েকটি অনুচ্ছেদই সেকথা বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

"...এই পাঁচটি বক্তৃতায় নিকট ও দূরের দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে আলোচনা হবে, তাতে থাকবে মোহন রূপ ও দেশী সংকীর্ণভাব, যাদের পরস্পর সংমিশ্রণ এবং জড়াজড়ি নিকটকে দূরে ও দূরকে নিকট দেখায়। মনোবিশ্লেষণের ভাষায় একে বলা হয় 'প্রতিভাস,' সাহিত্যতত্ত্বের দৃষ্টিতে এ এক বিচিত্র অবস্থা, যাকে ব্রেখ্‌ট্

এবং তাঁরও আগে রুশ সাহিত্যতত্ত্ববিদ্ শক্লভ্‌স্কি) Verfermdung (অর্থাৎ অপরিচয় করে দেওয়া) বলেছেন, অর্থাৎ সেই প্রয়াস ও অনুধাবনের স্বাভাবিক পদ্ধতিকে ভেঙে দেওয়া, যাতে অপরিচিতকে অন্তরঙ্গ ও অন্তরঙ্গকে অপরিচিত করে দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমার বক্তব্য সাহিত্য-কল্পনার ক্ষেত্রে উপনিবেশ-বাদের প্রভাব।...দূরবর্তী দেশসমূহের ওপর ঔপনিবেশিক শোষণ ও ঐসব দেশের অধিবাসীকে বন্য বলে ফতোয়া দিয়ে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গেই চলে তাদের সেই অবদমিত সংস্কৃতিকে আপন করে নেবার প্রয়াস; সেখানে যা ঘটে তা হল, যা সংরক্ষিত হবার যোগ্য, তা-ই নিঃশেষ ধ্বংস হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কোনো সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও ধ্বংসের মধ্যে কোনো বিরোধই চোখে পড়ে না—ডোমিনিকান্ সাধু দিয়েগো মায়া-জাতির পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি আগুনে পুড়িয়ে শেষ করার আগে সেগুলোকে নকল করে নিয়ে আগাগোড়া স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। এই পদ্ধতির পরিণতিতে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক দশা কী হয়েছে, সে-কথা এখানে আলোচ্য নয়, কিন্তু ভৌগোলিক সীমানার প্রসারের ফলে উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছিল, সাহিত্য ও শিল্পকলায় তা যখন নিবদ্ধ হল—তখন নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে উপলব্ধির অবশ্যই সম্পর্ক আছে। সুদূরের মোহন রূপ, প্রাচ্যবিদ্যা, আমেরিকা চর্চা, জাপান-চর্চা, আদিমতার চর্চা বা দেশীয়তার চর্চা অবশ্যই সেই পন্থারই বিভিন্ন স্তর—মনে পড়ছে ইম্প্রেশনিজম্-এর চিত্রকলায় দূরপ্রাচ্যের চিত্রকলার প্রভাব, বা কিউবিজম্-এর ওপর আফ্রিকার ভাস্কর্যের প্রভাব—; শিল্প-কলার ক্ষেত্রে এবিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হলেও সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনো কাজ হয়নি বলা চলে।...” (Die Nache und die Ferne, Suhrkamped. ১৯৯১, পৃ. ১২-১৩)।

Die Naehe und die Ferne—গ্রন্থে বুধ্ রোমান্টিক পর্বের জার্মান লেখক Forster, Humboldt, থেকে শুরু করে Gessner, Voss, Goethe, Hebel—এঁদের রচনাবলি বিচার করে দেখাতে চেয়েছেন, দেশের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে-লেখক, তিনি স্বদেশ ও বিশ্বের কোন্ ছবি তুলে ধরেন; আর যিনি তা করেন নি, তিনি নৈকট্যের কোন্ শান্ত স্নিগ্ধ চিত্র আঁকেন। অন্যদিকে লেখকের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে শুধু বিদেশের নয়, দেশের ছবিও অন্যরকম হয়। তাঁর বক্তব্য—“লেখক শুধু বর্তমানের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সক্রিয় তা নয়, সে নিরন্তর অতীত যুগের সাহিত্যের সঙ্গেও

সংলাপরত ; আর সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সোজাসুজি পিতা থেকে পুত্রে বর্তায় না ; কিছু আদিম জাতিতে যেমন পিতৃব্যের থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রে যায়, এও কিন্তু তেমন—ঐতিহ্যের পরম্পরা সরলরেখায় না চ'লে জিকজ্যাক্ বা কোণাকুনি বক্ররেখা ধরে এগোয়।" (ঐ পৃ. ১৫)

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও বর্তমান স্থিতির আবর্তে তৃতীয় বিশ্বের মূল্যায়ণ করতে না পেরে নিছক রোমান্টিকতার স্নিগ্ধ স্পর্শ, পেলবমধুর স্বপ্ন অথবা দুঃখ দুর্দশা দেখে হাহাকার করে ইউরোপীয় বা জার্মান সাহিত্যিকরা যে তাঁদের বর্ণনার দেশগুলোর সঠিক পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, ব্যর্থ হয়েছেন আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রেও—একথাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে আগাগোড়া হের্মেনয়ুটিক্ পদ্ধতি ও শৈলীতে লেখা বইটিতে। শুধু প্রাচীন লেখক নন, আধুনিক যুগের দুই লেখককে নিয়েও তথ্য নির্ভর প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বাস্তব পটভূমির অভিজ্ঞতা ও বিদেশের সঙ্গে পরিচয়—এই দ্বান্দ্বিকতা লেখকের ব্যক্তিমানস ও সাহিত্যমননকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার নিদর্শণ হিসেবেই বৃধ্ এই বিশ্লেষণ করেছেন ; লেখকের উপলব্ধির ফাঁকগুলো কোথায় এবং তার কারণ কী সে বিষয়েও তাঁর আলোকপাত দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

..."ইহুদী জন্মসূত্রের কারণে বা ফ্যাসীবাদবিরোধী মনোভাবের কারণে নাৎসীরা যত লেখককে নির্বাসন দিয়ে ছিল, তাদের সকলের কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।' সেই অজস্র নামের মধ্যে থেকে আমি শুধু দু-জনের কথা বলব, যাদের রচনাবলির সঙ্গে আমার বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রয়েছে—তাঁরা হলেন আল্‌ফ্রেড্ ড্যোব্লিন্ এবং স্টেফান্ ৎসোয়াইগ্। দেশত্যাগে বাধ্য হবার অনেকে আগেই এ'রা বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন ; একজন আক্ষরিক অর্থে, অন্যজন তাৎপর্যের দিক থেকে—স্টেফান্ ৎসোয়াইগ্ ভারতভ্রমণে যান এবং সাংবাদিক হিসেবে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ান ; আর 'বের্লিন আলেকজাণ্ডারপাৎস্' (উপন্যাসটি) লেখার আগে ড্যোব্লিন্-রচিত কল্প-কাহিনী চীন, ভারত বা আগামী দুনিয়ার কথা বলে (রচনাগুলি—ডি ড্রাই স্প্রুঙে ডেস্ ওয়াঙ্—লুন্ ; মানস্ ; বের্গে, মেরে উন্ড, গিগান্টেন্)। নির্বাসিত হয়ে একজন ইংল্যান্ড হয়ে ব্রাজিলে যান, অন্যজন ফ্রান্স হয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে ; যাত্রাপথে দুজনেই একই সময়ে, তবে পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে দক্ষিণ আমেরিকাকে কেন্দ্র করে দুটি বই লেখেন, ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে দুটি রচনারই বিষয় বর্বরতার পথে ইউরোপের অধঃপতন। স্টেফান্ ৎসোয়াইগ-এর বইটি হচ্ছে 'ব্রাজিলিয়েন্, লান্ড্ ডের

ৎসুকুন্‌ফট্' (১৯৪১, অর্থাৎ 'ব্রাজিল, আগামীর দেশ), আল্‌ফ্রেড্‌ ড্যোবলিন্‌-এর উপন্যাস-ত্রয়ী 'আমাজোনাস্' (১৯৩৬-৪৮) নামে প্রকাশিত। একটি বই যেন অপরটির নেগেটিভ ছবি—দুটিই দর্পণে প্রতিফলিত উল্টো ছবির মতো করে দেখাচ্ছে অতীতের সন্ত্রাস ও অত্যাচারের দুঃস্বপ্ন কীভাবে বর্তমান যুগে ফিরে আসছে ; এই বর্তমান এক জনের কাছে নরকতুল্য, অপরজনের তাকে মনে হয়েছে স্বর্গ। স্টেফান্‌ ৎসোয়াইগ্‌-এর শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় তিনি ফ্যাসীবাদ ও যুদ্ধ-মুক্ত আগামী দিন সম্পর্কে আশাবাদী ; ড্যোব্‌লিন্‌ কিন্তু অতীতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে সেই হিংসাত্মক কার্যকলাপেরই চিহ্ন দেখেছেন, যে হিংসাত্মক কার্যধারা তাঁকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করেছে।···

"তখন গায়ের রঙ্‌ দেখে দুই বিরোধী দলকে ঠিক চেনা যেত না—ছিল না সাদা আর কালো। ওরা সকলেই ছিল সাদা-চামড়া শুধু পোশাক আর মুখভঙ্গি দেখে চেনা যেত বিদ্রোহীদের ওপর জবরদস্তি যারা করেছে, সেই প্রভু কারা। কড়া আদেশ, বিকট তাড়া শোনা যেত দখলদার প্রভুদের কণ্ঠ থেকে। অতীতে তীর-ধনুকধারী দেশীয় মানুষদের ওপর হিংস্র কুকুর আর আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে যে-আক্রমণ চালানো হত, তা-ই করেছে বক্তৃতা-মালা, সংবাদপত্র, রেডিও, পুলিশ, জেলখানা। মানুষের সমস্ত চিন্তা এমনভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে, যাতে তার আর কোনো প্রকাশক্ষমতাই না থাকে, তারপরই নির্জীব নির্বোধের মতো মানুষকে দাবিয়ে রাখা যায়। এভাবেই সেই পরিশ্রান্ত পঞ্চম সম্রাট চার্লস্‌ আর স্পেনের রাজার আমল থেকে এ-পর্যন্ত পদ্ধতিগুলোর বদল হয়েছে।" (ড্যোব্‌লিন্‌—ডের্‌ নয়ে উর্‌-ভাল্‌ড্‌, 'নবরূপে সেই অরণ্যানী' হিল্‌ডেস্‌হাইম্‌ ১৯৭৭, পৃ. ১৪৭)।

এল্‌-ডোরাডো-র সেই বিজয়ীরা আগেই দেখিয়েছে নাৎসীদের বীভৎসতা, ইন্‌ডিয়ানদের ধ্বংস করা ইহুদীনিধনের ভয়ঙ্কর আদল যেন ; এই স্থানকালের পরিসরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এই উপন্যাসে কম্যুনিস্‌ট্‌ ইউটোপিয়ার ব্যর্থতাও সূচিত হয়েছে, বিষয়গতভাবে তাঁর বহুমুখী বিচার অবশ্য করা হয় নি, তার আভাসমাত্র পাওয়া যাচ্ছে ; একই ভাবে ক্রান্তীয় মৌসুমী বনাঞ্চলকে ধ্বংস করার কথাও বলা হয়েছে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির আলোকে, তার ফলাফল অবশ্য তখনো বোঝা যাচ্ছিল না। ড্যোব্‌লিন্‌-এর ইতিহাস বিষয়ক নৈরাশ্যবাদ, যা অগ্রগতির সম্ভাবনাকে নাকচ করে, লক্ষণীয়—এর বিপরীতে স্টেফান্‌ ৎসোয়াইগ্‌-এর দৃষ্টিতে ব্রাজিল এক ইতিবাচক ইউটোপিয়া, এক শান্তির দ্বীপ, যেখানে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা অজানা ব্যাপার—

'এখনও পর্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধের আতঙ্কে জীবন আচ্ছন্ন নয় এখানে, যেমনটা আমাদের দেশে হয়েছে, আর সমস্ত রকম অর্থনৈতিক উদ্যোগ একমাত্র সেই লক্ষ্যে নির্ধারিত হয় না; (···) এই বিশাল দেশটিতে কোনোরকম সাম্রাজ্যবাদী চাল নেই (···)। ১৯৩৬-এর ইউরোপের বৈপরীত্যে আরেকটি আশ্চর্য বিরোধাভাস চোখে পড়ে—ব্রাজিলে এখনও পর্যন্ত বর্ণবৈষম্য ব্যাপারটার আবিষ্কার হয় নি; বরং অত্যন্ত সহজ ও সুস্থ উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে, যাতে নানা জাতি, বর্ণ, জনগোষ্ঠী ও ধর্মের মধ্যে কয়েক দশক ধরে জমে ওঠা সমস্ত বিভেদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। (···) বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় ভিন্ন ভিন্ন গাত্রবর্ণের শিশুরা মিলেমিশে খেলা করছে (··) আর বয়স্করাও হেসেখেলে পাশাপাশি বসবাস করছে; কারখানায় নিগ্রো আর ক্রেওল্-এর পাশেই দাঁড়িয়ে কাজ করছে কোনো শ্বেতকায়; নাচের রেস্তোরাঁতেও একই দৃশ্য, সামান্যতম বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা কোথাও কখনও চোখে পড়ে না।" (স্টেফান্ ৎসোয়াইগ্—ক্লাইনে রাইজে নাখ্ ব্রাজিলিয়েন্—'সংক্ষিপ্ত ব্রাজিল ভ্রমণ', দ্রষ্টব্য: লোন্ডার্, স্টেডটে, লান্ডশাফ্টেন্, ক্রুট্ বেক্ প্রকাশনা, ফ্রাংকফুর্ট্ ১৯৮১, পৃ ১৫৬-১৫৭)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর (পর্যটকদের বিবরণে পাওয়া) দক্ষিণ-মহাসাগরীয় স্নিগ্ধ ছবির মতোই এই ইউটোপিয়া, যা স্টেফান্ ৎসোয়াইগ্ এখানে বর্ণনা করেছেন, বর্ণণীয় দেশটির চেয়ে লেখকের নিজের মনের কথাই বেশি জানতে পারছি। ব্রাজিল যেন অমৃত সুধা, যাকে ঘিরে ইউরোপ-ক্লান্ত এক বুদ্ধিজীবী তার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা ও ভীতি প্রকাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু যে বাস্তব অবস্থাকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা ছিল, তা উভয়কেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল—যুদ্ধের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের) প্রসারের মধ্যে চরম বিমূঢ় হয়ে ১৯৪২ সালে পেট্রোপোলিস্-শহরে স্টেফান্ ৎসোয়াইগ্ ও তাঁর পত্নী আত্মহত্যা করেন; আর হতাশা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে আল্‌ফ্রেড্ ড্যোব্লিন্ হলিউড্-শহরে প্রোটেস্টান্ট্ ধর্ম ছেড়ে ক্যাথলিক হয়ে গেলেন।"

[Die Naehe und die Ferne 'কাছে ও দূরে' Suhrkamp ed, পৃ ১২৭-১৩০]

এইভাবে হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ বারে বারে দেখাতে চেয়েছেন, ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিক-লেখকেরা কীভাবে দূরবর্তী দেশ, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশ ও তার ইতিহাস বা বর্তমান পরিস্থিতির কোনো বাস্তবোচিত তথ্য-নির্ভর বিবরণের চেয়ে সুদূরপ্রসারী কোনো মায়াময় কল্পরাজ্যকেই বিবৃত

করেছেন। কিন্তু বাস্তব নৈকট্যের অভিঘাতে সেই কল্পচিত্র বারে বারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। বুখ্ চেষ্টা করেছেন, শুধু জনগোষ্ঠীগত তথ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কোনো ভ্রমণপঞ্জী বা গল্প-উপন্যাস নয়, লাতিন-আমেরিকার মানুষ ও সংস্কৃতির প্রতি দরদী মনোভাব নিয়ে তাদের বুঝতে, সেই প্রেক্ষিত থেকেই কাহিনীর নির্মিতি সাজিয়ে তুলতে।

কয়েকটি জার্মান গণমাধ্যম সংস্থা থেকে এই একটু অন্য-রুচিপ্রকৃতির লেখককে তাঁর রচনার বিষয়, বক্তব্য ও শৈলী নিয়ে নানা প্রশ্ন করা হয়। সেই সব সাক্ষাৎকারে হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ যে-সব উত্তর দেন, তা থেকে তাঁর সমকালীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বছর দুয়েক আগে ১৯৯২-সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বুখ্ ভারতে এসেছিলেন। এই সাক্ষাৎকার ও তাঁর উত্তর সম্পর্কে তিনি অপরিবর্তিত মনোভাবই বহন করছেন, একথা জানিয়েছিলেন এই প্রবন্ধের লেখিকাকেও। সেই পাঁচটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার থেকে সংক্ষেপ ও সংকলন করে এখানে সংযোজন করছি।

॥ ১ ॥ জার্মান সাহিত্যিক বা সাহিত্য-পাঠক সমালোচকদের কাছে প্রায় অপরিচিত একটি দেশ হাইতি প্রায় সমস্ত গবেষণা ও স্বকীয় রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এতে লেখকের মর্যাদা পেতে কি অসুবিধে হয় না?

ক. "জার্মানির সাহিত্য সমালোচনাকে সংকীর্ণভাবে প্রাদেশিক এবং অপটু মনে হয় আমার; তবু আমি আমার কাজ করে যাব।" বলেন Hans Christoph Buch। জার্মানির মানুষেরা হাইতি বা তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো দেশ সম্পর্কেই যে-ধারণা পোষণ করেন সে সম্পর্কে Buch-এর বক্তব্য—"এক মুহূর্তেই তাদের ধারণায় স্বর্গ থেকে নরকে পরিবর্তিত হয় ঐ সব দেশ। পর্যটকদেরও এ জাতীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। প্রথমে তারা খুব উচ্ছ্বসিত থাকে, তারপরেই ঘটে কোনো অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। যেমন ধরুন, হয়তো চুরি ডাকাতি কিংবা জোরজবরদস্তি অথবা রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর তখনই যে-দেশটাকে এর আগে পর্যন্ত স্বর্গ মনে হয়েছিল তা নিমেষেই নরকে পরিণত হয়...।

১৯৬৮ সালে হাইতি-তে আমার প্রথম পদার্পণ। তখন আমি '৬৮-র ছাত্র আন্দোলনের ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ ছিলাম। তৃতীয় বিশ্বে সংগঠিত বিপ্লবে বিশ্বাস ছিল আমার। এইটি ছিল স্বল্পসংখ্যক বিষয়ের অন্যতম, যে-ব্যাপারে '৬৮-র বামপন্থীরা সকলে একমত ছিল; কোনো বিরোধ ছিল না যে, বিদ্রোহ তৃতীয় বিশ্বে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দৃষ্টিতেই তা ন্যায্য,

এমন কি হিংসাত্মক ঘটনা পর্যন্ত। ঐ বছরগুলিতে সে-বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না, আমারও না। ১৯৬৭-র শরতে বলিভিয়াতে চে গুয়েভারা মারা গেলেন। তার অল্পদিন পরেই আমি হাইতিতে যাই; আমি সচেতন ছিলাম যে, গোটা ব্যাপারটা নয়া-উপনিবেশবাদের পাঁকে জটিল, যার দ্রুত সংশোধন প্রয়োজন, যার জন্য হাইতিবাসীদের সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো কর্তব্য।··· সে সময়ে প্রথম পরিচয়ে আমি যা আবিষ্কার করি এবং যা আমাকে আজও পর্যন্ত মুগ্ধ করে, তা হচ্ছে হাইতির বিপ্লবের ইতিহাস, দাসবিদ্রোহ, যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার সূত্রপাত ঘটায়; সময়টা ১৮০৪ খৃঃ, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য স্পেনীয় উপনিবেশগুলির বহু পূর্বের কথা।

বলতে গেলে এ বিষয়েই ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত রচনা Die Schcidung von San Domingo-ডি শাইডুং ফন্ সান্ ডোমিংগো। হাইতি সম্পর্কে এটি আমার দ্বিতীয় ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আমি চিঠিপত্র, বক্তৃতাবলি, আইনকানুন, এবং অন্যান্য মৌলিক নথি ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। অবশ্য এ-বইটি একমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যমূলক গ্রন্থ, যা জার্মানিতে পাওয়া যায়। এই বিবরণপঞ্জী ১৮০৪-এ এসে থেমে গেছে। কারণ এই বইটির বিষয় হিসেবে আমি একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের বিদ্রোহকেই বেছে নিয়েছিলাম, যে-বিদ্রোহ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে শেষ হয়েছিল। তারপর শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় পর্ব, যা হাইতিতে আজও চলেছে, সমাপ্ত হয় নি—বারবার স্বাধীন রাষ্ট্র গড়া, স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও তার বিপর্যয়।"

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত Karibische Kaltluft "কারিবিশে কালট্লুফট" গ্রন্থের পরিশিষ্টে লেখক Buch দিনপঞ্জী-শৈলীর রচনাকে একটি দেশের পরিচয় পাবার উপায় হিসেবে নির্দেশ করে বলেছেন—

"আজকে দিনের দক্ষিণ-আমেরিকা সফররত (কোনো ইউরোপীয়) পর্যটকও অনেকটা সেই প্রথম আবিষ্কর্তা ও প্রভুসুলভ অবস্থায় পড়ে; সে মোটামুটি এক অজানা মহাদেশের "বিস্ময়কর বাস্তবের" সামনে দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, আর মহাদেশটি তার চোখের উপর অসংখ্য অণুপরিমাণ একক ঘটনা ও পরস্পর সম্পর্কবিহীন খণ্ডচিত্রে ভেঙে পড়ে। ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণার কাঠামো তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে; তারা এই বাস্তবকে স্পষ্ট করার বদলে অনেক বেশি ঘোলাটে করে দেয়। বস্তুনিষ্ঠ (Objective) সংজ্ঞা-

আবিষ্কারের দাবি ত্যাগ করলেই হয়তো এই অবস্থায় সত্যের সবচেয়ে নিকটে পৌঁছনো যায় !"

খ. হাইতি-দিনপঞ্জীতে Hans Christoph-Buch হান্স্ ক্রিস্টফ্ বুখ্ ১৬ই ফেব্রুয়ারি, "Mardi Gras (মার্ডি গ্রাস্)-এ প্রথম দিন" শিরোনামে যা লিখেছেন, তা তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে। তাঁর বক্তব্য তিনি ব্যক্তিগত দৃষ্টিতেই এসব লক্ষ্য করেছেন বস্তুগত ধ্রুব সত্য হিসেবে নয়।

নিগ্রো ছেলেটা, যে চিক্লেট্ বিক্রী করছে।
নিগ্রো ছেলেটা, যে পটকা বিক্রী করছে।
নিগ্রো ছেলেটা, যে দাড়ি কামানোর ব্লেড বিক্রী করছে।
নিগ্রো লোকটা, যে চিক্লেট্ পটকা এবং দাড়ি কামানোর ব্লেড বিক্রী করছে।
নিগ্রো লোকটি, যে কার্টন ধরে সিগারেট বিক্রী করছে।
নিগ্রো লোকটি, যে প্যাকেট হিসেবে সিগারেট বিক্রী করছে।
নিগ্রো লোকটি, যে প্যাকেট হিসেবে সিগারেট ও দেশলাই বিক্রী করছে।
নিগ্রো ছেলেটা, যে একেকটা সিগারেট ও একেকটা দেশলাই কাঠি বিক্রী করছে।
নিগ্রো মহিলাটি, যে কাঁচকলা বিক্রী করছে।
নিগ্রো মহিলাটি, যে কাঁচকলা ও পাকা কলা বিক্রী করছে।
নিগ্রো ছেলেটি, যে ছোবড়া-ছাড়ানো নারকেল বিক্রী করছে।
নিগ্রো মহিলাটি, যে এক ঝুড়ি কালো ও সাদা বরবটি মাথায় নিয়ে চলেছে।
নিগ্রো মহিলাটি, যে এক ঝুড়ি লাল বরবটি মাথায় নিয়ে চলেছে।
নিগ্রো লোকটি, যে এক বোঝা কলা কাঁধে নিয়ে চলেছে।
নিগ্রো লোকটি, যে এক বস্তা কাঠকয়লা কাঁধে নিয়ে চলেছে।
নিগ্রো মহিলাটি, যে ভর্তি এক ঝুড়ি কাপড়-চোপড় মাথায় নিয়ে চলেছে।
নিগ্রো মহিলাটি, যে কাপড়-চোপড়ের খালি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চলেছে।
নিগ্রো মহিলাটি, যে উপর উপর চাপানো একাধিক ঝুড়ি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাচ্ছে।
নিগ্রো মেয়েটি, যে এক বালতি জল মাথায় নিয়ে চলেছে।
নিগ্রো মেয়েটি, যে একটা টিনের বাক্স মাথায় নিয়ে চলেছে।

নিগ্রো লোকটির মাথায় ঘাসের টুপি।
নিগ্রো লোকটির মাথায় একটা সিলিন্ডার।
. . . .
নিগ্রো মহিলাটির মাথায় রুমাল।
নিগ্রো মেয়েটির বেণিগুলি।
. . .
শ্বেতকায় সাহেব, যে ট্যাক্সি-কোম্পানির মালিক।
নিগ্রো লোকটি কালো স্যুট পরেছে।
নিগ্রো লোকটি সাদা স্যুট পরেছে।
নিগ্রো লোকটির চেক অথবা ডুরে কাপড়ের স্যুট।
নিগ্রো লোকটি বুশ্-শার্ট গায়ে।
নিগ্রো লোকটি টি-শার্ট গায়ে।
নিগ্রো লোকটি হাফ্-প্যান্ট প'রে।
নিগ্রো লোকটি স্নানের প্যান্টিতে।
নিগ্রো লোকটি প্যান্ট বিহীন।
নগ্ন নিগ্রো।
নিগ্রো মহিলাটি নীল সুতীপোষাক পরে।
নিগ্রো ছেলেটি নীল স্কুল-ড্রেস প'রে।
. . .
নিগ্রো লোকটির হাতে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়কার অস্ত্র।
নিগ্রো লোকটির হাতে জঙ্গলের ছুরি।
নিগ্রো লোকটির হাতে বাঁশের লাঠি।
নিগ্রো লোকটির হাতে বেড়াতে যাবার লাঠি।
নিরস্ত্র নিগ্রো লোকটি।
অন্ধ নিগ্রো মহিলাটি, যাকে একটি নিগ্রো মেয়ে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে।
যার একটা পা নেই; সেই নিগ্রো লোকটি ক্রাচে ভর দিয়ে।
নিগ্রো লোকটি, যার দু-পায়ের একটাও নেই।
নিগ্রো লোকটি, যার দুই-পা এবং দুই-হাতের একটাও নেই।
. . .

নিগ্রো লোকটি সাইকেলে চ'ড়ে।

নিগ্রো লোকটি মার্সিডিস্-এর স্টিয়ারিং-এ।

মুলাত-লোকটি মার্সিডিস্-এর ড্রাইভারের পাশের সীটে।

শ্বেতকায় সাহেব মার্সিডিস্-এর পিছনের সীটে।

ছ-জন নিগ্রো একটা পোজেও-গাড়ির পিছনের সীটে।

শ্বেতকায় সাহেব নিগ্রো মহিলাটির সঙ্গে এক শয্যায়।

শ্বেতকায় সাহেব দু-জন নিগ্রো মহিলার সঙ্গে এক শয্যায়।

মুলাত-রমণীটি একজন শ্বেতকায় সাহেব ও একজন নিগ্রোর সঙ্গে এক শয্যায়।

সমকামী নিগ্রো লোকটি হোটেলের হল্‌ঘরে।

নাবালক নিগ্রো ছেলেটি সমকামীদের পানশালায়।

...

দন্তবিহীন বৃদ্ধ নিগ্রো।

নিগ্রো লোকটির সোনা-বাঁধানো দাঁত।

....

নিগ্রো লোকটি চিড়িয়াখানায়।

নিগ্রো ছেলেটি, যে এক টুকরো আখ চিবোচ্ছে।

নিগ্রো লোকটি আখের খেতে।

আখের খেত, নিগ্রোবিহীন।

নিগ্রো লোকটি, যার আখের খেত নেই।

...

নিগ্রো লোকটি, যার মাথার উপরে ছাদ নেই।

শ্বেতকায় সাহেব, যে এক ডজন নিগ্রোকে তার বাড়িতে কাজে লাগায়।

নিগ্রো লোকটি, যে তার শ্রমশক্তি বিক্রী করে।

মুলাটো লোকটি, যে নিগ্রো নিয়ে ব্যবসা করে।

শ্বেতকায় সাহেব, যে মুলাটোর কাছ থেকে তার নিগ্রোদের কিনে নেয়।

নিগ্রো লোকটি, যে নিজের রক্ত বিক্রী করে।

নিগ্রো মহিলা, যে নিজের মাংস বিক্রী করে।

বৃদ্ধ নিগ্রো, যে তার নিজের হাড় বিক্রী করে।

নিগ্রো লোকটি, যে নিগ্রোর কাঠের মূর্তি বিক্রী করে।

...

শ্বেতকায় সাহেব, যে নিগ্রো শিল্পকলার ব্যবসা করে।

নিগ্রো শিল্পকলা, মিউজিয়ামে।

নিগ্রো মহিলাটি, যে মিউজিয়ামের শৌচালয় সাফ করে।

নিগ্রো লোকটি, যে মিউজিয়ামের প্রবেশপত্র বিক্রী করে।

...

শ্বেতকায় সাহেব মিউজিয়ামের ডিরেক্টর।

॥ ২ ॥ নিজের সাহিত্য-শিল্পকলার প্রেরণার উৎস ও শৈলী প্রসঙ্গে হান্স্ খ্রিস্টফ্ বুখ্ বলেন—

ক. "৪০ এবং ৫০-এর দশকে ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্যাশন হয়ে উঠেছিল হাইতি-দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া। এছাড়া জার্মানিতে গণমাধ্যমগুলিতে নিতাই আলোচিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের প্রতি বাস্তব ও প্রকৃত আগ্রহ আছে খুব কম মানুষের। অধিকাংশ জার্মানিই এই সব দেশের প্রতি কোনো আস্থা রাখে না, ফলে তৃতীয় বিশ্ব নিয়ে তাদের উৎসাহের মধ্যে সত্যি সত্যি কোনো অভিজ্ঞতা বা কৌতূহল থাকে না। সব কিছু সীমিত থাকে ভিক্ষে দেওয়ার মধ্যে : জার্মানরা দানপ্রিয়, কিন্তু নিজেরা শেষাবধি সমস্যামুক্ত শান্তিটুকু চায়। "সমস্যা" শব্দটি ভুল, কারণ আমি তৃতীয় বিশ্বে শুধু সমস্যাবলি দেখি না. আমি ঐ দেশগুলি দেখে মুগ্ধ হই, হাইতি-যাত্রা আমার জন্যে যেন নতুন ভিটামিন-সঞ্জীবনী, আমার সাহিত্য কল্পনাকে প্রাণিত করে, আমার শক্তি যেন সতেজ হয়ে ওঠে।···কিন্তু কোনোমতেই তা সামাজিক অনুকম্পা নয়।

......

খুব কম জার্মান লেখকই লাতিন আমেরিকাকে কেন্দ্র করে তাঁদের কথাশিল্প গড়েছেন। সেদিক থেকে হাইন্রিখ্ ফন্ ক্লাইস্ট্-এর বড়ো গল্প Die Verlobung in St Domingo আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে, যদিও বক্তব্যের দিক থেকে আমি তার বিরোধী। তবু এইটিই জার্মান সাহিত্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, যার বিষয়বস্তু হাইতির দাসবিদ্রোহ, অবশ্য এতে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক তথ্য ও উপলব্ধির ভ্রান্তি প্রচুর।··এছাড়া Anna Segher-এর গল্প-সংগ্রহ Die Hochzeit von Haiti [হাইতির বিবাহ] আমি উৎসাহের সঙ্গে পড়েছি।···সংখ্যায় কম হলেও আরো কিছু লেখক আছেন, যাঁরা তৃতীয় বিশ্বের

সমস্যা নিয়ে ভাবেন—Uwe Timm আফ্রিকা নিয়ে লিখেছেন, Gert Hotmann লাতিন আমেরিকা এবং সুইৎজারল্যান্ডের লেখক Hugo Loetscher ব্রাজিল নিয়ে লিখেছেন।

.....

ক্লাইস্ট্‌কে আমি, আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে, প্রতিক্রিয়াশীল মনে করি। কিন্তু তবুও তিনি জার্মান কথাশিল্পীদের অন্যতম প্রধান এবং আমার নিজের প্রিয়তম লেখকদের একজন, বরাবর। আমি যখন ক্লাইস্ট্‌-এর কোনো বিষয়বস্তু গ্রহণ করি, আমার লক্ষ্য থাকে শুধুমাত্র আমার নিজের কাহিনী, অর্থাৎ আমার কল্পিত কাহিনীটি নিবেদন করা; আমার লক্ষ্য নয়, ক্লাইস্ট্‌-এর রচনার ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যাসত্য বিচার করা অথবা তার সাহিত্যিক বিচার ও ব্যাখ্যা করা। তা সম্পূর্ণ অন্য কাজ। এছাড়া ক্লাইস্ট্‌ তো শুধু অচেনা একটি পরিবেশকেই ব্যবহার করেছেন, একটি জার্মান কাহিনী, বলা যায় তাঁর নিজস্ব কাহিনী বিবৃত করার লক্ষ্যে।"

খ. "আমার নিজের রচনাবলির মধ্যে উপস্থাপনা ও বর্ণনারীতির সাদৃশ্য দেখা যায় অবশ্যই। তুলনীয় সজাতীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে একাধিক গ্রন্থে। কিন্তু আজকের দিনে একটি বিশেষ সমস্যার সঙ্গে লেখককে মোকাবিলা করতে হয়। তা এই যে তাঁর রচিত বইগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়া হয়। আমি একটি বিশেষ ভাবনা (motif) "Historische Begebenheit" "ঐতিহাসিক ঘটনা", "Die Hochzeit von Port-au-Prince" "পোর্ট-ও-প্র্যাস-এ বিবাহ" এবং "Aus der neuen Welt" "নতুন বিশ্ব থেকে"—এই তিন গ্রন্থে রূপায়িত করেছি। প্রথম বইটিতে বর্ণনা করেছি—কোনোরকম শত্রুর আক্রমণে নয়, একটি সেনাবাহিনী পাঁকের মধ্যে ডুবে নিশ্চিহ্ন হল। দ্বিতীয় গ্রন্থে এই একই তথ্য বিবৃত করেছি, সেখানে বন্যায় নিশ্চিহ্ন হল সেনাবাহিনী। তৃতীয়বার শেষোক্ত গল্প-গ্রন্থটিতে বর্ণিত, ক্যালিফোর্নিয়ায় ভূকম্পজনিত গহ্বরে নিশ্চিহ্ন হলেন এক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ···এভাবে আমি পাঠককে মজা দেবার আশা করি। অন্যদিকে তাকে আলোকপ্রাপ্ত করার মৃদু বাসনাও থাকে; যাতে সে ১৯ শতকে ক্রান্তীয় অঞ্চল নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে পড়ে, যেগুলিতে সর্বদাই কুমীরের মতো হিংস্র জন্তুর কথা লেখা থাকে আর সেই কুমীরগুলোও সবসময় গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে হয়। ···একদিকে আমার নিসর্গবর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমি ইউরোপীয়দের গতানুগতিক আতঙ্ক ও আকাঙ্ক্ষাগুলি ফুটিয়ে

তুলতে চাই ; অন্যদিকে গতানুগতিক নিসর্গবর্ণনা, যা প্রকৃতিবিজ্ঞান বা জীবন-বিজ্ঞানের বইতে দেখা যায় তাকেও আঘাত করতে চাই। ক্রান্তীয় অঞ্চলে সফর করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। বন্যজন্তুর দেখা পাওয়া যায় না প্রায় কখনোই, আর দেখা পেলেও তাদের নেহাৎ নিরীহ মনে হয়। আমি নিজে ঘড়িয়ালপূর্ণ নদীতে সাঁতার কেটেছি, সেগুলো ছোটো ছোটো কুমীর, যাদের খাদ্য মাছ এবং পাখি ; মানুষের দেখা পাওয়ামাত্র তারা পালায়। পুরনো বর্ণনার অনুচ্ছেদ তুলে আমি ব্যঙ্গরসের, প্যারোডির আবরণে এসব তথ্য একাধিকবার বিবৃত করেছি ...অন্যভাবে আমার নিসর্গবর্ণনা ও অবাস্তব আশঙ্কা পাশাপাশি মিশে যায়। এর উদ্দেশ্য পাঠকের প্রত্যাশাকে হতাশ করা, তাকে হতবুদ্ধি করে দেওয়া। যেমন "Hochzeit von Port-au-Prince"-এ ফরাসীরা ভাবছে ব্রিটিশ বাহিনী তাদের আক্রমণ করেছে, কিন্তু তা ছিল ফ্লামিঙ্গো-পাখির দলের পদধ্বনি। আবারও এক আক্রমণ, এবার তারা ভাবছে, বিদ্রোহী দাসেরা এগিয়ে আসছে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে—একটি বাজির কারখানায় অসাবধানতাবশতঃ আগুন লেগে গিয়েছিল।

আমার রচনার ভাষা ও আঙ্গিকগত শৈলীর ব্যাপারে বলব, যদিও আমি কিউবার লেখক Alejo Carpentier (আলেখো কার্পেনটিয়ের)-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তবু শৈলীতে আমি তাঁর থেকে পৃথক্। একটি উপাদান আমার গ্রন্থসমূহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে—তা হল হাস্যরস, যা কার্পেনটিয়ের-এর রচনায় প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্য ভিনদেশের সাহিত্যসংস্কৃতির বিশদ অনুপুঙ্খ তথ্যের নিবেদন এবং তার মাধ্যমে পাঠককে চমকে দেওয়ার প্রচেষ্টা আমাদের দুজনের মধ্যেই আছে—ওঁর ক্ষেত্র প্রধানতঃ আফ্রিকা, আমার হাইতির ইতিহাস।

আমি ক্লাইস্ট-এর রচনাশৈলীতে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত। কার্পেনটিয়ের-এর রচনায় মানুষের মনোলোক থাকে কেন্দ্রবিন্দুতে। ক্লাইস্ট-এর রচনায় চরিত্রগুলির কিন্তু অন্তর্লোকের কোনো ব্যাপার নেই ; ঘটনাবলি অথবা সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই তাদকের রূপায়ণ ঘটেছে। আমার বর্ণনাও চলে অনুরূপ শৈলীতে। মধ্যযুগীয় গাথা-সাহিত্যে যেমন বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং অতীত একই আধারে নিবেদিত হত, অথবা দৈব ঘটনা ও লৌকিক ঘটনাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা যেত না, আমার উপন্যাসের বিভিন্ন কক্ষেও তেমনই অসংখ্য কাহিনী বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বর্ণিত। চরিত্রগুলির কোনো অন্তর্লোক বিবৃত করি না আমি। বলতে গেলে কোনো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই সেখানে। আমার নায়কেরা

যদি তা আদৌ বলা হয়, আমার উপন্যাসের বা গল্পের মধ্যে চরিত্রগুলি ক্লাইসট্-এর ভাষায় পুতুলমাত্র কিংবা কৌতুক চরিত্র বলেও চিহ্নিত হতে পারে।···উপন্যাসের প্রচলিত গঠনকে আমার কোনোদিনই ভালো লাগে নি। তার বিপরীতে অন্য একজন জার্মান লেখক আমাকে প্রভাবিত করেছেন, তিনি Poter Weiss। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসগুলি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে।···"

॥ ৩ ॥ তৃতীয় বিশ্বের সংকট ও সংকটমোচনের উপায় সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে কী বা কেমন এ প্রসঙ্গে Buch-এর বক্তব্য স্পষ্ট।

"আগেকার মতো আমি এখন আর বিশ্বাস করি না যে, হাইতি, তৃতীয় বিশ্ব এমন কি ইউরোপের জন্যেও কোনো বাঁধাগৎ সমাধান আছে। আমি এও বিশ্বাস করি না যে "বিপ্লব" এক আঘাতে বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে। আজকের দিনে আমরা জানি যে, বিপ্লব বরং নতুনতর এমন কি হয়তো কঠিনতর সমস্যার সৃষ্টি করে।···নীট্শে-র অনুসরণে সজাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তির কথা উঠছে আজ, এবং হাইতিতে তেমন কিছু আমার চোখে পড়েছে: এই দেশটি জার্মানির মতোই তার নিজের ইতিহাসেরই শিকার।···আমি মনে করি না, লেখকের দায়িত্ব—যেমনটা গ্যান্টার গ্যাস ভারতে করেছেন,—ভারতীয়দের বলা, তারা কী কী ভুল করছে এবং কীভাবে তারা তার সংশোধন করতে পারে। আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই লেখকের এই স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি; কারণ, তা জার্মানির প্রসঙ্গেও তো খাটে না। তার পরিবর্তে অনেক বেশি কাজ হয়, যদি পাঠকবর্গ সচেতন হয়, অর্থাৎ বাঁধাগৎ কথাকে চ্যালেঞ্জ করে, তা রাজনৈতিকই হোক অথবা শিল্পসাহিত্যসংক্রান্ত।···

আমি কখনোই দাবি করি না, হাইতিদেশীয় লেখকের মতো করে হাইতিকে বর্ণনা করতে পেরেছি। হাইতিবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি বর্ণনা করি না; বস্তিবাসী বা নিরক্ষরের দৃষ্টিকোণ থেকে তো আদৌ নয়।··· একটি কথা আমি বারেবারে পাঠককে স্পষ্ট জানাতে চাই, আন্তরিকভাবে বলতে চাই যে, আমি বর্ণবাদী নই, দোহাই ধর্ম, পাঠক যেন আমাকে ভুল না বোঝেন।···একটি আশার স্ফুলিঙ্গ কিন্তু সর্বদা প্রচ্ছন্ন থাকে, যা আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে থাকেই; তা হচ্ছে—কোনো সমাধানের ঠিকানা নয়, পাঠকের সূক্ষ্ম পরিমিতির বোধকে তৃপ্তি দান করা।"

ব্যবহৃত রচনার মূল জার্মান থেকে অনুবাদ এবং সাক্ষাৎকারের সম্পাদনা ও ভাষান্তর—লেখক

ফুলমণি

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

অবশেষে ফুলমণি মরে গেল। কোনো আয়োজন ছিল না। হাঁক-ডাক নয়। গাছের শুকনো পাতা অনাদরে, সবার অজান্তে যেমন ঝরে যায় তেমনি নৈঃশব্দ তাকে ছুঁয়ে গেল। তাকে ঘিরে নির্জনতা। শুধু বুকের উপর একটি স্পন্দিত জীবন, ফুলমণির দু বছরের মেয়ে, খেলছে। সে জানে না যে, তার মা আর নেই; জীবন অর্থাৎ প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে, ঝরে গেছে পরিত্যক্ত খোসা। ফুলমণিও কি জানে যে, সে নেই; তার আদরের অসহায় মেয়ে তারই বুকের উপর খেলছে। সে এখন জানা-অজানার বাইরে।

চারিদিক সুনসান। এখন ভোর পূব আকাশ লাল ছোপ ধরা ঘন কুয়াশায় ঢাকা। ফুটপাথের ধারে ঝোপড়িতে স্ট্রিট লাইট তেরছা ভাবে পড়েছে। তাতেই যা আলো। সেই ম্লান আবছা আলোয় ফুলমণি টানটান, নিষ্পন্দ।

ফুলমণি চিৎ। হাড়ের উপর শুকনো চামড়া জড়ানো। রুক্ষ, খরখরে মুখমণ্ডলে কোনো পেলবতা নেই। চোখ খোলা। ঘোলাটে। কোনো দ্যুতি নেই। ফুলমণির শতছিন্ন কাপড়ের নিচের দিকটা ভিজে।

এই ঝোপড়িতে এখন প্রাণের অস্তিত্ব বলতে দু বছরের টেঁপি। সে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বোঝে না। মায়ের শারীরিক উপস্থিতিই তার কাছে বড়ো কথা। ঘুম ভেঙে গেলে রোজকার কর্তব্য সে পালন করে, প্রথমে খুঁতখুঁত করে, নাকে কাঁদে, মার বোঁজা চোখে আঙুল চালিয়ে খুলতে চেষ্টা করে, বুকের উপর ধামসায়, খেলা করে, শুকনো মাই চোষে যদিও এক ফোঁটা দুধ নেই। এসবই টেঁপির রুটিন মাফিক কাজে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু আজ অন্যদিনের মতোই মায়ের বুকের উপর। মায়ের চোখ খোলা, তাই পরম নিশ্চিন্ত।

কয়েকদিন হলো মরদটা নেই। কোথায় গেছে ফুলমণির জানা ছিল না। এরকমই মাঝে মাঝে সে বেপাত্তা হয়ে যায়। রোজগারের ধান্দায় সে অনেক দূরে চলে যায়। দিনের পর দিন ফেরে না। একদিন হঠাৎই ফেরে। বাজার করে আনে। তিনটে ইট পেতে কাঠ-কুটো জেবলে রান্না হয়। পেট ভরে দুটো খায় তারা। ফুলমণিকে আদর করে। হয়ত দু-তিন রাত থেকে আবার কোথায় হারিয়ে যায় গণপতি।

ফুলমণি জিগ্যেস করেছিল, "যাস কোথায় ? ঠিকানা থাকে না। হঠাৎ হঠাৎ এসে সোহাগ। কেমন ধারার মানুষ হে তুই ?"

গণা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বিচ্ছিরি নোংরা দাঁত বের করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠে। "তর আহ্লাদ দেখলে আমার বুকের ভিতর ঝড়ের বাতাস বয়রে মাগী। শালা, ভেবেই পাই না তরে কোথায় রাখি।"

"আহা মিনষের কথার কী ছিরি। তুই আমায় রাখবি কি রে! তোরটা খাই না পরি।"

"আমারটা কেন, নিজেরটাই খাস।" গণা অঙ্গভঙ্গি করে। তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে ফুলমণি। মাথার চুল ধরে টানে। পরনের ছেঁড়া কাপড়ের ছোটো আঁচলটা কোমরে কষে বাঁধে। চিলের মতো চেঁচাতে থাকে। অনর্গল বকে যায়। দুর্বোধ্য ভাষা। সব বোঝা যায় না।

"কোন মাগের বাড়ি ছিলি এ তিন দিন, যা, সেখেনে যা। এখানে পিরিত মারাতে এসেছিস কেন? পোঁদে নাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? শালা, হারামি কোথাকার, হাড় জ্বালাতে এসেচে···"

ফুলমণি থামে না। থামতে চায় না। জোর কমে এলে গণা একটু একটু করে উসকে দেয়। আবার জ্বলে ওঠে ফুলমণি। পুরো দমে গলার শিরা ফুলিয়ে চিল্লাতে থাকে।

ক্রমশ অন্যান্য ঝোপড়ি থেকে একে একে ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ির দল এসে জড়ো হয়। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। ফুলমণিকে কিছু বলতে তাদের সাহস হয় না। ফুলমণি মাঝে মাঝে উবু হয়ে ঝোপড়িতে ঢোকে, আবার বেরিয়ে এসে জোর কদমে এদিক ওদিক করে, হাতের কাজ সারে; ত্যানা শুকতে দেয়, কাঁথার ধুলো ঝাড়ে, রাস্তার পাশে কাঠ-কুটো ছড়িয়ে দেয় রোদে; এমনি আরো কত কি। মুখ, হাত-পা একই সঙ্গে সমান তালে চলতে থাকে। ছুটোছুটিতে ফুলমণির কোমরের কষি খুলে যায়। দশ-বারো বছরের একটি রোগা-প্যাংলা ছেলে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলে ওঠে, "খুলে গেছে, ন্যাংটো···।" সকলে হেসে ওঠে। ফুলমণি তেড়ে যায় ছেলেটির দিকে। "শালা, বেজন্মা, ঘরে গিয়ে দেখ।" ছুটতে গিয়ে তার অবস্থা আরো বেহাল।

গণপতি তাড়াতাড়ি ফুলমণিকে জাপটে ধরে ঝোপড়িতে ঢুকিয়ে দেয়। "হালকা করো, হালকা করো," বলে জমায়েতের দিকে এগিয়ে যায়। আস্তে

CENTRAL LIBRARY

আস্তে অনেকেই সরে পড়ে। গণা কর্কশ গলায় চিৎকার করে ওঠে, "মজা দেখতে এসেছো, না!"

ফুলমণি ঝোপড়ির মধ্য থেকে চিল্লাতে থাকে। বিহ্বল টেঁপি এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে।

ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে ফুলমণি। হঠাৎ জ্বলে ওঠা ওর বরাবরের স্বভাব। ক্রোধের আগুনে সে সমস্ত কিছু পুড়িয়ে ছারখার করতে চায়। নিজেও জ্বলতে থাকে। গণপতি ওকে বুঝতে চায়। বোঝে না। ফুলমণি সম্পর্কে কোনো হিশাবই মেলে না। তবু অদ্ভুত একটা টান অনুভব করে। তাই বারবার ফিরে আসে ফুলমণির কাছে।

"অনেকটা বেলা হয়ে গেল, রাঁধবি না ফুলি?"

মাথা নিচু করে ফাটা পায়ের মরা চামড়া খুঁটছিল ফুলমণি। চকিতে মুখ তুলে তাকাল গণার দিকে। ফিক্ করে হেসে ফেলল। এখন আর চোখে-মুখে সেই ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। এই হলো ফুলমণি, কখনো বোশেখ মাসের ধা ধা রোদ্দুরের মতো, তাপের চোটে ঝলসে দেয়; আবার কখনো ফাল্গুন মাসের ঝির ঝির বাতাস বয় যেন তাকে ঘিরে। তার দ্বৈত মেজাজের ছবিটা এইভাবে গণার কাছে ধরা পড়ে।

"না রাঁধলে গিলবি কী?" ক্ষোভ নয়, ফুলির গলায় দরদ। সে খুশি হয়ে ওঠে। "খিদে পেয়েছে? দ্যাখ তো কত বেলা হলো। মাঝে মাঝে মাথার ভিতরটা কেন যে চটকে দিস।" ফুলমণির গলায় আবেগ আর অভিযোগ মেশামেশি হয়ে কেমন যেন গোঙানির স্বর বেরিয়ে আসে। শীতের রাতে রাস্তার ধারের একটু আগুনের উত্তাপের জন্য ঘেয়ো মাদি কুকুরটার মতো কুঁইকুঁই করতে করতে গণার গা ঘেঁষে আসে ফুলমণি। গণার ইচ্ছে হচ্ছিল ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। সাহস হলো না।

কিভাবে যে ফুলি তার সঙ্গে গেঁথে গেল তা ভাবতে বসে অবাক হয়ে যায় গণা। গাঁ থেকে এসেছিল ফুলি। সহায়-সম্বলহীন। মাথা গোঁজার ঠাঁই তো দূরের কথা, পেটের দাউ দাউ চিতায় দুমুঠো গুঁজে দেওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। উপায় কারই বা থাকে। খাবার কি আর সহজে মেলে? আর আস্তানা? গণা ঝোপড়িটার চারদিক দেখে। তবু তো মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই। আর এখানে তার আশ্রয় ফুলমণি। ফুলমণি বলে, গণা তার আশ্রয়। হয়তো দুজন দুজনার।

"কী ভাবিস, গণা?" ফুলমণি কনুই দিয়ে গুঁতো মারে গণার পিঠে।

"তর কথা ভাবি।" কালো-হলুদ ছোপ ধরা দাঁত বের করে হাসে গণা। কিন্তু কীভাবে, সে গুছিয়ে বলতে পারে না। কী এক আবেগে সে ফুলিকে জড়িয়ে ধরে। ফুলি যেন ফুলে ফুলে ওঠে আহ্লাদে।

এই তো বুঝি চায় মানুষ, সমস্ত জীব জগৎ। একা একা থাকা দায়। গণা দেখেছে, মেয়ে-পুরুষ কী একটানে কাছাকাছি আসে। সেই এক বাউল তাকে বলেছিল, মনের সঙ্গে মন মুখ ঘষাঘষি করে। তত্ত্বকথা সে বোঝে না। তবে অনুভব করে সে, ফুলির কাছে তাকে ছুটে আসতেই হয়, শুধু শরীর নয়, অন্য কিছুর টানে, যা সে অনুভব করে, কিন্তু ভাষায় বোঝাতে পারে না। একেই কি মনের সঙ্গে মনের মুখ ঘষাঘষি বলেছিল বাউল? গণার শরীরে ঢেউ জাগে ছলাৎ-ছলাৎ, বুকের ভিতর দাঁড় টানার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। ফুলি তার বড়ো আপনার, নদীর বুকে নৌকোর মতো।

এখন ফুলি শান্ত। সে ভরা গাঙে পাল তুলেছে। পালে হাওয়া লেগেছে গণার বুকে মুখ রেখে গভীর স্বরে সে বলে, "কোথায় বাস তুই গণা। মাঝে মাঝে বেপাত্তা। আমার ফাঁকা লাগে।"

"কাজ-কামের ধান্দায় ঘুরতে হয়···"

"হেঃ, রোজগার করে তুই কত্তো বড়ো লোক হবি, যেন···"

"পেটটা তো চালাতে হবে।"

ফুলমণি ভাবে, এই পেটের মধ্যে যে চিতাটা জ্বলছে সেটা কত বড়ো কে জানে। দিনরাত কাঠকুটো জোগাড় করতেই সময় বয়ে যায়। তবু সে গণাকে ছাড়তে চায় না। গণা না থাকলে সে অসহায় বোধ করে। তার মনে হয়, আবার বুঝি সে ভেসে যাবে, কোথায় কোন ঘূর্ণিপাক তাকে ডুবিয়ে নিয়ে যাবে গহীন গাঙের নিচে।

ফুলমণি যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, বন্যার জলের তোড়ে ভেসে গেল ফালানির বাপ—তার প্রথম সোয়ামী। দেহটার হদিশ মিলল না। তিনটে প্রাণী—সোয়ামীর মা, মেয়ে ফালানি, আর সে নিজে। তিনটে পেট। কী কষ্ট। লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করেছে উদয়াস্ত। নোঙর ফেলেছে ঘাটে ঘাটে। শরীরে তখনও তার রং-ঢঙ যা ছিল অভাবের সংসারে ক্রমশ তা নিভে আসছিল। তখনই তো আলি এল তার জীবনে। বস্তির শেষ প্রান্তে থাকত সে। একা। কারখানায় কাজ করত। গাঁ থেকে এসেছিল। কিভাবে যে জড়িয়ে গেল ওর সঙ্গে, মনে

করবার চেষ্টা করল সে। সবটা আর মনে আসে না। ছবিগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া, এলোমেলো, ধোঁয়াটে।

গণা ডাকে, "ফুলি!"

"উঁ?" ফুলির ভাবনায় ছেদ পড়ে।

"চুপ মেরে গেলি যে!"

"কোথায়?"

গণা তাকে আদর করে। সে ভাবে, ফুলি কত দুঃখী। ওর বুকের ভিতরের দুঃখের পাহাড়টা যেন সে দেখতে চায়। ফুলি ভাবে গণাটা পাগল। আজ তার কী আছে। রঙ মুছে গেছে। আছে শুধু খোসা। রস নেই। তাই নিয়ে তার খেলা। গণাটা পাকা খেলোয়াড় হতে পারে নি। আনাড়ি। আরশোলার মতো ফরফর করে। যাই-হোক, তবু তো সে ফুলির নাঙ্। একটা নাঙ্ না না থাকলে ইজ্জত থাকে নাকি। ফুটপাত হলেও তো একটা সমাজ আছে গণার হাড়-কাঠি বুকে চেলা কাঠের মতো লেপটে থাকে ফুলি। কিন্তু আলির কথা তার বারবার মনে পড়ে যায়। বেশ তাকত ছিল ওর। সংসার থেকে সে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। অন্ধ বুড়ি শাশুড়ি আর অল্প বয়সী মেয়েটাকে ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তো ছিলই, তবু নতুন জীবনের স্বাদ, স্বপ্ন, গোছানো সংসার—এসব তার অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছিল। এসব তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল।

আলি কারখানার কাজ ছেড়ে ফুলমণিকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে। চারদিক থেকে সব ছুটে এসেছিল আলির বউ দেখতে। ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন মুখ চুক্ চুক্ করে মন্তব্য করেছিল, "মাগীর গতর দ্যাখ! আহা যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে!" ফুলির বেশ ভালো লেগেছিল কথাটা। সে ভেবেছিল, আলিকে বাঁধার যন্তরটা তা হলে ঠিকই আছে।

এই দিয়েই কি মেয়েরা বাঁধে নাকি পুরুষদের। না কি অন্য কিছুও থাকে। ফুলমণির সব গোলমাল হয়ে যায়। সে অতশত বোঝে না। তার ভাবনার সঙ্গে সবটা মেলেও না। গণাকে সে বাঁধল কী দিয়ে। এত ভালোবাসে কেন গণা তাকে? দুর্বল ক্ষয়াটে গণা তার নাঙ্। তার আশ্রয়। একটু আশ্রয়ের জন্যই সে তাকে প্রশ্রয় দেয়। ফুটপাতের বাসিন্দারা বলে—গণা ফুলির সোয়ামী। বয়সে ফুলির চেয়ে অনেক ছোটো। ওদের পাশের ঝোপড়ির খঞ্জ বুড়িটা আড়

চোখে তাকিয়ে বলেছিল, "আহা, কেমন সন্‌সার কোরচে দ্যাকোনা, যেন মায়ে-পোয়ে সোয়ামী-ইস্তিরি। ভাতারখাগীটা কচি মন্ডু চিবিয়ে খাচ্ছে। বড়ো নোলা হয়েছে ফুলিটার।" এ কথা শুনে জ্বলে ওঠে ফুলি। খ্যান্‌ খেনিয়ে চিৎকার করে ওঠে—'তোর কী লা বুড়ি? জানি না, তোর ঝোপ্‌ড়িতে দিনরাত কী হয়, তোর নাতনি মুখে ছাইভস্ম মেখে, ঠোঁটে আলতা লাগিয়ে চলাতে যায় না?'

"মুখ সামলে কতা কইবি ফুলি। মুখে নুড়ো ঘষে দেব।" ফুঁসে ওঠে বুড়ি। উত্তেজিত বুড়ির কাশির দমকে শ্লেষ্মা গড়িয়ে পড়ে ঠোঁট বেয়ে থুতনিতে। কাঁপা কাঁপা বাঁ হাতটা তুলতে চেষ্টা করে মোছার জন্য। ওঠে না।

ফুলমনির চিল-চিৎকারে চারিদিক মাত। তাকে থামায় কার সাধ্যি। তার মুখ দিয়ে ক্রমাগত যেন আগুনের ফুলকি বের হতে থাকে।

কতদিন পর গণা ফিরেছে। হালে পানি পেয়েছে ফুলি। সে নিশ্চিন্ত। তবু তো মানুষটা কাছাকাছি। একা থাকলে বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় দিতে থাকে। ফাঁকা ফাঁকা হাহাকার তাকে জড়ায়। গণার হাড়-কাঠি বুকে পেলে সে বল পায়। কাউকে তোয়াক্কা করে না।

টেঁপি কেঁদে ওঠে। ঘুম ভেঙেছে। গণাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ফুলি। বলে, "সর গণা, তোর মেয়ে উঠেচে, কঁকাচ্ছে।" গণা উঠে বসে। সরে যায় খানিকটা। মাথার ভিতর ঝিক্‌মিক্‌ করে ওঠে—সত্যিই মেয়েটা কি তার! হয়তো তারই, আবার নাও হতে পারে। ফুলিই কি ঠিক বলতে পারে? ওর ছেনালির কি শেষ আছে? এই তো সেদিন পর্যন্ত চাল পাচারের কাজ করত ফুলি। দিন রাত কাজ। রাত-বিরাতে যেখানে সেখানে আটকে পড়তে হতো। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে চলানি তো ছিলই। গণার সঙ্গে তখনই আলাপ। এক পেট খিদের আগুন নিয়ে গ্রাম থেকে ফুলি এসেছিল। লেগেছিল চাল পাচারের কাজে। গণাও করত ঐ একই কাজ, ওদেরই সঙ্গে। পান্ডুয়া, কালনা-কাটোয়া থেকে নদীয়ার ভিতরে ভিতরে ছিল তাদের আনাগোনা। হেঁটে, রেলগাড়িতে এবং আরো কত উপায়ে তারা শহর কলকাতায় চাল নিয়ে আনত। সেই চাল তুলে দিত ব্যাপারীদের হাতে। বাবুরা খেয়ে বাঁচত। শত ঝক্কি-ঝামেলা পুইয়ে তারাও বাঁচার পথ খুঁজত। এইভাবে তৈরি হয়েছিল তাদের চাল পাচারের সংসার। ফুলি কি তখন তার একার ছিল না-কি! কার পেসাদ সে পেটে ধরেছিল কে জানে! পোয়াতি ফুলি আর কাজ করতে পারেনি না। ওর পাশে তখন কেউ

নেই। সব সরে পড়েছে বা নিজেদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। শেষে ফুলিই একদিন বলল, "আর তো চলতে পারি না, গণা। তোরটা পেটে ধরেচি। তুই না দেখলে কে দেখবে?" গণার বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠেছিল, মাথার ভিতরের শিরাগুলো টান টান, আর একটু টোকা লাগলেই যেন ছিঁড়ে যাবে, গরম নিঃশ্বাসের সঙ্গে তপ্ত রক্ত বেরিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত তারটাই পেটে ধরল ফুলি! সারা শরীরে তার সমুদ্দুরের ঢেউ, উথাল-পাথাল। একবার সে বকখালিতে সমুদ্দুরের ঢেউ দেখেছিল। হঠাৎ বলে উঠেছিল, "এত ঢেউ কে দেয়? সমুদ্দুরের নিচ থেকে উপরের দিকে ঢেউ ঠেলে দিচ্ছে কে?" সঙ্গে হরিদা ছিল। তাদের প্রতিবেশী। বলেছিল, "জানিস না? ভিতরে একটা জানোয়ার সব সময় খলবল করছে।" এসবের সত্যি-মিথ্যে জানে না গণা। যাচাই করেনি, করতেও চায় না। শুধু অনুভব করেছিল, তার ভিতর থেকে কে যেন ঢেউ তুলছে। ফুলির মধ্যে সে নতুন করে জন্মাচ্ছে। ফুলির গর্ভে তার সন্তান। ফুলিকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, ওকে কাঁধে নিয়ে নদীর দিকে ছুটে যায়। কেন জানে না গণা, ফুলিকে ওর একটা নদী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল নদীতে জোয়ার এসেছে। ছেলেবেলায় নদীতে জোয়ার এলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ত।

সেই থেকে ফুলিকে গণাই দেখে আসছে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, 'তোরটা পেটে ধরেচি' এই কথা আরো কতজনকে বলেছিল ফুলি কে জানে! ফুলিটা তো ছেনাল, সকলের সঙ্গে ফস্টি-নস্টি করত। এখনো কি আর করে না! নয়তো রাত-বিরেতে অন্ধকার গলিতে আধবুড়ো ভিখিরির ঝোপড়ির মধ্যে কী করে সে! একদিন রাতে ঝোপড়িতে ফেরার পথে কুপির মরা আলোয় ফুলির আবছা ছায়া সে দেখেছে। ভোরবেলায় যখন ফিরেছে তখন তার হাতের মুঠোয় পয়সা ছিল। কিছু বলে নি গণা। জানতে চায় নি কিছুই। শুধু চোখ বুজে টানটান হয়ে, মটকা মেরে পড়েছিল। পাশে ছেঁড়া কাঁথায় জড়ানো ছিল ঘুমন্ত টেঁপি।

তবু ফুলিকে ভালোবাসে গণা। ভালোবেসে 'ফুলমণি সোনামণি' বলতে ইচ্ছে হয়। ওর বুকের মধ্যে নিজের ছবিটা দেখতে ইচ্ছে হয়। সে আঁতি-পাতি করে ফুলির মধ্যে নিজেকে খোঁজে। ফুলি তাকে কতটা ভালোবাসে?

ফুটপাতের উপরেই রাঁধতে বসে ফুলি। তিনটে ইঁটের উপর মাটির মালসা। কাঠ-কুটোর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। চোখ জ্বালা করে, দু চোখ ছাপিয়ে জল পড়ে। গণা বসে থাকে। কোলে শোয়ান টেঁপি। গড়িয়ে যাওয়া এক চিলতে ফেনের মতো। চড়াই পাখির মতো ছোট্ট বুকের খাঁচাটা নিয়ম মাফিক ওঠা-নামা

করছে। বেঁচে আছে টেঁপি। মেয়েটা নাকি গণারই। ফুলি তাই বলে। এই বিশ্বাস নিয়ে গণাও বাঁচতে চায়। এদের ঘিরেই তো আকর্ষণ। এই টানে সে বারবার ফিরে আসে ফুলির কাছে, এই ঝোপড়িতে।

ফুলি রান্না করে। আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। গণা কতদিন পর ফিরেছে। ভালো-মন্দ খাওয়াতে ইচ্ছে তাকে। কৌটোয় তোলা শুঁটকি মাছ চাপিয়েছে মাটির মালসায়। তরিতরকারির সঙ্গে সেদ্ধ হচ্ছে। চাল তো ছিল না, গত রাতেই আঁচল ভর্তি চাল পেয়েছে গলির ভিখিরি-বুড়োর কাছ থেকে। দেয় বুড়ো, চাল-পয়সা যখন যা পারে তাই দেয়। সে বড়ো ভালোবাসে ফুলিকে। আদর করে। রান্না হলে দিয়ে আসে বুড়োকে। ওর খাওয়া দেখলে বড়ো মায়া হয় ফুলির। আলি আজ থাকলে এ বয়সেরই হতো। তা হলে কি রোগা-প্যাংলা গণা ঘেঁষতে পারত? গণার জন্য রাঁধতে বসত? আলিটা যে কী—সেই যে খাঁড়িতে মাছ ধরতে গেল আর ফিরল না। বাঘে খেল, না কুমীরে নিল, কে জানে! কত খোঁজ খবর করা হলো, পীরের থানে মাথা কুটলো—কিছুতেই কিছু হলো না। প্রথম কয়েকদিন প্রতিবেশীরা আসত, দুঃখ করত, সামান্য হলেও খাবার দিয়ে যেত। কিন্তু সে আর ক'দিন। আস্তে আস্তে ভাঁটা পড়ল। পরে ওদিকে আর কেউ ঘেঁষতো না। কিন্তু জ্যান্ত পেটটা নিয়ে তার বেদিশে অবস্থা। নিরুপায় ফুলমনি একদিন ক্যানিং হয়ে শেয়ালদা ইস্টিশনে উপস্থিত হলো। সে বুঝেছিল, শেয়ালদা ইস্টিশন সুন্দর বনের চেয়েও খারাপ, বিপজ্জনক, ভয়াবহ। সে প্রথমে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তারপর খর স্রোতে ভেসে গেল সব। নাঙ্গা হয়ে গেল সে। স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিল নিজেকে। সেই থেকে ভেসে চলেছে ফুলমণি। আজও। গণার ঘাটে নোঙর ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু গণা বড়ো পল্‌কা; কখন পাটকাঠির মতো ভেঙে যাবে কে জানে! তবু এই গণাই তো তার ভরসা। অগতির গতি।

"শুয়ে পড়ালি, খাবি না গণা?"

"তোর হলো?"

"আর এটটুখানি বাকি।"

"হোক্। এট্‌টুখানি লম্বা হয়ে নিই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই গণা ফুরুৎ-ফুরুৎ নাক ডাকতে থাকে। ঘুমন্ত গণাকে দেখে ফুলমণির কেমন মায়া লাগে। গণার আঠালো ঘন চুলে ভরা মাথায় পরম মমতায় হাত রাখে ফুলি। যেন সে অবোধ শিশু। টেঁপি আর গণা একাকার হয়ে যায়।

গণার ইষৎ হাঁ করা মুখে মাই গুঁজে দিতে ইচ্ছে হয় তার। টেঁপিটা ভীষণ লোব্‌লা, টানতে পারে না।

ফুলমণি আনমনা হয়ে পড়ে। ক্রমে রাত বাড়ে। রাস্তায় মানুষের চলাচল কমে আসে। অন্যান্য ঝোপ্‌ড়িগুলো থেকে আওয়াজ আসে—অস্পষ্ট ; কিছু বোঝা যায় না। এদিকে অসাড়ে পড়ে আছে গণা। তার পাশে এক রত্তি সল্‌তের মতো টেঁপি। বাপ-বেটি ? হয়ত তাই। ফুলমণি চায় নি, ওর সন্তানের পরিচয় হোক বেজন্মা হিসেবে।

হঠাৎ হৈ-চৈ। ফুলমণির সম্বিত ফিরে আসে। রাত অনেক হলো। এবার খাওয়া-দাওয়া সারতে হয়। গণাকে ঠেলে, বলে, "গণা, ওঠ ; খাবি না ? রান্না হয়ে গেছে।" গণা পাশ ফিরে শোয়।

ততক্ষণে হৈ চৈ হট্টগোল ওদের ঝোপ্‌ড়ির কাছে চলে এসেছে। কথা কাটা-কাটি চলেছে তুমুল। এবার স্পষ্ট শুনতে পায় ফুলি। সেই মুখরা খোঁড়া বুড়ির নাতনিকে নিয়ে কাণ্ড শুরু হয়েছে। বয়স আর কত, চোদ্দ-পনের। এরই মধ্যে পাকা খান্‌কি হয়ে উঠেছে। ভাদ্দরের কুত্তির মতো একই সঙ্গে তিন-চারটে কুত্তাকে অনায়াসে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে একবার পেট খসিয়েছে। "আ মরণ, ভদ্রলোকেদের মতো পেট খসানোর কী আছে রে মাগী ? বাজার চিনেছে। জানিস না, ভগবানের জীব পেটে ধরতে হয়। বেজন্মা কোথাকার।" দাঁতে দাঁত পিষে আপন মনে বলে ওঠে—"তোদের লজ্জা নেই, রাত দুপুরে কুত্তা-কুত্তির মতো হুটোপাটি কচ্ছিস ?"

আচমকা চিৎকারে ওরা থেমে যায়। মেয়েটি পায়ে পায়ে এসে ফুলির মুখোমুখি হয়। বলে, "এ কী বলচ গো ফুলি মাসি। তোমারটা তো কারো জানতে বাকি নেই।"

"কী জেনেচিস্‌ লা ?"

"আহা, তোমার ন্যাঙ্‌..."

"আছে কো। একটাই। পারমেন্ট।"

"জানি জানি, গণা ঢ্যামনা। আর গলির ভিখিরি বুড়োটা তোমার কে গো ?" মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেনে টেনে বলতে থাকে মেয়েটি। কোমরে হাত দিয়ে হিন্দি সিনেমার মেয়েদের মতে নাচের ভঙ্গিতে ফুলির দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে আসে।

ফুলির মাথার ভিতরটা চির্‌বির্‌ করে ওঠে। কিন্তু বলতে পারে না। গণাটা

ঝোপড়িতে। কে জানে এতক্ষণে হয়ত জেগে উঠেছে। তাই ভিখিরি বুড়োর কথা উঠতেই সে থাতিয়ে যায়।

"তুমি যে কত সতী, আর কারো জানতে বাকি নেই।" বলতে বলতে মেয়েটি লাইট পোস্টটা পেরিয়ে বড়ো বাড়িটার আবছা আবছা অন্ধকারের দিকে চলে যায়। ওর পিছু নেয় তিনটে প্যাংলা-হ্যাংলা ছোকরা।

ফুলি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে ঝোপড়িতে ঢোকে। দ্যাখে, গণা বসে আছে। মুখটা কাঠের মতো শক্ত। বলল, "খেতে দে।"

এই তো ফুলমণির সংসার। সে ভেসে চলে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে। নোঙর ফ্যালে বেলে মাটিতে। নোঙর বসে না। গাঁথে না। আলগা। ভীষণ আলগা। বারবার আপনি উঠে আসে। আবার ভাসতে থাকে। এলোমেলো। ইদানীং সে গণাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চায়। গণাটা মাঝে মাঝেই ফসকে যায়। চলে যায় কোথায় কে জানে! মাঝে মাঝে ফিরে আসে।

আজ প্রায় এক মাস হলো গণার কোন পাত্তা নেই। ফুলি ভাবে, "মরে-টরে যায় নি তো! না-কি অন্য মাগের ভাতার সেজে তাকে ভুলেছে!

ফুলমণির শরীরে অসহ্য ব্যথা। মাথা তুলতে পারে না। ভার। ঘনঘন বমি। পেটের ভিতরটা যেন খামচে ধরেছে। নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। অসাড় হয়ে যাচ্ছে। কাপড় ভিজে। চোখে অন্ধকার দেখে সে। রাত ক্রমশ বাড়ে। কেউ নেই। শুধু টেঁপি। ভিখিরিটাও তো একবার আসতে পারত। আসে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে ফুলির। "গণা, গণাটা এখন কোথায়, কোন গর্তে সেঁধিয়ে বসে আছে; শালা, হারামি। গণা, আর যে বাঁচি না আমি। তোকে নিয়ে, টেঁপিকে নিয়ে আমার যে বাঁচতে ইচ্ছে হয় রে!"

ফুলমণি ক্রমশ নিথর হয়ে আসে। চোখের আলো মুছে যায়। তারপর অন্ধকার! পাথরের মতো অন্ধকার নেমে আসে ফুলমণিকে ঘিরে।

ভোরের ট্রেন

গৌতম ভট্টাচার্য

ভোর পাঁচটায় ট্রেনটা পাশ হয়। যাত্রী যারা তারা অধিকাংশ হল—কৃষক, মজুর, ছোট ব্যবসায়ী, ও বিভিন্ন বড় ব্যবসাদারের কাজে এবং ছোটখাটো শিল্পে নিযুক্ত থাকা আরো কিছু মানুষ।

বেশ কিছুটা দূরে আসনসোল শহর। ঠিক সকাল আটটা হলে এসব লোকগুলো আসানসোল শহরটাতে গিয়ে ভীড় করে। কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফসলগুলো ওখানে বিক্রি করতে নিয়ে যায়। মজুররা যখন গ্রামাঞ্চলে কাজ পায় না তখন তারা ঐ শহরটাতে কুলি খাটতে যায়। ছোট ব্যবসা ও আরো অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকা মানুষদের অধিকাংশ হল, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা। তারা স্কুল, কলেজের দু-চারটে ডিগ্রি নিয়ে ভারতবর্ষের অনেক কারখানায়, খনিতে ঘুরেছে—কিন্তু চাকরী পায়নি। শেষে অধিকাংশই ছোটখাটো ব্যবসার কাজে নেমেছে। ওদের কেউ কেউ সংসারী। বিয়ে করেছে। ছেলে মেয়ের বাপও হয়েছে। ঐ ভোরের ট্রেনটার ওপর নির্ভর করে চলে এ অঞ্চলের কতকগুলো সংসার। দিনের পর দিন ঐ লোহার জন্তুটা যুগিয়ে আসছে এ অঞ্চলের কতক-গুলো মানুষের পেটের ভাত ও কাপড়।

পরেশ ঐসব মানুষের একজন। ও ছোট ব্যবসায়ী। পুঁজি কম। সবজীর ব্যবসা করে। সে পূর্ণ সংসারী। তিন চারটে ছেলে মেয়ের বাপ। পরেশের অবশ্য বিয়ে করে সংসারী হওয়াটা একদম ইচ্ছে ছিল না। কারণ, এদেশের বেকার যুবকদের বিয়ে করে সংসারী হওয়াটা একদম শোভা পায় না পরেশ তা বেকার জীবনে এসে মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিল। তবে ওর বাবা স্বর্গে যাবার কিছুদিন আগে একটা মেয়েকে জোর করে ওর গলায় গেঁথে দিয়ে গেল। বিয়ে হতেই ছেলে। এভাবে সময়ের আবর্তে পরেশ পূর্ণ সংসারী হয়ে দাঁড়াল।

পরেশ মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত টিপে বলে, বাবার কথা শুনে বিয়ে আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

হতাশা যখন ওর টুঁটি চেপে ধরে তখন ও স্বর্গীয় বাবাকে পর্যন্ত গালিগালাজ করতে দ্বিধা বোধ করে না। পরেশ ঐ ভোর পাঁচটার ট্রেনটার রোজকার একজন যাত্রী। সে রোজ ঐ ট্রেনটাতে আসানসোল শহরে আসে। আসানসোল শহরে

সে সবজীর ব্যবসা করে। তবে তার স্থায়ী কোন দোকান নেই। ফুটপাথে বসে। কোন রকম ঐ ট্রেনটা ধরতে না পারলে সেদিন আর ঠিক সময় মতো আসানসোলে পৌঁছুতে পারবে না। কেননা পরের ট্রেন অনেক দেরীতে আসে। বাসস্ট্যান্ডও তার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। এদিকে সকাল আটটার মধ্যেই তাকে আসান-সোলে পৌঁছুতে হবে। কেননা চালানী সবজী সময় মতো হাতে না গেলে সেদিনের তার ব্যবসাটাই মাটি। আর ঠিক সময় মতো আসানসোলে পৌঁছুতে না পারলে পরের দিন ঘরের ছেলেমেয়ের উপোস। পরেশ আসানসোল যাবার সময় ঘরের ছেলেমেয়েদের এক বেলার খোরাক দিয়ে যায় আর এক বেলার খোরাক সে ব্যবসা সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি এসে দেয়। পরেশের বৌটা অবশ্য ভালো। সে স্বামীর সামান্য রোজগারে কোন রকম গুছিয়ে গাছিয়ে সংসারটা চালায়।

পরেশ মাঝে মাঝে ওর বৌ মল্লিকাকে বলে, তোমার খুব ভাগ্য খারাপ বুঝলে। আমার মতো বেকার স্বামীর হাতে পড়েছো।

মল্লিকা কোন কথা বলে না। দাঁত টিপে হাসে। মল্লিকা যথেষ্ট বোঝে অভাবী হলেও তো স্বামী। পরেশের মাঝে মাঝে লজ্জাও পায়। কেন লজ্জা পাবে না? ওর বৌ যখন ফুটো ব্লাউজ পরে অন্য পুরুষ মানুষের সামনে দাঁড়ায়। শাড়ীর অভাবে যখন কোন উৎসবে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। গেলেও মুখ নিচু করে থাকতে হয়। এসব দেখে কোন্ পুরুষের না লজ্জা হয়? শত লজ্জাকেও পরেশকে বুকে চেপে রাখতে হয়। তার এ বিবেকটা আছে অভাবী হলে মানুষকে লজ্জার দাস হয়ে থাকতে হয়।

পৌষের ভোর। ঠান্ডা সির্‌সিরে হাড় কাঁপানো হাওয়া। যেন দেহের ভেতরকার হাড় পাঁজরাগুলো পর্যন্ত কন্‌কনিয়ে ওঠে। পরেশ মেঠো পথ দিয়ে হাঁটছে—ভোরের ট্রেনটা ধরবে।

মেঠো পথের দু-ধারে সর্ষের ক্ষেত। সর্ষে গাছগুলো থেকে টপ্‌টপ্‌ করে শিশির ঝরে পড়ছে। শিশিরে সিক্ত হলদে সর্ষে ফুলগুলো ভোরের ঠান্ডা হাওয়া পেয়ে হাসছে। পরেশের এসব দেখতে বড়ো ভালো লাগছে। ও মনে মনে ভাবছে—সারা দেশটা যদি এরকম সোনালী ফসলে ভরে যেত তাহলে দেশের মানুষগুলোর এতো অভাব থাকত না।

মেঠো পথের ঘাসগুলোতে জলের মতো শিশির জমেছে। পরেশ ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য গোটা মাথা ও শরীরটাতে পুরনো ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে নিয়েছে। কেবল মুখ আর চোখ দুটো খোলা। এতো হাড় কাঁপানো

শীত যে পথে পা ফেলা যায় না। তবুও পরেশ পৌষের উলঙ্গ হিমেল হাওয়া ও শীতকে দুপায়ে মাড়িয়ে একের ওর এক পা ফেলে স্টেশনের দিকে হেঁটে চলেছে। হঠাৎ একটা চেনা গলা পরেশের কানের কাছে ভেসে এল—তাড়াতাড়ি হাঁটো হে ঠাকুর, ট্রেন যে স্টেশনে ঢুকে গেল!

কথাটা শোনামাত্র পথ চলতে চলতে এক পলক দৃষ্টি ফেরাল পরেশ। দেখল, আলুর ক্ষেতের পাশে কুঁড়ে করে সারা রাত জেগে বসে আছে অর্জুন বাগ্দী। তার চোখে মুখে রাত জাগা ক্লান্তির ছাপ। সরল গ্রামীণ মানুষ অর্জুন। পরেশের গাঁয়ের ক্ষেত মজুর। মনে মনে ভাবল পরেশ—বেটা বাগ্দী! সারা রাত ফসল আগলে বসে আছে! এদিকে পেটে ভাত নেই!

ঠিক তারপর মুহূর্তেই স্টেশনের দিকে তাকাল। তাকাতেই অবাক। ট্রেন স্টেশনে প্রায় পৌঁছে গেছে। পরেশ ছুটছে। ছুটতে ছুটতে সে স্টেশনের সামনা সামনি পৌঁছল। স্টেশনে পৌঁছতেই ট্রেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল। পরেশ পথ হাঁটা ক্লান্ত দেহটাকে নিয়ে স্টেশনের মধ্যে বসে পড়ল। একরাশ ঘন বিষণ্ণতা এসে তার মনকে চেপে ধরল। সে ভাবতে শুরু করল, এখন সে কি করবে। পরের ট্রেনও অনেক দেরীতে আসে। এদিকে সকাল আটটার মধ্যে আসানসোল শহরে পৌঁছতে না পারলে চালানী সব্জীও অন্যান্যে সব ব্যবসাদার-দের হাতে চলে যাবে। কোন উপায় খুঁজে পেল না পরেশ। আজকের ব্যবসাটা তার মাটি হয়ে গেল। নিরুপায় ক্ষতিগ্রস্ত পরেশ শেষটায় বাড়ির দিকে মুখ ফেরাল।

মল্লিকা পরেশকে দেখে অবাক। ও সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে মুখে জিজ্ঞেস করল—কি হল! ঘুরে এলে? পরেশ হতাশার সুরে জবাব দিল—ট্রেনটা ধরতে পারলাম না।

মল্লিকা চোখ টেনে বলল—তোমার যা ঘুম! কেন ট্রেন ফেল হবে না? খেটে খাওয়া মানুষের কি এতো ঘুমুলে চলে?

পরেশ হাত-পা ধুয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। রাতের বিছানাটা এখনো পাতা আছে। বিছানায় তার চার বছরের মেয়ে মিতা শুয়েছিল। কি অদ্ভুত মিতার চেহারা। বুকের পাঁজরাগুলো সহজেই গোনা যায়। পুষ্টির অভাবে যেন ঠিক মতো বেড়ে ওঠেনি।

পরেশের ছোট ছেলে ভোলা সকাল থেকেই কাঁদতে শুরু করেছে। সে চায় মায়ের বুকের দুধ। মল্লিকা অভাবী মা। সে গোটা তিনেক কাচ্চা বাচ্চা প্রসব-

করার পর দুধের ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছে। তারপর আবার পেটের মধ্যে এক নতুন জীবের আগমন। তার জন্যও সঞ্চয় রাখতে হবে দুধের ভাণ্ডার। তাই সে ভোলাকে এখন বুকের দুধ দিতে চায় না। ভোলার বড্ড খিদে! সে মায়ের দুধ খেয়েই পেট ভরাতে চায়।

দিনের খোরাক বাড়িতে পরেশের দেওয়া ছিল। শীত কালের দিন। খুব ছোট। কোন রকম দিন গড়িয়ে বিকেল এল। পরেশের বৌ মল্লিকা বলল—হ্যাঁ গো, রাত্রে কি হবে?

দেহের দু-পাশে দু-হাত কিছুটা ছড়িয়ে একটা ক্লান্তির হাই তুলতে তুলতে বলল পরেশ—কি আর হবে? রাতে উপোস দিতে হবে!

মল্লিকা বলল—ছেলেগুলো বুঝি উপোস দিতে পারবে?

পরেশ বড়ো সমস্যায় পড়ল। বিশেষ করে ওর মিতা বলে মেয়েটা তো এক বিন্দু খাবার কম হলে পাড়া মাতিয়ে দেয়। বড় ছেলে রতনের তো দানবের মতো খিদে। খিদে ও একদম সহ্য করতে পারে না। পরেশ ভোরের ট্রেনটা ধরতে না পেরে বড়ো মুশ্কিলে পড়েছে।

মল্লিকা পরেশকে বলল—হ্যাঁ গো, এতো চিন্তার কি আছে? তোমার পুঁজি ভেঙে আজকের রাতটার মতো তিনটা টাকা দাও না। ছেলেগুলোকে কোন রকম ফেনভাত ঘেঁটে দি!

—না! আমি পুঁজি ভাঙতে পারবো না! পুঁজি ভেঙে গেলে একদম জীবনের মতো উপোস পড়ে যাবো!

—ওগো শীতের রাত—ছেলেগুলো যে না খেয়ে আধমরা হয়ে যাবে।

অনেক চেষ্টা করেও শেষটায় আর পরেশ মল্লিকার কথা ঠেলতে পারল না। শেষটায় ওকে পুঁজি ভাঙতে হল। পুঁজি ভাঙা তিনটে টাকায় হল পরেশের সংসারে এক শীতের রাতের খোরাক।

মল্লিকা ফেন ভাত ঘেঁটে থালা বাটিগুলোতে দিতে শুরু করেছে। খেতে খেতে মিতা বলে উঠল—মা! খুব ভালো হয়েছে! আর একটু দাও না।

মল্লিকা জোরে চেঁচিয়ে উঠল—হ্যাঁ, যতোটুকু আছে তোর পেটটাতে পুরে দি।

পরেশ খাচ্ছে। ও খেতে খেতে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমিও বসে পড়ো, রাত হয়েছে।

খাওয়া শেষে মল্লিকা পরেশকে জিজ্ঞেস করল—তোমার পেট ভরেনি, নাগো?

পরেশ বলল—আমার ভরেছে, বরং তোমারই কম হল।

কি অদ্ভুত এদের সাংসারিক জীবন !– খাওয়ার ব্যাপারেও এরা যেন স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে গোপন রাখতে চায়।

একটা পুরনো টালির ঘর। তাতে গুটি কয়েক নির্দিষ্ট বালিশ বিছানা পাতা। পরেশের সংসারে শুধু চাল ডাল নয়। শীতের দিনে লেপ তোষকেরও বড়ো অভাব। রোজ শোবার সময় ছেলে মেয়েগুলো লেপ তোষক নিয়ে ঝামেলা করে। ঝামেলা সামলে পরেশ তার ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকার।

গ্রামখানা একেবারে নিস্তব্ধ।

মল্লিকা বাড়ির কাজ সেরে পরেশের পাশে এসে শুয়ে পড়ল। পরেশ তখনও ঘুমোয় নি। বিছানার ভেতর সে ঘুস ঘুস করছিল। মল্লিকার দেহের স্পর্শে পরেশের সমস্ত শরীরটা যেন শিউরে উঠল ! বরফের মতো ঠান্ডা মল্লিকার দেহ !

পরেশ পাশ ফিরে মল্লিকার মুখখানা চেয়ে দেখে। লণ্ঠনের টিম টিম আলোয় মল্লিকার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায়। সারাদিন একটানা অভাবের বোঝা বয়ে যেন কতো ক্লান্ত ও করুণ মল্লিকার মুখ।

মল্লিকা বলল—কি এমন করে এক দৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে আছো কেন ?

পরেশ মুখে কিছু কথা বলে না। সে শুধু এক দৃষ্টে মল্লিকার করুণ মুখ-খানা চেয়ে চেয়ে দেখে। পরেশের এ মুহূর্তে ভীষণ ভালো ভাসতে ইচ্ছে করছে মল্লিকাকে। সে অতন্তে সযত্নে মল্লিকার করুণ মুখখানি নিজের বাম বাহুর ওপর রাখে। ধীরে ধীরে ধীরে মল্লিকার মাথায় ঢেলে দেয় তার ডান হাতের সোহাগী পরশ। মল্লিকা চাপা গলায় বলল—শুনেছো, আজকের মতো কালকে ভোরের ট্রেনটা ফেল করো না যেন !

পরেশ কিছুক্ষণ চুপ চাপ। তারপর একটু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তুমিও কাল একটু ভোর ভোর উঠিয়ে দেবে, তা না হলে একদম ঠায় উপোস দিতে হবে !

•

হামিদের গান

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

পৃথিবীর কিছু কিছু নিয়ম পৃথিবীর সব পোকাদেরই জানা। পর পর তিন বার চাষ জলে ডুবে গেলে, গাছগুলির ক্ষীণ-রুগ্ন-স্পর্ধাকে যে সহজেই জব্দ করা যাবে, এটা তারা জেনেছিল। মকবুলের সন্তান হামিদ এ সব চক্রান্তের খবর না রেখেই শেষ পর্যন্ত পোকাদের মতোই পড়েছিল জমিতে।

বাপের সঙ্গে কথা কওয়া কওয়ি বন্ধ সেই থেকে। অবশিষ্ট বিড়া ক'টি থেকে পাখিদের মতো খুঁটে খুঁটে কিছু শস্য যখন জড়ো করবার ফালতু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল সে, তখন শালের আগুন থেকে দু' দশটা ফুলকি উড়ে আসছিল।

কারণটা অর্থনৈতিক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেহিসেবী পয়সা খরচ করে জমিতে সার ঢেলেছে হামিদ। সে সব এসেছে পূর্ণ ঘড়ুই-এর সার-ওষুধের দোকান থেকে। মকবুলের ধার বাড়িয়ে।

—বেবাক মানুষকে কী তমার মত হতে কও?

লাল আগুন হয়ে বাঁশ-কঞ্চিসহ মকবুল তেড়ে উঠতেই, বাপের বিক্রমের ভয়ে যুবক হামিদ পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল কিম্বা মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাটির গুণ পরীক্ষা করছিল।

যে কোনো মানুষেরই এ সব দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। ফিরে এসে নিজের হাতের কাজে মন দিলো মকবুল। এক অবাধ্য ছোকরার পাল্লায় পড়ে মধ্যবয়সেই সে পুরোটা বুড়িয়ে গেল। মুহূর্তেই টের পেলো, মগজে স্যাঁতলা পড়ছে—কব্জীর হাড় ঢিলে হয়ে গেছে—হাটে হাটে ঘুরে পায়ের গাঁট খুলে পড়ছে—রোদ-বৃষ্টি সহ্য করবার মুরোদ নেই চামড়ার—পেটে খাদ্য জমে থেকে ভুট ভুট ফোটে—এ এক অসহায় অবস্থা।

মুখ তুললেই পূর্ণর প্রাসাদ। তিনতলা কোঠা। গাছ দিয়ে পুকুরের চারপাশ সাজানো। জলে মাছ। তিনটে ধানের গাদা। এ পাড়ার মধ্যে যেন একটা উদ্ভট চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ পাড়ায় বেড়ে ওঠাটা পূর্ণর বড় অস্বাভাবিক।

তার পাশে থেকে কোন্ মানুষের না হাব-ভাব সঙ্গীতিতে ঐ রকম একটা কিছু হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়? শেখ মকবুলের সন্তান হামিদের মাথায় অহরহ সেই পোকা

ঘুরেপাক খায়। মকবুল বলে, বাপরে—নিজেদের জাত-ব্যবসা টিন-ঝালা রাংঝার কাজ। হাতের কাজ। তাই কর না ক্যান—মোকে হেল্প কর। দু জনের পত্তরে দেখবি, দু দিনের স্থানে তিন দিন লাগবে অমন হতে।

হামিদ বলে, না—মুই বিকল্প চাষ করব।

বিকল্প চাষ করা আর আগেকার দিনের বড় লোকের হাতি পোষা—এ দুই-এ বেদম মিল। যারা করতে পারে দেখতে দেখতে পূর্বের মত লাল। ছেলে সেই স্বপ্নে বিভোর।

হামিদ বলে, জাত-ব্যবসা কও ক্যামনে? আমানকার জাত-ব্যবসাই যদি কও, সে তো পটীদারী। তুমি কি সে সব কর? তমার বাপ করছে?

একথা সত্যি। এখনো তল্লাটে মকবুলের বা হামিদের পরিচিতিতে পটীদার শব্দটি এঁটে বসে আছে। লোকে বলে, মকবুল পটীদার।

মকবুলের বাবা সাজেদ না কি পট দেখানো ছেড়ে ছুড়ে প্রথম টিনের কাজ-ঝালের কাজে মন দেয় বাল্যকাল থেকেই। মকবুল জন্মাবার পর থেকে সে-সব দেখে আসছে। কেবল মুরুব্বিদের বলতে শোনে, তার ঠাকুরদা পট দেখাত—গান বাঁধত—ঠাকুর গড়ত।

এ এক আজব ব্যাপার! আজ মকবুল সে সব স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। হামিদের মাকে সাদি করবার পর থেকে নয়া-র প্রথম পক্ষ আউট। বউ মরলে, সম্বন্ধিদের সঙ্গে সম্পর্ক কি? তারা না কি তবে এখনো পট দেখায়—টিভিতে তাদের ছবি বেরয়—রেডিওতে তারা কথা কয়। নয়ার পটীদারদের খুব নাম!

সে সবের সঙ্গে মকবুলের দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ নেই। এখন হরিনামের বস্তীর মুসলমানদের সঙ্গেই তার নিয়মিত ওঠা-বসা—আচার আচরণ।

আজ হামিদ হঠাৎ সেই প্রসঙ্গই তুলল। এ এক অদ্ভুত অবস্থান তাদের। পটের সঙ্গে—গান বাঁধার সঙ্গে—ঠাকুর তৈরির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই তার, অথচ লোকে বলে পটীদার। কেন ঝালদার বলতে কি গায়ে লাগে?

টিনের পাতে ফুটো ফুটো নক্সা গড়ে উঠছিল। এরপরই ভাঁজ করে ঝাল দিয়ে দিলে একটা চাল-ধোওয়া চুঙ্গনি গড়ে উঠবে। চুঙ্গনি লম্ফ মগ—এই সব তৈরি হবে একের পর এক, মকবুল পটীদারের হাতে। সে সব যাবে রাণীচক-সবং-বুড়োল-মোহার-তিলন্তপাড়ার হাটে।

অঘ্রাণের বেলাতেও হালকা ঠান্ডা থাকে। তবু হামিদের মা সফিরু আদুল পিঠ। সামনে থেকে কাপড় উঠে গিয়ে ঘাড় বেয়ে ফের সামনে নেমে এসেছে।

কতকগুলি কাঠ কাঁড় আর পাতা যোগার করে এসে সামনেটায় দো-পাখা উনোন ধরিয়েছে। একটায় ভাতের কালো হাঁড়ি, অন্যটায় গরুর জাবনার গরম জল।

অন্যমনস্ক হামিদ সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। সুখ দুখতে ভাগ্যটা চাকার মতো ঘোরে। বাপের অত কাৎরানির মানে সে তাই খুঁজে পায় না। আর ঝালের কাজ সে শেখেনি বা বাপকে হেল্প করবার প্রয়োজন অনুভব করেনি বলে তার মনে কোনো সে দুঃখু নেই। তবে বাপের পরিশ্রম দেখলে কষ্ট হয়। রোজগার বাড়িয়ে বাপের শরীর স্বাস্থ্যটা ভালো রাখতে সাধ জাগে। পূর্ণ ঘড়ুইকে লোকে বড়লোক বলে। এ পাড়ার খড় টালির টুঙি-ঘরের মাঝখানে বড় পূর্ণর চেহারাটা বড্ড বেঢপ। বহু বদনাম তার। তবু নিশ্চিন্ত থাকে হামিদ তাদেরও এ পাড়ায় কেউ গরীব বলে না। বরং সবাই ঈর্ষা করে।

গ্রামের এক দিকে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে তাদের বাস। ঘড়ুই ডোম পাটাদারদের পাড়া। ঘড়ুইরাই সংখ্যায় বেশি। অধিকাংশই মুনিস খেটে পেট চালায়। ব্যতিক্রম পূর্ণ ঘড়ুই। বাপ ভূষণ ছিল এলাকার নাম করা ডাকাত। সবাই জানত, অথচ ধরা পড়েনি কোনো দিন। যে দিন পঞ্চু পারিয়ালের ঘর ডাকাতি করতে গেল, পুরো দলটাকেই ঘিরে ফেলেছিল গ্রামের লোক। বাকিরা জ্যান্ত ধরা পড়লেও ভূষণকে লোকে পেয়েছিল দু'টুকরো অবস্থায়। পূর্ণর বাড়-বাড়ন্ত অবস্থাটা সেই থেকেই। পূর্ণও ডাকাত। তবে বাপ-ব্যাটায় বিস্তর ফারাক। ভূষণের লজ্জা ছিল, পূর্ণর তাও নাই। ভূষণ ছিল রাত-চরা, পূর্ণ দিনেই করে।

প্রতি বছর এ পাড়ায় একবার করে কলেরা হ'ত।—কার্তিক মাসে। আটা-ঘাঁটা মাইলো-ঘাঁটা খেয়ে মানুষকে বেঁচে থাকতে হত। সে সব দিন এখন নেই। আটাত্তরের বন্যার পর থেকেই বোরো চাষের কল্যাণে এলাকার হাল বদলে গেছে। এসব হামিদের নিজের চোখে দেখা জিনিস। লোকে জমি কিনছে—ঘর তুলছে—রেডিও সাইকেল ঘড়ি কিনছে—জল কিনে চাষ করতে করতে নিজের শ্যালো বসাচ্ছে—তারপর পয়সা কড়ি জমিয়ে বুড়োল বাজারে দোকান দিচ্ছে। মাদুরের আড়ৎ, ওষুধ, সার, কাপড়, ভূষিমাল, চা-পান-বিড়ি। বুড়োলের হাট বসত হপ্তাহে একদিন। মূলত মাদুরের হাট—আড়ৎদারেরা কিনে নিয়ে যেত এসে। সেই বুড়োল মোরান বিছানো রাস্তাকে ঘিরে এখন জমজমাট। মানুষ সূর্য ডুবলে ঘরে না ঢুকে বুড়োল বাজারে চা-বিড়িতে কাটিয়ে রাত করে ঘরে ফেরে।

এ একটা জগৎ। হামিদের স্বপ্ন এ সবকে নিয়ে। যে স্বপ্ন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গান শোনায়। তার পূর্বপুরুষের মতো অতীতের গান নয়।

তাই প্রায় যে কোনো অজুহাতে বাবা মকবুল ঘাড় বা চুল ধরে পিঠের ওপর দু'চার ঘা বসালে কিম্বা চেঁচিয়ে গালি-গালাজ করলেও নির্লজ্জের মতো সে চুপ চাপ থাকে। মকবুল হয়তো ভাবে, বড্ড বেয়াড়া আর অবাধ্য এই হামিদ। মুচকি হাসে হামিদ। করেই দেখিয়ে দেবে সে।

তেরো কাঠা জমি সব মিলিয়ে। চাষ করলে ছাব্বিশ থেকে তিরিশ মন ধান। বাপের চক্ষু স্থির। এ বৎসর হামিদ বসাতে পারলেই পয়সা। জল বিক্রির পয়সা। মালিক হামিদ তখন কার পরোয়া করে।

এই জন্যই ক্ষেতে খেসারি কলাই বুনতে দেয়নি সে। তাই নিয়েও মকবুলের সে কি চোটপাট! তাছাড়া আজকাল খেসারি ডাল খেলে নাকি মানুষের পক্ষাঘাত হয়। এসব গরু খায়। অথচ বাল্যকালে তারা শুধু খেসারি সেদ্ধ খেয়েই কত দিন পেট চালিয়েছে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বেলা বাড়ছিল। এরই ফাঁকে এক সময় গজর গজর করতে করতে মকবুল ভাত খেয়ে বাঁকের এক দিকের সিকেয় যন্ত্রপাতি অন্য দিকে তৈরি জিনিসপত্র ঝুলিয়ে হাটে চলে গেল।

ছাগল গরু ঠুকে দিয়ে এসে মুরগীর গু ঝাঁট দিয়ে তার মা খুঁটে পাওয়া ক'টি ধান সেদ্ধ করতে বসল। আর হামিদ দেখল, পৃথিবীর চেহারাটা পাল্টে গেছে। পূর্ণর মতো আর একটা ঘর এ পাড়ার বুকে বুক চিতিয়ে মরদের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার ভেতর রাম ঘড়ুই-এর আবড়া ঝি হামিদ সেকের বিবি সেজে ঘর গোছাচ্ছে—মা বেঞ্চিতে বসে বসে পান খাচ্ছে—বাপ মস্ত একটা পাকা দোকান দিয়ে বড়োল বাজারে গেড়ে বসেছে। জগতের কাণ্ড কারখানে দু'হাত মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে হামিদ পটীদার। তার পূর্বে পুরুষের পটে আঁকা রাবণকে বাধাদানকারী জটায়ুর মতো। সবই হচ্ছে বিস্তৃত চরাচরে—মুক্ত বাতাসে।—নীল আলোতে।

তখনই গায়ে তেল চাবড়ে রোদ লাগা ঘাটে স্নানে গেল হামিদ। রাম ঘড়ুই-এর ঝি আঙুর ভেজা কাপড়ে ফিক করে হাসি ছাড়ল।

সন্ধেবেলা একবার যাবে খন হামিদ।

মুখের ভেতব জল—জলের ওপর রোদ—রোদে জলে রঙ—একটা ফার্স্টক্লাস বেলুন আকাশে উড়ে গেল। হামিদ দেখল অবাক হয়ে। মাথার ভেতর থেকে খস খস শব্দে সুখ নামছিল বুক হয়ে পেট হয়ে তলপেটের দিকে। আঙুর আঙুর ও আঙুর, আঙুর বড় টক—কানে কানে বলে যা না সত্যি না কি ঢপ?

আঙুর একটা জ্যান্ত রহস্য। তার ভেজা পেছনে তাকিয়ে তাকিয়ে হামিদ জলে ডুব দিলো। ডুব দিয়ে সোজা পূর্ণ ঘড়ুই-এর ঘাটে। সেখান থেকে ফের ডুব। এ পাশের ঘাটে। ভাত খেয়ে বড়াল যেতে হবে—পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বীজধান দেবে—কাম মাত্র দাম—হামিদ মুহূর্তেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবার সন্ধের পর আকাশ দেখবে—নক্ষত্র চিনবে—বাতাস খাবে—গান গাইবে।

এখন ভেজা গায়ে বাতাস এসে শরীরে শীত তুলেছে।

॥ দুই ॥

আকাশে মুখ তুললেই কিম্বা মাটিতে চোখ ধরে রাখলে গনগনিয়ে গান নামে বটে হামিদের শরীরের খাঁচার ভেতর তাঁরে—টুং টুং। কিন্তু ফটাফট কতকগুলো কথা মনে পড়ে যায়। কেন এরকম হয়? আঙুররে তুই কার?

বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে নাড়ি কাটার গণ্ডগোলে পূর্ণর বউ মরেছে—পঞ্চম বাচ্চা মরেছে। আঙুর এখন সারা দিনই পূর্ণর ঘরের কাজ সারে। কাজ করতে করতে গতর ডাগর হয়। হামিদের সঙ্গে গল্প করবার সময় কমে। পূর্ণ চাষে বিপরীত মার খেয়েছে।

আঙুর বলে, পুন্নদার সময় খারাপ যায়ঠে যে। তমাকে ডাকছিল একটিবার—

—মোকে?

—ফের কাকে? আঙুর হাসিতে টইটম্বুর ফুলে আছে। সেপটিপিন ধরলেই রস খসবে টুপ টুপ। কিন্তু বেলুনের মতো ফটাস শব্দে চুপসে যাবে না। হামিদ মন খারাপে মজা পায়। —ক্যানে?

—ক্যান? কুন সারটি কুন ওষুধটি পয়োগ কচ্ছিলে জমিতে?

—চাষে পুন্ন রাজা! সে জানে নি?

—জানলে কি আর পোকায় খায়?

—তাতে তোর খুব দুঃখু না রে?

—মোটেই না।

—ফের?

—ডাকছিল—সেউ কথাটাই কইলাম?

এ সব কথা কিছুদিন আগের। এখন গরম। মাঠ ঠাঁ-ঠা। বৃষ্টি নামলে ক্ষেতে উগালে দেবে মানুষ। ঐ সব কথার সূত্রে পূর্ণর সঙ্গে হামিদের ওঠা বসা —ফাই ফরমায়েস—বন্ধুত্ব বেড়ে গেছে। পূর্ণ বলেছে, মোর ক' বিঘা বোরো এবার

তুই চাষ করবি হামিদ। জল পাবি মোর স্যালো থিকে, সার ওষুধ মুনিসের আগাম দাম মুই দিব—ধান উঠলে হিসাব হবে।

এ সব কথা শুনে তিড়িং তিড়িং লাফিয়ে হামিদ প্রসঙ্গ তুলেছিল মকবুলের কানে। মুখের কথা বাপকে বলতে তার ভালো লাগে—এ বরাবর। রাগারাগির কথা মনে থাকে না—বরং একটা মজা শরীরকে চাঙ্গা করে দেয়। সেই মজার রঙ নীল-লালে মাখামাখি! ভিতরে জল বাইরে আগুন—মন গান গায় গুন-গুন-গুন। রগড়টা দেখছিল হামিদ। এই বার মকবুল পাটীদারকে সে জব্দ করতে পেরেছে। এত দিনে! বাপের জ্ঞানের আগুনে ঝাল ধরে—হামিদের খুশির আগুনে দুঃখু ছাড়ে। এই খুশি মকবুলের বাপ সাজেদেরও মনে কি জ্বলে গিয়ে বাতাসে এই রকম লাল রঙ ছড়িয়েছিল? যে দিন পটের কাজে মন না দিয়ে টিন-ঝালের জন্য নিজের আঙুল গুলোকে তৈরি করেছিল সাজেদ? কে জানে।

সব প্রশ্নেরই উত্তর যদি সাথে সাথে মিলে যাবে, তবে আর হামিদ কেন? কিন্তু মকবুলের অমন জবাব সে আশা করেনি। চমকে উঠল!—অত মিলা ঘে'সা ভালো নয়! লোকে কইবে কি?

—কুন লোক?

—বেবাক মানুষ।

মকবুলের মূর্খের মতো কথা শুনে হামিদ বলে, সমস্ত বড় বড় লোক—পার্টির লোক—কে পন্নর দুয়ারে পা দেয়নি কও দেকিনি?

তা তো সত্যি। তবু মকবুল কেন বলল এ কথা? মকবুল নিজেই এখন আর উত্তর খুঁজে পায় না। কেবল দু' চোখ ভাসিয়ে রেখে ছেলের খুশির ঝাঁঝ আন্দাজ করতে থাকে। বড় ভালো লাগে এখন তার ছেলেকে। কাজের মনে হয়।

আড় চোখে বাপের চোখের এই খেলা বুঝতে পেরে হামিদ যেন লজ্জা পায়। নিচের দিকে তাকিয়ে পোকা দেখছে—মাটির গুণ পরীক্ষা করছে।

প্রত্যেকটি মানবের মধ্যে একটা সুর থাকে। আল্লাহর দান। মুরুব্বিদের আঙুল তুলিতে গলায় চোখে যে সুর আসত শ্রমের ভেতর দিয়ে, তার থেকে সাজেদ বা মকবুলের সুরের রঙটা ভিন্ন। কিন্তু হাতের গুণে যখন টিনের ওপর কারুকার্য গড়ে ওঠে, তখন কি গুনগুনিয়ে একটা সুর কেবলই মকবুলকে তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে না? বাউঁড়ি ভূতের মতো? যেন একটা ঘোর মকবুলকে টেনে নিয়ে যায়।

এখন বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধে অন্ধকারের মাতামাতিতে সন্তান হামিদের মধ্যে বীজ-চাষ-মাটি-পোকাদের গান বাজতে শুনেছে মকবুল। তা হোক, কিন্তু মাটিদের পোকাদের চিনলেও মানব-জাতটাকে চেনে কী হামিদ? না চিনলে বেজাতের আঙুরের সঙ্গে অত মাখামাখি কেন? বড়লোক পুন্নর সাথেই বা অত গলাগলির কি দরকার?

আর ভাবতে পারে না মকবুল। এখন পেটে ক্ষিদে। সন্তানকে উন্নতি করতে দেখলে কোন বাপের না শরীর জুড়ে খুশি নামে। আছে এমন বাপ পৃথিবীতে?

বানে ধান না ডুবলে, ধানে পোকা না বসলে, মাটিতে ধ্বসা না নামলে, সময়ে বৃষ্টি হলে—এ এলাকায় আমন ধান কাঠায় মন-মন।

ফাল্গুন-চৈত-বৈশাখে মাঝে মধ্যে বৃষ্টি নামলে, সার ওষুধ সময় মতো প্রয়োগ করলে, ধানে পোকা রোগ না ধরলে, চৈত-বৈশাখে শিল না পড়লে—বোরো ধান কাঠায় দু' মণ।

এই হিসেবে চাষীরা মেতে ওঠে। পোকা-জল-মাটির গুণ সম্পর্কে তাদের সজাগ থাকতে হয়। জাত চিনতে হয়। মাদুর কাঠির চাষের চেয়ে এলাকায় বোরো চাষে মানুষের নজর বেশি আজকাল। চাষীর আসল গুণ হামিদের মধ্যে দেখতে পেয়েছে পুর্ণ ঘড়ুই।

ঘুরে অঘ্রাণ আসতেই বোরো চাষের পরিকল্পনায় নামতে হল। গত বছর মার খেলে ও, এ বছর যাতে লোকসান না হয়, সে কথাই এখন ভাবছিল পুর্ণ। একটু বাদে হামিদ আসবে।

হ্যারিকেনের আলো উলোটি করা দেওয়ালে নানা রকম ছায়া তৈরি করেছে। এ ঘরে পুর্ণ থাকে। একটা ডাঁয়া পিপড়ে সুর-সুর করে উঠে আসছিল। পেনসিল দিয়ে আস্তে ঠেলা মারল পুর্ণ। পড়ে গিয়ে আবার এগুলো। এগিয়ে আসছে। পুর্ণ জানে, আবার কখন খোঁচা মারতে হবে। এতে বলে টাইম-জ্ঞান। নিজের মনেই হাসছিল এখন সে।

আঙুর ঢুকে বলে, পুনোদা এখন আসি মুই?

পেনসিলটার সঙ্গে আঙুরের আঁটো-সাঁটো গতরের হুবহু মিল খুঁজে পেয়ে পুর্ণ উঠে বসে।—ঘর যাবি?

—তবে কি সঙ্গে যাব?

কথা বার্তার কায়দা এনেছে আঙুর। এ সব সে শিখছে পেট ভাঁত খাদ্য পেয়ে—পূর্ণর নাই পেয়ে। মন খারাপ হয়ে গেল পূর্ণর।—যাবি? একটা বার হামিদকে ডাক দিদিত—

—আচ্ছা!

আঙুর চলে গেল। পূর্ণ নিজেই অন্ধকার চেয়ে চেয়ে এটুকু পথ আঙুরের সঙ্গে গিয়ে মকবুল পটাঁদারের উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়তে পারত—হামিদ আছ না কি রে?

কিন্তু গেল না; আঙুর যাক। আঙুর ডেকে দিক।

ক্যান? না। এ সব ক্রিয়াকাণ্ডের কোনো কিছুর মানে পূর্ণর জানা নেই।

অবশেষে হামিদ এল। চার বিঘা জমি পূর্ণর এবার বোরেতে সাঁজায় চাষ করবে হামিদ পটাঁদার। পাক্কা কথা। একটাই শর্ত—পূর্ণ ব্যস্ত মানুষ—নানা ঝামেলা তার—নানা জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ—দুনিয়া সামাল দিতে হয় তাকে—পূর্ণর নিজের চাষটাও সামাল দেবে হামিদ।

রেডিও তে সাড়ে সাতটার খবর বাজছিল। ভাগলপুরে একটা কুঁয়ার ভিতর থেকেপুলিশ তিরিশটা কঙ্কাল উদ্ধারকরেছে। রাম শিলার দাঙ্গা হচ্ছে সারা দেশে। মন্দির মসজিদ মীমাংসার সূত্র খুঁজা হচ্ছে। বামফ্রন্টের বন্ধু সরকার ক্ষমতায় এল।

হামিদ বলে, পুমুকা, এ সরকার কাজ দিবে, কও?

পূর্ণ বলে, হুম।

—তবে উঠি মুই। হামিদ উঠে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণ বলে, ঐ কথাই থাকল—

সে দিন রাতে স্বপ্ন দেখল হামিদ। ডাকাতির স্বপ্ন। কোথায় যেন এক দল ডাকাত ঢুকে পড়ে খুট কাঠ চালাচ্ছে। নিজে ডাকাত না গেরস্থ ঠাউরে উঠতে পারছে না হামিদ। চোর চোর বলে চেঁচিয়েই চলেছে।

মা উঠে এসে ঠেলা মারল।—তাই? কাই? কাইরে হামিদ—চোর?

এক ঘটি জল খেলে হামিদ। দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

॥ তিন ॥

ঘুমের ঘোর লাগা চোখে হাই তুলতেই হামিদ দেখতে পেল ধুয়া-ধুঁয়া আকাশটা বেলুন হয়ে উড়ছে। তার তলায় দড়ি ধরে ঝুলছে হামিদ। হামিদ তো? হ্যাঁ, সে নিজেই, হামিদ পটাঁদার!

আঙুর জলের কাজ সেরে কাপড় ধুয়ে ঘরে ঢুকল। এবার পুরুষকার ঘরে কাজে যাবে।

সেই একই রকম হাসি। একটা টাইট হাসি! সেপ্‌টিপিন ধরলেই রস খসবে। টক-মিষ্টি স্বাদ। সেপ্‌টিপিন পাবে কোথায় হামিদ? সে তো আঙুরেরই ছেঁড়া ব্লাউজ থেকে খুলতে হবে। দূর! তা কি হয়?

লজ্জা পেয়ে হামিদ বেলুনটার কথা ভাবল। আসল কারণটা মাথায় আসতে হাসি পেল। এ সব বিডিও দেখার ফল্। ভিডিও নয়, বিডিও তো পঞ্চাৎ-সমিতির অফিসার। ভিডিও দেখেছে হামিদ বড়াল মার্কেটে ঘড়ুই কফি সেন্টারে। পূর্ণ ঘড়ুই-এর ভিডিও। নতুন নামল এ বছর। বিস্তর ভিড়। এবং সিনেমা-হলে অতদূরে কষ্ট করে কে যায়! সেখানেই অ্যাডভ্যাট টাইন—টাটা ওকে সাবাস। টাটা না কি খুব বড়লোক!

আর একটা হাই উঠল। মুখে সাত ডাঁটার দাঁতন। বোরো ধানে পাক ধরেছে। মানে মানে সব রক্ষা হলে হয়।

তারপর আর পূর্ণর শ্যালু নয়। পঞ্চায়েতের বাঁধ কেটে তবে হামিদের তেরো কাঠা বা পুবের সমস্ত জমিতে পূর্ণর শ্যালু থেকে জল পাবাতে হয়। এবার চাষ উঠলে পূর্ণর জমি নয়, ঘড়ুই পাড়ার অন্যান্য গরীবদের জমি ধরবে হামিদ। গরীব লোক পয়সার অভাবে চাষ করতে পারেনি। এক কথায় রাজি হয়ে যাবে। আঙুর আছে। আঙুরকেই কাজে লাগিবে হামিদ। তার ঘরের বাপ কাকাদের চার নেই। চার ভাই-এর জমি পেলে এলাহি কাণ্ড! জমি না কিনে নিজের তেরো কাঠার কোনে শ্যালু বসালে, পুবের বিল একা হামিদ। পশ্চিমে পূর্ণস্থ বাকিরা যেমন আছে তেমন থাকল। পূর্ণ জমি যে ভালো না নেয় না দিলে।

এ সব ভাবতে ভাবতে পূর্ণর শ্যালু ঘরে ঢুকল হামিদ। ঘড়িটা ছেড়ে গেছে। রাতে এই শ্যালু ঘরে শুয়েই শ্যালু পাহারা দিয়েছে—জল পাবিয়েছে। তারপর ঘরে গিয়েছিল, ঘড়ি নিতে মনে নেই। মনের আর দোষ কি? যত দোষ আঙুরের। রাতে আসার কথা ছিল। আসবে বলেছিল, হেসেছিল, পূর্ণ হামিদকে কি সব বলতে বলে গিয়েছিল—সে সব ও বলেছিল। কিন্তু আসেনি।

সারা রাত আনন্দে খুশিতে পুলকে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকল। কাঁপতে কাঁপতেই ভোর হয়ে গেল।

ভোরে এসে ডেকেছিল পূর্ণ। —পত্‌রা কি কয়? উঠে পড়—

সারা রাত বড়োল মার্কেটে ভিডিও শো চলেছে। তখনই ফিরছে পূর্ণ। টায়ার্ড।

এখন কি করছে পূর্ণ? ঘুমোচ্ছে নাকে তেল দিয়ে? আঙুরের ওপর খুব রাগ হল হামিদের। তখনই সে ঘড়িটার দিকে তাকাল।

শব্দ শুনেছে, টিক টিক। কবি ভাই বোনেরা সারাক্ষণ এটা নিয়ে খুট খুট করে। হামিদ হাতে বাঁধলে মন দিয়ে দেখে। মায়ের মুখের রংটা খুশিতে বদলে যায়। টালি নামিয়ে চালের টং-এ এ্যাজবেসটাস না হলে টিন তুলবে হামিদ এ বার। গোয়াল ঘরটা সারাতে হবে। বাপের ব্যবসায় খাওয়ার পরার অভাব নেই। এ সকল সব এক্সট্রা। আঙুরদের নিম আর তাল গাছটা সস্তায় কিনতে—নিজেদের আম গাছ কেটে তক্তা বানাবে। নন্দীগ্রামের করাতিদের খবর দেবে। ঘরের কাঠামো হবে—তক্তোপোষ বানাতে হবে। একটা আলমারি হবে।

মুরুব্বিদের কথা মনে পড়ল হামিদের। যারা পট দেখাত গান বাঁধত ঠাকুর গড়ত। এ এলাকায় কি এখন পট দেখে পয়সা চাল দিত কেউ? পুনুকার ভিডিও না দেখে পট দেখত কেউ? তবে সাজেদ ঠিক কাজই করেছিল। নিশ্চয়ই হাতের কাজ না শিখে হামিদও ঠিক করছে। এখন আঙুরকে ছেড়ে তার রাগ গিয়ে পড়ল মকবুলের ওপর। কিন্তু বাপের ওপর কি সন্তান বেশিক্ষণ রাগ পুষতে পারে?

হামিদ পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল—উঠছিল। মাটির ডাঁই-এর ওপর—পাহাড়ের ওপর। এখন প্রত্যেকটি শ্যালোর পাশে এক একটা পাহাড়। পঁচিশ তিরিশ ফুট গর্ত খুঁড়ে মেসিনকে পাতালে নামিয়ে জল তুলতে হয়। সেই গর্তের কারণে এই পাহাড়।

ওপরে উঠতেই হামিদ দেখতে পেলো, কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে তার বাবা মকবুল পটীদার পুব-মুখো হেঁটে চলেছে। রাণীচকের হাটবার আজ। একবার ইচ্ছে হল হামিদের, ছুটে গিয়ে সে এখন বাঁকটা নিজেরই কাঁধে নিয়ে নিক, আর দীর্ঘ—দেহী মানুষটা হেঁটে চলুক বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে।

পরক্ষণেই হেসে ফেলল হামিদ। দূর। ঠিকই আছে সব দুনিয়াতে।

ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে কালো বিন্দুটা। ভোরে বেরিয়ে গেল। সেই রাতে ফিরবে।

মেসিনের একটানা ঘরর ঘরর শব্দ। ধান ঝাড়া হচ্ছে। ছোট ছোট আঁটি

দু'জন মানুষের হাতে। পায়ের চাপে সামনের তার-ওঠানো রোলারটা ঘুরছে। কত কম সময়ে কত ভালো কাজ হচ্ছে ফটাফট।

এ সব একে একে হামিদেরও হবে। হবেই। তার পূর্ব লক্ষণ স্পষ্ট। ইদানিং বেশ খুশির একটা হালকা বাতাস মগজকে কর করে রাখে। বাইরে মেজাজ দেখালেও বাপ মকবুল যে বেজায় খুশি তারও ইঙ্গিত পেয়েছে বৈকি হামিদ! মকবুল কেবলে বলছে, সামলে পা ফেলিস বাপ রে!

আঙুরের ভূমিকা আরো উজ্জ্বল। চমৎকার তার আচরণ। কোনো রাখ-ঢাক নেই। পূর্ণ তার কাজে লাগলে, আঙুর কাজে লাগে। হামিদ তার কাজে লাগলে, অঙুের কাজে লাগে। এর মাঝখানে কোনো জড়তা নেই। আঙুরের সেই রসে ঠাসা হাসিটি দেখলে থমকে যায় হামিদ। একটা সেপ্টিপিন দরকার। নিয়ে টুক করে কেবল টাইট চামড়ায় বসিয়ে দেওয়া। দুনিয়ার লোক অবাক হয়ে দেখবে, রস চুয়াচ্ছে—বেবাক মানুষ বাতাস মাটি টক-মিষ্টি রসে ভিজে যাচ্ছে!

এরই মাঝে একটাই চিন্তা। ক'দিন ধরে পোকাদের দুর্বুদ্ধির চক্রান্তে বিচলিত মস্তিষ্কের মতো একটাই যন্ত্রণা হামিদের। মকবুলের ঐ কথাটা বার বার মনে পড়ে, সামলে পা ফেলিস বাপরে।

কিন্তু অভিজ্ঞ একটা বাপ মকবুল পটাদার, সে নিজে কি করল? পায়ে একটা টিনের পাত ঢুকিয়ে রক্তারক্তি—ঘায়ে পচে আজ এক মাস মকবুল ঘরে বসা। ডোজ ইনজেকসান ট্যাবলেট চলছে, হরি দড়পাটের চিকিৎসা।

যেদিন মাটির স্তূপের ওপর উঠে একটা টানটান মানুষকে বাঁক কাঁধে খাড়া পুব-কুখো হেঁটে যেতে দেখেছিল হামিদ, সেই দিন রাতে বেঁকে আধখানা হয়ে ন্যাঙচাতে ন্যাঙচাতে রাতের অন্ধকারে ফিরতে দেখল হামিদ। একটা টিনের পাত্ গ্যাঁক করে ঢুকে গেছে পায়ের পাতায়।

হামিদের জান কাহিল। ধান কাড়ার ঝামেলা মিটলে নিয়ে যাবে সরং. হাসপাতালে।

আঙুর আড়ালে ডাকল। পূর্ণর তেঁতুলতলায়। কী যেন এখন বলবে সে। কালো টাইট চামড়ার বড় সড় আঙুর—লক্ষ্মী টেরা, মাথায় লাল ফিতা, বয়সে বছর এক দুয়েকের বড়ই হবে হামিদের থেকে—আঙুর ও আঙুর!

কিছু না বলেই একটা আবছা আলো বা খসে যাওয়া তারার মতো ব্যবহার করে কেটে পড়ছে আঙুর। পূন্নকা ডেকেছে হামিদকে।

তা হোক। এটুকু বলতে বলেই কি এত আয়োজন করে ডেকে নিয়ে আসা—

ধানের গাদার আড়ালে। যেখানে ওইভাবে দাঁড়ালেই বুকের শব্দ বেড়ে যায়। নিঃঝুম ধীর পরিবেশে। শুয়ে থাকা একটা কুকুর কিম্বা গাছের ওপর কটা বকের বাচ্চা আর দাঁড়কমলির ডালে বসা একটা ফিঙে ছাড়া কোনো সাক্ষী নেই। অন্ধকার নেমে এসে উঁকি দিলো। তা দিক। মাটি আলো আঁধার—এ সব তো সব কিছুর সাক্ষী। ওকে লজ্জা পেলে কি চলে? হামিদ দেখল, তার চোখগুলো ধরে আসছে—জিবে জল কম—বুক কাঁপছে ধক্‌পক্‌—পেট খালি। মাথার কষ্টগুলো সব এসে শরীরে জড়ো হয়েছে।

হামিদের অনেক কাজ। পৃথিবীর ব্যস্ত মানুষদের একজন সে। এত সব ভাবলে চলে কি করে? মকবুলকে কাল সকালে হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে—সরকারি পয়সায় চিকিচ্ছা চলবে তখন। বাপের চেয়ে ভালো আর দরকারী মানুষ এ পৃথিবীতে কে আছে? পুন্নকার বুদ্ধিতেই হাসপাতালের যুক্তি পেয়েছে হামিদ। তা বেশ ভালো! সেই রকমই হবে।

॥ চার ॥

সবং হাসপাতাল দশ দিন বাদে বলল, এ কম্মো আমাদের নয়।

তবে কার? চিন্তিত হামিদ পটীদার।

—জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাও—কাটতে হবে—হাঁটু পর্যন্ত পচে গেছে—

এ সব কথার চেয়ে মাথায় বাজ পড়লে মানুষের আর বেশি কি ক্ষতি হয়?

ঘা বাড়ছে ধীরে ধীরে।

পূর্ণ ঘড়ুই সব শুনে বলে, অত ভাববার কি? যা—চাষ বাসের হিসাব মিটে নিয়ে যা মেদিনীপুরে—

যুক্তি দিয়ে হাসছিল পূর্ণ। ধারও দেবে সে। সুতরাং মানুষের কাজে লাগবার বা উপকার করবার তৃপ্তি ছিল চেহারায়। —টাকা পয়সার কথা ভাবিবিনি পুত্‌রা—তুই মোকে দেখিবি—মুই তোকে দেখব—মানুষে মানুষে সম্পর্ক তো এই রকম—চিন্তার কুনো কারণ নাই—পশ্চাৎ থিকে লিখে দিব—ভালো চিকিচ্ছা হবে। সেই মতোই ব্যবস্থা। জেলা সদরের ডাক্তার কাটার মতো কিছু দেখেনি প্রথমে। কিন্তু থাকতে হবে। বহুদিন থাকতে হবে। ঘা সেরে যাবে।

পরের দিন ফিরে এসে মাকে রেখে এল হামিদ। সঙ্গে এক ঝোলা মুড়ি। নিজে যাতায়াত করতে থাক। ঘরে দু'টি কচি ভাই একটি বোন—তাদের রাঁধা-বাড়া দেখভাল—চাষ গোছানো—হামিদের মরবার সময় নেই।

কিন্তু অফুরন্ত সময় হাতে পেয়ে হামিদ পটীদারের বাপ মকবুল পটীদার এক অসহনীয় গরমের দিনে হাসপাতালে মরে পড়ে থাকল। মরবার আগে শেষ করে দিয়ে গেল হামিদকে—জানে নয়, মনে ক্ষমতায়।

পূর্ণ চড়া দামেই তেরো কাঠাটা কিনেছে। সেদিকে কোনো জালিয়াতি নেই। কিন্তু হামিদের সব গেল। সব গেছে।

এক বৃষ্টি বাদলের দিনে এই ফাঁকে তুলসী মঞ্চের পাশে তুলসী মালা বদল করে জনগণকে সাক্ষী রেখে পূর্ণ ঘড়াই আঙুরকে স্ত্রী হিসেবে ঘরে তুলল। পাঁচ মাসের গর্ভবিস্থা নিয়ে বড্ড বেঢপ হয়ে উঠেছিল আঙুর। সবায়ের চাপে পূর্ণও উত্তর করেনি। আপত্তির কিছু নেই। ঘরদর গরু বাছুর বাচ্চা কাচ্চা চাসবাস সবকিছু সামাল দিতে গৃহস্থের যে মেয়েলোক দরকার।

কী মনে হতে ঘরে গিয়ে ছাদ কোঠা চোরা কুঠরি বাক্স ট্যাঙ্ক—সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সাজেদের বাপের হাতে আঁকা একটাও পট খুঁজেও পেলো না হামিদ। নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে থাকল বাপের লোহালক্কড়ের দিকে।

কিন্তু গান আসছিল গুনগুনিয়ে। মনের ভেতর। মকবুল বলত, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই গান থাকেরে হামিদ—চুইয়ে চুইয়ে পড়ে—ঘাম করলেই টের পাওয়া যায়—

এ সিজিনে আঙুর ডাকতে এলো না। বদলে পূর্ণ নিজেই এলো। বলল, হামিদ পুত্রা—আছু না কিরে বাপ? সাত সন্ধ্যায় ঘুমে পড়ছু তুই? কাজ-কাম নাই?

রেডিও শুনছে পূর্ণ। বগলে সাঁটা রেডিও। সরকার উল্টে গেছে। ফের দাঙ্গা। যুদ্ধ হবে। সরকারের অবস্থা কেরোসিন—কানাকড়িও নাই।

হামিদ হাসল। কারণ হীন হাসি। তারপর কথাবার্তা হল। পাকা কথা।

পূর্ণ বলল, মুই আসি এখন—পঞ্চাতে মিটিং আছে—তেল ধরতে হবে—স্টক করতে হবে তেল।

আমন উঠে গেল। দিন গেল। বোরো চাষের জমি তৈরি হবে। ব্যানতলা পড়বে। ওস্তাদ মেসিন-ম্যান হামিদ পটীদার ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো। হাতে হ্যান্ডেল।

শ্যালোর মালিক পূর্ণ ঘড়ুই-এর চোখের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে মেসিনম্যান ঘড়িতে চোখ আটকে দিয়েছে।

টিক···টিক···টিক—কব্জীর ওপর এ'টে থাকা সময় গান গাইছে।

এ গান কাজে লাগবে।

অক্ষয় উপাধ্যায় : একটি মৃত্যু, একটি কবিতা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কবি, চলচ্চিত্রকর্মী ও শিল্পী অক্ষয় উপাধ্যায় একটি পথ দুর্ঘটনায় নিহত হলেন গত ৪ নভেম্বর সকালে। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে এই রূপবান ও সুদেহী মানুষটি পনেরো মিনিট জীবিত অবস্থায় যখন পড়েছিলেন বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ ও লেক টাউন-এর মাঝামাঝি ভি আই পি রোডের চওড়া অ্যাসফাল্ট-এর ওপর, অসংখ্য উৎসুক লোকজন তাঁকে ঘিরেছিলেন। তাঁর ঘড়ি, জুতো ও সাইড ব্যাগও সরিয়ে নিয়েছিল কেউ কেউ, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। এরপর, একজন মহিলা, যিনি ডাক্তার, গাড়ি চালিয়ে ঐ পথে যেতে যেতে রাস্তায় শায়িত অক্ষয়কে দেখেন ও নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

অক্ষয় বেনারসের ছেলে। একটু ডাঁটো হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এখানেই তাঁর লেখাপড়া ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২—দশ বছর বাগবাজারে আমরা প্রায় পাশাপাশি ছিলাম। কলকাতাবাসী অনেক হিন্দিভাষী কবি-লেখকের সঙ্গে যেমন, তেমনই আমার আলাপ ও অচিরাৎ রীতিমত ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে। গোড়া থেকেই অক্ষয়ের কবিতা আমার ভালো লাগত। পরস্পরের কবিতা অনুবাদ করেছি, কবিতা পড়ার জন্য বা নিছক আড্ডা দিতে হিল্লি-দিল্লি কম ঘুরে বেড়াইনি দুজন।

অক্ষয় ছিলেন চাঁদে-পাওয়া তরুণ। কবিতা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে অনেক কবির দরজায় দরজায়। আশির দশকের একেবারে গোড়ার পর্বে 'অর্থাৎ' নামে একটি চমৎকার কবিতার কাগজ সম্পাদনা করতেন তিনি। মার্গ সঙ্গীতের প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন, বেনারসে তাঁরই হাত ধরে মনিকর্ণিকার ঘাটে বজরায় উঠেছি এবং আমার পরম সৌভাগ্য, সেখানে এক হাত দূরত্বের ভেতরে বসে বেগম আখতার-এর নিজের গলায় গান শুনেছি। এই সময় দিয়েই তিনি রচনা করতে থাকেন তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'চাক পর রাক্খি ধরতি'-র কবিতাবলী। 'কাছাকাছি' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনে অক্ষয়ের 'নদীকে নিয়ে' শীর্ষক কয়েক টুকরো কবিতা অনুবাদ করেছিলাম। এখানে লেখাটি আবার প্রকাশিত হল।

এক সকাল হঠাৎ অক্ষয় তাঁর ঝোলা থেকে বার করলেন একটি পান্ডুলিপি, -যা আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য। সম্পূর্ণ বিমূর্ত রচনা, বিষয়—কবিতা। অক্ষয়ের সাহসী যোগ্যতা সেদিন আমাকে অবাক করেছিল।

ক্রমশ চলচ্চিত্র-ভাবনা তাঁকে গ্রাস করতে লাগল। ছোট দৈর্ঘের ছবি, ডকুমেন্টারি, ফিচার ফিল্ম—সব কিছুতেই মগ্ন হতে চাইলেন বেশি বেশি করে। বাংলা চিত্রনাট্যের হিন্দি রূপান্তরের ক্ষেত্রে রীতিমত সুনাম অর্জন করলেন অল্পদিনের মধ্যেই। সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্চ কি খিলাড়ি', 'সদ্গতি', 'কাঠমণ্ডুকে ফেলুদা',—এইসব ছবি টেলি-ছবিতে অক্ষয়ের এই অনুবাদকের ভূমিকা তাঁকে মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ প্রমুখের কাছে জরুরী করে তোলে। কিন্তু নিজে ছবি করাটাই ছিল আজীবন তাঁর অপ্রতিরোধ্য অবসেশন।

স্বভাবতই দেখাশোনা অনেক কমে এল। এর ভেতর আমিও অবশ্য বাগবাজার ছেড়ে নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাই করে বাগুইআটি উঠে এসেছি।

বছর দুয়েক আগে, এক সন্ধ্যায় পরিচয় পত্রিকার দপ্তরে বসে সম্পাদনার কাজ করছি, হঠাৎ অক্ষয় এসে হাজির। আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেলেন পাম অ্যাভিনিউ-এর দোতলার এক চিলতে ফ্ল্যাটে, সেখানে পরিবারের সবাইকে ছেড়ে একা থাকতে শুরু করেছিলেন। আমাকে বসিয়ে একটু পরেই যাদুকরের মত তিনি আমার চোখের সামনে মেলে ধরতে লাগলেন তাঁর আঁকা ছবির পর ছবি। কোনোটা মিক্সড মিডিয়ায়, কোনোটা তেল রং-এ, কোনোটা বা জল রং-এ। তাছাড়া নানা বিজ্ঞাপন ও নানা রং-এর কাগজ কেটে অসংখ কোলাজ। বললেন, এক বছরে হাজার দেড়েক ছবি এঁকেছেন। যখন ছবি দেখাছিলেন, ওর আরতির মত এগিয়ে-দেওয়া সারা শরীর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সে-সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ছিলেন শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি আদৌ হয়েছে কি হয়নি যাচাই করার জন্য পরে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীকেও এমনই হানাদারি ব্যস্ততায় অক্ষয় নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কামরায়। অতি সম্প্রতি দিল্লীতে একটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়েছিল তাঁর। প্রদর্শনী হয়তো করবেন তাঁর প্রিয়জন। শুধু অক্ষয় থাকবেন না।

বোম্বাই-এর বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন-অভিনেতা পংকজ কাপুরের সঙ্গে একযোগে একটি ডকুমেন্টারি তোলার ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিলেন অক্ষয়।

এবং, সেই ছবির লোকেশান খুঁজতে যে-সন্ধ্যায় রাঁচি যাওয়ার কথা ছিল তাঁর, সেদিনই সকলে মৃত্যু তাঁকে টেনে নিল।

একটা কথা খুব মনে পড়ে যায়। সত্তরের দশকের প্রথম পর্বে, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও পরিচয় পত্রিকার সেকালীন সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বেঁচে। তখন তাঁর বিখ্যাত গল্প 'অশ্বমেধের ঘোড়া' হিন্দি ও বাংলায় একযোগে চলচ্চিত্রায়িত হতে থাকে। হিন্দি চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়াটি করেছিলেন অক্ষয়। সেই দোভাষী চলচ্চিত্র-নির্মাণ শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেমন রূঢ় ভাবে অমীমাংসিত থেকে যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর কাহিনীর চিত্রনাট্যকার অক্ষয় উপাধ্যায়ের জীবন।

আজ, ১৯৯৪-এর অন্তিমে অক্ষয়ের স্মৃতিতে আমি সমর্পণ করছি তপ্ত ভালোবাসা আর ফিরিয়ে নিচ্ছি সমস্ত অভিমান।

নদীকে নিয়ে

অক্ষয় উপাধ্যায়

এক নদী।

নদীর ওপারে একটি গাঁ।

গাঁয়ের শেষে

একখানা ঘর।

যখন নদীর এপার থেকে

হাঁক ওঠে,

তখন ওপারের ঘর

মুখ মুচকে হাসতে থাকে।

২

এক নদী।

তাতে মাছ নেই।

এক পাহাড়।

তাতে গাছ নেই।

এক আকাশ।

তাতে জল নেই।
এক লম্বা জোরছুট রেলগাড়ি।
তাতে লোক নেই।
নগরের আনাচে কানাচে
ঘুরছে কালো বেড়াল—
নতুন বউ-এর কান্না কেন?

৩

নদী রানি, নদী রানি,
এত জল—
তোমার বাবা কি করেন?

৪

নদী
এক ছুটে চলা পালকির সওয়ার,
সে পুকুরের কথা শুধোলে
কাহার বলল :
ওর এখনো পাকা দেখা হয় নি।

৫

নদী
নাও চেপে ঘরে যায়,
আর নাও তো
নদীর ঘরেই থাকে।

৬

ছোট বেলায় মা বলেছিলেন :
বড় হয়ে আমাকে নদীতে খুঁজিস।

৭

আমাদের গাঁয়ের সবচেয়ে রূপসী মেয়ে
রাত্রি
নদীর সঙ্গে হঠাৎ বেপাত্তা।

৮

এক নদী
ঘরেই বহে যায়।
মা, বউ আর মেয়ের চোখ থেকে নেমে
বুকের ওপর কলকলিয়ে যেতে থকে।

৯

সূর্য আর নদীর বিয়ে হল,
নদী বিয়োলো জল,
জল আর মাটির মধ্যে
জমে উঠল প্রেম,
তারপর
তামাম লোকজনের
সে কি গান আর গান।

১০

কে জানে
নদীর বুকে কত মানুষ,
কত দেশ
কত গল্প
কত স্বপ্ন—
আর,
আর কী আছে নদীর ভেতর?

১১

এক উদাস মেয়ে
নদীর পারে।
তার কাছে আছে ধানের ক্ষেত,
গাইবাছুর,
আর
এক ছোট সাদা খরগোস।

সে মাঝে মাঝে গানও গায়।

১২

নদী,

নাও,

সূর্য আর মাছ—

সব তো একই মায়ের পেটের।

১৩

নদীকে এখন ছুঁয়ো না।

ও গান গাইছে

ঝম ঝম বাদলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

ওকে ছুঁয়ো না এখন।

১৪

এই মাঝি

নদীর জলে পা রাখছে।

এই মাঝি

নৌকো বাইছে।

নদী তো লজ্জায় ডুবুডুবু।

কিন্তু, এতো স্রেফ মাঝি নয়,

ওর আত্মায়

এই নিয়ে

পঞ্চাশটি নৌকাডুবি হল।

অনুবাদ ঃ অমিতাভ দাশগুপ্ত

গর্জন ক'রে ওঠা

অমিতাভ গুপ্ত

ওগো রাইফেলবাচ্চারা তোমাদের　　সেই ১৯৬৬ সন থেকে
দেখছি, দিব্যি ফুটফুটে রয়ে গেছ
জালিয়ানওলাবাগে এ'রকমই ছিলে ?
এত সুন্দর ?　তেলেঙ্গানায় ?　　ধোঁয়ায় বুলেটে ধোঁয়ায়

আর কী বলব ।　আচ্ছা,　　একটা প্রশ্নই করি পিছুপিছুপিছু ডেকে
তারকেশ্বর সিঙ্গুর কাঁথি ফুলবাগানের　　চোরাকুঠুরির
কীর্তিকলাপ দেখে　　বাবামহাশয় তোমাদের হাত থেকে
লাফিয়ে যদি নামে
তোমাদেরই দিকে গর্জন ক'রে গর্জন ক'রে গর্জন করে ওঠে

নৈশ অপরাধ

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কিছুটা সময় জুড়ে বিকেলের উপদ্রবশেষে
একটি পুলিশ তার নির্ধারিত বাড়িটিকে গোপন আদেশে
ছেড়ে রেখে অন্য এক ব্যারাকের দিকে চলে যায়—
পায়রা ওড়ে গৃহস্থের উঠোনে ও চালে. ইতস্তত কিছুটা অন্যায়
পড়ে থাকে—জানলা বন্ধের শব্দে তীব্র এক সন্ধ্যার আঁধার
ধেয়ে আসে লোকটির দিকে ;　তার অভুক্ত খাবার
ফেলে রেখে সেও যায় আরো কোনো অন্ধকার মানুষের প্রতি
দুপাশে সতর্ক চোখ. পুলিশের নীরব সম্মতি ।

নিরুদ্ধ পিপাসা

শংকর দে

কাগজের পাতায় অক্ষর সাজিয়ে লিখে চলেছি
শপথের স্বাধীনতা শহিদের অগ্নিময় চিতা
বাংলা ভাষা কবিতার ভাষা।

প্রাণের জিজ্ঞাসা কি অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি
দেহময় শূন্যময় সহমরণের সাক্ষী ওগো কবি
সন্ধিক্ষণে প্রতিপক্ষের ভালোবাসা।
দুরন্ত আভাসে ঝড়ে পূর্বাভাসে সঙ্কেতে সন্ত্রাসে
সৌরলোকে বাজে বীণা প্রভাতীর ভৈরবীর দেশে
অন্তরে দ্যোতনা ফিরে আসা।

যে যার নির্জনে

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

যে যার নির্জনে একা শূন্যে বসে থাকে
ছিমছাম
অভুক্ত উদাসী
প্রতিদিন

সূর্য—ও কেটে পড়ে জ্যামিতিক
কৌণিক কসরতে
আকাশ ভ্রমণ সারা হলে
ঠোঁটে
রোদ্দুরের ক্ষুদ কুঁড়ো নিয়ে
ইঁদুরের ছোটাছুটি এঘরে—ওঘরে
ইঁটের গভীরে খোঁজে
জমা করে চাঁদের পাহাড়

চাঁদ তবু পায়নাকো হাতের মুঠোয়
এ ওকে শোনাবে বলে কথা জমে
গালগপ্প
পরাজয় ব্যর্থতার আশার কথা–ও
ক্ষুৎ-পিপাসার মত প্রাণের আলাপ

নিকটে যাবার আগে
রাত্রি এসে হানা দেয় তামাটে বিকেলে

যদি আসতে এই শহরে

কানাইলাল জানা

তখন কলকাতা নেই কলকাতায়। ঘাস আর ঘাসফুলে
ভরে গেছে শহর। আর ঘাসফড়িং এর সঙ্গে ভেড়া
মহিষপাল চলেছে স্নানে। এই দেখে আস্ত শহিদ
মিনারটাই নড়ে চড়ে বসে গুপ্ত যুগের যাদুকর।
হঠাৎই নীল চোখ ঘি রঙ-ডানার মস্ত একমেরু
পাখির পিঠ থেকে নামল ঘুড়ি-বালক। যাদুকরের
চারপাশে নাচতে নাচতে ছাড়ল সুতো। এতটাই ছাড়লো যে
দুই মেঘের মাঝখানে আটকে গেল ঘুড়ি। কিছুতেই
ছাড়াতে না পেরে সুতো ধরেই উঠতে লাগলো মেঘের
দেশে। আর ততক্ষণে ফিরছে ঘাস ফড়িং-রা।
দেখেই তো থ ঃ এ নিশ্চয় যাদুকরের কাণ্ড।
বলতে না বলতে সমস্ত সোনামুখ রোদ ঝরে
পড়ল রূপশালী ধান। সারা শহরে এখন ফলে
আছে চাবুক চাবুক ধান। যার মালিক ঘাসফড়িংরা······

ভাতের গন্ধ এবং ভালবাসা

শোভা চট্টোপাধ্যায়

আজন্ম এক স্বপ্ন ছিল
সুখের এবং সুখ-দুঃখ পাশাপাশি,
সূর্য-ছেঁড়া আগুন দিয়ে
যবের রুটি—
শাপলা পাতায় ভাতের গন্ধ
মাঠ পেরিয়ে······
গেঁড়ি-গুগলি, সিদ্ধ শালুক
উপোষী মুখ।
স্বপ্ন কেন সানকি জুড়ে,
কিশোর যুবা মাঠে নামুক।

হলুদ গাঁদা সূর্যমুখী রাই সরষের ছড়াছড়ি,
হাল বলদের সখ্যতাতে আলের ধারে হলুদ শাড়ি,
বিছানা জোড়া ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়ে সবুজ ক্ষেতে
কচি কাঁচা নামতা পড়ুক দাওয়া জুড়ে মাদুর পেতে।

আপাতত

পঞ্চানন মালাকর

নগরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন চিৎকার করে বলি—
আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে···
সবাই অপলক বিস্ময়ে ভাবে—
এখানে কিসের ভয়? এই লোকালয়ে?
এত লোক আর এত প্রাচুর্যের মাঝে?
ওরা তো জানে না—এখানে
নিয়ত মারণখেলা চলে।

এখানে মানে—এইখানে। শহরের বুকে
সভ্যতা কলুষিত হয় যে শহরে
বিষবাষ্পে ভারি যার বুকের বাতাস।
যে শহরে মানুষেরা বিশ্বাসহীনতায় বেঁচে থাকে।
প্রতিবেশী পরিচিতের প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে ভদ্রতার হাসি,
ঈর্ষাতুর মনের গভীরে পুড়ে মরে।

পরিমিতি এখানে মানুষকে বেঁধে রাখে
সুসজ্জিত জীবনের ঘেরাটোপে। তা থেকে
বেরিয়ে আসতে শিক্ষার অভিমানে বাধে।
বাহারি মুখোশ পরে বসে থাকি পাশাপাশি
জীবনের জটিল ছায়ার অন্ধকারে।

নগরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখনই—
চিৎকার করে উঠি—আমাকে বাঁচাও!
পথ-চলতি মানুষেরা ভেবে নেয়—
লোকটি ছিলেন ভালোই· আপাতত
মাথাটা বিগড়ে গেছে; তাই তাকে
কোনো মানসিক হোমের গারদে
পাঠাতে পারলে ভালো হয়।

তিনটি কবিতা

জয়তী রায়

আত্মহনন আমার নয়

আমি একটা পিঁপড়েরও
    টুঁটি টিপে ধরতে পারিনি,
এ আত্মহনন আমার নয়—
তুমি আমাকে মেঘ থেকে
    বৃষ্টি এনে দিয়েছ,

বিদ্যুৎ থেকে আলো,
চাপা অভিমান থেকে
ঝোড়ো রাতের কান্না,
আমকে মুক্ত করতে
যেমন তোমার আগ্রহ
তেমনি পিষ্ট করতে নষ্ট করতেও,
তুমি আমাকে ছিঁড়ে ছেনে
কোন মহার্ঘ ওষধি বানাবে,
অথবা স্থাপত্যের চূড়ায় বসাবে
তীক্ষ্ম পাখির চোখের মত চোখ,
প্রতিমূর্তি খুঁজে পাইনা,
শুধু বরফের ধ্বস নেমে আসে,
আমি একটা পিঁপড়েরও টুঁটি
চেপে ধরতে পারিনি,
এ আত্মহনন আমার নয়।

নতজানু প্রার্থনায়

মনে হয় যাই ঐ পাহাড়ের কাছে,
হয়তো সেখানে কিছু ফুল ফুটে আছে,
মৃত্যুহীন, শোকহীন, রৌদ্রদাহহীন—
যেখানে অনন্ত খাদ,
তারও নিচে কিছু বৃষ্টি জল রেখেছে গোপনে
ঝর্ণার জন্ম-দোসর,
মনে হয় মুখ তুলে
দেখি ঐ আকাশের নীল,
সেখানে চিঠির ভাষা ধরে রাখে
বিনম্র নিখিল,

চোখ পেতে রাখি সেই
শান্ত হাওয়ায়,
নতজানু প্রার্থনায়,
অবোধ্য ব্যঞ্জনা যত
খুলে যাক খিন্ন জটাভার।

এই প্রশ্ন

আমি কি আমার মত
হতে পেরেছি,
এই প্রশ্ন ঘুমের অতল বেয়ে নামে,
এই যে পোষাক,
চুলচেরা হিসেবের বাঁক,
নিজের ইচ্ছেয় গড়া ধাতুরূপ
সে কি গহন সংসারে
ডুবে আছে,
কার ইচ্ছে ধারাপাত
সমস্ত যাপন ঘিরে ওঠায় নামায়,
ডোবায় ভাসায়,
তার সঙ্গে আমার অর্থের মিল
কখনও কি ঠিকঠাক
মিলে গেছে সহজ মুদ্রায় ?
ভেবে শুধু মূর্খ হতে হয়,
নিজে হাতে রং তুলি
ডুবিয়ে একাকী
নিজের একান্ত ছবি
কখনও আঁকিনি,
অসমান থেকে গেছে
প্রতিটি নিখুঁত ভাঁজ

অবসর, সুডৌল আঙ্গিক,
আমি কি নিজের মত
একদিনও হেঁটেছি কখনও
এই প্রশ্ন ঘুমের অতল বেয়ে নামে
আমাকে গভীর থেকে
গভীর রক্তের দিকে নিয়ে যায়।

তিনটি কবিতা

অজিত বাইরী

ছিপ ফেলা

মনোহর পুকুর পাড়ে ব'সে
তুমিও ফেলেছো ছিপ।
ভেবেছো, ফাত্না ডুবিয়ে
ভোরে জোর টান দিয়ে খেলবে
রুপোলি রোহিত ; তারপর
ধীরে ধীরে উঠে আসবে ডাঙায়।

দিবসান্তে কি দেখলে তুমি ?
ঠুকরে ঠুকরে গেলো টোপ।
দু' একবার ফাতনা ডুবিয়ে দিয়েছিলো টান—
বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়ে বসেছিলে।
সন্ধ্যা এলো, বিফলে গেলো কি বেলা ?
বঁড়শিতে কি উঠে এলো
মাছ না কি মাছের কংকাল ?

অনু কবিতা

১

ফুল ফুটলে বাতাস তার নিজের গরজেই
সুগন্ধ বয়ে নিয়ে যাবে দূর-দূরান্তে ;
তোমার ভাবার কোনো প্রয়োজনই নেই
ফোটার পর কি হবে।

২

থাকতো যদি আকাশে দু'খানি চাঁদ
অনায়াসে দেওয়া যেতো তোমার বুকের উপমা ;
কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত আকাশে একটিই চাঁদ।

দেবী

কার তুমি মূর্তি গড়ো মনে মনে
সে তো অস্পৃশ্য, দুশ্চরিত্রা।

কার তুমি পায়ে রাখো ফুল
সে তো স্বৈরিণী, কুলভ্রষ্টা।

কার পায়ে রাখো প্রণাম
সে দ্বিচারিণী সে কলঙ্কিনী।

কাকে নিবেদন করো হেমবর্ণ প্রেম
যে ধূলোয় লুটোয়, যে অবজ্ঞা করে।

কাকে দাও হৃদয়ের সিংহাসন
যে তছনছ করে, করে অবহেলা।

সে নষ্টা, সে ভ্রষ্টা, পাতকিনী ; তবু
সে-ই আমার দেবী, সে-ই আমার দেবী।

ইতিহাস শ্রমিক আন্দোলনের না কেবল শ্রমিক শ্রেণীর ?

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

দার্শনিক হেগেলের মতে, বিদ্যার দেবী মিনার্ভার বাহন পেঁচা রাতের অন্ধকারে ছাড়া ডানা মেলে না। একটি পর্ব বা যুগ শেষ হয়ে গেলে তবেই তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব। সে দিক থেকে বিচার করলে কি আজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখার সময় এসেছে ?

এই বিতর্কেই উত্তাল হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক সংগঠনের সাম্প্রতিকতম সম্মেলন। এই সংস্থা '৯৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে তার ত্রিশতম জন্মদিন পালন করল। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় এর অবদান কম নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত অথবা এর সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠায়। অবশ্য মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ওজন স্বাভাবিক কারণেই সব চেয়ে বেশি। প্রধান ভাষা জার্মানি। পীঠস্থান, অস্ট্রিয়ার লিনৎজ সহর।

এবার জন্মদিনের আনন্দের সঙ্গে যেন মিশেছিল গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। সংগঠনের ভবিষ্যত আর ততখানি উজ্জ্বল তা নিশ্চিত ছিল না। প্রথম কথা, আর্থিক সংস্থান। লক্ষ্মীর কৃপা ছাড়া সরস্বতীর সাধনা অসম্ভব। এখানে টান পড়েছিল। আই. টি. এইচ্ (সংস্থার জার্মান নামের আদ্যক্ষর) এর টাকা আসে ইউনেস্কোর কোষাগার থেকে। অস্ট্রিয়ার সরকার কিঞ্চিৎ সাহায্য করে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের সদস্য (affiliated সংগঠনগুলিও প্রসারিত করে বদান্যতার হাত। এদের মধ্যে আবার অর্ধেকের বেশি প্রাক্তন সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্গত। সমাজবাদ থেকে বাজার অর্থনীতির রাজপথে ফিরে আসা রাষ্ট্রগুলির সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় কারো অবিদিত নয়। যে দু'একটি দেশ সংকটের পর উন্নয়নের মুখ দেখছে, সেখানেও গভীর দারিদ্র্যও নানা সমস্যা বিদ্যমান। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তারা যে মুক্তহস্ত হবে না, তা বলা বাহুল্য। রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য শাখার মত ইউনেস্কোরও ততটা সুদিন নেই।

মূল প্রশ্ন আরো গভীরে। শ্রমিক ইতিহাসের কি আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা

আছে। ব্রেশট একটি কবিতায় বলেছিলেন, শ্রমিক সংগ্রাম এক বিরাট নদী, যা গোটা দুনিয়াকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আজ যে নদী এক ক্ষীণ ধারা বা বদ্ধ ডোবায় পরিণত হয়েছে। ১৭৮৯ থেকে ১৯৮৯, বাস্তিলের পতন থেকে বার্লিন প্রাচীরের পতন, এই দুই শতাব্দীতে এক ঐতিহাসিক পর্ব শেষ হয়েছে, যদি ফুয়ামার মতানুসারে ইতিহাসের সমাপ্তি নাও ঘটে থাকে। প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পূর্ব ইউরোপ কার্যত পশ্চিমের উপনিবেশ। চীন বা ভিয়েতনামে হয়ত এক ধরনের সমাজতন্ত্র বজায় আছে কিন্তু তার সঙ্গে অন্তত সমাজতন্ত্রের ধ্রুপদী ধ্যান ধারণার কোনো মিল নেই। পশ্চিমের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজবাদ না এলেও দুশ' বছরের সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী বেশ কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করেছিল। রেগান থ্যাচারের আমলে তার অনেকখানি বিপন্ন বা অন্তর্হিত। তৃতীয় বিশ্বের অবস্থা আরো শোচনীয়। যে সংগঠিত শক্তি, মতাদর্শ, আত্মবিশ্বাস এক সময় শ্রমিক শ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা আজ খুঁজে পাওয়া ভার।

এ ত' গেল বর্তমান বা ভবিষ্যতের কথা। হয়ত বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমানের ঘরে 'শূন্য, ভবিষ্যত অন্ধকার। কিন্তু তার জন্য ইতিহাস চর্চা বন্ধ থাকবে কেন? ইতিহাসের কারবার অতীতকে নিয়ে। সে অতীত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মৌর্য, মোগল, টিউডর, স্টুয়ার্ট, বুরবঁ, চীনের মিঙ বা জাপানের তকোগোয়া যুগ অনেক আগে মুছে গেছে। ওই সময়ের উত্তরাধিকার এখন কার হাতে, তাও স্পষ্ট নয়। তা বলে কি এ সব যুগের ইতিহাস লেখা থেমে গেছে? শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসের ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম দেখা যাবে কোন যুক্তিতে?

আসলে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত জটিল। বর্তমানকে বাদ দিয়ে অতীতকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অতীত যেমন সাম্প্রতিক ঘটনাকে প্রভাবিত করে, তেমনি সাম্প্রতিক ঘটনার আলোয় অতীতকে দেখা রেওয়াজ। কবে কোন মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়া হয়েছিল কি হয়নি, সে ব্যাপার কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। অথচ ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল অযোধ্যা বিতর্ক। ১৯৭১ সালে ফরাসী বামপন্থীরা যখন প্যারি কমিউনের শতবার্ষিকী পালন করল, তখন শাসক শ্রেণীর ভয় ও উৎকণ্ঠা চাপা রইল না। কারণ, দু বছর আগের ছাত্র শ্রমিক বিদ্রোহ ইতিহাসের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা বা তাৎপর্য যোগ করেছিল। কমিউন যে ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে, এ সম্ভাবনা শত্রু মিত্র দু' পক্ষেরই মনে ছিল।

আরো সুদূর ফরাসী বিপ্লব বা ক্রমওয়েলের আয়ার্ল্যান্ড জয় আজকের দিনে ফ্রান্স বা বৃটেনের রাজনীতি থেকে পৃথক করে বিচার করা কঠিন।

হয়ত, প্রত্যেক বিপ্লব বা বিপ্লবীর স্বপ্ন, সব চেয়ে বীরত্ব পূর্ণ, গৌরবময় মুহূর্তকে ধরে রাখা বা নতুন করে সৃষ্টি করে। ১৮৩০এ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের কালে কোনো জঙ্গী বিদ্রোহী না কি গুলি ছুঁড়ে ঘড়িরকাঁটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই প্রতীকী আচরণ ছিল বাইবেলের জশুয়ার মত সময়কে ধরে রাখার প্রচেষ্টা। ফরাসী ঐতিহাসিক তোকভিল দাবি করেছেন, ফরাসী বিপ্লব এক অনন্ত নাটক। যুগে যুগে তার নতুন দৃশ্য অভিনীত হয়। রুশ বলশেভিকরা নিজেদের মনে করত, অতীত সংগ্রামের উত্তরাধিকারী ও ভবিষ্যতের দিশারি। সোভিয়েত বিপ্লব যখন প্যারি কমিউনের জীবন সীমা অতিক্রম করল, তখন এই তুলনামূলক সাফল্য তুলে ধরা হল গর্বের সঙ্গে। কমিউনের মত পরাজিত হলেও তাদের সংগ্রাম উত্তর সাধকদের অনুপ্রাণিত করবে, এ আশা সোভিয়েত নেতারা গোপন রাখেন নি। নতুন বিপ্লবের আলোয় পুরনো বিপ্লবের অর্থও যেন বদলে যেতে পারে। পরিচিত পাতার অন্তরালে ফুটে উঠতে পারে নবাবিষ্কৃত তাৎপর্য। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক স্তাঁদাল জানিয়েছেন, ফরাসী বিপ্লবের উত্তাল দিনে তাঁর বাবা দেড়শ বছর আগেকার ইংরেজ বিদ্রোহের ইতিহাস নতুন করে পড়তেন।

অতএব রেগান থ্যাচার গর্বাচেভ ইয়েল্টসিনের আমলে সে সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক, মূল্যহীন মনে হবে, তা আশ্চর্য নয়। নতুন বিশ্বাস বা "সীমা" অনুসারে বিপ্লব বা সমাজতন্ত্র দূরে থাক, যে কোনো আন্দোলন, দাবি দাওয়া আদায়ের চেষ্টা ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর। সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে মালিকদের মর্জি ও বাজারের "অদৃশ্য হাতে"র উপর। একদা চরম দক্ষিণপন্থী ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদরাও গণ সংগ্রামের গুরুত্ব মেনে নিতেন। এখন আর তার দরকার হয় না। সংগ্রামী অতীতকে ভুলে যাওয়া বা মুছে ফেলা ভাল। তাকে বড় জোর মনে রাখা যেতে পারে ভুলের তালিকা রূপে।

এই অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকে উদ্ধার বা নতুন করে লেখার কয়েকটি প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। তার মধ্যে দু'টি প্রধান ধারা নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল। সাবেক, প্রচলিত অর্থে রক্ষণশীল (এই উল্টো পুরাণের যুগে বামকে দক্ষিণ, প্রতি বিপ্লবকে বিপ্লব ও মাফিয়া পুঁজিবাদকে র‍্যাডিকাল আখ্যা দেওয়ার উদ্ভট নীতি সুরু হয়েছে।) প্রখ্যাত ফরাসী গবেষক গ্রপো সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা ও প্রবক্তাদের একজন। তিনি স্বদেশের উদাহরণ দিয়ে এক নতুন ধারার ইতিহাস

চর্চার কথা তুললেন। ফ্রান্সে না কি আজকাল অজস্র শ্রমিক ইতিহাস লেখা হচ্ছে। শ্রমিক ইতিহাস, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস নয়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য খেয়াল রাখা ভাল। কোন অঞ্চলে, কোন সময় শ্রমিকরা কি খেত, কি পরত, কেমন বাড়িতে থাকত, কত মজুরী পেত, তাদের পারিবারিক আচার ব্যবহার অথবা অবসর বিনোদনের রূপটি কি ছিল, এ সব নিয়ে কৌতূহল ও গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন নামক চারণভূমিতে যেন "প্রবেশ নিষেধ" টাঙানো। গ্রপো পরোক্ষ ইঙ্গিত দিলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিকদের সংস্থার নাম ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা উচিত। "আন্দোলন" কথাটিকে সযত্নে বাদ দেওয়া কর্তব্য। তাহলেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের স্ববিরোধ মিটবে মসৃণ হবে গবেষণার পথ।

গ্রপোর মণীষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বেশ কয়েকজন সদস্য গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ মতাদর্শগত অন্ধতা নয়, নিছক সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। ভাল হক, মন্দ হক, আন্দোলন বাদ দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর গত দু'শ বছরের ইতিহাসের কথা চিন্তা করা অসম্ভব। ভবিষ্যত যদি ভিন্ন রূপ নেয়, সে অন্য কথা। তার মানে কি এই যে বিশ্বশুদ্ধ শ্রমিক দিন রাত আন্দোলন করত। তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবন ছিল না, ছিল না অবসর সময়ের হাল্কা আমোদ প্রমোদ। অবশ্যই তা নয়। শ্রেণী সংগ্রামের পাশাপাশি শ্রেণী সমঝোতার অভাব হয়নি। "মিথ্যা চেতনা"র (false consciousness) কুয়াশা বার বার আবৃত করেছে সত্যিকারের স্বার্থকে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, উগ্র জাতীয় দম্ভ শ্রমিক শ্রেণীকে পরিণত করেছে শাসকদের হাতিয়ারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মাদনার পরিপ্রেক্ষিতে ভেঙে পড়েছিল মহা শক্তিধর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। হালের অবস্থা ত' দেখাই যাচ্ছে।

তবু আন্দোলন ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস চিত্রিত করা অসম্ভব। বিনি সুতোর মালার মত আন্দোলন শ্রমিক জীবনের বিভিন্ন দিক গেঁথে রেখেছে। অবসরও তার বাইরে নয়। ইউরোপের কত পাঠাগার বা "পাবলিক হাউসে" ধর্মঘট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে খনি অঞ্চল বা "কোম্পানি সহরে। সেখানে সহকর্মীরা পড়শিও বটে। ধর্মঘট ভাঙা "ব্ল্যাকলেগ" বা "হলদে মানুষ" নিজের জায়গায় মদ খাওয়াতে চাইলেও কেউ তার হাত থেকে গেলাস তুলে নিত না। শ্রেণী একতা ভাঙার শাস্তি, সামাজিক বয়কট বা আরো কিছু। শিল্প সংক্রান্ত লোকগীতিও আন্দোলনের কাহিনীতে ভরা। যেমন হিংস্র শ্রেণী

চেতনা ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি ঘৃণায় অনুপ্রাণিত বিখ্যাত গান "Blackleg Miners"

গ্রপোর নিজের দেশের কথাই ধরা যাক না। আন্দোলন বাদ দিয়ে ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীকে কি নিছক জীবনতত্ত্বের এক নিদর্শন হিসাবে দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অভ্যন্তরে, চরম,শাখা রূপে প্রথম সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা, ১৮৩০এর জুলাই বিপ্লব, ১৮৪৮, ১৮৭১এর প্যারি কমিউন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে উত্তাল শ্রমিক সংগ্রাম, ত্রিশের দশকে পপুলার ফ্রন্টের আমলে শ্রমিকদের কারখানা দখল, ১৯৪৪এ মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে শ্রমিক বিদ্রোহের মিলন, ফ্যাসিবাদ বিরোধের বাম রূপ ; '৬৯এর অবিস্মরণীয় মে মাসে ছাত্র শ্রমিক গণঅভ্যুত্থান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কারখানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া বিদ্রোহের বন্যা। এ সব বাদ দিয়ে কি কেবল সংখ্যাতত্ত্বের কৌশল বা বহিরঙ্গের বর্ণনার ছটায় শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস ধরা যায়। ফ্রান্সের ইতিবৃত্তই কি বোঝা যায় ? আমরা কি উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে লিয়ঁ সহরের রেশম শ্রমিকরা কোন খাবারের সঙ্গে কি ধরনের মদ খেত কেবল সেই গবেষণায় ব্যস্ত হব। ভুলে যাব ছাঁটাই হওয়ার পর তাদের অমর স্লোগান, "কাজ করে বাঁচব অথবা লড়াই করে মরব।" অবশ্য এ সব কথা বলার মানে এই নয় যে শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি ইতিহাস চর্চার যোগ্য বিষয় নয়। তবে সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামের স্মৃতি অপরিহার্য।

আজ ফ্রান্সের বাম শক্তি ও শ্রমিক শ্রেণী পরাজিত, বিধ্বস্ত, বিভ্রান্ত। তবু সাবেক ঐতিহ্য একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। সাম্প্রতিক কালে বিমান কর্মী থেকে সুরু করে কৃষক ও জেলেদের আন্দোলন, তরুণ শ্রমিক কর্মীদের মজুরী হ্রাসের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ, মোটর শ্রমিকদের লড়াই ইত্যাদি অনেকের মনে ১৮৬৮ এর বা আরো আপেকার স্মৃতি জানিয়ে তুলেছে। এই বর্তমান কাল ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। দু শ' বছরের পুরানো ফরাসী র‍্যাডিকালিজম্ নামক মরা হাতির দাম লাখ টাকা না হলেও কয়েক হাজার ফ্রাঁ।

আর এক দিক থেকে ব্যাপারটা দেখা যায়। Contra history, কাল্পনিক ইতিহাস, অমুক না হয়ে অমুক হলে কি হত, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা। যদি পলাশীতে ক্লাইভের পরাজয় ঘটত, ওয়াটারলুতে নেপোলিয়ন জিততেন, যদি শ্রমিক শ্রেনী কেবল খাবার জুটলে খাওয়া দাওয়া, বংশবৃদ্ধি ও অবসর বিনোদন করত, কারখানায় যন্ত্রের মত কাজ করত, কখনো চোখ তুলে তাকাত না, আন্দোলন

কথাটার অর্থ জানত না, দাবি দাওয়া অভিধানে খুঁজে পেত না, তাহলে আজ পৃথিবীর চেহারা কেমন হত? অন্ততঃ আমরা যা জানি, যেমন দেখেছি তা হত না। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ এক সময় সমাজতন্ত্র বরণ করেছিল। আজ পাশার দান উল্টে গেলেও সে সবস্মৃতি, কৃতিত্ব অবদান উড়িয়ে দেওয়ার নয়। পুঁজিবাদী দুনিয়ার উপরও শ্রমিক আন্দোলন স্বাক্ষর রেখেছিল। আজ প্রচার মাধ্যমগুলি বোঝাবার চেষ্টা করে, বাজার অর্থনীতি ও গণতন্ত্র শ্যামদেশীয় যমজ। বস্তুতঃ, প্রায় সর্বত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের দরুণ, শাসক শ্রেণীর প্রবল বিরোধিতার মুখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃটেনে চার্টিস্ট ও অন্যান্য আন্দোলন, ১৮৪৮ এর বিপ্লবী প্যারিসে সশস্ত্র শ্রমিকদের পার্লামেন্ট দখল, প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যে ভোটের দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি ছাড়া বুর্জোয়া গণতন্ত্র পর্যন্ত মানব সমাজ অগ্রসর হত কি না সন্দেহ। পশ্চিমে যে কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন কি তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী যে ছিটে ফোঁটা পেয়েছে তা হজুরদের বদান্যতার ফল নয়। শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লব সংক্রান্ত আতঙ্কের ফসল। এক অন্যতম বৃটিশ রাজনীতিবিদ, চেম্বারলেন তাঁর শ্রেণী ভাইদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। "টি"কে থাকতে হলে সম্পত্তিকে মুক্তিপণ দিতে হবে।" "জার্মানির লৌহ চ্যান্সেলর" বিসমার্ক আরো স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, সব সক্ষম শ্রমিককে চাকরি, বৃদ্ধদের জন্য পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিলে তবেই শ্রমিক শ্রেণী সমাজবাদী নেতাদের "পাখি ধরার ডাক" অগ্রাহ্য করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক আন্দোলন ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করার উৎসাহে নতুন পর্যায়ে উঠেছিল। বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পুঁজিবাদী চক্র থেকে বেরিয়ে পরিণত হয়েছিল পাল্টা আকর্ষণের কেন্দ্র তাই "মুক্তিপণ" আরো জরুরী হয়ে উঠেছিল। আজ যে কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র ও অন্যান্য কষ্টার্জিত অধিকার বিপন্ন, আক্রান্ত, তাও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার ফলে।

আরো একটি দিক নিয়ে কোনো কোনো সদস্য মন্তব্য করেছিলেন। বস্তুতঃ ১৯৯৩ এর সম্মেলনে এটাই ছিল আলোচ্য বিষয়। যে কথা অনেকের মনে ছিল। শ্রমিক আন্দোলন সরাসরি জাতীয়তাবাদী না হয়েও অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার মাধ্যম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাহায্য করেছিল দেশগঠনের প্রক্রিয়া। বিশেষ করে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান বা তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙে যে সব রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, বা ইটালি ও জার্মানির মত যেখানে রাষ্ট্রীয় ঐক্য দেরিতে

এসেছিল, সে সব ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের এই ভূমিকা প্রযোজ্য। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও কি নয়? এ দিক থেকে বিচার করতে গেলেও শ্রমিক শ্রেণীকে নিষ্ক্রিয়, যাদুঘরে সাজিয়ে রাখা দ্রষ্টব্য বস্তু গণ্য করা যায় না।

গ্রপো ও তাঁর সম মনস্ক কয়েকজন অন্য দিক থেকেও আক্রমণ চালালেন, অথবা বলা যায়, যুক্তি বিন্যাস করলেন। আজকের দিনে শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। (এই বক্তারা মূলতঃ পশ্চিমের কথা বললেও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের কথা তাঁদের চিন্তার মধ্যে ছিল।) একদা পশ্চিম ইউরোপে রাজনীতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা কম ছিল না। শ্রমিক ভিত্তিক সংগঠন—ট্রেড ইউনিয়ন, বাম দল—অনেকখানি স্থান দখল করত। শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র না হলেও ফ্রান্স, ইটালি বা সুইডেনকে শ্রমিক প্রভাবিত রাষ্ট্র বললে ভুল হত না। পশ্চিমের ধ্রুপদী রাজনৈতিক চিন্তায় যাকে বিভিন্ন শক্তির ভারসাম্য বলা হয়েছে (এটাই না কি সুস্থ রাষ্ট্রের লক্ষণ) মালিক শ্রমিক সম্পর্ক হয়ত ছিল তারই অন্যতম নিদর্শন।

গত এক দেড় দশকে এই ছবি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। যন্ত্রীকরণ (automation) ও "বিশ্বকরণ" (globalization) উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর শিরদাঁড়া প্রায় ভেঙে দিয়েছে। মার্কিন গণশিল্পী পিট সিগার গান গেয়েছিলেন, "বস প্রথমে তোমাদের চুলোয় যেতে বলবে। কিন্তু যখন দেখবে সব কর্মী একজোট, তখন পেছিয়ে যেতে বাধ্য হবে।" আজ "বস" কোনো একক পুঁজিবাদী নয়, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের মালিক বহুজাতিক কোম্পানি। শ্রমিকরা এককাট্টা হলেও তাদের মাথা ব্যথা নেই। একটি যন্ত্র বসিয়ে হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা যায়। বস্তুতঃ, গত বছর দুয়েকে বৃহত্তম মার্কিন কোম্পানিগুলি লাখ দশেক শ্রমিক কর্মী ছাঁটাই করেছে। আজকের আদর্শ, "রোগা" কর্পোরেশন। আর নয় ত বিনিয়োগ স্থানান্তরিত হয় তৃতীয় বিশ্বের কোনো প্রান্তে। যেখানে পুঁজির স্বর্গরাজ্য—ট্রেড ইউনিয়ন নেই অথবা নাম মাত্র আছে, শ্রম সংক্রান্ত আইন শিথিল, কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করলেও চলে; মজুরী "মেট্রোপলিটান" দেশের এক দশমাংশেরও কম। মার্কিন "মাকিলাদোরা', শিল্প এই ভাবে ল্যাটিন আমেরিকায়, বিশেষ করে সীমান্তের ওপারে মেক্সিকোতে পাড়ি দিলে। পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিপতিরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে এলব নদীর ওপারে সদ্য বিজিত সোভিয়েট ব্লকের উপর। জাপান নামছে পূর্ব এশিয়ায়। মার্কিন শ্রমমন্ত্রী রাইখের মন্তব্য, তাঁর দেশের মালিকরা আর শ্রমিকদের চিন্তা ভাবনা, ইচ্ছা অনিচ্ছা

নিয়ে মাথা ঘামায় না, "নাফ্‌টা" (North American Free Trade Association) সৃষ্টির পর।

তাদের হাত আরো শক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ভাগ্যে পাশার দান উল্টে গেছে। তাদের ভবিষ্যত ছায়াচ্ছন্ন। সবটাই ঘটেছে তাদের বাদ দিয়ে, কিছু করার সুযোগ না দিয়ে। আন্দোলনের তবে আর গুরুত্ব কোথায়? অতীত আন্দোলনের ইতিহাসও এ প্রসঙ্গে নেতিবাচক, নিরর্থক, ব্যার্থ মনে হয়, "sound and fury, signifying nothing.

এই রণক্ষেত্রেও গ্রপোদের বিরুদ্ধে দু' একজন সদস্য অস্ত্র ধারণ করলেন। বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ঈর্ষণীয় নয়, এ সত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু তার সঙ্গেও কি অতীত আন্দোলনের সম্পর্ক নেই? যন্ত্রীকরণের কথাই ধরা যাক। মৃত পুঁজি অর্থাৎ যন্ত্র যে জীবন্ত পুঁজি, অর্থাৎ শ্রমিকদের স্থান ক্রমশঃ নেবে, এ চিন্তা শিল্পবিপ্লবের আদি যুগ থেকে তাত্ত্বিকদের মাথায় ছিল। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা এ সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণীও করেছিলেন। সিসমঁদির মতে, এমন একদিন আসবে, যখন বৃটেনের রাজা একা একটি মাত্র বোতাম টিপে সারা বিশ্বের শিল্প নিয়ন্ত্রণ করবেন। যন্ত্রীকরণের চরম। (সে সময় বৃটেন সর্বপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ ছিল বলেই বোধ হয় সিসমঁদি এই উদাহরণ বেছে নিয়েছিলেন। আজকের দিনে বলতে পারতেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, জাপানী মিকাদো বা জার্মাণ চ্যান্সেলরের কথা।) মার্কসও এ নিয়ে অনেক লিখেছেন।

যন্ত্রীকরণ অতএব পুঁজিবাদের অমোঘ ও অবধারিত ফল। তবে এখানেও শ্রমিক আন্দোলন একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ট্রেড ইউনিয়ন, মজুরী বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়াকে হয়ত ত্বরান্বিত করেছিল। অপেক্ষাকৃত মূল্যবান শ্রমের বদলে এসে ছিল উন্নত প্রযুক্তি। অর্থাৎ শ্রমিকরা অজান্তে বা অনিচ্ছায় ইতিহাসকে তার নির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এ বিষয় অন্ততঃ বিতর্ক চলতে পারে। প্রচুর গবেষণাও হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের শ্রমমন্ত্রী সাঙ্গমা পরামর্শ দিয়েছেন, ভারতীয় শ্রমিকরা যদি চুপচাপ থাকে, কম মজুরীতে কাজ করে তাহলে বিদেশী কোম্পানিরা শ্রমঘন (labour intensive) ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে কর্ম সংস্থানের ভরসা দেবে। অর্থাৎ পুঁজির গতিবিধি বা বিনিয়োগের ছক কিছু পরিমাণে নির্ভর করছে শ্রমিকদের আচরণের উপর।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যে বি-শিল্পকরণ (de-industrialization) জোর কদমে চলেছে ও চলছে, তার পেছনেও কি কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই?

কয়লা শিল্পের কথাই ধরা যাক। এক কালে—খুব বেশি দিন আগেও নয়—খনিশিল্প ছিল ইউরোপীয় শিল্পের মুকুট মণি। খনিশ্রমিকরা ছিল ট্রেড ইউনিয়নের সবচেয়ে সংগঠিত, শক্তিশালী, জঙ্গী ভ্যানগার্ড বা অগ্রবাহিনী। এখন উত্তর ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, উত্তর ফ্রান্স, জার্মানির অঞ্চল, বেলজিয়ামের একাংশ ইত্যাদি শিল্প শ্মশানে পরিণত হয়েছে। খনিশিল্প সূর্যাস্তের পথে। যে সব সংঘবদ্ধ সমাজ বা গোষ্ঠী প্রায় দুই শতাব্দী ধরে খনিকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল, তা ছত্রভঙ্গ। সামাজিক জীবনের উপর এই পরাজয়ের গভীর প্রভাব পড়েছে। এর কারণ নাকি নেহাত অর্থনৈতিক। ব্যবসার নিরপেক্ষ হিসেব। চড়া মজুরী পাওয়া শ্রমিকরা ভূগর্ভ থেকে যে চড়া দামের কয়লা তোলে, তা আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি পশ্চিমের দেশগুলির পক্ষেও নিজেদের মাটিতে কয়লা উৎপাদনের তুলনায় বিদেশ থেকে আমদানি করা বেশি সুবিধাজনক। নয়ত জ্বালানির অন্য উৎস খোঁজা।

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। একাধিক সদস্য মন্তব্য করলেন, অর্থনীতির সরল অঙ্কের অন্তরালে মুখ লুকিয়েছে রাজনৈতিক কৌশল। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বৃটিশ খনি শ্রমিকরা ছিল গণ আন্দোলনের পুরোভাগে। ১৯২৬এ তাদের কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর লেবার সরকারের এক প্রধান সাফল্য ছিল খনি জাতীয়করণ। ১৯৭৪ সালে খনি শ্রমিক ধর্মঘট এক রক্ষণশীল সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। '৮৪-'৮৫এর অনুরূপ বৎসর ব্যাপী ধর্মঘট ছিল। বৃটিশ ইতিহাসে বৃহত্তম শ্রমিক সংগ্রাম ও থ্যাচারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। লেবার দল, অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন, এমন কি খনি শ্রমিকদের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ মরণ পণ লড়াই ব্যর্থ হয়েছিল। থ্যাচারও প্রতিশোধ নিতে ছাড়েন নি। লাখ দুয়েকের মহা পরাক্রান্ত খনি শ্রমিক ইউনিয়ন এখন হাজার দশেক সদস্য নিয়ে কোনো ক্রমে টি'কে আছে। অথচ খনিগুলি সত্যিই অতখানি লোকসানের উৎস ছিল না। হিসাবের কারচুপি দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। খনি ধ্বংসের ফলে বৃটিশ অর্থনীতির বরং দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হবে। দেখা যাচ্ছে, এখানেও শ্রমিকদের সর্বনাশ অমোঘ, যান্ত্রিক কিছু নয়, আন্দোলনও তার পরাজয়ের সঙ্গে জড়িত।

সম্মেলন কক্ষে এ প্রসঙ্গে দেখা দিল বিতর্কের ঝড় না হলেও কয়েকটি তরঙ্গ। এক ইংরেজ সদস্য '৮৪এর খনি ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য

করেছিলেন। সে কথা তুলেও তিনি নেতাদের তথাকথিত চরমপন্থার সম লোচনা করলেন। যাই হক, সে প্রশ্ন ভিন্ন। ক্ষেত্রবিশেষে রণনীতির ব্যাপার। আন্দোলন বাদে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস যেন প্রাণহীন দেহের ব্যবচ্ছেদ, এটুকু যেন অনেক সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মেনে নিলেন। গ্রপো পর্যন্ত স্বীকার করলেন, বৃটেনে হয়ত, আন্দোলন, তার ব্যর্থতা ও "ব্যাকল্যাশ" এবং মাদাম থ্যাচারের সুপরিকল্পিত দমন নীতি শ্রমিকদের সর্বনাশ নামক বৃক্ষটির মূলে জলসিঞ্চন করেছে। কিন্তু অন্যত্র এ প্রক্রিয়া ব্যক্তি নিরপেক্ষ।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাসকেও কি অতীতের শ্রমিক রাজনীতি ইতিবাচক ও নেতিবাচক, সংগ্রাম ও সহযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়? কয়েকজন সদস্য মনে করিয়ে দিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমে গড়ে উঠেছিল এক ধরণের মতৈক্য (consensus) ও সামাজিক চুক্তি (social contract)।

আন্দোলন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম, বিশ্বের এক বড় অংশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রমুখের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদের অভ্যন্তরেই বেশ কিছু আদায় করেছিল; প্রায় পূর্ণ কর্ম সংস্থান, অপেক্ষাকৃত উচ্চ মজুরী, কল্যাণ-ভিত্তিক রাষ্ট্র। বিনিময়ে তারা পুঁজিবাদকে মেনে নিয়েছিল, সমর্থন করেছিল, এমনকি ঠাণ্ডা গরম যুদ্ধে বাম বিরোধী শিবিরের শরিক হয়েছিল। প্রধান মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন, A. F. L.–C. I. O. (American Federation of Labour-Congress for Industrial Organisation), বৃটিশ লেবার দল, ইউরোপের বিভিন্ন সোশ্যাল ডেমোক্রাট পার্টি ও তাদের প্রভাবাধীন শ্রমিক সংগঠন কম্যুনিস্ট বিদ্বেষে ম্যাককার্থিকেও অতিক্রম করেছিল। আজ কম্যুনিজমের পতনের পর রাজনৈতিক ভাবে মালিকদের কাছে এই অনুগামীদের দাম কানাকড়ি। তৃতীয় বিশ্বের কিছু অংশে উপযুক্ত পরিকাঠামো (infrastructure), প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রম সহজলভ্য হওয়ার পর (সেই সঙ্গে মজুরী ও শ্রমিক কর্মীদের অন্যান্য অধিকার পশ্চিমের তুলনায় নামমাত্র) তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্বও ঢের কমে গেছে। তাই রাইখের উপরোক্ত মন্তব্য, রেগান, থ্যাচার, বালাদুর, বোলের দুঃসাহস। যে সি, আই, এ, তার পেন্টাগন মার্কা নীতির দৌলতে সি আই এ, নামে খ্যাত হয়েছিল, তার প্রবল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে "বন্ধু" প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন "নাফতা" চুক্তি অবলীলাক্রমে সই করলেন। রাজনৈতিক অভিধানে কৃতজ্ঞতা বলে কোনো কথা নেই। আছে কেবল তাৎক্ষণিক স্বার্থ।

আন্দোলন বনাম "অ্যান্টিসেপটিক" শ্রমিক ইতিহাসের বিতর্কের মধ্যে

সংগঠনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন আর এক দিক থেকে উঠল। তুললেন প্রাক্তন সোভিয়েট ব্লকের কিছু প্রতিনিধি। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। সম্মেলনের সমগ্র সদস্যদের প্রায় অর্ধেক এসেছিলেন "একদা" সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের নানা দেশ থেকে। গত দু'তিন বছরে তাদের রাষ্ট্রগত পরিচয় বা নাগরিকত্বের তালিকা বিভ্রান্তিজনক ভাবে বার বার বদলেছিল। সোভিয়েট থেকে রুশ, ইউক্রেনিয়ান, তাজিক ইত্যাদি চেকোশ্লোভাক থেকে চেক ও শ্লোভাক, ইউগোশ্লাভ থেকে সার্ব, ক্রোট, বসনিয়ান··হয়ত সদস্যরা নিজেরাও মনে রাখতে পারছিলেন না কে এই মুহূর্তে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। এটাই শেষ না ভবিষ্যতে আরো যোগ বিয়োগ, কাটা জোড়া হবে, তাও অনিশ্চিত। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের জাতিবৈর অবশ্য সম্মেলনে প্রতিফলিত হয়নি। বসনিয়ান সদস্যের বক্তৃতা এক ক্রোট মহিলা জার্মানে অনুবাদ করেছিলেন। আমার ইউক্রেনিয়ান রুমমেট, খারকভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মারিয়া হাকেল, রুশ ও লাটভিয়ান সদস্যদের দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। দেশ ভাগ হলেও তাঁদের ভাষা, ঐতিহ্য ও সমস্যা প্রায় এক। সবাই মিলে এক স্লাভিক প্রীতিভোজ হল!

প্রতিবিপ্লব ও পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতামত স্বাভাবিক ভাবেই বিভক্ত। কেউ উল্লসিত, কেউ বিষণ্ণ, অধিকাংশ বিভ্রান্ত, অনিশ্চিত। রুশ প্রতিনিধিদের একজন, মাদাম ওলগা উচ্ছ্বসিত ভাবে দাবি করলেন কম্যুনিস্ট আমলে আই, টি, এইচ, এর মঞ্চ ছিল সোভিয়েট ঐতিহাসিকদের পক্ষে সত্যভাষণের একমাত্র স্থান। এই অবদানের উপর স্মারক বক্তৃতায় জোর দিলেন সংগঠনের অন্যতম নেত্রী, (পশ্চিম) জার্মান সুজি মিলার। অন্য দু' একজন সিনিকাল সদস্য অবশ্য ব্যক্তিগত কথোপোকথনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করলেন। মাদাম ওলগার সত্যপ্রীতি, মানে কম্যুনিস্ট বিরোধিতা না কি হালের। বিগত জমানায় তিনি স্বদেশের সরকারি লাইন অনুসরণ করতেন। অনেকের বিষয়েই এ কথা প্রযোজ্য। তাছাড়া সত্যভাষণ বর্তমানে কতখানি অবাধ, নিরঙ্কুশ যে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন হাঙ্গারির ইয়ানুস। কাগজে কলমে সেন্সরশিপ খারিজ হলেও সূক্ষ্ম "সেলফ সেনসরশিপ" চালু আছে। আছে চাকরি যাবার ও অন্যান্য হেনস্থার ভয়। মিডিয়ার উপর দেশী বিদেশী মালিকদের ছড়ি ঘোরানো। তবে কি তথাকথিত ভোলতেয়ারিয়ান নীতি, "আমি তোমার সব কথায় বিরোধিতা করি কিন্তু তোমাকে কথা বলার অধিকার দিতে প্রাণ বিসর্জন

দেব", পূর্ব ইউরোপের নয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে অনুসৃত নয়? ইংরেজ প্রতিনিধি হাসতে হাসতে বললেন, "আমি তোমার সব কথার বিরোধিতা করি আর তোমাকে কথা বলতে দেব না।" লক্ষ্যণীয় এই যে মারিয়া বা ইয়ানুস অন্তরালে যা বলেছেন তা প্রকাশ্য সম্মেলনে বলেন নি। তাঁর দেশে "গোলাপী"রা কয়েক মাস আগে ক্ষমতায় এলেও অবস্থার পরিবর্তন হবে না, এটাই ইয়ানুসের ধারণা।

প্রায় সব দেশেই অনেক মানুষ আছে, যারা রাজনীতি বা সামাজিক অর্থ-নৈতিক কাঠামো নিয়ে ততখানি মাথা ঘামায় না। মোটামুটি স্বচ্ছন্দে থাকলে, কর্ম জীবন ও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন নির্বিঘ্নে যাপন করতে পারলে খুশি হয়। কেবল সর্বনাশ মাথার উপর এসে পড়লে সচেতন না হয়ে পারে না। মারিয়া সম্ভবত. এই সংখ্যাগুরু দলের প্রতিনিধি। তিনি কম্যুনিস্ট প্রেমিক নন বলেই মনে হয়। সম্মেলনে তাঁর পেপারের বিষয়ই ছিল ইউক্রেনে স্টালিনের অত্যাচার। কিন্তু তিনি স্বীকার করলেন, কম্যুনিজমের পতন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হওয়ার পর জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। খাবার. সাবান, ও দুধ সব কিছু দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য। মারিয়ার মাসিক মাইনে পাঁচ লক্ষ নয়া মুদ্রা আর এক পাউণ্ড সসেজের দাম প্রায় চার লক্ষ। লেখাপড়া উচ্চতর গবেষণার কথা না বলাই ভাল ইউক্রেনের বিখ্যাত রুটি পর্যন্ত আমদানি করতে হয়। অপরাধের হার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কেবল মেয়েরা নয়, পুরুষরাও সন্ধ্যার পর বাইরে যেতে সাহস করে না। রাতের সুন্দরী লিনৎস সহরের আলোকোজ্জ্বল পথ দেখে তাঁর মনে হত, স্বদেশের লাগাতার নিষ্প্রদীপ অবস্থার কথা। মারিয়ার মতে, একদল মাফিয়া ক্ষমতা দখল করে গোটা দেশকে লুট করছে। আগের জমানায় আরাম বিলাস না থাকলেও খেয়ে পরে বাঁচা যেত।

এই অবস্থার সঙ্গে শ্রমিক ইতিহাসের সম্পর্ক কি? ঐতিহাসিকদের কি সুবিধা না অসুবিধা হবে? এক পোলিশ প্রতিনিধির বক্তব্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে প্রতিবিপ্লব (তাঁর ভাষ্যে, গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতির উদয়) শ্রমিক ইতিহাস চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। প্রথমতঃ কম্যুনিস্ট আমলের মতাদর্শগত "স্ট্রেটজ্যাকেট" থেকে মুক্তি মিলেছে। সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে হবে না। অ-কম্যুনিস্ট, এমন কি কম্যুনিস্ট বিরোধী ধারা আর গবেষণার ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক প্রাক্তন সাম্যবাদী দেশে আর্কাইভ বা মহাফেজখানা সাধারণ পাঠকের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এইসব পুরানো অথচ নবাবিষ্কৃত দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র

শ্রমিক আন্দোলনের অতীতকে, আন্তর্জাতিক পটভূমিকাকে নতুন করে বুঝতে সাহায্য করবে। প্রচলিত চিন্তা বদলে দেবে, অজানা আনাচে কানাচে আলোকপাত করবে। বস্তুতঃ, ৯৫ সালের জন্য সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে শ্রমিক ইতিহাস সংক্রান্ত নতুন তথ্যের উৎস, "সোর্স মেটিরিয়াল।" সংগঠনের প্রাক্তন সেক্রেটারি ব্যারি ইতিমধ্যে এই কাজে মস্কোয় পাড়ি দিয়েছেন।

ইয়ানুস প্রমুখ কিছু পূর্ব ইউরোপীয় সদস্য এতখানি আশাবাদী নন। ইয়ানুস জোর দিলেন আর্থিক সংকটের উপরে। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। আই. টি. এইচ. এর ক্ষেত্রে যা সত্য, সোভিয়েট ব্লকের বিভিন্ন দেশের বেলায় তা আরো বেশি সত্য বা প্রযোজ্য। ইয়ানুস বুদাপেস্তে তাঁর নিজের প্রখ্যাত সংস্থার দিন আনি দিন খাই অবস্থার অন্ধকার ছবি তুলে ধরলেন। এমন কি সংস্থার "ইয়ার বুকের" কপি সম্মেলনে এনে বিতরণ করবেন, তেমন সামর্থ নেই। পশ্চিমের সর্বোন্নত প্রযুক্তি হাতের মুঠোয়, অথচ একটা টাইপ রাইটার কিনতে গেলে দশ বার ভাবতে হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এক হাতে যে আইনগত অধিকার দেয়, অন্য হাতে তার বাস্তব প্রয়োগ কেড়ে নেয় বা সীমিত করে। প্রাক্তন সোভিয়েট ব্লকের গণতন্ত্র প্রেমিকরা সর্বত্র এই সত্য ঠেকে শিখছে। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রও ব্যাতিক্রম নয়। মারিয়া ত' স্পষ্ট ভাষায় বলে ফেললেন, "ইতিহাস চর্চা, শ্রমিকদের নিয়ে লেখা লিখি হক বা না হক, আমার কিছু এসে যায় না। আমি এখন মেয়েকে নিয়ে কোনো মতে বাঁচতে চাই।" এ কথা তিনি অবশ্য আড়ালে বলেছিলেন; প্রকাশ্য সভায় নয়। কে জানে, এটাই ওপরের ওপারের অনেক সদস্যর অনুচ্চারিত মনের কথা কি না।

আর্থিক দুর্বলতা ছাড়াও নয়া জমানায় আরো বাধা আছে। তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, কিছুটা সভায়, আরো বেশি ব্যক্তিগত কথোপকথনে। না হয় ধরে নেওয়া গেল, কম্যুনিস্টরা শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসে এক বিশেষ ধরণের ঝোঁক, "বায়াস" আমদানি করেছিল। গবেষণা হয়েছিল কিছুটা একমুখী ভাবে। কিছু অস্বস্তিজনক এলাকা ধূসর রাখা হয়েছিল, কঠিন প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তবু মতাদর্শগত কারণে, এমন কি রাষ্ট্রশক্তি রূপে বজায় থাকার তাগিদে কম্যুনিস্ট শাসক ও বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয় বিশেষ উৎসাহ দেখাত। এক অর্থে শ্রমিক ও গণ ইতিহাসই ছিল তাদের অস্তিত্বের কারণ। সাধারণ মানুষের সামনে পরিবেশন করার মত যুক্তি ও আদর্শ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে,

সত্তরের দশকের শেষ দিকে সোভিয়েট অ্যাকাডেমির একদল সেরা পণ্ডিত ও গবেষক যে বহু খণ্ড সম্বলিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস প্রকাশ করেছিলেন, তা ত্রুটিহীন না হলেও অত্যন্ত মূল্যবান।

আজকের পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কেবল পুঁজিবাদী তাই নয়, কবর খুঁড়ে পুঁজিবাদকে বার করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোনো আন্দোলনের ব্যাপারে তারা অতিরিক্ত স্পর্শকাতর, অ্যালার্জিক। অতীত বা বর্তমান যাই হক না কেন। অতীত কখন আচমকা বর্তমানের উপর আছড়ে পড়বে। পূর্ব ইউরোপের অনেকাংশে আজ প্রাক কম্যুনিস্ট যুগের অবস্থা—যার বিরুদ্ধে একদা শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল—ফিরে এসেছে, সে কথা অনস্বীকার্য। ও সব ভুলে থাকাই ভাল। যে দু একটি দেশে গোলাপী বনে যাওয়া নানা দল ক্ষমতায় আছে, সেখানেও অবস্থা অন্য রকম নয়। তারা বরং নিজেদের অতীত মুছে ফেলতে পারলে বাঁচে।

ইয়েল্টসিনের রাশিয়ার কথাই দেখা যাক। এখন সে দেশে এমন কি উদার পন্থা নয়, জারতন্ত্র মডেল হিসাবে গৃহত। প্রাক বিপ্লব রাশিয়া স্বর্গরাজ্য ছিল, রোমানভরাই আদর্শ, এমন বাণী জোর করে প্রচার করা হচ্ছে। বৃটিশ রাজ পরিবার নানা কেলেঙ্কারি ও বে-হিসেবী খরচের দরুণ স্বদেশে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। রাশিয়ায় কিন্তু রাণী ও যুবরাজের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা যে রোমানভদের আত্মীয়, বলশেভিকরা বাদ না সাধলে রোমানভরা আজো ঈগল চিহ্নিত সিংহাসন আলোকিত করত, একথা বার বার বলা হয়েছিল। নিহত জার নিকোলাসকে সপরিবারে, সসম্মানে সমাধিস্থ করা হবে। বিপ্লব বা সাম্যবাদ দূরে থাক। সামান্যতম জার বিরোধিতা অপরাধ বলে গণ্য করা নিয়ম। এই মানসিক অবস্থায় কি ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত লেখা যাবে? গ্রপো যাকে শ্রমিক ইতিহাস বলেছেন, তাও হাতের বাইরে। কারণ জারের জমানায় রুশ শ্রমিকরা রাজার হালে ছিল না, এ সত্য প্রকাশ করা যাবে না।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, জার ভজনা গর্বাচেভের আমলেই সুরু হয়েছিল। যারা গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রয়কাকে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ মনে করত, তারা এর প্রতিক্রিয়াশীল দিক সম্বন্ধে চোখ বুজেছিল।

যে সব নতুন তথ্য নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করা রেওয়াজ, তার মূল্যও সন্দেহাতীত নয়। আজকের দিনে রাশিয়ায় ক্ষমতাসীন চক্র যা খুশি করতে পারে।

ইতিহাসে ভেজাল মেশানোও অসম্ভব নয়। যেমন, বছর খানেক আগে মস্কোয় প্রকাশিত এক দলিল নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। তাতে না কি প্রমাণিত হয়, ভিয়েতনামিজ কম্যুনিস্টরা বহু মার্কিন যুদ্ধবন্দীকে সে যুগের সোভিয়েট কারাগারে পাচার করেছিল। পরে দেখা গেল, দলিল জাল। স্বদেশে লেনিন জীবনী নামে হালে যে সব প্রকাশিত হচ্ছে, তাকে সিরিয়াস ইতিহাস না বলে নিছক গালাগাল-বা মিথ্যা প্রচার বলা উচিত। তাও খুব বুদ্ধিমানের মত মিথ্যা ভাষণ নয়। লেনিন ইহুদী ছিলেন (উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদীর চোখে এটা অপরাধ), তিনি ধর্মকে উচ্ছেদ করেছিলেন, পশ্চিমের কাছে দেশ বেচে দিয়েছিলেন, এ জাতীয় গোয়েবেলসিয় বিবরণ।

হ্যাঁ, শ্রমিক আন্দোলনের একটি দিক সম্বন্ধে পূর্ব ইউরোপের নয়া জারদের (বা নয়া পিলসুদস্কি, নয়া হর্থিদের) আগ্রহের অন্ত নেই। সেটা হল, কম্যুনিস্ট বিরোধী শ্রমিক বিক্ষোভ। ১৯১৮ এর রাশিয়ায় ক্রনস্টাট, ৫৩-র পূর্ব বার্লিন, ৫৬ র বুদাপেস্ত '৫৬, '৭০, '৭৬ সর্বোপরি ৮০–৮১ এর সলিডারিটি আন্দোলনে উত্তাল পোল্যান্ড, ছয় জুন ৮৯ এর পিকিং, যদিও সেখানে শ্রমিকদের অবস্থান স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন সোস্যাল ডেমোক্রাট গোষ্ঠী বা ধারা বছর তিনেক আগে নিকলজের সম্মেলনে এক (পশ্চিম) জার্মাণ সদস্য আশা প্রকাশ করেছিলেন, লেনিনবাদী বিষাক্ত পরগাছাকে ছাঁটাই করে খাঁটি মার্কসবাদ, অর্থাৎ সোশাল ডেমোক্রাসির গাছ, তরতাজা হয়ে গজিয়ে উঠবে। সোভিয়েট "গুলাগ" বা বন্দী শিবির নিয়েও জল্পনার অন্ত নেই। "স্টালিন, হিটলারের তুলনায় বেশি কম্যুনিস্ট হত্যা করেছিলেন", এমন দাবি সম্মেলনে একাধিক বার শোনা গিয়েছিল।

তবে কি এ সব বিষয় নিয়ে ইতিহাস চর্চা হবে না? নিশ্চয় হবে। আরো ভাল নিরপেক্ষ, তথ্যপূর্ণ ইতিহাস চাই। যে সলিডারিটি বা সলিডারনস্ক আন্দোলন পোলিশ তথা পূর্ব ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর সর্বনাশ করেছিল, (এক সময় ওয়ালেসা সম্বন্ধে অনেক বামপন্থীর কী মোহই না ছিল) তাও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু এই চিত্র সীমাবদ্ধ। কম্যুনিস্ট ইতিহাস যদি একপেশে হয়, তবে নতুন ঐতিহাসিকদের ঝোঁক বিপরীত দিকে। দু শ' বছর ধরে, এমন কি বিগত সত্তর বছর ধরে, বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী কি কেবল কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের পুঁজিবাদ বিরোধী দিকের প্রতি আজ "শোধনবাদী" ঐতিহাসিকদের অনীহা।

এক চেক প্রতিনিধি (ইনি নৈরাশ্যবাদী হলেও মোটের উপর বর্তমান সরকারের সমর্থক) সমাজ গণতন্ত্র অবধিও যেতে রাজি নন। শ্রমিক সংগঠনকে মিশে যেতে হবে সরাসরি গণতান্ত্রিক "মূল ধারায়।"

চীন থেকে এসেছিলেন পাঁচজন সদস্য। এশিয়ান দেশ গুলির মধ্যে এটিই ছিল বৃহত্তম দল। পার্টি স্কুলের প্রবীণ পরিচালক থেকে তরুণী রিসার্চ ছাত্রী তাতে স্থান পেয়েছিল। চীনের অবস্থা সোভিয়েট ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপের মত নয়। সংস্কার সেখানে বিপর্যয় বা গৃহযুদ্ধ নিয়ে আসে নি। এনেছে অভূতপূর্ব সাফল্য—এবং নানা সমস্যা। দেং গর্বাচেভ নন। তিনি পশ্চিমের নিন্দা প্রশংসার পরোয়া না করে স্ব-নির্বাচিত্ পথে অগ্রসর হয়েছেন। তবু ভবিষ্যত এখনো সংশয়াচ্ছন্ন। চীনা প্রতিনিধিরা কয়েকটি মূল্যবান গবেষণা পত্রে সংস্কার উত্তর শ্রমিক শ্রেণীর কয়েকটি দিক, শক্তি ও দুর্বলতা, নিয়ে খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করেছিলেন। প্রাক্‌বিপ্লব যুগের কিছু প্রসঙ্গও উঠেছিল। তবু একটা বিষয়ে সন্দেহ বা কৌতূহল দূর হল না। মাও-উত্তর চীনের মূল নীতি, কোনো মতে, যতটা বেশি সম্ভব বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করা। এই চিন্তা ও মতাদর্শের জগতে কি ভাবে মূল্যায়ণ হবে বিশের দশকে সাংহাই ক্যান্টনে বিদেশী কোম্পানিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের বড়ের? "চাং, আমি চাং, লোহাশালে সাংহাইয়ের পথে ধর্মঘটে" (বিষ্ণুদের অনুবাদ, ল্যাংস্টন হিউজের কবিতা) সে যুগের নায়ক ছিল। আজকের দিনেও কি সে বীর গণ্য হবে? '৯৩-'৯৪ এ বিদেশী সেক্টরে শ্রমিক কর্মীদের ধর্মঘট চীনা সরকার খুব ভাল চোখে দেখে নি, যদিও তাদের কিছু দাবি মেনে নেওয়া হয়েছিল।

মানুষ ইতিহাস লেখে আর সৃষ্টি করে। আবার তাদের সৃষ্টি করে ইতিহাস। এই ভাঙ্গা গড়ার খেলা, অতীত, ভবিষ্যত ও বর্তমানের মধ্যে দ্বান্দ্বিকসম্পর্ক লিনৎস্ সহরের শান্ত, মায়াময় পরিবেশে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। জীবন ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আবাহন না বিসর্জনের বাজনা বেজেছে, সে প্রশ্নের উত্তর আগামি দিনই দিতে পারে। অতীতের ছায়া হয়ত' তখন দেখা দেবে অন্য রূপে।

কুমার রায়ঃ একটি সাক্ষাৎকার

সন্ধ্যা দে

[কুমার রায় পশ্চিমবাংলার গণনাট্য আন্দোলনের একজন শিক্ষিত কর্মী এবং গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে তাঁর দায়বদ্ধতা বাংলা মঞ্চে আজ কিংবদন্তি হয়ে গেছে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে নাট্যাভিনেত্রী ও নাট্য-গবেষিকা সন্ধ্যা দে তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার টেপবন্ধ করেছিলেন। সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বয়ান এ-সংখ্যায় প্রকাশিত হল। এটি গ্রহণ করা হয় ১৯৮৭-র ২ এপ্রিল। সম্পাদক পরিচয়]

১। নাট্যকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করার আগে এ-বিষয়ে আপনার মানসিক প্রস্তুতি কিভাবে গড়ে উঠেছিল ?

উঃ খুবই ছেলেবেলা থেকে দেখেছি আমাদের বাড়িতে নাটকের চর্চা ছিল। ঐ ছাড়া উত্তরবঙ্গে নাটকের চর্চা খুব বেশি ছিল। ফলে আমার বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে নাটকের পরিবেশের মধ্যে। কাজেই, নাটক সম্পর্কে অল্প বয়স থেকেই ধ্যানধারণা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। যদিও পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে থিয়েটার সম্পর্কে যে গভীর কথা শুনলাম তা আগে এতটা জানা ছিল না। কিন্তু থিয়েটার সম্পর্কে ভালবাসা খুব অল্প বয়স থেকেই গড়ে উঠেছিল।

২। আপনি আপনার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে নাটক পরিচালনা ও নাট্যাভিনয়কে গ্রহণ করলেন কেন ?

উঃ এটাতো ভেবে চিন্তে কিছু করিনি। এখন বললে তা মিথ্যে মিথ্যে বানিয়ে বলা হবে। নাটক ভাল লাগত তাই চলে এসেছি। এখানে এসে হঠাৎ একদিন, ঋত্বিক অর্থাৎ ঋত্বিক ঘটক (কলেজে আমার সহপাঠী ছিল) এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটির সামনে ও বলল 'আমরা একটা দল করছি'—শম্ভুদাও ছিলেন সেদিন ওর সঙ্গে। এই প্রথম শম্ভুদার সঙ্গে আমার আলাপ হল। তারপর থেকে চলে এলাম নাটকে। আর ভেতরে ভেতরে নাটক করবার যে আর্জ তা তো ছেলেবেলা থেকেই ছিল। সেই থেকে ৩৮ বছর হয়ে গেল 'বহুরূপী' তে।

৩। (ক) আপনার চোখে চল্লিশের দশকের গণনাট্য আন্দোলনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা কি?

আসলে কি দেখো—এখানে এসেছিলাম আটচল্লিশ কি উনপঞ্চাশ সালে। তখন চল্লিশের দশক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা একটা জিনিস তখন দেখেছিলাম, তা হলো—গণনাট্য তখন ভেঙে গেছে। ভেঙে নতুন নতুন গ্রুপ তৈরি হয়েছে। যদিও নতুন নতুন গ্রুপ বলতে তেমন অসংখ্য তা নয়। শুরুতে তো আমরা একটাই অর্থাৎ একটাই দল ছিল। আর তারপরে এক-আধটা যেমন 'রূপচক্র' সুধীবাবুদের এবং লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এরপরে অবশ্য ধীরে ধীরে আরও গ্রুপের আবির্ভাব ঘটেছে। কাজেই তখন 'গণনাট্য'-র মূল্যায়ন এক রকম করে হয়েই গিয়েছে বলতে পারো। 'গণনাট্য' কাজটা শুরু করে ছিল একটা আদর্শ সামনে রেখে এবং মোটামুটিভাবে 'গণনাট্য' ভেঙে গেলেও এই দলগুলির মধ্যে সেই আদর্শটা কিন্তু ছিল। যে আদর্শটা সবাইকে এক জায়গায় করতে পেরেছিল। যেমন 'গণনাট্য'-র সামনে আদর্শ ছিল বলেই তারা কাজ করতে পেরেছিল তেমনি এখানে যখন গ্রুপগুলো তৈরি হলো তখনও কিন্তু 'গণনাট্য'-র মতই একটা আদর্শ সামনে ছিল এবং সেই সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছিল এই ভাবনা, নাটকটাকে কিভাবে শিল্প-শোভন করে তোলা যায়; ভাল নাটককে কিভাবে আরও ভাল করে করব যাতে জীবনের কথা থাকবে, সমাজের কথা থাকবে এবং যে করাটা হবে সেটা কিন্তু খুব ভাল করেই করতে হবে। অর্থাৎ নাটকে যে নাট্যশিল্পের দিকটা রয়েছে সেটাও যেন যথেষ্ট গুরুত্ব পায় এই নাটক প্রকাশের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ দর্শক যেটা দেখবে তার মধ্যে যেন সেটা থাকে। আমার মনে হয়, এসবের শুরু 'গণনাট্য' থেকেই, তাই 'গণনাট্য' আদি নিঃসন্দেহে।

(খ) 'গণনাট্য' অতি দ্রুত ভেঙে গেল—সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? তাছাড়া বহু ব্যক্তিত্ব নিয়ে গণনাট্যের বিকাশ, কিন্তু থেমে গেল খুব অল্পদিনে—এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উঃ তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল ঠিকই, কিন্তু গণনাট্যর অস্তিত্ব এবং নাম কিন্তু দীর্ঘদিন এমন কি আজও রয়েছে। দেখো, যে কোনও আন্দোলনের শুরুতে একটা উত্তেজনার পর্ব থাকেই তারপরে সংগঠনের পর্ব। তো, আমার ধারণা গণনাট্যের সেই কালটা হলো উত্তেজনার পর্ব আর সেই উত্তেজনাকে আমরা ফেলনা ভাবতে পারি না, কারণ যে কোনও আন্দোলনই শুরু হয় উত্তেজনা থেকে তারপর আন্দোলন সংগঠিত হয়। সেই সংগঠনের পর্বটাই হচ্ছে আমাদের এই পর্বটা। এটাই আমি মনে করি।

৪। (ক) রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ে আপনি শুধু অংশগ্রহণই করেন, নি...

'মালিনী' নাটকটি পরিচালনাও করেছেন—এই সবকিছুর প্রাসঙ্গিকতা আপনার কাছে কতটুকু ?

উঃ আমার কাছে ? দেখো, এর আগেও এখানে আমি শম্ভুদার কাছে যতটা শিখেছি, শুনেছি রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনার সূত্র ধরে, তাতে বুঝতে পেরেছি যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলো অন্য ধরনের। এই বোধটা এবং এই ধরনটা খুব যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ধরন সে সম্পর্কে একটা আন্দাজে শম্ভুদা আমাদের মনে তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর অসাধারণ প্রযোজনাগুলো, যার সঙ্গে আমরা নিজেরাও যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং অভিনেতা হিসেবে নানান কাজের মধ্য দিয়ে এটা করতে করতে সেটা আমরা বুঝেছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধরন আলাদা। এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক আমাদের জীবনে কিন্তু অনেকখানি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল, যা পায়নি বলে মনে হয়। যা সাধারণত 'বহুরূপী' চেষ্টা করেছে, শম্ভুদা চেষ্টা করেছেন। যতদিন যাচ্ছে, তত একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের উত্তরের ভাণ্ডার, অর্থাৎ নানান সঙ্কট, নানান প্রশ্ন তার নানান উত্তর রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং আমাদের নাট্যচর্চার মাধ্যমে একটা দিক—যা প্রায় অবহেলিত থেকেছে, সেটা রবীন্দ্রনাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে সেই অবহেলার যে দায়ভার সেইটে থেকে মুক্তি দিতে পারি। তার কারণ, বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক কারণে একভাবে সূচনা হয়েছিল আবার ঐতিহাসিক কারণে বা প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন বলে অন্য ধরনের নাটক লিখতে শুরু করেন। সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনটা বহুকাল বুঝতে পারা যায়নি যে, কেন রবীন্দ্রনাথ নাটকগুলো লিখেছিলেন বা কেন লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৯০৮ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারার যে পরিবর্তন হলো শেষ পর্যন্ত যার মধ্যে আমাদের সেই ঐতিহাসিক প্রযোজনাগুলি রয়েছে তবে এর মধ্যে বিসর্জন ছাড়া। বিসর্জন অবশ্য তাঁর প্রথম দিককার নাটক। আর বাকি যেগুলো আমরা করেছি সেসব গুলোই পরবর্তীকালের, সম্প্রতি মালিনীও করলাম। দেখা গেল, বিসর্জনের পরেই সেটা লেখা। বিসর্জনের ছ'বছর পরে লেখা কিন্তু আজকে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে মালিনীর পর প্রায় নব্বই বছর কেটে গেছে তবুও মালিনীর মধ্যে আমরা আজকের সমস্যার কতকগুলো উত্তর খুঁজে পাচ্ছি। সেই জন্যে আমার কাছে বার বারই যেন মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলো যেন আমাদের উত্তরের সম্ভার। যে উত্তরগুলো আমরা খুঁজি, তার উৎস সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তি-সঙ্কটের মধ্যে আমাদের অসম্পূর্ণতা। আমার কাছে এটা মনে হয়েছে

যে আজও সেই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার উত্তরগুলো আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে খুঁজে পাই।

(খ). আপনারা কিন্তু অনেকদিনবাদে রবীন্দ্রনাটকে হাত দিলেন এবং তাও রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম বর্ষ উপলক্ষে।

উঃ আসলে কি জানো, ১২৫ তম অনুষ্ঠান এভাবে ভেবে কিছু করা হয়নি। ঘটনাটা ঘটে গেছে। এ নাটক আমাদের করবার ইচ্ছা অনেকদিন ধরে। এবং বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের বর্তমান যে অবস্থা সেইটে অনেক বেশি আমাদের এ নাটক করবার পেছনে প্রেরণা। ১২৫ বছরটাও হয়ে গেল। আসলে 'মালিনী'র যে বিষয়বস্তু, 'মালিনী'তে যে সঙ্কটের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে চতুর্দিকে যে কাণ্ডটা হচ্ছে—এই অবস্থায় আমাদের মনে হয়েছে 'মালিনী' করা উচিত। এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। তাও তো আমার মনে হয় 'মালিনী' ভালভাবে করা যায়নি নানান কারণে। মনে হয়েছে, এটা খুব ছোট, লোকের কাছে ঠিকমত যাবে না। দেখো, ৯০ বছর আগের লেখা আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। এবং আরও মনে হয়েছে আজকের সংকটের কতকগুলো উত্তর আমরা এর মধ্যে দিয়ে খুঁজে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে বলেছেন ধর্ম কি? আজকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মের অর্থ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। সঙ্কীর্ণ বলেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ধর্ম প্রদীপ নয়, ধর্ম আলো।' আমার কাছে আজকের দিনে ধর্মের এই ব্যাখ্যা বড় তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ধর্ম নিয়ে আমরা ভীষণ সঙ্কীর্ণ—তায় ভুবছি। অর্থাৎ সেই দিক থেকে এই সময়টা 'মালিনী' করার সপক্ষে।

(গ) 'মালিনী' নাটক করতে গিয়ে আপনাকে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে? এতগুলো লোক বেরিয়ে যাবার পরেও আপনি এ ধরনের নাটক কিভাবে করলেন—সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

উঃ দেখো, এতগুলো লোক সে তো কয়েক বছর আগের থেকেই নেই। এই পর্বের মধ্যে তো আমরা কয়েক বছর রয়েছি তাছাড়া এর পরে তো আর নতুন কিছু ঘটেনি। শম্ভুদা অবসর নেওয়ার এবং তৃপ্তিদি চলে যাবার পর বাকি যে অবস্থাটা রয়েছে সে তো সেই থেকেই রয়েছে। এক্ষুনি ঠিক এই মুহূর্তে আর কোনো নতুন সঙ্কট দেখা দেয়নি বা ঘটেনি। কাজেই যে শক্তি নিয়ে মৃচ্ছকটিক, গ্যালিলেও, রাজদর্শন করা গেছে মোটামুটি সেই শক্তি নিয়েই 'মালিনী' করা গেছে।

(গ) চিরায়ত বা ক্লাসিক ধর্মী নাটকে অভিনয় আপনার আগ্রহের কারণ কি?

উঃ আমি আধুনিক বা আজকের দিনের লেখা নাটকে অভিনয় করি না বা তাতে আমার অনীহা এমন কোন কারণ নেই। দেখো, ভাল নাটক পেলেই অভিনয় করতে ইচ্ছে করে। আমি কেবলমাত্র specialised করছি ক্ল্যাসিক ধর্মী নাটকে তা নয়। যদি আমার পুতুল খেলার অভিনয় কেউ মনে রাখে বা কারো মনে থাকে, অবশ্য আমি কি করেছিলাম জানি না—দেখো ওটা তো ঐ অর্থে classic নয়, যদিও আধুনিক ক্ল্যাসিক নিশ্চয়ই, পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিক হিসেবে বলা যায়।··এছাড়া কাঞ্চনরঙ্গ করেছি। সেতো একেবারেই আধুনিক নাটক। এছাড়া রাজদর্শন সেটাও তো সাম্প্রতিক লোকেরই লেখা। ওটা নিশ্চয়ই ক্ল্যাসিক নয়। আধুনিক সমস্যা নিয়েই লেখা। যদিও ভঙ্গিটা একটু রূপক, মানে রূপকথার ধরন রয়েছে। আর গ্যালিলেও-কে কি বলব—আধুনিকই বলব, আধুনিক ক্ল্যাসিক নিশ্চয়ই। দেখো, তবুও একটা প্রবণতা আর কি। আসলে ভাল নাটকে ভালভাবে কাজ করতে পারলে ভাল লাগে।

৪। আবৃত্তি ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত মিল ও পার্থক্য কোথায় ?

উঃ মিল তো নিশ্চয়ই রয়েছে। মূলত আবৃত্তি আর অভিনয়ের মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই। দেখো, আমরা আবৃত্তির যে চর্চা করি এবং অভিনয়ের যেটা চর্চা করি এর মূল ভিত্তিভূমি বোধহয় এক। মোটামুটি দুটোই বাচিক ব্যাপার অর্থাৎ কথা বলার ব্যাপার। আবৃত্তিও তাই, অভিনয়ও তাই। আমাদের যা কিছু অভিব্যক্তি সেটা আমাদের কণ্ঠস্বর দিয়েই প্রধানত। অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি হচ্ছে শারীরিক অভিব্যক্তি, মুখজ অভিনয় এবং দেহজ অভিনয়—যেটা শারীরিক। আবৃত্তিতে এটা লাগছে না। কিন্তু যতক্ষণ আমরা কণ্ঠস্বরের ওপর অর্থাৎ বাচিক ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ততক্ষণ কিন্তু আবৃত্তি আর অভিনয়ের ব্যাপারটা একই। আমরা আবৃত্তি করি কণ্ঠস্বরের অনুশীলনের জন্য তো বটেই ; আর উচ্চারণের স্পষ্টতা ? আমরা যে ভাষায় কথা বলছি সে ভাষার যে বৈশিষ্ট্য তার প্রকাশ উচ্চারণের মধ্যে। দ্বিতীয় কথা আমরা যখন কথা বলি তখন তার মধ্যে একটা ছন্দ থাকে আবৃত্তিতে, সে ছন্দের অনুশীলনও হচ্ছে, যদিও কবিতার ছন্দ আর কথা বলার ছন্দ এক নয় কিন্তু ছন্দ তো দুটোতেই আছে ? তাহলে ছন্দের শিক্ষাটা আমাদের আবৃত্তি চর্চার মধ্য থেকে হচ্ছে। উচ্চারণে কণ্ঠস্বরের সাবলীলতা যেমন অভিনয়ের ক্ষেত্রে দরকার, তেমন আবৃত্তির ক্ষেত্রেও দরকার ; আর দ্বিতীয় কথা যখন কবি কবিতা লিখছেন তখন শব্দ নির্বাচনের পেছনে একটা মনোভাব বা ভাবকে প্রকাশ করবার

জন্যেই শব্দ নির্বাচন করা হচ্ছে। এবং আমরা যখন আবৃত্তি করছি সেই শব্দটাকে কণ্ঠে ধারণ করে সেই আবেগটা বা অনুভূতিটাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তো সেই একই। নাট্যকার যখন একটা চরিত্রের সংলাপ লিখেছেন তখন সেই সংলাপের পিছনে নিশ্চয়ই একটা মনোভাব বা আবেগ কাজ করছে। সেইটেই ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এবং আমরা যখন কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করছি অভিনয়ের ক্ষেত্রে, তখন ঐ নাট্যকারের বা চরিত্রের যে ভাব এবং আবেগ, সেইটাকেই প্রকাশ করছি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে, কাজেই, সে দিক থেকে তো খুব একটা তফাৎ নেই। অন্তত অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না। যার জন্যে অভিনয়ের ক্ষেত্রে শম্ভুদা আমাদের এখানে প্রথমেই আবৃত্তির চর্চা করাতেন। এবং এখানে অভিনেতা তৈরির প্রাথমিক পর্যায়টাই হলো—আবৃত্তি। আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কণ্ঠস্বর তৈরি, উচ্চারণের স্পষ্টতা, উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য এবং কথার পেছনে যে চিন্তা বা ভাবনা বা আবেগটা রয়েছে সেইটাকে কিভাবে গলায় প্রকাশ করি বা প্রকাশ করতে পারি অভিব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে ছন্দ যোগ। কেবল অভিনয়ের ক্ষেত্রে তফাৎ রয়েছে তা হলো—আবৃত্তি কেবলমাত্র বাচিক, আর অভিনয়ে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে অভিনয় করছি। মূখজ অভিনয় রয়েছে। সেখানে অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছে চোখে। তবে যতক্ষণ কণ্ঠস্বরের ওপরে নির্ভর করছি ততক্ষণ কিন্তু আবৃত্তি ও অভিনয়ের মধ্যে তফাৎ নেই।

৫। দেখুন, আমরা এমনও দেখতে পাই অনেকে আছেন যাঁরা অভিনেতা হিসেবে প্রভূত স্বীকৃতি পেয়েছেন অথচ আবৃত্তি করেন না। সে ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি ?

উঃ দেখো, এমন হতে পারে যে, আবৃত্তির আসরে কবিতা আবৃত্তি করেন না। সে কোন অভিনেতা আবৃত্তি নাও করতে পারেন আসরে, কিন্তু তাই বলে যে, আবৃত্তি চর্চা করেন না এটা অবশ্য আমি ঠিক জানি না। তবে কি জানো, আমার ধারণা যারা বড় অভিনেতা বা ভাল অভিনেতা, তাঁরা বোধহয় আবৃত্তিচর্চা করেন, গিরিশবাবুদের সময়ের কথা বলতে পারব না তবে নিশ্চয়ই করতেন। শিশির ভাদুড়িদের সময়ে অর্থাৎ শিশির ভাদুড়ি এবং তারপরে আমাদের যুগে শম্ভুদা, এঁরা কিন্তু আবৃত্তি করেছেন এবং বাচিক অভিনয়ের খ্যাতিটা অর্থাৎ আবৃত্তিচর্চা করার ফল আমরা কিন্তু পেয়েছি।

৬। নাটক পাঠের রীতি যে রকম ভাবে হবে নাট্যাভিনয়ের স্বরক্ষেপণের রীতিও কি সে রকমই হবে ?

উঃ না, তা কেন! এটা তো খুব স্বচ্ছ ব্যাপার আমি নাটকটা পাঠ করছি

তো অল্প লোকের জন্যে, আমি ঘরে বসে নাটকটা পাঠ করছি। কিন্তু যখন যখন অভিনয় করি তখন তো সাতশো, আটশো হাজার লোকের কথা ভাবতে হচ্ছে আর দ্বিতীয় কথা হলো, আমি এক জায়গায় বসে একটা জিনিস করছি আর সেখানে আমি আমার ভূমিকাটিই করছি। আর যখন নাটক পাঠ করছি তখন তো বিভিন্ন চরিত্রগুলোর সংলাপও পড়ছি আর সেটা এক জায়গায় বসে করছি, একটা তফাৎ হবেই।

৭। আপনার পরবর্তীকালের নাট্যপরিচালকদের সম্পর্কে এবং বিশেষতঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলুন।

উঃ অজিতেশ আমার বয়সে ছোট কিন্তু ওর কাজটা আমার কাছে খুবই শ্রদ্ধেয়, যে কাজ করে গেছে অজিতেশ তাতে তো আমার শ্রদ্ধাই বেড়েছে। এবং আমার তো মনে হয়েছে যে, যেভাবে শম্ভুদা থিয়েটার সম্পর্কে ভেবেছিলেন আমরা দেখেছি যা এবং পরের ধাপে বোধহয় অজিতেশই একমাত্র করেছে। নিজের মতো করে নিশ্চয়ই সে আলাদা করে নিয়েছে কিন্তু শুরু বা তার অনেকদিন পর্যন্ত—শম্ভুদা যে আদর্শটা থিয়েটারের ক্ষেত্রে তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন, সফল হয়েছেন, অজিতেশ কিন্তু সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন, তাতে করে আমরা যারা 'বহুরূপীতে' আছি তারা একটা আত্মীয়তা অনুভব করি কাজ করতে করতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সে অর্জন করেছে। আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করে গেছে। আমরাও তার কাজকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছি শেষ প্রযোজনা পর্যন্ত। আজ অজিতেশ থাকলে আরো কাজ করতে পারলে বাংলা থিয়েটার নিশ্চয়ই আরও সমৃদ্ধ হত। এবং সবচেয়ে যেটা বড় তা হলো ও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পেরেছিল। আলাদা দাগ রেখে যাবার যে ব্যাপারটা সেটাতো একটা বিরাট ব্যাপার। আর অন্যদের কথা আমার পক্ষে বলা মুশকিল, আমি যে তাদের খুব কাজ দেখেছি তাও নয়।

৮। দেখুন, তবু এই মুহূর্তে কি মনে হচ্ছে না যে—আমাদের থিয়েটারে বিশেষ কাজ বেশি হচ্ছে না? টিঁকে আছে এই পর্যন্ত?

উঃ দেখো, এই ব্যাপারে আমার দুঃখ একটাই আমি তো সব নাটক দেখিনি—তাই আমার পক্ষে কিছু বলা খুব মুশকিল, তবে যেটুকু দেখেছি—তাতে করে বোঝা যায়—বাংলা থিয়েটারে অভিনয় নিয়ে যে গৌরবটা ছিল, সেই গৌরব করবার মত চর্চা অভিনয়ে এখন আর নেই, দেখে মনে হয় না যে একটা দারুণ কিছু হচ্ছে। নানা বিষয়ে চর্চা নিশ্চয়ই হচ্ছে কিন্তু আমাদের গৌরব করবার মত যে ব্যাপারটা

ছিল তা হলো বাংলা থিয়েটারে অভিনয়। আজকাল দেখে মনে হয় না যে কোনো একটা দারুণ কিছু ঘটছে। একটা লোক হয়ত একটা গ্রুপে পনের বছর ধরে অভিনয় করে যাচ্ছে—এই দীর্ঘ সময়ে ধাপে ধাপে তার যে অনেক উন্নতি হয়েছে, এটা বোঝা যায় না। পর পর সে করেই যাচ্ছে নানান চরিত্র।' কিন্তু কি জানো, এটা খুব ইয়ে করে বলছি না—আমাদের এখানে এক একজন যারা এসেছে দশ-পনের বছর আগে, যারা নিজের জায়গা থেকে বা শূন্য জায়গা থেকে আরম্ভ করেছিল কিন্তু আজকে এতদিন ধরে করতে তাদের মধ্যে এক ধরনের উত্তরণ দেখা যাচ্ছে। এটা কিন্তু আমি একেবারেই অভিনয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখছি। প্রযোজনার নানান দিকে নানান ভাবে বৈচিত্র আনার চেষ্টা হয়েছে, সেই সব কাজও হয়েছে আন্তরিকভাবে, সেসব দিকে আমার বলবার কিছু নেই; কিন্তু আমাদের গৌরব ছিল যে অভিনয় সেইটির বড়—অভাব।

৯। নতুন কোন নাটকের প্রযোজনার কথা আপনি এখন ভাবছেন কি?

উঃ এক্ষুনি ভাবছি না। ১ মে 'মালিনী' করেছি, সবে নাটক নাবিয়েছি আর দেখো আমরা তো তবু করে যাচ্ছি '৭৯ থেকে প্রায় প্রতি বছরই একটা করে নতুন নাটক নাবছে, ঘটনাচক্রে এটাকে সৌভাগ্যই বলতে হবে। আর সব নাটক-গুলিই দর্শকের ভাল লেগেছে। এটা 'বহুরূপী'র একটা সৌভাগ্য তো বটেই।

১০। 'বহুরূপী'র বারবার ভাঙনের মধ্য দিয়ে আপনাকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে, তবু, আপনি কিভাবে নাটক উপস্থাপনা ও পরিচালনার কাজ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন?

উঃ আমি কিছু করিনি. 'বহুরূপী' সংগঠনের ভিত্তি যেটা শম্ভুদা করে দিয়ে গেছেন সেটা এতই শক্ত এবং পোক্ত যার ফলে যে কোন ব্যক্তিরই কাজটার প্রতি যদি কিছুটা ভালবাসা থাকে তবে সে এটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত। এটা আমার ধারণা. কারণ এটা আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি, যে ভিত্তিটা শম্ভুদা তৈরি করে দিয়ে গেছেন সেটা খুবই জোরালো। সেই জন্যই বোধহয় এত বিপর্যয়ের মধ্যেও কাজটা করতে পারা যাচ্ছে।

প্রশ্নঃ গ্রুপ থিয়েটারের ভাঙন ও বিপর্যয় সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উঃ এর দুটো দিক আছে, আমি বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র থিয়েটারের ক্ষেত্রে বিচার করছি না। সারাদেশে চতুর্দিকে যে ভাঙন যে রাজনৈতিক দলেই হোক, এমন কি সমাজের ছোট যে অংশটা—যেটাকে আমরা ছোট সমাজ বলছি—সেটা আমাদের পরিবার, সেই পরিবারেও ভাঙন—বড় দল, রাজনৈতিক দল, সেখানেও

ঐ একই চেহারা। তাহলে আমি বিচ্ছিন্ন করে, আলাদা করে নাটকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিচার করব কেন? আমার তো মনে হচ্ছে এই সমস্ত যে চতুর্দিকে যে ভাঙন এখানেও তারই একটা প্রতিফলন ঘটছে। আর ঐ যে দুটো দিক আছে, দল থেকে বেরিয়ে নতুন দলে যাওয়াটাকে আমি ভাঙন মনে করি না। কিন্তু দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর একটা দল তৈরি করা—এটাকে আমি ভাঙন মনে করি। কিন্তু দল থেকে চলে গেল একেবারে, নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল—সেটাকে আমি ভাঙন বলি না। সবাই সব সময় নাটক করতে পারবে এমন কি কথা আছে। শরীরের ভাল-মন্দ আছে, অন্যান্য ব্যক্তিগত কিছু থাকতে পারে—সে ভাবতে পারে, আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব। থাকল, তাকে ভাঙন বলব কেন? ভাঙন বলব—ভেঙে দল করাকে। যেমন নানান জায়গায় হচ্ছে। এর মধ্যেও আবার দুটো দিক আছে—যদি দল ভেঙে শক্তি কমে যায়। ভাঙন মানেই শক্তি কমা, কিন্তু এমন দেখা যায়, ছোট ছোট অংশ হতে হতে কাজই করতে পারা যাচ্ছে না, ভালো কাজ তো দূরের কথা কাজই করতে পারা যাচ্ছে না—তাহলে সেটাতো ক্ষতিকর। কিন্তু এমনও আবার দেখা যায় যে একটা দল থেকে সে বিশেষ কাজ করতে পারছিল না বেরিয়ে গিয়ে আর একটা দল করে সে হয়ত ভাল কাজ করতে পারছে। এরকম হাজার কারণ থাকতে পারে। সে কারণ বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ গ্রুপ থিয়েটার নামকরণটা কোথা থেকে প্রথম এসেছে বলে আপনার ধারনা।

উঃ. এটা খুব গবেষণার ব্যাপার। এটা আমাদের কাজ নয়। জানি না কবে থেকে এটা চালু হয়ে গেছে। উৎপলবাবু একটা কথা বলেছেন সেটা আমি মানি, সেটা হলো—'গ্রুপ থিয়েটার আবার কি? সমস্ত থিয়েটারই তো এক-একটা গ্রুপ। গ্রুপ ছাড়া কি আবার থিয়েটার হয়?'—ঠিকই তো একদল লোক সংঘবদ্ধ হচ্ছে, একসঙ্গে মিলছে সেটাই তো গ্রুপ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন
সন্ধ্যা দে

চিত্তপ্রসাদের চিঠি

(দ্বিতীয় কিস্তি)

৩০ মার্চ '৫৩

আন্ধেরি

ভাই মুরারিদা,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে criminally দেরি করে ফেলেচি। আমায় কি ভাবচো জানি না।

তুমি আর বটুকদা মিলে কলকাতা থেকে যে চিঠি দিয়েছিলে তাতে লিখেছিলে যে কলকাতা ছাড়বার পূর্ব-মুহূর্তে প্রায় লিখেছিলে সে চিঠি। তাই তখন ইচ্ছে থাকলেও লিখতে পারি নি। যাই হোক। এ সব কৈফিয়ৎ-এর কিই বা মানে হয়।

এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ যা করেছি—মানে যা নিয়ে বেশ ক'দিন বেশ কিছু গতর খাটাতে হয়েছে—মায় রাত জেগে অবধি—তা হোলো খ্যাতনামা ফিল্ম ডাইরেক্টর বিমল রায়ের "দো-বিঘা জমিন"-এর পাবলিসিটির জন্যে ৮ খানা লিনোকাট্ আর একখানা পোস্টার। গল্পটা সলিল চৌধুরির লেখা, ভূমিকায় বলরাজ, নিরূপা রায় ইত্যাদি। এক বেহারি চাষীকে জমিদার উৎখাত করল। পরে চাষী কলকাতায় গিয়ে রিক্সাঅলা হ'ল-আরো পরে সর্বস্বান্ত হয়ে, বৌ-এর গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যুর পর ছেলের হাত ধরে নিরুদ্দেশের যাত্রায় বাধ্য হ'ল—এই হোলো দু কথায় গল্প। গল্পে দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য সবেতেই মোটা মোটা ত্রুটি আছে। আবার অসংখ্য সূক্ষ্ম, অপূর্ব, বাস্তব, জীবনের মণি-মুক্তোও আছে। বলরাজ আর নিরূপা, আর অনেক চরিত্রই চমকে দেওয়া রকমের ভালো অভিনয় করেছে। ছবিটি নানান দিক থেকেই নিখুঁৎ বলেই দৃষ্টিভঙ্গী আর লক্ষ্যের ত্রুটি বড়ো বেশি রকমে গায়ে বেঁধে। দৃষ্টিভঙ্গীতে colonial দেশে industralist-রা agriculture এর শত্রু বিশেষ—গ্রামের বিরুদ্ধে কলকারখানা দাঁড়িয়ে গেছে—অথচ গল্পের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। তারপর—গল্পটাতে শুধু দর্শককে কাঁদানোর চেষ্টা—কোথাও হাড় পিত্তি জ্বালা করে ওঠে না অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে। গল্প শেষ হয় বিরাট হতাশার

মধ্যে। চাষাকে কোথাও দেশের অন্নদাতা রূপে দেখছি না ছবিতে। কলকাতার বস্তিতেও মেরুদণ্ড অলা মানুষ নেই। আগাগোড়া beast of burden-এর নিতান্তই করুণাপ্রার্থী tragedy। মানে ছবি সম্বন্ধে ভাবতে বসলেই গল্প রচয়িতা cum director-এর ওপর রাগ ধরে। তবু—অত্যন্ত sincere কাজ বলে কাহিনী যে নির্জলা সত্য তা অনায়াসে convince করে। কোথাও অভিনয় বা মনগড়া কিছু মনে হয় না—দু-একটি দৃশ্যের কাঁচা পরিকল্পনা ছাড়া।—সন্দেহ নেই এদেশের উঁচু দরের ছবি বলে ছবিটি খ্যাতি লাভ করবে। আর এদেশী ছবির মধ্যে এই প্রথম আমি অনিচ্ছা নিয়ে গিয়েও ছবির ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিলাম।

বিমল রায় কোথায় আমার কোন লিনোকাট দেখে এসে হাজির এক সঙ্গে বেলা ছবির বিজ্ঞাপন করে দিতে হবে লিনোকাটে। আটখানা লিনোকাটে গল্পটা বলা। শেষ করেছি। সাপ্তাহিক Screen কাগজে বেরুচ্ছে গত তিন হপ্তা ধরে। যদি তোমার interest লাগে original prints পাঠাবো। টাকা—পোস্টার সমেত বারো শো চেয়েছি। কি দেবে আজো জানি না। এতো বেশি ভদ্র ব্যবহার আর সম্ভ্রম সম্মান দেখিয়ে চলেন ভদ্দর লোক—আমা হেন ঠোঁটকাটারও ঠোঁট কেঁপে মুখ বন্ধ হয়ে যায় "টাকাটা" বলতে। বোধ হচ্ছে একেবারে ফাঁকি না দিলেও যা দেবেন তাতে শুধু চিত্তবিক্ষোভই লাভাংশ হবে। যদি নামের কথা ধরা যায় হিসেবে তবে শুনেছি অত্যত film রাজ্যে linocut-এ কাহিনী বলা ব্যাপারটাতেই হৈ হৈ পড়ে গেছে।

ওদিকে, দো বিঘা জমিনের আগে—সেই Children series-টি PPH থেকে বার করা নিয়ে বহুৎ দৌড় ঝাঁপ করতে হোলো আমায় আর সমরদাকে। শেষ পর্যন্ত PPH-এর পরিচালকদের মধ্যে ৩টি ছাপার বিরুদ্ধে মত দেখা দিলো। গেলাম রমেশচন্দ্ররের কাছে যদি AIPC থেকে বার করেন ওঁরা। "বার করা একশো বার উচিত, দুশো বার দরকার"—রায় পেলাম—তারপর সব চুপচাপ! এদানিং সমরদা'র মারফতে খবর এসেছে PPH আবার নাকি মত বদলেছেন।—কি গোলোক ধাঁধায় আছি এ থেকেই বোঝো।

তারপর মহারাষ্ট্র দুর্ভিক্ষের sketch করতে যাবার ডাক এসেছে এখানের Party-র B. C. থেকে। Dr. অধিকারিকে দেখছি আমার sketch-এর Exhibition করবার ব্যাপারে উৎসাহিত। কিন্তু গ্যাডগিলের Relief Committee-র সঙ্গে কি সব প্যাঁচ চলেছে—আর তারি সঙ্গে আমার sketch পর্ব কি

ভাবে যেন জড়িত—শুধু খরচ ব্যাপারেই নয়—তাই নিয়ে আমার বেরিয়ে পড়ার দিন পেছোচ্ছে। এ মাসের প্রথম হপ্তাতেই বেরুবার কথা ছিল এখন দাঁড়িয়েছে এপ্রিলের ১৫ই মানে IPTA কনফারেন্স চুকলেই।

IPTA conference মন্দ হবে না মনে হচ্ছে।—যদিও সময়টা হপ্তাখানেকের জন্যে এসে পড়তে পারো—প্রচুর folk songs dances etc-র programme পাবে। নেমি, S. Co আসছে—আমার কাছে সেটাই Grand attraction Poster করে দিয়েছি, exhibition করতে কিছু ভারও আছে আমার আর সমরদার ওপর। "প্রগতিশীল" থেকে একটি pantomine "শান্তির" ওপর দেবার কথা হয়েছিল হপ্তাখানেক মগজ চেঁছে পুঁছে আমি তার script খাড়া করে দিয়েছিলাম—সীতাদি Co গলে জল script পেয়ে কিন্তু "প্রগতি-শীলের" দুর্গতি চলছে—দলাদলি। কাজেই pantomine গ্যাংটো-মাইম হয়ে গেছে। মাঝ থেকে আমার কিছুটা সময় আর মগজ ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে গেল।

ওপরের ফিরিস্তি থেকে এইটুকু সমঝো যে যে-কদিন তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি সে-কদিন কতো জল সাঁকোর নিচে দিয়ে বয়ে গেছে। মানে, আমার নাকানি-চোবানির অন্ত নেই।

ইতিমধ্যে দাদা ইয়োরোপ থেকে ফিরেছেন। বম্বেতে রুখতে পারিনি তাঁকে, সন্ধ্যেবেলা airport-এ নামতেই কাণ্টমস্ cum পুলিশ। বিশদ বিবরণের দরকার নেই।—যে plane-এ এলেন সেই plane-এই দিল্লী। অপরের হাত দিয়ে আমার আর সমরদার জন্যে দুটি soviet ক্যামেরা—Laica জাতীয় আরো খুচরো অনেক কিছু মস্কো থেকে উপহার এনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওগোনিও-কে আমাদের যে ছবি বেরিয়েছিল তার বাবদে যে ২২০০্+৮০০্ টাকা আমাদের নামে ওখানে জমা ছিলো তাই দিয়ে কেনা ওসব। একটি প্রকাণ্ড print box ও আসছে আমার জন্যে—দেবীর হাত দিয়ে। দাদা মস্কো থেকে ওটি কিনে লণ্ডন গেছিলেন। (দেবীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!) দেবী ফিরে আসছে • এপ্রিলের প্রথম হপ্তায়। —Vienna-র যে সব ছবি পাঠিয়েছিলাম—তা সবই না কি খুব সুনাম পেয়েছে সব দেশের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। ওগুলিই একমাত্র উপহার হিসেবে ভারতবর্ষের তরফ থেকে সব দেশের প্রতিনিধিদের বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেরিন আর রমেশচন্দর বার বার বলছিল "your gifs saved our face!" তবু যদি সময় নিয়ে কিছু করে পাঠাতে পারতাম আমরা।

দাদার সঙ্গে klimashin-এর তবু দোস্তি হয়েছে—দাদকে ogoneok-এর staff থেকে কজনে গিয়ে জর্জিয়া বেড়িয়ে এসেছিল ও সময়টাতে ঐ অঞ্চলেই শুধু বরফ-ঢাকা ছিলো না। kimashin আমাদের জন্যে এখানে তোলা কিছু ফটো উপহার পাঠিয়েছেন আমি এখন ক্যামেরা (নাম : ZORKI) রপ্ত করতে মেতেছি—মুক্ত "ফিলিং"-এর ব্যবস্থা করতে পেরেছি—বাকি খরচ হাতির খোরাক। ভালো ছবি তুলতে পারলেই নমুনা পাঠাব। মারাত্মক রকমের চমৎকার ক্যামেরা। তুমি এবার এলে Bombay in pics. করে বেড়াবো। পরে খাজুরাহো অজন্তা ইলোরা and so on.

C. R. আরেক গোলোক ধাঁধা। তোমায় লিখেছিলাম কিনা মনে পড়ছে না—গত Xmas-এর gif হিসেবে মহাত্মা ডাঙ্গের লেখা এক মাসের Notice (Literally) পেয়েছিলাম, তিনি তখন C. R.-এর রাজা হয়েছিলেন। আমি আজো কাজ পাঠানো বন্ধ করিনি। অন্যান্যদের পত্র পাই—তাঁরা লেখেন—"ছবি পেয়েছি, ব্যবহার করবো, সবাই মুগ্ধ"—ইত্যাদি, ওদিকে দেখি ছবি ছেপে বেরোয় না। Notice সত্ত্বেও Februaryতেও পগার এসেছিলো—কাগজ না বেরোনো সত্ত্বেও। মার্চে চুপচাপ। গোবিন্দকে খেদিয়েছে C. R. থেকে—P. থেকেও খেদাবার চেষ্টা করছে। এর বেশি কোনো খবরই পাই না।

স্তালিনের কথা মনে পড়লেই এখনো বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কটা দিন বজ্রাঘাতের মতোই কেটেছে। অমন অসুখের খবর পেয়েও বিশ্বাস করতে পারিনি অতো বড়ো আলো কখনো নিভতে পারে। দস্তুর মতো ঝগড়া করেছি যারা উতলা হয়েছিল তাদের সঙ্গে। এখন স্তালিন-শূন্য পৃথিবীর কথা ভাবলে গা কেমন ছম ছম করে। সোভিয়েটের নর নারীর শোক শুধু কল্পনাই করতে পারি। ছেলে মানুষের মতোই স্বপ্ন দেখেছি লুকিয়ে মনে মনে একদিন জীবনের পরম পুরস্কারের মতো স্তালিনের সামনে দাঁড়াতে পারবো হয়তো। আজ যদি ছেলে মানুষের মতোই সরলতা নিয়ে কাঁদতে পারতাম বুকের ব্যথা কমতো। স্তালিনের অসীম দানের হিসেব বিচার করবার ক্ষমতা যোগ্যতা আমার নেই, শুধু এই টুকুই আমার জীবনকে ধন্য করেছে ঐ একটি মানুষের নাম যে-পৃথিবীতে স্বর্গে বিশ্বাস, স্বাধীনতার মধ্যে মানুষের পরিপূর্ণতার প্রতিজ্ঞা,—এক কথায় আমার এই ছোটো জীবনটির আর যাদের আমি ভালোবাসি তাদের জীবনের সার্থকতার প্রতিশ্রুতিকে আমি বহুবার বহুরকমে অনুভব করতে পেরেছি এই মানুষটির নামের সঙ্গে—জাগ্রত দেবতার নামের মতো। সে নাম চিরদিন বেঁচে থাকবে তা

সত্যি। কিন্তু সে দেবতা মাথার ওপর থেকে চিরদিনের জন্যে অস্ত গেছেন।—বড়ো বেশি অন্ধকার লাগে তাই যখনই নিজের ক্ষুদ্র জগতের থেকে চোখ তুলে দেখি চার পাশে। এ যুগের পৃথিবীতে সব কিছু ভালো সব কিছু মহৎ সব কিছু সুন্দর সব কিছু সত্যের এতো বড়ো নির্ভর এতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কে ছিলেন বলো। শুনলে হাসবে কিনা জানি না—স্তালিন নেই শুনেছি যখন তখন থেকেই আমার মনে একই সঙ্গে শোকের আঘাত যেমন লেগেছে তেমনি কেমন এক দারুণ ভয় এসে ঢুকেছে—কোনটা বেশি তা বলা শক্ত। একেক সময় মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী জুড়ে গোপনে যেন এক ভয়ানক প্রলয়ের ষড়যন্ত্র চলছে—হঠাৎ কখন এবার ফেটে পড়বে। আর এই যে আমরা সব বেশ আছি এখন-এ সবই গল্পকে মিথ্যে হয়ে যাবে—মুছে যাবে নয় তো বিকৃত হয়ে যাবে। বলে বোঝাতে পারবো না এ দম-আটকানো অনুভূতি। আর সেই সঙ্গে অপরিসীম অসহায় ভাব এসে বুক চেপে বসে যেন।—যাক গে এসব অনেক পরিমাণে Subjeetive ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। স্তালিনের মহাপ্রস্থানের খবরে সব রকমের মানুষকেই বিচলিত হতে দেখেছি। কিন্তু তারার মায়ের একটি ছোট্টো উক্তি চিরদিন মনে থাকবে আমার। তারার মায়ের বয়েস হয়েছে, তার ওপর আজ বছর খানেক অবধি paralysis-এ শয্যাশায়ী। তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর স্তালিনের কথা মেয়ের মুখেই যা শুনেছেন। তিনি খবর শুনে বলছিলেন—"সারা দুনিয়ার সবার এতো প্রিয় এতো বড়ো বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে মরণ আমার মতো অকর্মণ্যকে কেন নিয়ে গেল না।" এ কথাটি আমি ভুলবো না এই জন্যে যে এথেকে দেখতে পেয়েছি, যে-জীবনে সত্যিই বিপ্লবের একান্ত দরকার আর পরম মূল্য তাতেই বুকের মাঝখানে স্তালিনের আসন আপনিই পাতা ছিল—স্তালিন সত্যিকারের গরীব দুঃখীর আত্মীয় স্বজন ছিলেন।

এবারের মতো চিঠি এখানেই শেষ করি মুরারিদা, এতোদিন পরে কিছুই গুছিয়ে যত্ন করে লিখতে পারলাম না, অনেক ছিলো লেখার।

সমরদা প্রায়ই তোমার কথা বলেন। বৌদি চড়চ্চড়ি রাঁধলেই মুরারিদা'র নাম করেন। চিঠি লিখতে দেরি করি বলে গাল খাই ওদের কাছে।

তুমি আগের চিঠিতে লিখেছিলে ছুটিতে কলকাতা যাবে। সমরদা বৌদির আর আমারো প্রশ্ন "কেন বাপু কোলকাতায় এমন কি মধু পেয়েছ যে ঘন ঘন ছুটিতে চাও।" আর, আমাদের সবারই দাবি হচ্ছে ছুটি নাও তো এখানে এসে কাটিয়ে যাও। কিরকিতে কবে আসবে না আসবে তার ঠিক কি?

আশা করি ভালো আছো। বাবাকে আমার প্রণাম দিও। তুমি আমার বুক ভরা ভালোবাসা আর আলিঙ্গন নিয়ো। ইতি

তোমাদের স্নেহের
চিত্ত

প্রীতিভাজনেষু

৭ সেপ্টেম্বর '৫৩
মেদিনীপুর

ভাই মুরারিদা, তোমায় চিঠি লিখি লিখি করছি এমন সময় তোমার চিঠি পেলাম। আমার ধারণা ছিলো তোমায় আমার মেদিনীপুরের ঠিকানা দিতে ভুলে গেছিলাম।

এখানে এসে অবধি আমার অবস্থাও তোমার মতো নির্জন নিঃসঙ্গ। অবশ্যি এখানেও সবুজের উৎসব, আকাশে মেঘের মেলা,—যদিও দু চার দিন খুব গুমোট রেখে মাঝে মাঝে এখনো খুব ঢালছে, ঝোড়ো হাওয়াও দাপাদাপি করে যাচ্ছে। তবু শরৎ এসে পড়েছে। কিন্তু বাইরের প্রকৃতি মন টানছে না আদৌ। একদিন শুধু landscape আঁকতে বেরিয়েছিলাম নদীর ধারে, এ'কে এসেছিও। তবু বাইরের রং মনে ধরছে না। এবারে বাংলাদেশে এসে অবধি এ দেশের দারিদ্র্য এতো পীড়িত করেছে আমায় যে, প্রকৃতির এ সময়কার এই উল্লাস যেন কেমন আমার দম বন্ধ করে আনছে।

চারদিকে মানুষগুলো দেখছি কেমন যেন বে'টে হয়ে গেছে। গোরুগুলো প্রায় আমার হাঁটুর কাছাকাছি। মেয়েরা ভয়াবহ রকমের হতশ্রী অর্ধনগ্ন। ঘর বাড়িগুলো সারা সহরেই এতো পুরোনো আর কদাকার যে সাপ আর ই'দুরের বাস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথঘাট এতো ভাঙা যে দিন দুপুরে অন্যমনস্ক হ'লেই পা মচ্‌কাবে। পাল্কি গাড়ির আর্তনাদ আর বে'টে হাড়-সার ঘোড়ার করুণ দৃশ্য। ঘন ঘন বন্যার খবর তো আছেই। তার সঙ্গে মফঃস্বলের পলিটিক্স—সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ইস্ট-বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল খেয়োখেয়ি। আর সব ছাপিয়ে ফিল্মী গানা, রেডিয়ো, লাউড স্পীকার আর আবাল-বৃদ্ধ পথিক কণ্ঠে। গরীব পাড়ায় সন্ধ্যে হ'লেই অন্ধকার, হারিকেন অবধি চোখে পড়ে না, আর যে পাড়ায় আছি তাকে ঘিরে গরীব পাড়া। সকাল হ'লেই যুগযুগান্তের ভুখা চোয়াড়ে আধা-ভয়ার্ত আধা-কুটিল মুখের ভিড় যেদিকে যাও সেদিকে, আর খোলা বিবর্ণ এক বস্ত্রে কুশ্রী কালো কালো কঙ্কালের মিছিল কাঁকুরে পথে। শরৎকাল এলো এলো করছে যতোই ততোই মনটা আনন্দবাজার যুগান্তর পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার সম্পাদকীয়ের মতো সস্তা emotion এ গে'জিয়ে উঠছে। বুঝতে পারি সস্তা emotion তবু অন্যদিকে মন দিতে পারি না কেন জানি না। বোধহয় নেহাৎ নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়েছি তাই।

কাজ এগোচ্ছে যথাসম্ভব ধীরে ধীরে। আইডিয়াগুলো পেন্সিলে কষতে শুরু করেছি, খানিকটে এগিয়েছি মানে তাড়াতাড়ি এগোবার সূত্র প্রায় ধরে ফেলেছি, এখন একটানা খেটে যাওয়া। আশা তো করছি এ মাস খতম হবার আগেই sketches সব খাড়া হ'য়ে যাবে। তারপর আরো এক মাস ধরো finishing-এ।

শরীর আমার মোটামুটি ভালো আছে। টনিকটা তিন বোতোল ইতিমধ্যে সাবড়েছি। মজা শোনো, কলকাতায় প্রথম যখন করিয়ে আনলাম টনিকটির রং ছিলো স্বচ্ছ হলদে; এখানে আসবার আগেই ফুরোলো, আবার করালাম সেই একই ডিসপেন্সারি থেকে,—রং হোলো স্বচ্ছ লাল! কেমিস্ট মাথা চুলকে বললে অনেক কিছুই, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কি বলছে। এখানে এসে আবার ফুরোতে আবার করিয়ে আনলাম এখানকার এক ভালো ডিসপেন্সারি থেকে—রং হোলো এবার ঠিক গোবোর গোলা জলের মতো আর ঘন থকথকে প্রায়! স্বাদও তিনবার তিন রকমের, গন্ধ ও। শুধু দামটি ঠিক একই সর্বত্র—যে ২। সেই দু টাকা ছ' আনা।—এবার ঠিক করেছি কলকাতায় গিয়ে সবচেয়ে বড়ো ডিসপেন্সারি থেকে করিয়ে আনবো। কিন্তু রং যাই হোক ওটি খেয়ে হজম ভালো হচ্ছে, সকালের দিকে "আনন্দটা" বহুদিন পরে লোক ডেকে বলার মতো হচ্ছে। সেই অনুপাতে খিদেও বেড়েছে। শরীরে শক্তি এসেছে। তারপর, ক্যালশিয়ামের সঙ্গে অটোভ্যাকসিন সবগুলোই। মানে আট-টাই নিয়ে ফেলেছি, আপাতত ডাঃ রঞ্জত সেনের কাছ থেকে অন্য কিছু আনতে যেতে পারছি না তাই। গলাটা আগের চেয়ে ঢের পরিষ্কার আছে। পেটটাও দুবেলা লাগিয়ে যাচ্ছি।

আমার এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছো বলে মা যে তোমার ওপর কী অসীম খুশি কি বলবো, মুরারিদা, দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন তোমায় এসেছি অবধি। রোজই একবার মনে করিয়ে দেন, "মুরারিকে চিঠি দিয়েছ? দেরি কোরো না, ভাববে। কেমন আছে সে-ছেলে খবর নাও তাড়াতাড়ি"—ইত্যাদি দু'বেলা। তোমার কানের জন্যে আরেকটি ওষুধ খুঁজে বার করেছেন। "Viola Odorata"—Q (মানে, মাদার টিনচার) কিম্বা 6-শক্তি, দিনে একবার। খেয়ে দেখো। যদি ফল হয় খাওয়া বন্ধ কোরো। না হ'লে লিখো, অন্য কিছু দেবেন। হপ্তাখানেক খেয়ে দেখো। ও সহরে যদি না পাও কলকাতা থেকে আনিয়ে নিয়ো।

তোমার বাবা মা'র জন্যে কানের যে ওষুধ দিয়েছিলেন তাতে মা খুব উপকার

পেয়েছেন। দিন পনর ব্যবহার করার পরই শিশি ফুরিয়ে গেল, আবার আনবো টাকা হাতে এলেই। কানের চুলকানি একেবারে চলে গেছিল ক'দিন, সেই সঙ্গে মাথার চোখের গলার নানা উপসর্গও কেটে গেছিল। আর B.G. Phos-টিতেও খুব উপকার পাচ্ছেন, পেটের যতো উপসর্গ সব কমে গেছে, খিদে হয়, ঘুম হয়। জ্বর-জ্বর ভাবটাও কম আছে। পায়ের ফোলাটা এখনো বেশ আছে, শিগগীরই রক্ত পরীক্ষা করিয়ে তোমায় পাঠাবো।

সমরদার চিঠি পেয়েছি পরশু। "প্রগতিশীল বাঙালী সমিতি" রবিবাবুর "শেষ-রক্ষা" তাক লাগানো ভালো করেছে লিখেছেন। চিঠির সঙ্গেই এক বিরাট প্যাকেটে ফটো পাঠিয়েছেন আমার কিছু ছবির। চীনে পাঠানো হয়েছিল যে দুখানা, আর রামলীলা নাচের ছবির ফটো নিয়েছিলেন নিজেই। তারই enlargements, মা'কে দেবার উদ্দেশ্যে। মুরারিদা ভাই মাঝে মাঝে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে সুখে, তোমাদের কাছে যে অপরিসীম স্নেহ ভালোবাসা আর আমার কাজের প্রতি তোমাদের যে উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা পেয়েছি তাই নিয়ে। অথচ আমি তো জানি আমি কতো সামান্য। তোমাদের অসীম স্নেহ দিয়েই তোমরা আমার কাজের মূল্য বাড়িয়েছো ভাই মুরারিদা, এ ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করবো কে বলবে আমায় ?

কলকাতায় গেলে তোমাদের বাড়ি নিশ্চয় যাবো। কিন্তু তোমায় না পেলে জমবে কেন ? কাকে ডেকে ঢুকবো বাড়িতে মুরারিদা ? গৌরীকে নিয়ে যাবো এক রবিবার।

ফটো সম্বন্ধে যা লিখেছো, মানে negative-এ spots, develop-এর দোষেই হওয়া সম্ভব। কারণ জল পরিস্কার পাইনি একটু impure থাকলেই গেল, filter করে নেয়ার নিয়ম কিন্তু সরঞ্জামও ছিলোনা, যাই হোক কাজ চলনসই prints হয়েছে, মন্দের ভালো।

সেনমশায়ের টাকা পাইনি আজো। সুনীলকে চিনি, ভুলে বসে আছে কিম্বা সময়াভাবে ওগুলো আজো mount করে পৌঁছেই দেয়নি। সময়জ্ঞান ওর কোনো দিন ছিলো না, হবেও না। কলকাতায় গিয়ে নিজে করে নিতে হবে সব সেই অপেক্ষায় আছি।

ওদিকে সমরদা লিখছেন, সর্দ্দার-গিন্নি আমার আধেরির বাস ঘোচাবার জন্যে notice নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছেন। ঘরটি নাকি ও'দের নিজেদের দরকার। কিন্তু আমি জানি ও'দের পেয়ারের এক পরিবারকে ঢোকাতে চান। যাই হোক,

CENTRAL LIBRARY
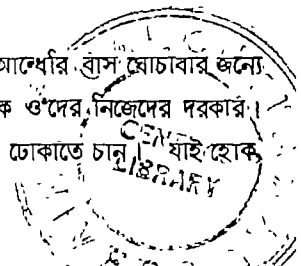
আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছি। খবরটা প্রশান্ত সান্যালকে লিখেছি, কিন্তু সর্দারের ওপর সর্দারি ওরা কেউ করবে না তা জানি। আমাদের রাজ্যে আমার অনাথ অবস্থাটা জানে বলেই সর্দারের এই দৌরাত্ম বরাবর চলে আসছে। টাকার জোর থাকলে নিজেই চলে যেতাম কবে। নেই সে জোর তাই বিপদ গুণছি। দেখা যাক, সব বিপদেরই তো পার আছে। এই হোলো মোটামুটি সব খবর আমার।

ফেরবার পথে তোমার কাছে হয়ে যাবো নিশ্চয়। ঠিক জানি না এখনো, তবে বোধহয় যদ্দুর, অক্টোবরের প্রথমে বা মাঝামাঝি রওনা দেবো। ছবির finishing এর কাজ বিশেষ করে page-lay-out সমরদার সঙ্গে আলোচনা করে করলে ভালো হবে নিশ্চয়। সেই করবো ভাবছি।

ফেরার পথে তোমার কাছে হয়ে যদি না যাই তবে তুমি যে আমায় "খুন করে" ফেলবে ভয় দেখিয়েছো তা শুনে মা তো হেসেই খুন—কাছে না পেলে খুন করবে কি করে? মা খুবই মুরারি-মুরারি করেন। তোমার পাকপ্রণালী কেনা খবরটি দিয়েছি অবধি তোমায় এখানে এনে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ানোর কথা কতোবার যে বলেছেন এরি মধ্যে তার ঠিক নেই। আমি বোকামি করেছি, দু-এক বেলার জন্যেও তোমায় একবার এখানে নিয়ে আসতাম যদি, খুব মজা হোতো।

আজ এই অবধি থামি। চিঠি দিয়ো তাড়াতাড়ি। বাবাকে আমার প্রণাম দিয়ো। তুমি আমার বুকভরা ভালোবাসা আর অশেষ শুভেচ্ছা নিয়ো। ইতি

চিত্ত

---

* চিত্তপ্রসাদের চিঠি দু'কিস্তি কোন টীকা ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কিস্তি প্রকাশের সময় টীকা সহ প্রকাশের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলেছে। তখন আগের দুই কিস্তির উপরেও টীকা থাকবে।

চিত্তপ্রসাদ আজও একান্ত প্রাসঙ্গিক

বিজন চৌধুরী

কলকাতার ললিতকলা কেন্দ্র এবং শান্তিনিকেতনের কলাভাবনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় কলাভবনে চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বিভিন্ন পর্বের চিত্রের এক প্রদর্শনী চলাকালীন একটি আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল। ১১ নভেম্বর ১৯৯৪ তারিখের এই সভায় কয়েকজন প্রখ্যাত কলা সমালোচক, শিল্পকলাবিশারদ ও নির্বাচিত শিল্পী আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। আমিও একজন আমন্ত্রিত শিল্পী হিসাবে চিত্তপ্রসাদের সৃষ্টিসমূহের উপর নিজের বক্তব্য রেখেছিলাম।

অনেকের আলোচনায় চিত্তপ্রসাদের ব্যক্তিজীবন, তাঁর সমাজ সচেতনতা ও রাজনৈতিক দিকটির সাথে সৃষ্টির প্রয়াস-কে যুক্ত করে দেখার চেষ্টার প্রাধান্য ছিল। তাঁর ব্যক্তিজীবনের অনেক অজানা দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আমি চিত্তপ্রসাদকে ও তাঁর সৃষ্টিসমূহকে মূল্যায়ন করতে চেয়েছি একজন কর্মরত শিল্পী হিসাবে নিজের জিজ্ঞাসা ও সমস্যার সাথে যুক্ত করে। কারণ আমার কাছে তাঁর সৃষ্টির তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা খুবই জীবন্ত।

আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে ছবি আঁকছি এবং চিত্রকলা জগতের ও শিল্প-কলা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। আমার কাছে এ যুগের পরিবর্তনশীল শিল্প রীতিনীতিগুলো যেমন অভিঘাত সৃষ্টি করে, তেমনি আবার দেশ, সমাজ, রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিবর্তনগুলোর আকর্ষণও উপেক্ষায় থাকে না। শিল্পকলায় বাস্তবতা এবং শিল্পীর সমাজ-সম্বন্ধ ও দায়বদ্ধতার প্রশ্নের পাশাপাশি শিল্পগুণে সমৃদ্ধ শিল্পসৃষ্টির বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়। আর এ সব কারণে চিত্তপ্রসাদের চিত্রসমূহ, তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতা আমাদের কাছে এক বিশেষ ভূমিকায় আজ উপস্থিত হয়।

আমরা চিত্তপ্রসাদের চিত্রসমূহকে চারটি পর্বে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথমত পত্রপত্রিকায় প্রকাশের জন্য সাদা কালোয় অংকিত স্কেচ, গ্রাফিক শিল্প। দ্বিতীয়ত প্রচারমূলক পোস্টার, কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র। তৃতীয়ত সামাজিক ও মানবিক বিষয়বস্তু নিয়ে স্কেচ, ছাপাই লিনোকাট ছবি, এগুলোও গ্রাফিক শিল্প। চতুর্থত বহুবর্ণে অংকিত চিত্রসম্ভার।

চিত্তপ্রসাদকে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী হিসাবে অনেক ছবি আঁকতে হয়েছে, যেগুলো পার্টির বিভিন্ন মুখপত্রে নিয়মিত ছাপা হয়েছে। এসব ছবিগুলি অবশ্যই প্রচারধর্মী ও রাজনৈতিক বক্তব্য-অনুযায়ী। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, প্রকাশ-ভঙ্গিতে চিত্তপ্রসাদ এক্ষেত্রেও বাঁধাধরা রীতিকে মেনে চিত্র করেন নি।

চিত্তপ্রসাদের চিত্রে ঐ সময়কালের রাজনৈতিক, বাস্তব ও বস্তু-নির্দিষ্ট বিষয়ের সমাবেশ থাকলেও প্রতিফলনের রূপটি শিল্পোত্তীর্ণ থাকতে চেয়েছে। মানুষের কাছে পৌঁছতে সক্ষম, তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে, চিন্তা ও আবেগ অনুভূতি সঞ্চার করতে পারে এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে থেকেও চিত্রের শৈলী, প্রকাশভঙ্গীকে তিনি বিশিষ্টতা দিতে চেয়েছিলেন এটা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। বাস্তবতা তাঁর চিত্রে অন্যভাবে উপস্থিত হয়েছে বারবার। বিষয় ও মানুষের আয়তন বাড়িয়ে, বলিষ্ঠ গতিবেগ সঞ্চারিত করে, প্রচলিত চিত্র-প্রকাশভঙ্গীর যে গণ্ডী তার বাইরেই থেকেছেন চিত্তপ্রসাদ। কোন সনাতনী ও নিশ্চল শিল্পকলা-শৈলী বন্ধন তাঁর ছিল না। এসব কারণে শিল্পী হিসাবে চিত্তপ্রসাদ আধুনিক ছিলেন বলা অসঙ্গত হয় না। ৩০ দশকের সূচনায় বাংলাদেশে যে নব্যপন্থী শিল্প আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যে সব তরুণ শিল্পীরা 'ইয়ং বেঙ্গল আর্টিষ্ট ইউনিয়ন' ও তারপর আর্ট রিবেল গ্রুপ নাম দিয়ে জীবনধর্মী ও বাস্তবপন্থী এক নতুন ধারা প্রবর্তনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। ঐ শিল্প আন্দোলনের প্রভাবও তিনি পরোক্ষ ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই তরুণ বিদ্রোহী শিল্পীদের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় চিত্রকলার একাডেমিক রীতিতে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে ইউরোপীয় বিভিন্ন প্রতিবাদী চিন্তাধারা, অনুরূপ আদর্শে জীবনমুখী একটি ধারার এদেশে প্রচলন করা। এঁরা পোষ্ট ইম্প্রেসনিষ্ট, এক্সপ্রেসনিষ্ট এবং কিউবিষ্টদের ছবির অনুপ্রেরণায়ও বেশ কিছু চিত্র রচনা করেছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল সব সময়ই সামাজিক।

চিত্তপ্রসাদ আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন চিন্তার এবং পরিবর্তনকামী যে সব শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস চলছিল সে সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক ও বিপ্লবোত্তর রুশদেশে শিল্পরাজ্যে এক বিপ্লবী পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে গ্রাফিক ও ছাপাই ছবিতে এই আন্দোলন এক উচ্চমাত্রায় পৌঁছয়। এল-লিসিত্স্কি, রোডচেংকো, এল পাপোভা, তার্ভলিন, স্টেনবার্গ ব্রাদার্স, মায়াকভোস্কি, মেলভিচ্ প্রভৃতির শিল্পীদের গ্রাফিক শিল্প শুধু রুশ দেশেই নয় অন্যদেশেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যদিও ফিউচারিস্ট ও

কনস্ট্রাকটিভিজম আদর্শের অনুসারী হিসাবে ঐ আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সচেতন ভাবে এ শিল্প আন্দোলন জড়িয়ে পড়ে। এ'রা ঘোষণা করেন, আমরা পরিবর্তনকামী ও বিপ্লবের সপক্ষে। সমাজ ও মানুষের জন্য আমাদের শিল্পসৃষ্টি নিয়োজিত। এ'রা প্রদর্শনী করে, পত্র-পত্রিকায় তাঁদের নিয়মিত চিত্রসমূহ প্রকাশ করে, প্রচারে অংশ নিয়ে সামাজিক অবস্থানে তাঁদের সৃষ্টিসমূহকে ব্যবহার্যে নিয়ে আসেন। এ'রা দাবী করেন এ'রা বাস্তববাদী, কিন্তু বাস্তবের হুবহু অনুকরণে বিশ্বাসী নয়। মানস সচেতনতায় প্রতিরূপের প্রকাশেই এ'রা আস্থাবান। রুশদেশের ঐ শিল্প আন্দোলন সম্পর্কে চিত্তপ্রসাদ অভিজ্ঞ ছিলেন। এছাড়া লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে বিশেষ করে মেকসিকোর প্রগতিশীল গ্রাফিক শিল্পের যে এক আন্দোলন বিশাল বৈভবে শুরু হয়েছিল তার প্রভাব চিত্তপ্রসাদের শিল্পে বেশ কিছু ছায়াপাত ঘটায়। আগ্রাসী জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদে উত্তর চিনে রাজনৈতিক ও সমাজ বাস্তবতার পক্ষে থেকে সে দেশের শিল্পীরা গ্রাফিক শিল্পের, কাঠখোদাই শিল্পের যে বলিষ্ঠ প্রগতিশীল শৈলী তৈরি করেন, চিত্তপ্রসাদের সৃষ্টিতে আমরা এইসব প্রগতিশীল শিল্প আন্দোলনের অনুকরণ লক্ষ করি।

আমরা জানি যে তিরিশ দশকের শেষে পৃথিবীজোড়া সংকট ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমাদের দেশে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। চল্লিশ দশকের শুরু থেকেই ফ্যাসীবাদ আগ্রাসনের মুখে বিভিন্ন জাতি প্রতিরোধে সামিল হয়ে যায়। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও সংকট ও অনিশ্চয়তা আমাদেরও গ্রাস করে। আসে দুর্ভিক্ষ ও ১৩৫০ এর মহা মন্বন্তর। দেশের এই দুর্দিনে এদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা দেশ ও সমাজের বিপর্যয় রুখতে মানবতার স্বপক্ষে নিজেদের সামর্থ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চিত্তপ্রসাদ এই সময়ে একজন রাজনৈতিক সচেতন শিল্পী হিসাবেই তাঁর দায় পালন করেছিলেন এই আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অসংখ্য সাদা-কালো রংয়ের চিত্র এ'কে। এই সময় অনেক চিত্রেই তাঁর পূর্বের উল্লেখিত অংকন-শৈলীর কিছু পরিবর্তনও ঘটে। কার্টুন ও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিমায় একজন সমালোচকের ভূমিকায় শিল্পীকে আমরা দেখতে পাই। প্রকাশ রূপেতে আসে কল্পিত প্রতীকের ব্যবহার ও আকৃতি বিকৃতকরণ। এই সময়কার চিত্রে চিত্তপ্রসাদের ওপর ইংরাজ কার্টুন শিল্পী ডেভিড্ লো'র প্রভাবের কথা অনেকে উল্লেখ করেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ডেভিড লো'র প্রভাবের কথা বলাটা সঠিক নয়। বরং

লাতিন আমেরিকার গ্রাফিক শিল্পীদের আঙ্গিকগত সৃষ্টির পরীক্ষাগুলি প্রভাবই হয়ত লক্ষণীয়। চিত্তপ্রসাদ বাংলার পঞ্চাশের অনেক চিত্র এঁকেছিলেন। শিল্পী অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, গোবর্ধন আঁশ, জয়নুল আবেদিন প্রমুখ অনেক শিল্পীরাই ৫০-এর বাংলার মন্বন্তরের ভিভিড চিত্র এঁকেছেন। এদের সবারেই মানুষগুলো অবশ্যই বিপর্যস্ত, কংকালসার, দুর্ভিক্ষ কবলিত। কিন্তু চিত্রের মানুষগুলো ছিল দুর্ভিক্ষ-কবলিত মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়া কলকাতায় অন্ন খোঁজে মানুষেরা। কিন্তু চিত্তপ্রসাদ বোধহয় একমাত্র শিল্পী যাঁর চিত্রে কলকাতা শহর ছাড়াও গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষের চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রামে ঘুরে ঘুরে তিনি অজস্র স্কেচ করেছিলেন এইসময়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্রাম্য মানুষগুলোর হা অন্ন করে বাঁচতে চাওয়ার সাক্ষী হয়ে আছে এই চিত্রগুলি।

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে চিত্তপ্রসাদ অনেক গ্রাফিক ছাপাই শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। এগুলি সবই লিনো-কাট। এগুলির বিষয়বস্তুতে পূর্বের সমালোচনার ও রাজনৈতিক বক্তব্যের আঁচ প্রায় অনুপস্থিত। সাধারণ মানবিক ও পরিবেশগত অবস্থানের বিষয়বস্তু চিত্রের জন্য নির্বাচিত। এখানে স্থান পেয়েছে গ্রামবাংলার নানান পেশার মানুষ, যেমন—লাঙল দেওয়া কৃষক, কৃষকের ধান বোনা, জেলের মাছ ধরা, কামার-কুমোরের কর্মরত ভঙ্গিমা, আকাশের নীচে ছুটন্ত বালক-বালিকার উদ্যাম ভঙ্গি, হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়ে পাটিতে শুয়ে গালে হাত রেখে যুবতীর বই পড়া, এই সব বিষয়কেই অত্যন্ত দরদী মন নিয়ে চিত্তপ্রসাদ তাঁর চিত্রসমূহে স্থান করে দিয়েছেন। এইসব ছাপাই ছবিতে প্রকাশভঙ্গীর সারল্য আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। চিত্রে সাদা কালোর সমতাপূর্ণ ব্যবহার, আকৃতিতে মোটা বন্ধনী রেখায় সামঞ্জস্য রক্ষায় চিত্তপ্রসাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরই পরিচয় বহন করে। চিত্তপ্রসাদের রঙীন ছবি সংখ্যায় অনেক কম। কিছু প্যাস্টেল রংয়ের আঁকা। টেম্পরা ও জলরংয়ের তিনি কিছু ছবি এঁকেছেন। তেল রং বা অয়েলপেইনটিং প্রায় করেননি বলেই অনুমান। এ সবের মধ্যে যা আমাদের দেখা আছে সেগুলি খুবই পরীক্ষামূলক।

এখানে পূর্বের আলোচনায় চিত্তপ্রসাদের প্রকাশভঙ্গী নিয়ে সাধারণভাবে কিছু বলেছি। কিন্তু সমসাময়িক কালে সৃষ্টির প্রশ্নে যে সমস্ত সমস্যার আমরা সম্মুখীন তার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্তপ্রসাদের মূল্যায়ন সর্বাধিক। সমাজ সম্বন্ধ অস্বীকার করা, বিষয়হীনতা, আত্মসর্বস্ব বিমূর্ততাকে সর্বগ্রাহ্য ও গ্রহনীয় করার প্রচেষ্টা, আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত। এ সবের বিপরীতে চিত্তপ্রসাদ হয়ত দৃষ্টান্ত ও প্রেরণাস্থল।

পরিশেষে বলতে চাই যে চিত্তপ্রসাদকে অনেকে মতাদর্শ প্রচারের সাথে বড় বেশি যুক্ত করে দেখেন। কিন্তু তাঁর কাছে মতাদর্শের প্রচারই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। বরং বলা যায় তিনি সার্থক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন আদর্শকে অবলম্বন করেই। এবং তা তিনি মাথা উঁচু করে করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে চিত্তপ্রসাদ সমাজ, মানুষ ও প্রতিবেশ-সচেতন ছিলেন। বোধ ও মনের বিকাশ সামাজিক মানুষকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়ে ওঠে। আর এর গভীরতর মানসিক অনুসন্ধানই তাঁর সৃষ্টিতে প্রতিফলিত। একারণেই চিত্তপ্রসাদ একজন বিশিষ্ট শিল্পী।

তরাস শেভচেংকো জীবনকথা

আলোচ্য গ্রন্থখানি নানাদিক থেকে বাঙ্গলা সাহিত্যে একটি নূতন সংযোজন বলা চলে। ইতোপূর্ব্বে সোভিয়েৎ ভারত সম্পর্ক নিয়ে ইংরাজী-বাঙ্গলায় রচনা কিছু কিছু পাওয়া যাবে। তার মধ্যে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের Balto Slav গ্রন্থ, গোপাল হালদার মহাশয়ের প্রকীর্ণ-নিবন্ধাবলী (১৯৫৯—১৯৬৮) স্লাভসংস্কৃতি ও স্লাভভাষা সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশন করে এসেছে। ১৯৬৫ সালে আচার্যদেব কীভ-এ আমন্ত্রিত হয়ে যান শেভচেংকার ১৫০ বছরের স্মরণোৎসবে যোগ দেবার জন্য। ইদানীংকালে ধরণী গোস্বামী মহাশয় অনূদিত 'কাতেরিনা' দীর্ঘ কবিতা কাহিনী, কেশব চক্রবর্তীর বাঙ্গালীর রুশচর্চা এবং সুভাষ সমাজদারের গ্রন্থ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ভিখু শেখের রুশ যাত্রার কাহিনী মনোমত রচনা। ১৯৬২ সালে গোপাল হালদার কীভে আমন্ত্রিত হয়ে যান শেভচেংকো স্মারক সভানুষ্ঠানে যোগ দিতে। বর্তমান লেখিকাও সঙ্গে ছিলেন। আমরা নীপার নদীর পরপারে শেভচেংকোর মূর্তি ও সমাধি দেখে পাদমূলে ভারতীয় ধূপ জ্বালিয়ে এসেছিলাম। উদার আকাশ-তলে বিরাট মূর্তিতে শেভচেংকো গমের খেতে ও নীপার তটে যেন তাঁর দেশের প্রতীকী পাহারায় নিযুক্ত। তাঁর Testament বা ঘোষণা কবিতাটি তাই বলে। এটি তাঁর সমাধিবেদীতে সমুৎকীর্ণ। কীভের শেভচেংকো বিশ্ববিদ্যালয় ও শেভচেংকো মেমরিয়াল গৃহ দেখার মত। সমগ্র বিশ্বে শেভচেংকোর লেখা যা কিছু যতটুকু প্রকাশিত, অনুবাদ হয়েছে, এটি তাও সংগ্রহ করে রেখেছে। Testament ডায়রীর আকারে অনূদিত হয়েছে ৪৫টি ভাষায় প্রয়োজনে বিভিন্ন লিপিতেও। বর্ত্তমান লেখিকাও সানন্দে Testament এর বাঙ্গলা অনুবাদ করেন এবং সেটার Tape ধৃত উচ্চারণ কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করেন—পরে তা আমরা বেতারে

শুনেছিলাম। ঐখানে থেকে পাঠানো তাঁর লেখাটি, অনুবাদ শেভচেংকো পরিচিতি সহ তখন দক্ষিণ চব্বিশপরগণা থেকে বার হওয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। অনুজ সুহৃদ শ্রী মনাথনাথ মুখোপাধ্যায় তা পাঠিয়ে দেন কীভে। মেমরিয়াল কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেন।

কীভ হলো কীভ রুশ। বান্ধবী লেখিকা নিশ নিকালদায়ভনার মতে কীভরুশ ও তার সংস্কৃতি সাহিত্যই স্লাভসংস্কৃতির মুখ্যরূপ। বিয়েলো-রুশ, উক্রাইনিয়ে ও রুশীয় তার তিন ভাষা রূপ। এছাড়া আছে পোল, বুলগারীয় চেক-স্লোভাক, আলবাজীয় যুগোস্লাভিক ইত্যাদি। যে কারণেই হক যুক্রাইন্যাকেই আদি রুশ সাহিত্য সংস্কৃতিকে তাঁরা প্রকৃত রুশ বলে বর্ণনা করেন। উক্রাইন্যায় লেখকদের মধ্যে এ চেতনা আছে, গোগোলের উপন্যাস তরাস বুলবাতেও এ ইঙ্গিত আছে। তাছাড়া যুক্রাইন্যাকে শস্য ভাণ্ডারও বলা হত। নাৎসী যোদ্ধারা অনেকেই যুদ্ধ শেষে কালনেমির লংকা ভাগ হিসাবে চাইতেন যুক্রাইন্যায় খামার বাড়ি করে থাকার স্বপ্ন দেখতে। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও মনে হত মস্কোভাইট ও লেনিনগ্রাদিৎসদের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক মান নিয়ে বিচিত্র মনোভাব আছে। যুক্রেইন্যিয়দের সম্পর্কে মনে হত তাঁরা সত্যই কর্মপটু ও ওয়াকিবহাল হিসাবে সকল কাজেই বিশেষ অগ্রণী। এ'টা তখন খুব সুনজরে দেখা হত না।

তরাস শেভচেংকো উনিশ শতকের লোক। ১৮১৪-১৮৬১ পর্য্যন্ত তাঁর জীবন কাল। বলতে গেলে তাঁর সমগ্রজীবনই এক বিস্ময়কর স্বেচ্ছাসৈনিকের ইতিহাস। সমগ্র কীভরুশ তথা মূলরুশদেশে সার্ফ বা দাসতন্ত্র ছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত। অজস্র দরিদ্র নরনারীর এই দাসজীবন বর্ণিত হয়েছে রুশী লেখকদের মহৎ লেখনীতে। তবে তাঁরা অনেকেই প্রত্যক্ষদর্শী হলেও দাস নন। অথচ শেভচেংকোর পিতামাতা, বিমাতা এমনকী প্রেয়সী পর্য্যন্ত সকলেই দাস পর্যায় ভুক্ত। তিনি নিজেও দাসপুত্র এবং দাসও। বস্তুতঃ স্লাভ কথাটা কেউ slave অর্থে ধরেন—আবার কেউ শ্লাঘা বা গৌরবার্থে ধরেন। শেভচেংকোর রচনায় বিবৃত এই দুঃখী জীবনের, দাসজীবনের, দরিদ্রগৃহের সুন্দরী দুহিতায় প্রণয় ও ভগ্নহৃদয়ের কথা, তথা গর্ভিনী নারীর আত্মহত্যা (দ্রষ্টব্য কাতেরিনা)—এরূপ বালিকার সখাজজীবনের দুর্ভোগের (মেরী) এবং দুঃখী পরিত্যক্ত শিশুদের ভিক্ষুকজীবনের, অসহায়তার কথা অসাধারণভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাঁর চিত্রে, শীতের কুয়াশায় ক্লিস্ট দুখীচাচার ঘরের শীর্ণ বুভুক্ষু ঘোড়াটির কথা আমরা ভুলতে পারি না। পথের ভিখারী দুঃস্থ

মানবশিশুর খোলাবুকে ছেঁড়া জামায় শীতশীর্ণ অবয়ব, খালি পা, কাতর, দুটি ভিক্ষার্থী হাত আমাদের স্থানকালপাত্র ভুলিয়ে দেয়। এই কারণেই মহৎ শিল্পী সোমনাথ হোড় বলেছিলেন বইটির ভাষা না বুঝলেও চিত্রভাষা তো অবোধ্য নয়। শেভচেংকোর আশ্চর্য আন্তরিকতা, চিরজীবনের সংগ্রাম, তারই মধ্যে নিজের স্বাধীনতা অর্জন, স্বশিক্ষণ সবই মনে হয় এক অসাধারণ অসামান্য জীবনকথা। য়ুক্রাইন্যার শিল্পী ও লেখক ও শিক্ষিতসমাজ এই মহৎ চরিত্রকে নিজস্ব ঐতিহ্য বলে গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকও বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাঁকে উপস্থাপিত করার জন্য আমাদের ধন্যবাদভাজন। গ্রন্থটি আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় ইংরাজীতে লেখা শেভচেংকোর জীবনী গ্রন্থখানি। আমরা এ গ্রন্থে প্রস্তাবনা, ছেলেবেলা, ভিলন্যুস-এ চিত্রাঙ্কন শিক্ষার শুরু, সেন্টপিটর্সবুর্গে চিত্রশিল্পীদের সান্নিধ্যে সার্ফ জীবন থেকে মুক্তি, আর্টস একাদমীতে প্রবেশ, সেন্টপিটর্সবুর্গে কাব্য ও সাহিত্যরচনা, নিজের মাতৃভূমি য়ুক্রাইন্যায় বিপ্লবী মনসিকতার অঙ্কুরোদ্গম, শেভচেংকোর কাব্যে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিকতার সুর, ওরস্বুর্নে নির্বাসিত জীবন, আরলসাগরের পথে, আরল সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, নভোপেত্রভস্কে নির্বাসন, পরে মুক্তি, রুশদেশের ঝড়ের সংকেত, মস্কো ও সেন্টপিটর্সবুর্গে মুক্তির স্বাদ, মাতৃভূমি ইউক্রেনে, জীবনদীপ নির্ব্বাপিত-শীর্ষক কয়টি অধ্যায় আছে। এগুলি মনে হয়, প্রথমে লেখকও সেকথার উল্লেখ করেছেন স্বতন্ত্রভাবে নিবন্ধাকারে পরিবেশিত হয়; পরে একত্র সঙ্কলিত হয়ে থাকলেও নিবন্ধগুলি পর্যায়ক্রমে সাজানো ও সুসম্পাদিত। রচনাগুলিতে লেখকের আন্তরিকতা এবং বিষয়বস্তুর সুপরিচ্ছন্ন বিন্যাস পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মাত্র ১০৯ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখকের এই মহৎ ও বৃহৎ মাপের ব্যক্তিত্বকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করার প্রয়াসটি কোথাও তাঁকে খণ্ডিত করে নি। ভাষাও প্রসাদগুণসম্পন্ন। গ্রন্থশেষে শেভচেংকোর অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র, প্রেয়সী শিকেরার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা সংযোজিত করে লেখক শেভচেংকোকে বাঙালী পাঠকের কাছাকাছি এনে দিয়েছেন। এ গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে শেভচেংকোর জীবনের বর্ষানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী। বলা বাহুল্য এ সংযোজনটি গ্রন্থের মূল্যমান বাড়িয়ে দিয়েছে। জীবনীগ্রন্থ হিসাবে এটিকে লেখকের আশানুযায়ী পরবর্তীকালে বিস্তার গ্রন্থ বা আকর গ্রন্থ বলে গবেষক ভবিষ্যতে গ্রহণ করতে পারবেন।

শেভচেংকোর চিত্রিত ছবিগুলি শুধুমাত্র শিল্পকার্যই নয়—তাতেও তাঁর

জীবনধারার পর্যায় বিকশিত হয়েছে। য়ুক্রাইন্যার গ্রাম, শীতের ক্লিষ্ট আবহাওয়ায় বালক শেভচেংকোর দাসজীবনের শুরু এবং পরবর্তীকালের আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তিত্ববান শেভচেংকোর স্বপ্রতিকৃতি একান্ত বিশ্বাসভাজন রেকর্ড বলে মনে হয়। এর মধ্যেই আছে তাঁর প্রেয়সী নারীর চিত্রটি এবং তাঁর কবজার গ্রন্থের প্রথম পত্রটি বা প্রচ্ছদচিত্র। কবজার কথাটি লক্ষ্যণীয়, কবজার মানে চারণ-কবি। মনে করা যেতে পারে কবি, শিল্পী, বিপ্লবী-মানবিকতা প্রবুদ্ধ শেভচেংকো নিজেই সার্থকভাবে এ নামটি গ্রহণ করে স্বরচিত গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় সর্বত্র প্রথম যুগের কবিরা সকলেই চারণ কবি বা B... । হোমার, বাল্মীকী, ব্যাস-সৌতি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের হাঙ্গেরীয় এন্ড্রে অডি অথবা য়ুক্রাইন্যার শেভচেংকো সকলেই নিজেদের শোককবি অথবা জনগণের চারণ কবি বলে ঘোষণা করেছেন। এন্ড্রে অডি এবং শেভচেংকো কাছাকাছি সময়ের লোক, দুজনাই মানবিকতা প্রবুদ্ধ কবি ও একপ্রকার দার্শনিকও। শেভচেংকো তদুপরি শিল্পীও বটে। দুজনারই জীবনে দেখা যায় রাজরোষের প্রকোপ। এন্ড্রে অডি রাজস্বীকৃতিও পাননি।

কবজার কথাটি কৌতুহলদ্দীপকও বটে। ধ্বনিশাস্ত্রের বা Phonetics এর দিক থেকে কব্জার চারণ কবি-এই তার অর্থ। তত্ত্বগতভাবে য়ুক্রাইনীয় ভাষা স্লাভ ভাষা এবং স্লাভ ভাষা সতম্ শাখাভুক্ত ইন্দো-ইয়োরোপীয়হিট্টি পরিবারের অন্তর্গত ভাষা। অপরদিকে ইন্দোইরাণীয় ও ইন্দো-আর্য ভাষাগুলিও একই পরিবারভুক্ত বলে স্বীকৃত। এ আলোচনা প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখমাত্র এখানে করলাম। প্রেয়সী শিকেরার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত কবিতাটিতে ধর্মীয় আচার ও গির্জার প্রতি কবির বিদ্রোহাত্মক উক্তি লক্ষ্য করার মত। পংক্তিগুলি তাঁর শেষ জীবনে লেখা মেরী কবিতার শেষাংশ স্মরণ করিয়ে দেয়। শিকেরার মত কন্যাই মনে হয় 'কাতেরিণা'র অথবা—কুমারীজননী মেরী রচনার উৎস, প্রেরণা। তৎকালীন স্লাভসংস্কৃতি অধ্যুষিত দেশগুলিতে জমিদার ও প্রপীড়িত পরিচারক পরিচারিকা নিয়েই সমাজসংসার গড়ে উঠত। আর্থসামাজিকতার এক অসহায় পরিস্থিতিতে কুমারী কন্যার কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থা বা উপায় ছিল না। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সংঘটিত তার প্রেম বা অপ্রেমের তথাকথিত আত্মসমর্পনের অবৈধফল তাকেই বহন করতে হত। কাতেরিণা আত্মহত্যা করে। মেরী যেভাবেই হ'ক জুইশ সদ্বিবেচনার ফলে সংসারে স্বীকৃতি পায়। শেভচেংকোর মেরী ঠিক বাইবেলের মেরীর মত নয়। এ মেরী যেন আমাদের অনেক কাছের মানুষ বলে মনে

করা যায়। মনে হয় গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ এর থেকে রুশ অর্থোডক্স চার্চ পৃথক সত্তা নিয়ে এতদ্দেশে গড়ে উঠেছিল এবং শেভচেংকো মেরী রচনায় সেই চার্চকেই আক্রমণ করেন। (দ্রষ্টব্যঃ সমালোচনা-লেখিকার 'মানবপুত্র গ্রন্থে বিধৃত মেরী কবিতার বঙ্গানুবাদ)। তাঁর 'মেরী ও ইমানোয়েল (যীশু) কে আমাদের দুঃস্থ দরিদ্র ঘরের দুঃখী অথচ পরিচিত সজ্জন বলে চেনা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সংক্ষেপে অথচ সযত্ন পরিশ্রমে শেভচেংকোর জীবনীসহ তাঁর বিশেষ চারিত্রসম্পদের বিশদ উল্লেখ করেছেন। শেভচেংকোর ইংরাজী জীবনী গ্রন্থটির সহায়তা নিলেও লেখক নিজস্ব অনুবাদও কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছেন। আজকের দিনে ইংরাজী ভাষার যে স্বাভাবিক বিশ্ববিজয় যাত্রা অপ্রতিহত ভাবে স্বীকৃত সেকথা স্লাভদেশগুলিতেও অজানা নয়। ইংরাজীর প্রসার ও প্রচার (বেশীর ভাগই VOA) ত্রিশ বৎসর পূর্বেই এই লেখিকার অভিজ্ঞতা গোচর হয়েছিল। শেভচেংকোর বৃহৎ জীবনীগ্রন্থ তাঁর দেশীয় ভাষায় রচিত। তাতে তাঁর কাব্য ও শিল্পের পরিচয় আছে। ইংরাজী গ্রন্থটিও অতি উপাদেয় এবং তাতেও সযত্নচয়িত কবিতা ও শিক্ষিত চিত্রের পরিচয় আছে। মনে হয় পরবর্তী সংস্করণে লেখক আর একটু বাঁধত ও পরিশোধিত পরিবেশনায় শেভচেংকোকে পাঠকসমীপে উপস্থাপিত করবেন। অধ্যায়গুলির মধ্যে যদিও পরম্পর্যক্রম বিদ্যমান তবুও গ্রন্থটিতে আরও একটু বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা আছে বলে মনে হয়। কারণ গ্রন্থটি শুধুমাত্র বিবরণধর্মী নয়। অথবা গ্রন্থোদ্দিষ্ট শোভচেংকোচরিত্র শুধুমাত্র বিবরণের বিষয় নয়। এ চরিত্র মহৎ ও বৃহৎ মাপের চরিত্র এবং শেভচেংকো একপ্রকার বিশ্বপথিক হিসাবে স্বীকার্য চরিত্র। তিনি শুধু মাত্র লেখক বা শিল্পী বা বিদ্রোহী বিপ্লবকর্মী বললে তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। তিনি সমসাময়িক দেশকালে আবির্ভূত হলেও বিশ্বেরই ইতিহাসে একজন যুগন্ধর মানুষ বলেই স্বীকৃত থাকবেন। আমরা মনে করি লেখক এই দিকটি আর একটু মনোযোগ দেবেন। আমাদের এ আশা খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়। লেখক সযত্নে শেভচেংকোর রচনার মধ্যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা আছে তা তুলে ধরেছেন। এজন্যও ভারতীয় পাঠক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। আমরা মনে করতে পারি, সারা পৃথিবীতে ঊনবিংশ শতাব্দী একটা মহৎ কালও বটে এবং অবশ্যই শেভচেংকো সেইকালে ঐ দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারতে ও ইয়োরোপ এই সময়টিতে যুগন্ধর

কিছু মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মহিমা তাঁদের পরিস্থিতি ও দেশকাল ছাপিয়ে গিয়েছিল। শেভচেংকাকে সেইভাবে দেখার দরকার আছে। এছাড়াও একটা কথা ভারতীয় মনে না জেগে পারে না। বলা হয় "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তংতু পৌরুষম্" এই ঘোষণাটি বিশেষভাবে শেভচেংকোর ক্ষেত্রেই সত্য। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ ভারতে এবং অন্যত্র মিল বেন্হাম ডারউইন, তথা তলস্তই প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা পরিবেশ এবং ঐতিহ্যগত কিছু সুবিধা ছিল। অপরপক্ষে শেভচেংকোর জন্ম দাসকুলে। বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব। নিজের প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসে তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন কিছু মানবিকতাপ্রবুদ্ধ সজ্জন সুহৃদের। নিজের স্বাধীনতা তিনি অর্জন করেন আপন প্রয়াসে। সেই প্রয়াসে স্বীকৃত ছিল মানব মহিমার অপরাজেয় ঐশ্বর্য। তারই জোরে তিনি রুশসম্রাটের প্রভুতশক্তিকেও প্রতিহত করে চলেছিলেন। তাঁর বিশ্রাম ছিল না। নিজের মুক্তির সঙ্গে জড়িত ছিল মানব মুক্তির অক্লান্ত পথ-নির্দেশের সাধনা। কিছু গুপ্তদলের সঙ্গে অবশ্যই তাঁর যোগ ছিল। তৎকালীন রুশসাম্রাজ্য নিহিলিস্ট কর্মীদের বিপ্লবসাধনা ও সাইবিরিয়াতে অন্তরীণকৃত হওয়ার ঘটনা আজকালের দিনে আমাদের কাছে রুশবিপ্লবের ইতিহাসে অপঠিত বা অজানা নয়। কবি শিল্পী-লেখক তথামানুষ শেভচেংকো মানবমঙ্গল নীতিকে vision বলে প্রাপ্ত হন এবং mission বলে তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে গ্রহণ করে পথ পরিক্রমা করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় শাস্তি ছিল নির্বাসন নয়—নির্বাসন কালে তাঁর প্রতি ছিল নিষেধাজ্ঞা, যেন তিনি লিখতে বা ছবি আঁকতে না পারেন। তবুও আরব সাগর তটে স্বচিত্রিত আত্মপ্রতিকৃতি আছে—শেভচেংকো মেমোরিয়াল মিউজিয়মে সেটি দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। আমাদের সংগ্রহে তাঁর বুটের ভিতরে লুকানো ডায়রী লেখার পাতাগুলির পুস্তকাকারে প্রকাশিত পরবর্তীকালে পেয়ে বিস্মিত আনন্দ ও বেদনাবোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল বহুদিক থেকে তিনি অপরাজেয় অদ্বিতীয় মানুষ হিসাবে, আদর্শবাদী মানুষের আশায় ও আশ্বাসের স্থান হিসাবে আলোকস্তম্ভ হিসাবে এখনও বহুদিন বর্তমান থাকবেন।

পরিশেষে মনে করি এই গ্রন্থটিতে শেভচেংকোর Testament বা ঘোষণা কবিতাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ সংযোজিত হলে (অংশত উল্লেখ করা হয়েছে) শেভচেংকো চরিত্র আমাদের কাছে আলোর মত উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে বা উঠতে পারে এবং গ্রন্থটিও সম্পূর্ণতর হয়ে উঠতে পারত। ঐ কবিতায় শেভচেংকো

নীপারপারে স্বদেশের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে মানব জীবনের সংগ্রামী সাথী হিসাবে নিজেকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি সেখানে অত্যাচারী ভগবানের বিদ্রোহী সন্তান এবং স্বদেশের গোধূম ক্ষেত্রের দিগন্তব্যাপী শান্তির কোলে শয়ান একটি জাগ্রত প্রহরী। সর্বোপরি তিনি মানুষ হিসাবেই মানুষের সাথী ও পথের দিশারী। আমরাও বলি "জয় হোক মানুষের ঐ চিরজীবিতের"। প্রণাম মানুষকে।

অরুণা হালদার

তরাস শেভচেংকো জীবন কথা ঃ ভানুদেব দত্ত
প্রকাশক ঃ—ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৭, লেনিন সরণি, কলি-১৩। ২০ টাকা

আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার গল্প

তেরোটি গল্প নিয়ে 'সুখ-অসুখের গল্প।* যে গল্পটির নাম অনুসারে গল্প সংকলনটির নাম সেই গল্পটি যে তাৎপর্য বয়ে আনে সেটিকেই বলা যায় সংকলনের মূল বিষয়। পল্লবী প্রথম জীবনে বিরাট আঘাত পেয়েও ভেঙে পড়ে নি কখনো। তিলে তিলে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে,ব্যাধির যন্ত্রণা কষ্টের কাছে হার না মেনে তাকে যুঝতে চেষ্টা করেছে। অথচ কখনো সে তথাকথিত বিদ্রোহিনীর মত ফুঁসে ওঠে না, জীবনের সংকট মোকাবিলা করে শান্ত স্থৈর্য নিয়ে। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র, নারী নরকের দ্বার, ফলে পুরুষের নির্যাতন ও শোষণ অকথ্য হয়ে ওঠে। নন্দিতা ঘোষ সেই অবদমিত নারীর আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব তুলে ধরেন গল্পগুলিতে।

তবে সব গল্পেই যে পর্যুদস্ত নারীর আলেখ্যপ্রধান হয়ে উঠেছে এমন নয়, 'টুকুর দিনরাত্রি' তেমন একটি গল্প। এ গল্পে নির্যাতনের কোনো ছোঁয়া নেই, আছে মায়ের নিটোল আবেগ—মেয়ের জন্য মা-র চিন্তা এবং মায়ের জন্য মেয়ের মমতা। এই আবেগের ফলে গল্পটি কাব্যিক আমেজ লেগে যায়—"চাঁদ একটুখানি উঁকি দিচ্ছে—সেই চাঁদের আলোয় উঠোনের জমা জল ঝিকমিকিয়ে উঠছে—টুকুর হঠাৎ চোখে পড়লো বৃষ্টির জলে ভাসতে ভাসতে একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি তাদের সিঁড়ির পাশে আটকে আছে—তার ওপর চাঁদের আলো পড়ে চিক্‌চিক্‌ করে উঠছে—"

এই আমেজের পাশে 'মালতীর মা' গল্পটি আমাদের অন্য অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়। সীমা ও মালতীদের সামাজিক ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তিনি হৈ চৈ করে দেখান না, ঘটনার ছোট ছোট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আমরা বুঝে যাই মালতীরাই পারে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের জোরে। আর মধ্যবিত্তীয় আপাত নৈতিকতা সীমার মামাতো বোনকে আরও দুর্বিপাকে ফেলে। আবার 'উৎসের দিকে' গল্পে নন্দিতা প্রকরণের পরীক্ষায় মেতে ওঠেন—'অশোকের কথা', 'সুমিতার কথা,' শেষে 'বুলুর কথা' তিনটি কথার মধ্যে তিনজনের আবেগমথিত আলেখ্য তুলে ধরে এসে পৌঁছান মূল কথায়—"অন্ধকারের আবরণ আমার সব সংকোচ ঘুচিয়ে দিল, আমি মাসিমণিকে জড়িয়ে ধরে বললাম—'তোমাকেই তো ডাকছিলাম মা।'" গল্পটির উপসংহার যত স্বাভাবিক হয়েছে, 'ভেজাল' গল্পের উপসংহারে চন্দনার পঙ্গুত্ব ঘুচে যাওয়ার ব্যাপারটি তত ইচ্ছাপূরণের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। গল্পটিতে যে জটিল প্রকরণ নেওয়া হয়, উপসংহারটি তেমন সহজ সরল হয়ে ওঠে। চন্দনার পঙ্গুত্ব না ঘুচলে ক্ষতি হতো কি গল্পটির? চন্দনা তো মানসিক ভাবে সজাগ ও সচেতন ছিল। তেমনি 'যৌতুক' গল্পে সুজয়-তনিমার সম্পর্কে জট বাঁধতে থাকলে এবং তনিমার ব্যক্তিত্ব পদে পদে দলিত হতে থাকলে সে যে সিদ্ধান্ত নেয় তা যে কোনো মর্যাদাসম্পন্ন মানুষই নিতে পারে। কিন্তু তনিমার বাঁচার ইচ্ছা বারবার উচ্চারিত হলে ঐ আবেগের তীক্ষ্ণতা যথেষ্ট তীব্র হয় না। "...সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে সে নিজের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে সন্তর্পণে দরজা খুলে বড়ো রাস্তায় নেমে আসে।" গল্পটি এখানে শেষ হলে গল্পটির রেশ পাঠককে অনেক কিছু ভাবার অবকাশ দিত।

লেখায় লিঙ্গভেদ করা যায় কিনা, আমরা ঠিক জানি না। তবে দেখা যায় লেখকের লেখায় পুরুষ চরিত্র প্রাধান্য পায়, আর লেখিকাদের রচনায় নারী চরিত্র। আমরা পুরুষদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছি নানা লেখায়, নারীর অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক আলেখ্য আমাদের সাহিত্যে এখনও উপেক্ষিত থেকে গেছে। নন্দিতা ঘোষের গল্পগুলি সেই ঘাটতি কিছু পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাঁর লেখার ভঙ্গিটি সাবলীল এবং ভাষাও সহজ। আমার আশা করবো, ভবিষ্যতে শ্রীমতী ঘোষ নারীমনের আরও গভীর জটিলতায় নেমে আমাদের আরও গল্প উপহার দেবেন।

কার্তিক লাহিড়ী

সুখ-অসুখের গল্প। নন্দিতা ঘোষ। দে বুক স্টোর। চল্লিশ টাকা

দুটি কাব্যগ্রন্থ

১

'প্রজাপতি আঁকা গাড়ি' রমেন আচার্যের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ।

পৃথক ভাবে দেখা একজন মানুষকে যখন কোনো উৎসব-মুখরতায় অনেকের মধ্যে দেখি তখন একই মানুষ অন্য এক মাত্রা পেয়ে যায়। কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে উৎসবের অনুষঙ্গটি কিভাবে যে আচমকা এসে গেল তা আমি নিজেই জানি না। তবে একটা ভাল লাগার যে ব্যাপার থাকে তা অনস্বীকার্য। 'স্বপ্নবৃক্ষ' কবিতায় 'চতুর্দিকে সবাই যথাযথ।/···শুধু মিথ্যে হয়ে গেছে / সেই রুপোর গাছে সোনার পাতা আর মুক্তো ফলের / সেই স্বপ্ন-বৃক্ষটি,/ কোন বজ্র তাকে হত্যা করেছে!' এবং ঠিক তার পরবর্তী কবিতা 'পানের দোকান'-এ 'জীবনের রক্তিম উল্লাসের সঙ্গে রক্তপাতের কোন সম্পর্ক নেই'—পাশাপাশি না দেখলে এই মেঘ-রৌদ্রকে কোথায় পেতাম ?

এই যুগ এই সময় যাঁদের কাবভাবনার চালচিত্র, তাঁরা বোধহয় এখন একটু বেশি সজাগ কবিতার অবয়ব নির্মাণে। 'শ্লোগান' কথাটি সঙ্কীর্ণ হতে হতে যখন একেবারে অচ্ছুত, তখন তত্ত্ব-ভাবনায় নতুন সুরারোপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আমার সামাজিক ভাবনা কবিতার ভিতরে স্ফূর্তি পেলে কেন তাকে 'শ্লোগান' বলা হবে, এই সাহসী প্রশ্ন এখন বোধ হয় কেউ আর করেন না। পরিবর্তে কাব্যশরীরকে দুমড়ে মুচড়ে নতুন ছাউনি দিয়ে এক উদ্বাস্তু কাব্যসমাজ গড়ে ওঠে। রমেনের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'বাতাস থেকে বেদনাবোধ'-এর কবিতার 'নিহত পাথর' এক্ষেত্রে দারুণ প্রাসঙ্গিক মনে হয়, 'আমি বোবা ভারী কথা নিয়ে উঠি, অথবা/'পাথর নিয়ে শুধু / গঠিত শুঙ্গের নিচে পড়ে থাকে রাশিকৃত / নিহত পাথর।'

যদিও 'প্রজাপতি আঁকা গাড়ি'র আলোচনায় প্রাগুক্ত মন্তব্যগুলি মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়, তবু আমি যে কথাগুলি বলতে প্ররোচিত হয়েছি তার মূলে রমেন আচার্যেরই কয়েকটি সাবলীল পংক্তি—'বুদ্ধিজীবী তুমি, চিরকাল কলমের অহঙ্কার করো।/ তোমার কবিতার চেয়ে ভোঁতা ঝাঁটা বেশী / জঞ্জাল সরায় প্রতিদিন [পুরোনো খবর]'। রমেন যখন বলেন, 'ঘাসের গহন বনের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে যতটুকু রোদ / তার চেয়ে বেশি রক্তের ছোপ। শিশুও তেমনি / চিনেছে বারুদ, বারুদগন্ধী বিশ্বভুবন।' [জলে-স্থলে], তখন সত্যকথনকে কেউ কেউ বিষাদ বলে চিহ্নিত করতে পারেন। কিন্তু কে অস্বীকার করবে এই রূঢ় সত্যকে—'দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে নির্বোধ মাছ প্রশান্ত জলে / মাছেরই একটা কঙ্কাল থেকে কাড়াকাড়ি

-করে খাবার খাচ্ছে!' [জলে-স্থলে]। সমগ্র না হলেও এটাই তো সমসময়ের পৃথিবীর সামাজিক চিত্র।

শল্যচিকিৎসকের ছুরি আর সমালোচকের কলম বেহিসেবী হলে নানা অঘটন ঘটায়। তাই তত্ত্ব ছেড়ে কবিতার চিত্রকলার দিকে একটু নজর ফেরানো যাক। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্রী কবি স্বয়ং। প্রচ্ছদে প্রতীকী পুষ্পকলস আর প্রজাপতি। কিন্তু গ্রন্থের নাম-কবিতায় বিবাহোৎসবের কোনো চিহ্নই নেই। সেখানে আর এক চিত্র। অরণ্যশিকারীদের আগ্রাসী ক্ষুধাকে কবি এঁকেছেন এই ভাবে-'শহরে অসুখ, ক্রনিক বিষাদ পিছনে করেছে তাড়া / টায়ারে টায়ারে আগ্রাসী গতিবেগ, / সবুজ রক্ত-শিকারী চলেছে হৃৎপিণ্ডের দিকে।' ওদের থামিয়ে সবুজ-সাম্রাজ্যে যেতে হলে কবির পরামর্শ-'ফেলে দাও তীর, / গাড়ীর উপর সুগন্ধী ফুলে ফুলে / আঁকা হোক প্রজাপতি।' জানি না এই চিত্রিত প্রজাপতি কোন্ কবির জনারণ্যে ক্রমাগত ডানা ঝাপটাতে থাকবে। আমরা কি এই বলে প্রশস্তি লাভ করব, 'তাদের কষা অংক শুদ্ধ, কিন্তু যোগফল ভিন্ন ভিন্ন' [হাতুড়ি ও কাউডগা]।

২

একজন কবির জীবন-দর্শণ আহরণ করা যায় তাঁর কবিতার মধ্য থেকেই। কিন্তু কাব্যগ্রন্থের নামকরণে যদি এমন বৈশিষ্ট্য থাকে পাঠককে অবশ্যম্ভাবী মনোযোগী হতে হয় উপনিষদ বা পুরাণকাহিনী সম্পর্কে, তা হলে স্তিমিত কাহিনীগুলিকে একটু উস্কে দিতে হয়। নামমাত্র পৌরানিক চরিত্রগুলি নিয়ে মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য যে কেবল পৌরানিক রোমন্থন হয়ে ওঠেনি, প্রত্যেকটি নতুন চরিত্রে পরিণত হয়েছে, তা বুঝতে গেলেও তো পাঠককে পুরুরবা-উর্বশী, নীলধ্বজ-জনার পুরাণ-কথনে প্রবেশ করতে হয়।

২. এবার শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'চিরন্তন নচিকেতা আমি'-তে প্রবেশ করার চেষ্টা করি। দুর্লভ অগ্নিবিদ্যা সামাজিক মানুষকে কতখানি উদ্বোধিত করেছে, আর কতটাই বা দগ্ধ করেছে তা অষ্টাদশ সর্গ ও ২১৪৮ ছত্রে বিধৃত আলোচ্য এই কাব্যগ্রন্থে নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। কঠোপনিষদের আঙ্গিক অনুসরণে যদিও তাঁর এই সর্গ ও ছত্রবিন্যাস, তথাপি মানুষের ধারাবাহিক ছলনা-তিতিক্ষা-অর্জনের ইতিহাসকে কাব্যদেহে উপস্থিত করেছেন মানুষেরই দরবারে। উপনিষদের নচিকেতা অগ্নিবিদ্যা অর্জন করেছেন অমরত্বের জন্য। আর এযুগের নচিকেতার নিরন্তর যাত্রা যদিও যমের সন্ধানে, তথাপি

তাঁকে বলতে হয়, 'অমরতা' থাকে চিরকাল / যুদ্ধে নয়—রক্তে নয় / সাহিত্য দর্শন-শিল্পে-স্থাপত্যে-বিজ্ঞানে।' বাজশ্রবসের ছলনার প্রায়শ্চিত্তকামী নচিকেতা যে যমকে শিক্ষাগুরু আচার্য হিসাবে মেনে নিয়েছেন, সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ যম কিন্তু শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের অন্বিষ্ট নন। সংগ্রামরত মানুষ পরাভবকে মৃত্যু বলে জানে। তার বিরুদ্ধেই তো অমৃতপথযাত্রীর যুদ্ধ—'পাথরের অস্ত্র হাতে। তাই প্রতিদিন / ছুটে গেছি— / প্রবাহিত ভোলগা থেকে। জাহ্নবীর তীরের সন্ধানে।' এই যুদ্ধ-যাত্রার পটভূমি প্রত্নগবেষণার হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো থেকে শুরু করে বিধ্বস্ত হিরোসিমা নাগাসাকির বিপুল বিস্তারে, ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডি থেকে 'অক্টোবর-নভেম্বরে নতুন জন্মের দিন' পর্যন্ত বিধৃত। অষ্টাদশ থেকে বিংশশতাব্দীর অনেক মৃত্যু আর মৃত্যুহীনতার কাহিনী তুলে ধরেছেন শিবেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই উপনিষদভিত্তিক অথচ সমসময়ের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে। তাঁর কাব্যভাষা এমন স্বচ্ছন্দ যে কোথাও তা ঘর্মাক্ত গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে না। সরল অক্ষরবৃত্তে এই দীর্ঘ পরিক্রমা কোথাও রসগ্রহণের প্রতিবন্ধক হয়নি।

কবি শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটি নিবেদন। স্থির বিশ্বাসের যে উজ্জ্বল কালিতে ডুবিয়ে তিনি এই রাষ্ট্রসমাজনৈতিক বিশ্লেষণকে কাব্যরসে উত্তরণ ঘটিয়েছেন উপনিষদনির্ভর না হলে তার কি কোনো রসাভাস ঘটত? মৃত্যুর দেবতাকে চিরন্তন নচিকেতা লুকিয়ে থাকতে দেখেছেন 'মুষ্টিমেয় মানুষের অফুরন্ত আগ্রাসী ক্ষুধায়'। অভূতপূর্ব যুগযন্ত্রণায় বিপন্ন এই পৃথিবী অপার্থিব তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানে ছুটবে কোন্ সান্ত্বনার জন্য? উপনিষদের নিহিত সত্য সর্বক্ষেত্রে যে জীবনসত্য নয়, এই উপলব্ধি আছে বলেই এই কাব্যগ্রন্থে যম আত্মতত্ত্বের শিক্ষক নন। তাঁর অবস্থান 'বিধ্বংসী মারনাস্ত্র, পরমাণু বোমার ভিতরে'। কালান্তক যমের দিকে তীক্ষ্ণ শব্দাবলী ছুঁড়ে কবি তাই বলতে পারেন 'মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ করা যায় না কখনো।' পিতার মৃত্যুর পরে 'মায়ের সিঁদুর ধোয়া জলে স্নান করে উঠে' চিরন্তন নচিকেতা দেখলেন—'শুভ্রতার প্রতিমূর্তি আমার জননী।' তাঁর মনে হলো—'মৃত্যুর বর্ণ কি তবে কালো নয়? / ভীষণ শুভ্রতা?' 'ভীষণ' শব্দটি শুভ্রতায় শুদ্ধতাকে যেন একটি প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ। মৃত্যু বা মৃত্যুর দেবতাকে মহান করে তুলবার বিলাসিতা এখানে নেই। ২১৪৮ ছত্রের অন্তরঙ্গে আমরা মাঝেমাঝেই এমন 'নাচিকেত অগ্নির' প্রবন্ধ স্পর্শ লাভ করেছি যা কদাচ উপনিষদের নচিকেতা থেকে বিচ্ছুরিত নয়।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

প্রজাপতি আঁকা গাড়ি। রমেন আচার্য।
একুশে। ১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭। দশ টাকা
চিরন্তন নচিকেতা আমি : শিবেন চট্টোপাধ্যায়।
দি বুক ট্রাস্ট। ৫৭-বি, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। ষোলো টাকা

বিবস্বানের আলোকে উদ্ভাসিত এক মনোজ্ঞ স্মৃতিচারণ

বিবস্বান্‌ সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ শ্রীরবীন্দ্র ঘোষের ছদ্মনাম। জন্ম ১৯২২ সালে এলাহাবাদে। উত্তর কলকাতার এক বনেদি পরিবারের, লেখকের নিজের ভাষায় 'এক তথাকথিত জমিদার বংশে'র (পৃ. ১২), সন্তান শ্রীরবীন্দ্র ঘোষ। সেই যুগে এই ধরনের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারগুলিতে যে রকম পরিবেশ স্বাভাবিক ছিল, শ্রী ঘোষের বাড়ির পরিবেশ ছিল ঠিক সেই রকমই। আর এই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অন্যান্য অধিকাংশ জমিদার-পরিবারগুলির মতই লেখকের বাড়িতেও ছিল রাজভক্তির প্রাবল্য, যদিও লেখকের নিজের বাবা ও ঠাকুর্দা ছিলেন এই রাজভক্তির আবহাওয়া তথা বাবু কালচারের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। লেখকের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল মামার বাড়িতে এলাহাবাদে। সেখানে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ—সে পরিবেশ ছিল দেশপ্রেমের, স্বদেশীর। লেখকের দাদামশাই এবং বড়মামা উভয়েই ছিলেন দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, বড়মামা ছিলেন জেলখাটা রাজনৈতিক কর্মী। মামার বাড়িতে অবস্থানকালেই লেখকের মধ্যে দেশপ্রেমের উন্মেষ, লেখকের স্বদেশীতে দীক্ষালাভ। তখন দীক্ষা হয়েছিল কংগ্রেসের রাজনীতিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ ক্লাসে পাঠরত অবস্থায় দীক্ষা হল বামপন্থী রাজনীতিতে, যোগ দিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই যোগ দিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘেও, গণনাট্য সংঘের কাজকর্মে শুরু করলেন সক্রিয় অংশগ্রহণ। সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটে গিয়েছিল স্কুলজীবন থেকেই, আগ্রহ ও প্রভাবটা এসেছিল নিজের মায়ের কাছ থেকে। ১৯৪৫ সালে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সাংবাদিকতা। ১৯৪৮ সালের অগস্ট মাসে সংবাদপত্রকর্মীদের তৎকালীন ধর্মঘট-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে ছাড়তে হয়েছিল সাংবাদিকের পদ। জীবিকার প্রয়োজনে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিলেন ঔষধ শিল্পের সঙ্গে, যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন ঔষধ প্রতিষ্ঠানে। সেইসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে আসীন হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রজীবনেই বামপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার ফলে অর্জিত মূল্যবোধের কারণে রক্তের টান ছিল সব সময়ে শ্রমিকদের দিকেই, আর তার ফলে কোথাও সুস্থিতি আসেনি।

পঞ্চাশের দশক থেকেই লেখক যুক্ত ছিলেন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সঙ্গে। আর ১৯৮১ সালে জীবিকার্জনের জগৎ থেকে অবসর গ্রহণের পর লেখক সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন আঞ্চলিক স্তরে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে, আঞ্চলিক স্তরে শান্তি কমিটিগুলি সংগঠিত করার কাজে শুরু করলেন সক্রিয় অংশগ্রহণ। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে লেখকের বিশ্বাস এখনও অটুট, এখনও তিনি বিশ্বাস রাখেন বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়লাভে। তাই তাঁর জীবনদর্শনে হতাশার স্থান নেই।

'বিবিধ বিবস্বান' লেখক শ্রীরবীন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় বই। তাঁর পূর্ববর্তী বই 'বিবস্বানের ভূয়োদর্শন' (প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে, বইটি ছিল ব্যঙ্গকাহিনী সংকলন। বর্তমান বই 'বিবিধ বিবস্বান' সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ লেখকের স্মৃতিচারণ। লেখক নিজে এই বইটিকে আত্মজীবনী বলতে রাজি নন, কারণ তাঁর মতে'···যেহেতু আমি নিজের জীবনটাকে কোনো মহাপুরুষের দীপ্তিমান জীবন বলে মনে করি না তাই সত্যর্থে নিজের জীবনী লেখার কোনো আগ্রহই আমার জাগেনি কোনোদিন' ('নিবেদন', পৃ [৭])। তাহলে কেন এই বই লেখা? লেখকের নিজের ভাষায় 'জীবনটাকে কেন্দ্র করে আমার দেখা নানা ঘটনা, আমার মনে জাগা নানা চিন্তা আমি অকপটে মেলে ধরতে চেয়েছি পাঠকদের কাছে। চলতে চলতে জীবনটা বহু বাঁক নিয়েছে।···

··তাই নিজের জীবনকে সুতোর মতো করে আপন জীবনের নানা কথা ও কাহিনী একসূত্রে গেঁথে হাজির করে দিলাম পাঠক-পাঠিকার আসরে।' ('নিবেদন', পৃ [৭])। বর্তমান সমালোচকের অভিমত, এই কাজে লেখক নিঃসন্দেহে প্রায় পুরোটাই সফল। লেখক নিজেই জানিয়েছেন, 'চেষ্টা করেছি আত্মপ্রচারকে যথাসম্ভব পরিহার করতে' ('নিবেদন', পৃ [৭])। এ লেখকের কোনও অতিশয়োক্তি নয়, লেখক এই কাজে সত্যই সফল। আত্মপ্রচারকে যথাসম্ভব পরিহার করতে পারাই এই স্মৃতিচারণার অন্যতম প্রধান গুণ।

লেখক শ্রীরবীন্দ্র ঘোষের লেখার হাতটি যথেষ্ট ভাল। ঝরঝরে গদ্যে লেখা এই স্মৃতিচারণা প্রায়ই সাহিত্যপাঠের আস্বাদ জাগায়। এই স্মৃতিচারণার সাহিত্যমূল্য এবং রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দলিলের মূল্য দুইই আছে, উভয় কর্মেরই সার্থক সমন্বয় সাধিত হয়েছে এই বইটিতে। বইটিকে পরিষ্কার দুটি

ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম ভাগের বিস্তার পাঁচের অধ্যায়ের শেষভাগে অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আর সেইখান থেকেই শুরু বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ, যার বিস্তার ২৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ বইয়ের শেষ পর্যন্ত। লেখক এই ভাবে বইয়ের কোনও ভাগ করেন নি, এই ভাগ বর্তমান সমালোচকের করা। প্রথম ভাগের মধ্যে পড়ে লেখকের শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন, তখনও লেখক রাজনীতির পথের পথিক হন নি, এখানে লেখাটা যেন মূলত নিজেকে নিয়েই, সুরও তাই অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ। লেখকের বামপন্থী রাজনীতির পথের পথিক হওয়া দিয়েই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের সূত্রপাত। চলার পথ বদলে গেছে, ফলে লেখার সুরও গেছে বদলে। স্মৃতিচারণা সেখান থেকেই হয়ে উঠেছে মূলত তথ্যপ্রধান, অনেকাংশেই ইতিহাসধর্মী। বইয়ের প্রথম অংশের মূল্য প্রধানত সাহিত্যমূল্য, আর দ্বিতীয় অংশের মূল্য অনেকাংশেই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দলিলের মূল্য। বইটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়। ভূমিকায় তিনি যথার্থই লিখেছেন, "'বিবিধ বিবস্বান" বইটির পূর্বভাগ-উত্তরভাগ দুই ভাগেরই নিজস্ব আকর্ষণ আছে, যদিও দুই ভাগের আকর্ষণ দুইরকমের। ভরসা করি, অধিকাংশ পাঠককেই বইয়ের পূর্বভাগ আর উত্তরভাগ—কাঁচা আলোর সকাল আর কড়া রোদের দুপুর, দুই-ই সমানভাবে টানবে।' [পৃ ১৪]।

বিবিধ এবং বিচিত্র ধরনের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে এই স্মৃতিচারণে। প্রথম ভাগে পাই লেখকের শৈশব-বাল্য-কৈশোর-প্রথম যৌবনের নানাবিধ টুকরো টুকরো ঘটনার সরস ও সজীব বর্ণনা। কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সক্রিয় কর্মী শ্রী সজল রায়চৌধুরী ছিলেন লেখকের সহপাঠী ও বন্ধু। বাংলায় এম এ পড়াকালীন এই সজল রায়চৌধুরীর কাছেই লেখকের মার্কসবাদে প্রথম দীক্ষাগ্রহণ, আর তার পরিণতিতেই লেখকের কমিউনিস্ট পার্টিতে ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান। উত্তাল চল্লিশ দশকের সে এক ঝোড়ো সময়। এই সময়টাকে ধরা যায় লেখকের এই স্মৃতিচারণে।

লেখকের এই স্মৃতিচারণে উল্লিখিত ও আলোচিত বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে কয়েকটি প্রসঙ্গকে বর্তমান সমালোচকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। আর সেই কারণেই বইটির দ্বিতীয় অংশের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দলিলের মূল্য অনস্বীকার্য। এই রকম একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হচ্ছে ১৯৪৮ সালের অগস্ট মাসের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ও 'যুগান্তর'-এর সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারীদের যৌথ ধর্মঘট-আন্দোলনের প্রসঙ্গটি। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে

রবীন্দ্র ঘোষ 'যুগান্তর' পত্রিকায় অন্যতম সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের অগাস্ট মাসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ও 'যুগান্তর'-এ সংবাদপত্র-কর্মীদের যৌথ ধর্মঘট-আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। এই ধর্মঘট-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ার ফলে অন্যান্য ধর্মঘটিদের মতই শ্রীরবীন্দ্র ঘোষও কর্মচ্যুত হন, তাঁকে সাংবাদিকের চাকরি হারাতে হয়। তাঁর স্মৃতিচারণে এই ধর্মঘট-আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন লেখক (পৃ. ১০৬—১৭, ১২৯), আর এই প্রসঙ্গে সেই সঙ্গেই করেছেন অকপট আত্মসমালোচনাও (পৃ.পৃ. ১১৫ ১২৯)। তিনি অকপটে লিখেছেন, "'যুগান্তর', "অমৃতবাজারের" এত যে শ্রমিকরা আমাদের কথায় ধর্মঘটে যোগ দিয়ে চাকরী হারালো—তারপর সপরিবারে শেষ হয়ে গেল অভাবের গুরুতর আঘাতে জর্জর হয়ে—তাদের কাছে আমরা কি অপরাধী নই? পার্টির একজন হিসাবে দায়িত্ব এড়ান যায় কি? আমরা যারা সেদিন সাংবাদিক ছিলাম কষ্টের মধ্যে পড়লেও বেঁচে রইলাম তো পরবর্তীকালেও—কিন্তু তারা আমাদের উপর, আমাদের পার্টির বক্তব্যের উপর বিশ্বাস রেখে অকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অপরাধ অস্বীকার করা যায় না তো। আর ভুল স্বীকারেই অপরাধ লঘু হয় না।' (পৃ. ১২৯, তৎসহ পৃ. ১১৫)।

আলোচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের মধ্যে আছে নিষিদ্ধ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের প্রসঙ্গ। উত্তর কলকাতার ফড়িয়াপুকুর অঞ্চলে অবস্থিত লেখকের পৈতৃক বাড়িতেই নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির গোপন বৈঠক বসত মাঝে মাঝে। নেতারা যাওয়া-আসা করতেন ছদ্মবেশে। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসাবে লেখকের দায়িত্ব ছিল নেতারা ছদ্মবেশে এলে তাঁদের একে একে বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে পৌঁছে দেওয়া। অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রাদেশিক নেতা নৃপেন চক্রবর্তী সেই গোপন যুগে লেখকের পৈতৃক বাড়িতে আত্মগোপন করেও ছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টি-সংক্রান্ত আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এই স্মৃতিচারণে। তার বাইরে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের মধ্যে আছে জীবিকার প্রয়োজনে লেখকের ঔষধ শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন ঔষধ প্রতিষ্ঠানে চাকরির প্রসঙ্গটি। ৩৩ বছরেরও কিছু অতিরিক্ত সময় বিভিন্ন ঔষধ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছিলেন লেখক। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক কাল তাঁর কেটেছিল সদা ভ্রাম্যমান এক প্রচারকের ভূমিকায়। আর বাকি অর্ধেক সময় তিনি কাজ করেছিলেন

অফিসে বসে। তিনটি দেশী ও একটি বিদেশী সহ মোট চারটি ঔষধ কোম্পানিতে কাজ করেছিলেন লেখক, এই সূত্রে ঔষধ শিল্পের জগৎটাকে তিনি দেখেছিলেন একদম ভেতর থেকে। তাঁর এই স্মৃতিচারণে পাঠকদের এই জগৎটার সঙ্গে বেশ কিছুটা পরিচিতি ঘটিয়েছেন লেখক, পাঠকদের সামনে উন্মোচিত করেছেন এই জগতের শোষণের রূপটিকে। (পৃ.পৃ. ২–৯, ১৬১–৮৭)।

জীবিকার্জনের জগৎ থেকে অবসর গ্রহণের পর লেখক সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন আঞ্চলিক স্তরে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে, আঞ্চলিক স্তরে শান্তি কমিটিগুলি সংগঠিত করার করার কাজে শুরু করেছিলেন সক্রিয় অংশ গ্রহণ। এই স্মৃতিচারণে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে সেই প্রসঙ্গটি (পৃ. ১৯৪-২১৩)। বর্তমান সমালোচক স্মৃতিচারণের এই অংশটিকে আলাদা করে গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। কারণ সংবাদপত্রের টুকরো টুকরো রিপোর্টের বাইরে এই বিষয়টি এতকাল প্রায় অনালোচিতই থেকে গিয়েছিল। শান্তি কমিটিগুলির বিভিন্ন কাজকর্ম এবং অঞ্চলে অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আলোচনার পাশাপশি লেখক এই শান্তি কমিটিগুলিকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা এবং সাধারণভাবে শান্তি কমিটিগুলির কাজকর্মের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির অনীহা এবং শান্তি কমিটিগুলির স্খলনের আলোচনাও তাঁর এই স্মৃতিচারণে এনেছেন।

লেখক বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পর্ক যুক্ত নন, কিন্তু বামপন্থী মতাদর্শে লেখকের বিশ্বাস এখনও অবিচল। আর সেই কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থী রাজনীতির নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি-সুবিধা-বাদ-আপসকামিতা তাঁকে দুঃখ দেয়, একজন একনিষ্ঠ বামপন্থী হিসাবে তাঁকে বাধ্য করে এগুলির সমালোচনায় লেখনী চালনা করতে। লেখক বিশ্বাস রাখেন আত্মসমালোচনার উৎকর্ষে। একই সঙ্গে লেখকের এখনও অবিচল বিশ্বাস সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে, বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়লাভে। দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি লেখেন, 'সমাজবাদে আমি বিশ্বাস ত্যাগ করতে প রি না—পারছি না।' (পৃ. ২২৭)। তাঁর লেখায় ধ্বনিত হয় এই আশা, এই বিশ্বাস—'আমরা আর আমার ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের লোকেরা অপেক্ষা করে থাকবো সেদিনের, যেদিন ঘুরে দাঁড়িয়ে বঞ্চিত মানুষেরা অশান্তি দূর করবে সারা পৃথিবী থেকে—সমাজবাদী ব্যবস্থায় যত্নে সাজাবে বসুন্ধরাকে।' ('নিবেদন,' পৃ. [৯])।

এই স্মৃতিচারণে ধারাবাহিকতার অভাব আছে। স্মৃতিচারণ যেহেতু কখনই

সঠিক অর্থে ইতিহাস নয়, সুতরাং ধারাবাহিকতার এই অভাব স্মৃতিচারণে থাকতেই পারে। তবে ধারাবাহিকতা আরও একটু সতর্কভাবে রক্ষিত হলে এই স্মৃতিচারণের মূল্য বাড়ত বই কমত না। সন–তারিখের ক্ষেত্রে কয়েকটি ত্রুটি চোখে পড়ল। সেগুলি মুদ্রণ প্রমাদ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে পৃ [১০]–এ দেওয়া উল্লেখযোগ্য সংশোধনের সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই ত্রুটিগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এই ত্রুটিগুলি স্মৃতিচারণটির গ্রহণযোগ্যতাকে কোনওভাবে ক্ষুণ্ন করছে না বলে সেগুলির আর আলাদাভাবে উল্লেখ করলাম না।

সমালোচক হিসাবে এই স্মৃতিচারণটির গুরুত্ব বিচারে এর বহুল প্রচার কামনা করি।

অমিতাভ চন্দ্র

বিবিধ বিবস্বান ॥ রবীন্দ্র ঘোষ ॥ প্রকাশক : নীলিমা ঘোষ, কলকাতা ॥ পরিবেশক : প্যাপিরাস ॥ ২. গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৪ ॥ মার্চ, ১৯৯৪ ॥ পৃ.পৃ. ১৬+২০২ ॥ মূল্য : ষাট টাকা

সাহিত্য আলোচনার নানাদিক

সাহিত্য পাঠের ক্রমপ্রসারণের সঙ্গে সাহিত্য-বিচারের নানা পদ্ধতি ও প্রকরণ অনিবার্যভাবেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রকৃত সাহিত্য-জিজ্ঞাসুদের কাছে নান্দনিক অভিজ্ঞতা কখনোই সমাজ-মনস্কতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ক্রিয়া হতে পারে না। আজকের দিনের যে-কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য সমালোচনা এই যুগ্ম অভিজ্ঞতার ভাষ্য রচনায় দায়বদ্ধ থাকবে বলে যেমন ধরে নেওয়া যায়, তেমনি তারই পাশাপাশি সাহিত্যের প্রকরণগত বিচিত্রতা ও অভিনবত্বকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে তাও স্বতঃসিদ্ধ ভাবা হয়। অধ্যাপক রমেন্দ্রনারায়ণ নাগের 'শূন্যের সজ্জা' সমালোচনা-বইটি পাঠের প্রবেশ-লগ্নে এমনতর প্রত্যাশা জাগতে পারে। তবে, এ গ্রন্থটি এ-ধরনের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে চায়, তা পরবর্তী পর্যায়েই নির্ণীত হবে।

অধ্যাপক নাগ তাঁর সমালোচনা-সংকলনটি বিষয় বৈচিত্র্যে-সজ্জিত করেছেন। মঁতেনের নিবন্ধ-সাহিত্যের সমীক্ষা এই গ্রন্থের আরম্ভের রচনা আর শেষ প্রবন্ধ আমেরিকার সাময়িক পত্রিকার তালিকা-গ্রন্থন। নানা বিষয় নিয়ে লেখক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি এই বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি বেশ কয়েকটিতে ক্লাশরুমের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর দায় শনাক্ত করা যায় অন্য কয়েকটিতে তথ্য সন্নিবেশের তাগিদ অগ্রাধিকার পেয়েছে। কয়েকটি রচনায় শিল্প সাহিত্যের কিছু মূল সমস্যা, প্রবণতা, বিতর্ক সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অভিনিবেশ ও আগ্রহ প্রকটিত।

ছাত্র-স্বার্থের প্রয়োজনে রচিত প্রবন্ধ হিসেবে যেগুলিকে আমরা ধরে নিতে পারি সেগুলি হল : 'সাহিত্যের একদিক ও মঁতেন', 'কাব্যনাট্য ও মালিনী,' 'মালিনী এবং গ্রীক নাট্যকলা', 'নীলচাষ সম্পর্কে জেমস লঙ-এর দুষ্প্রাপ্য সংকলন, 'নীলদর্পণ-কী ট্র্যাজেডি,' নীল দর্পণের সংলাপ" হাসির ছটা, চোখের জল : নীলদর্পণ'। Personal Essay বা ব্যক্তিনিষ্ঠ রচনার আদিগুরু মঁতেনের জীবন ও শিল্পের একটি দ্রুত-পঠন রচনা 'সাহিত্যের একদিন ও মঁতেন'

মন্তেনের রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা নির্ণয়ে কোনো মৌলিকতা বা নতুন মাত্রা সংযোজনার প্রয়াস এখানে নেই, এ-কথা অনায়াসেই বলা যায়, তবু জানা কথা এক সপ্তে পাওয়া গেলে যাঁদের শিরে সংক্রান্তি তাঁদের উপকার হয়। সে উপকারে এই নিবন্ধ লাগতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যের দিকপাল রসজ্ঞ লেখক চার্লস ল্যাম্বের ওপর মন্তেনের প্রভাবের প্রসঙ্গ শুধু ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে—বিশদে আলোচনা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের-নাটকের ওপর দু'টি প্রবন্ধ 'কাব্যনাট্য ও মালিনী' ও 'মালিনী ও গ্রীক নাট্যকলা' আমাদের আগ্রহকে উদ্দীপিত করে, কিন্তু এই দুই বিষয়ে বিহঙ্গ-দৃষ্টি সমীক্ষা আমাদের মন ভরাতে পারে না। কাব্যনাট্যের প্রকৃতি বিচারের ক্ষেত্রে মৌল সূত্রগুলি লেখক তুলে ধরেছেন, কিন্তু প্রসঙ্গের গভীরে যান নি। দেশীয় ভার্স নাটকের ঐতিহ্য ছেড়ে পাশ্চাত্ত্যের পোয়েটিক ড্রামার আদর্শে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনা কিভাবে এসেছিল প্রথম প্রবন্ধে তার পর্যালোচনা অনুপস্থিত। কবি রবীন্দ্রনাথের নাট্য-ভাবনায় মাইমেসিস প্রক্রিয়ার মূল কথা বাস্তবের অনুপুঙ্খ প্রতিবিম্বন নয়, সৃজনশীল সৃষ্টির আলোকে তার ব্যাখ্যানমূলক চিত্রণ। নাটক ও কবিতা এখানে এক অবিভাজ্য অভিজ্ঞতা। প্রবন্ধটিতে এ-বিষয়ে আরো আলোচনা কাঙ্ক্ষিত ছিল। 'মালিনী' নাটকে রূপকল্পের ব্যবহারে নাট্য-সংহতি সৃষ্টির কাজ কেমন করে সম্পন্ন হয়েছে, সে-দিকটি এ-রচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু কাব্যনাটকের সামগ্রিক পট ও প্রকরণের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিবন্ধটিতে পরিস্ফুট হয়নি। এ-কথা লেখকের পরবর্তী প্রবন্ধ 'মালিনী ও গ্রীক নাট্যকলা' প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। গ্রীক-নাটকের গঠন-কারুত্বের সঙ্গে 'মালিনী' নাটকের কাঠামোগত সাদৃশ্য প্রতীয়মান করাই এ-রচনার উদ্দেশ্য। গ্রীক নাটকের আরও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 'মালিনী'-তে কিভাবে বর্তেছে তা প্রবন্ধকার দেখাতে চেয়েছেন রেখার টানে, গূঢ় বিশ্লেষণে নয়। বিষয়টি কিন্তু আরো বিশ্লেষণ দাবী রাখে।

'নীলদর্পণ' নাট্য-সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি যতটা তথ্যভিত্তিক ততটা মৌলিক নয়। বাংলা সাহিত্যের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকর্ম সম্পর্কে সমালোচনা-ধারার প্রবহমানতা প্রত্যাশিত, নিছক পৌনঃপুনিকতা নয়। 'নীলদর্পণ'-কে ঘিরে রমেনবাবুর একাধিক রচনায় পৌনঃপুনিকতার স্বাদ পাওয়া গেছে। নীলদর্পণ ট্র্যাজেডি নয়, বিষাদের নাটক। এ-প্রশ্নের উত্তর মেলাতে স্নাতক পর্যায়ের

পরীক্ষার্থীরা মধ্য-রাত্রের ঘুম কামাই করে বহুদিন ধরে শ্রম করে থাবেন। তাহলে একটা গোটা নিবন্ধ লিখে সেই পুরনো ছককে আলোচনা আবার কেন ?

'নামায়ন' নিবন্ধটি মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো। দেশ-বিদেশের গ্রন্থের নামকরণে যে বিচিত্র প্রেরণা ও প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রায়োগিক কারুত্ব কাজ করে সেগুলির একটি বিশ্লেষণাত্মক তালিকা এখানে উপস্থাপিত। রচনাটি পরিশ্রমী ও আলোকসম্পাতী। ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে পাঠক সতীনাথ ভাদুড়ীর নিবিড় আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা, বাংলা-সাহিত্য ও সাহিত্যিকারদের ওপর ফরাসী সাহিত্যের অভিসংঘাতের প্রশ্নে সতীনাথের বিশেষণ 'ফরাসী সাহিত্য ও সতীনাথ' প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। সতীনাথের বক্তব্য ও মন্তব্যের সার-সংকলনে এ-রচনার নির্মাণ, সতীনাথের তত্ত্ববিশ্বে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব প্রদর্শন এর উদ্দিষ্ট নয়। 'বাংলাদেশের ব্যঙ্গ কবিতা' নিবন্ধ এক ঝলক নতুন আস্বাদ দিয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো, ঐতিহাসিক পরম্পরা, কালের দাবী ইত্যাদির প্রভাবে বাংলাদেশী কবিতায় কিভাবে ব্যঙ্গ-প্রবণতা বিধৃত ও বিবর্তিত হয়েছে, তাঁর রেখাচিত্র নিবন্ধটিতে মুদ্রিত। 'বাণীভঙ্গী'-র বিশিষ্টতার কেমন করে এগুলি কবিতা হিসেবে গ্রহণীয় ও উপাদেয় হয়ে উঠতে পারে, এ-প্রবন্ধে তার কিছু উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে কবিতার নন্দনের অন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে কবি জীবনানন্দ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রেরণা ও প্রয়োগের প্রামাণ্য রচিত হয়েছে 'জীবনানন্দর কবিতার সমাজতত্ত্ব' 'যেকোন জন্মই রক্তাক্ত' ও বুকের মধ্যে সেই অমল-নকসা' প্রবন্ধ ত্রয়ে। ঔপনিবেশিক পটভূমিতে শহর ও নগরের সমাজ-বাস্তবতায়, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও শোষণের চালচিত্রে জীবনানন্দের যে-সব প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা জন্ম নিয়েছে, সেগুলির প্রকৃতি বিচারে প্রাবন্ধিক প্রবেশ করতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জীবনানন্দের কবিমানসকে স্পন্দিত করেছে। প্রত্যয়ের ভিত্তিকে তিনি কবির সুচেতনায় দৃঢ়-মূল করে নিতে চেয়েছেন, অতীতের স্মৃতিকে উজ্জীবিত করেছেন 'অম্লান অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা'-র এষণায়। স্বদেশ ও সমসাময়িককালের চিহ্ন জীবনানন্দের কবিতায় অনায়াসে যে মুদ্রিত সে-পর্যবেক্ষণে রমেনবাবু সফল, কিন্তু জীবনানন্দের কবিকৃতির মূল্যায়নে তাঁর রীতি সংবাদ-প্রতিবেদনের লক্ষণধর্মী। কবির তত্ত্ববিশ্বে আরো অন্তর্ভেদী আলো ফেলার প্রয়োজন নেই কি ?

'যেকোনো জন্মই নিবন্ধ প্রতিবাদী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রক্ত ও স্বেদে ভেজানো কাব্য-স্বরূপের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা। কবির বিশ্বাস ও

বক্তব্যে এমন এক স্বকীয় জোর আছে, যা পাঠককে তীব্রভাবে আলোড়িত করে। জন্মভূমির সঙ্গে যে শিকড়ের টানে তিনি যুক্ত তাই তাঁর সমাজ-মনস্ক কবিতাকে ঋজু ও তেজী করেছে। তাঁর কবিতা কদাচ অবলিক নয়, ডিরেক্ট কবিতা রচনাই তাঁর শৈলীর বৈশিষ্ট্য। রমেনবাবু যথার্থভাবেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যপ্রেরণাকে কবির নিজের ভাষায় তুলে ধরেছেন : "কবিতা লিখতে হলে মানুষের কথা মানুষেরই কথা চেতনায় নিতে হয় রক্ত নিতে হয়।" কবি হিসেবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যয়ের অঙ্গীকারকে, তাঁর কবিতার বিষয়গুলিকে আলোচক দায়িত্ববোধের সঙ্গে বোঝাতে চেয়েছেন।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে নিয়ে লেখা নিবন্ধ 'বুকের মধ্যে সেই অমল নকসা' চল্লিশ দশকের এই কবিকে একনজরে বুঝে নিতে সাহায্য করে। স্ব-সময় ও স্বকাল নানা ক্ষতে কবিকে বিদ্ধ করলেও কোনো নেতিবাদের শিকার হওয়া তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাঁর বাক্-প্রতিমা স্মৃতির টান ও চাপে যেমন বাজায়, তেমনি বাস্তব-নিষ্ঠ স্বপ্নের নকসায় উজ্জ্বল। চল্লিশের বাংলা কবিতার বিশিষ্ট প্রতিনিধি কিরণশঙ্করের কাব্যভাষার সহজিয়া সুর ও সাবলীল ছন্দ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে আলোচক কোনো বিশেষণে যান নি, তাঁর পুরো ঝোঁকটাই থেকেছে কবিতার বিষয়গত আলোচনায়।

'বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গ : সার্ত্রের বক্তব্য' প্রবন্ধ সার্ত্রের সাক্ষাৎভিত্তিক আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ। সার্ত্রের নিজস্ব চিন্তার আলোকে এই দুই প্রসঙ্গে কিছু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রচনাটিতে উপস্থাপিত। বুদ্ধিজীবীর চরিত্রের মৌলিক দুই উপাদান হিসেবে সার্ত্র সর্বজনীনতা ও সংস্কারকামিতাকে নির্দেশ করেছেন। এই দুই উপাদানের ব্যাখ্যায় রমেনবাবু নিজের শক্তি খাটাতে চেয়েছেন, কিন্তু রচনাটিকে প্রাঞ্জল করতে পারেন নি। সমগ্র প্রবন্ধটিতে সাঙ্গীকরণের অভাব লক্ষণীয়। 'অন্তর্চেতনা প্রবাহের গদ্যশিল্পী' প্রবন্ধে রমেনবাবু চেষ্টা করেছেন ইংরেজী সাহিত্যে এই বিশেষ আঙ্গিকের দিক্‌পাল, ঔপন্যাসিক জেমস্ জয়েসের শিল্পরীতির সঙ্গে বাঙালী-পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে। প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু বিষয়টি সামগ্রিক বিচার কেন পেল না, সে প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। চেতনা-প্রবাহ রীতির ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে জেমস্ জয়েস নিশ্চিতভাবেই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও তাঁকে নিয়ে আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু এই শিল্প-শৈলীর চর্চায় ডরোথি রিচার্ডসন ও ভার্জিনিয়া উলফের কৃতিত্বপূর্ব অবদান অনুল্লিখিত কেন? জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহ রীতির ব্যবহারের পুঙ্খানু

১পদ্ধ্য বিশেষণে নিবন্ধ-রচয়িতা যে পরিশ্রমী প্রয়াস করেছেন, তা পাঠককুলের নজর কাড়তে বাধ্য। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে চেতনা-প্রবাহ-রীতির অনুশীলনে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগের প্রসঙ্গ খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হতে পারত। এই উল্লেখ থাকলে বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে ইংরেজী উপন্যাসের যোগসূত্র প্রতিক্ষেত্রে কিভাবে অবিচ্ছেদ্য রয়েছে রয়েছে তা প্রকটিত হোত।

'ঈশ্বর এবং ট্র্যাজেডি" নিবন্ধ ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে ট্র্যাজেডির অন্বয়-ক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচা। ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট ট্রাজিক নাটকগুলিতে নাটকগুলিতে ও গ্রীক ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রেরণা ও পরিবেশ কিভাবে ট্র্যাজেডির ন্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে সে-বিষয়ে ইংরেজিতে রচিত সমালোচনা-ধারার অনুসারী এই নিবন্ধটি পাঠককে আকর্ষণ করবে। সমালোচক H.D.K. Kitto ধর্মীয় নাটকের চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বলেছেন : "a form of drama in which the the real f cus is not the Tragic Hero but the divine backg-round ("Form and Meaning in Drama,") তাঁর বিচারে 'হ্যামলেট' ধর্মীয় নাটক হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এই সংজ্ঞার আলোকে রমেনবাবু সেকস্-পীরিয় ট্র্যাজেডির বিশ্ববিধান সূত্রের অনুসন্ধানে মনোযোগ দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সমালোচক Kitto-র নাম উল্লেখ করেন নি। সঙ্গত-কারণেই বার্নড শ'-এর 'সেন্ট্ জোন ও টি. এস. এলিয়টের মার্ডার ইন্ দ্য ক্যাথিড্রেল 'আলোচিত হয়েছে।

'গণনাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল : একটি অধ্যায়,' 'বুদ্ধিজীবীদের কাল শেষ হল' প্রবন্ধ দু'টির প্রথমটিতে তথ্যের ভার আছে, দ্বিতীয়টিতে লেখকের সাবজেকটিভ প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটেছে।

'আমলাতন্ত্র ও মানবিক অস্তিত্ব নিবন্ধে ফ্রান্ড কাফকার 'দি ট্রায়াল' উপন্যাস সম্পর্কে একটি সমীক্ষামূলক বিশ্লেষণ আছে। ব্যক্তির বিবিক্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিল বাস্তবের টানাপোড়েন নিয়ে এই উপন্যাসের নির্মিতি। লেখক হিসেবে কাফকার দায়নির্বাহের প্রয়াস ও পদ্ধতি রমেনবাবু নিবন্ধটিতে বোঝাতে চেয়েছেন। কতকগুলি গ্রন্থ-সমালোচনা এই বইটিতে গ্রথিত হয়েছে। এই রচনাগুলি সমালোচক হিসেবে অধ্যাপক নাগের সামর্থ্য ও দুর্বলতার পরিচয় বহন করছে। 'পাশ্চাত্তোর লিটল ম্যাগাজিন,' 'মিল্টন গেজেটিয়ার লিখেছিলেন' ও 'আমেরিকার সাময়িক পত্রিকা' প্রবন্ধগুলির পিছনে শ্রম ও অন্বেষণ কাজ করেছে, কিন্তু তেমন

কোনো বিশ্লেষণী মনোভঙ্গি ক্রিয়াশীল নয়। অবশ্য এ-রকম প্রচেষ্টার গুরুত্বও যথেষ্ট আছে, কারণ অনেক গবেষণার পথ-উন্মুক্ত করতে এইসব রচনার উপযোগিতা আছে।

অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ নাগের বহু শাখায়িত সাহিত্য-সমালোচনার বিছু নিদর্শনের মুখোমুখি হয়ে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নানাবিধ নান্দনিক ও সামাজিক চিন্তার প্রক্ষেপ তাঁর ওপর পড়েছে। এগুলির সাঙ্গীকরণেই সমালোচকেরে কেন্দ্রীয় অবস্থান গড়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং তখনই তাঁর 'পয়েন্ট অব্ ভিউ' স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। সমালোচকের এ-জাতীয় দায় সম্বন্ধে রমেনবাবু কি ভাবেন? প্রকরণগত বিচারের ক্ষেত্রে রমেনবাবু যে কতটা আগ্রহী সে-ব্যাপারে নিবন্ধগুলি পাঠের পর আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে নি। এ প্রসঙ্গটিও তাঁর মনোযোগ পেতে পারে।

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

শূন্যের সংজ্ঞা। রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ। পুস্তক বিপণি। কলকাতা-৯

"জেলের ভিতরে ফুল নেই"

এই সংকলনটি হো চি মিন, নাজিম হিকমত, হাওয়ার্ড ফাস্ট, লুই আরাগঁ, বের্টল্ট ব্রেখট প্রমুখ কবিদের রচনাসংগ্রহ। অনুবাদ করেছেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ কবি। সাহিত্যের প্রথম পাঠ নিতে গিয়ে আমরা শিখেছিলাম, দেশপ্রেম নিয়ে কবিতা হয় না। এরকম আরো কিছু কিছু নিয়ম, ক্রমে অনুভব করেছি, শিখতে হয় শুধু তাদের ব্যাতিক্রমগুলিকে বোঝবার জন্যেই। যেসব রচনা এই নিয়মের ভিতরে পড়ে তাদের নিয়ে সাহিত্য-পাঠকের কোনো সমস্যা নেই। যেসব রচনা এই নিয়মকে ভেঙে বেরোতে পারে সেগুলোই তার ঔৎসুক্যের বিষয়।

দেশপ্রেম নিয়ে বিখ্যাত রচনা অনেক হয়েছে, তাদের কোনো পঙক্তি জন-সাধারণের মুখের ভাষারও অন্তর্গত হয়ে গেছে, কিন্তু কবিতা হয় নি—এমন বহু, পংক্তি আমরা ভাবলেই মনে করতে পারি। 'আবার, আবার সেই কামানগর্জন,' 'দাঁড়াবে দাঁড়াবে ফিরে দাঁড়াবে যবন,' 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি'

'আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে', 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই,' —এইসব একদা বিখ্যাত পংক্তি, আধুনিকতায় দীক্ষিত পাঠকের মনে ঈষৎ ক্লান্তি ছাড়া আর কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করে না। কারণ এখন আমরা নিঃসংশয়ে বুঝে গিয়েছি যে 'দেশ' মূলত একটি রাজনৈতিক ধারণা এবং রাজনীতি মূলত একটি ব্যবসায়িক ধারণা। মানুষের মৌল মূল্যবোধ-সমূহের সঙ্গে এইসব ধারণার সম্পর্ক আদৌ অবিচ্ছেদ্য নয়।

কিন্তু হঠাৎ সামনে আসে একেকটি কবিতা, যা সরকারিভাবে দেশপ্রেমের কবিতা হলেও ফুৎকারে অতিক্রম করে চলে যায় দেশকালের রাজনৈতিক ধারণাকে, হয়ে ওঠে সর্বদেশের মানুষের সর্বকালের সম্পদ। একজন কবি সহসা লিখে ওঠেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।' এ-গানে যা আছে তা পৃথিবীর বিশেষ কোনো ভৌগোলিক অংশের নিরর্থক বন্দনা নয়, একটি বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠতায় গর্ববোধ বা হীনতায় গ্লানিবোধের কথা এখানে নেই। এখানে যা আছে তা মানুষের চিরকালীন ভালো-লাগার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ গানের কথাকে সামান্য বদলে নিয়ে সহজেই গাওয়া যায়, "আমার সোনার বলিভিয়া / আমি তোমায় ভালবাসি'—বা 'আমার সোনার নাইজেরিয়া / আমি তোমায় ভালবাসি।' দেশপ্রেমের সারাৎসার বিধৃত হয়ে আছে এই গানে। যে-কোনো মানুষ যেখানে জন্মেছে, যেখানে বড় হয়ে উঠেছে, যেখানকার ভাষা তাকে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা দিয়েছে সেই স্থানটি তার দ্বিতীয় মাতা। তাকে সে মায়ের মতোই ভালবাসে, সে স্থান মরু হোক বা মেরু হোক, হোক নগময় বা নদময়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় সেই জায়গাটি তার কাছে অধিক প্রিয় হবেই। আর সেই কবিতাই সার্থক দেশপ্রেমের কবিতা, যে-কবিতায় যে কোনো মানুষ তার নিজের দেশকে বিম্বিত হতে দেখবে, নিজেকে বিম্বিত হতে দেখবে। অর্থাৎ শিল্প-সৃষ্টির প্রথমতম নিয়মটি দেশপ্রেমের কবিতা সম্পর্কেও সমানভাবে প্রয়োজ্য—যে শিল্প নিজের দেশকালকে যত বেশি ছাড়িয়ে যেতে পারে, সেই শিল্প তত বড় শিল্প।

তেমনি, নিজের দেশের স্বাভাবিক স্থৈর্যকে অত্যাচারী শাসকের সদম্ভ পদপাতে সহসা উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে দেখলে, অত্যাচারের প্রতিকারহীন যূপে স্বয়ং আবদ্ধ হলে, যে-কোনো সংবেদনশীল মানুষের প্রতিবাদ প্রকাশের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হল ভাষা। আর সে ভাষা তখনই সার্বজনীন হয়ে ওঠে, সর্বগ হয়ে ওঠে যখন

তার মধ্য দিয়ে প্রাণ পায়—সেই বিশেষ মানুষটি বা বিশেষ দেশটির উপর অত্যাচারীর দুষ্ক্রিয়া নয়, নির্যাতিত মানবাত্মার চিরকালীন ক্রোধ, চিরকালীন ক্রন্দন, বন্ধনস্খলনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের চিরকালীন আকুতি। তখনই তা হয়ে ওঠে সত্যকার প্রতিবাদের কবিতা, যে-কবিতা চিরকাল মানুষকে উন্মুখ করে তুলবে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে নয়, শাশ্বত স্বাধীনতার দিকে, অত্যাচারহীন, শ্রেণীহীন সমাজের দিকে—যা আবহমান মানবস্বভাবের এক মৌল ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সুবীর ভট্টাচার্য আমাদের এমন একটি সংকলন উপহার দিয়েছেন যা এই শর্তগুলিকে বহুলাংশে পূরণ করে। এ-বইয়ের সবগুলি কবিতা কারান্তরালে বসে রচিত নয়, কিন্তু তাতে এসে যায় না কিছু। 'জেলখানা' শব্দটিকে একটু বড় অর্থে সহজেই গ্রহণ করতে পারি আমরা। যেখানেই শাসনব্যবস্থা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিকূলে পরিচালিত হচ্ছে, এবং তাদের প্রতিবাদকে দমন করে রাখা হচ্ছে বাহুবলের উলঙ্গ প্রয়োগে—সেখানে পুরো দেশটাকেই জেলখানা বলে ভাবতে বাধা কোথায়, আজকের ভারত বা চিলি বা নিকারাগুয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক ম্যান্ডেলা পর্বে জেলখানার চাইতে কি খুব বেশি স্বাধীনতা পাওয়া যায়? এ বইয়ে সংকলিত অধিকাংশ কবিতাই সেই সুরের, যেখানে বন্দী চিরকালের কবির ভাষা সকল বন্দীর ভাষা হয়ে উঠেছে:

বিনিদ্র রাত

নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত রুদ্ধ জেলঘরে
লিখেছি শতেক পদ্যে কাকে বলে দাস
প্রতিটি শ্লোকের শেষে কলম থামিয়ে
গরাদের বাইরে দেখি স্বাধীন আকাশ।

রচনা: হো চি মিন
অনুবাদ: শঙ্খ ঘোষ

হাতিয়ার

তোমার আছে বন্দুক
আর আমার, ক্ষুধা।
তোমার আছে বন্দুক
কারণ আমার আছে ক্ষুধা।

তোমার আছে বন্দুক
আর তাই আমার আছে ক্ষুধা।
থাকুক তোমার বন্দুক
থাকুক তোমার হাজার বুলেট, এমন কি আরো একহাজার
তুমি সব খরচ করে ফেলতে পারো আমার বেচারা শরীরে
তুমি আমায় খুন করতে পারো একবার দুবার তিনবার
দুহাজারবার, সাতহাজারবার,
কিন্তু শেষটায়
আমার কিন্তু চিরকাল তোমার চেয়ে বেশি হাতিয়ার থাকবে
যদি তোমার থাকে বন্দুক
আর আমার
কেবল ক্ষুধা।

রচনা : অটো রেনে কাস্তিইয়ো
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন, ইচ্ছে করলে অনেক তোলা যায়। 'জেলখানার কবিতা' 'যে-বইয়ের নাম' তাতে জেলখানার বাইরে রচিত একগুচ্ছ কবিতা কেন যোগ করা হল; বইটির পরিকল্পনা ও প্রকাশ যে হো-চি-মিন এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, নাম দেখে তা বোঝবার উপায় নেই কেন; সাম্প্রতিককালের আগেও জেলখানা গিয়ে অনেক স্মরণীয় কবিতা রচিত হয়েছে—তার থেকে কিছু রচনা গৃহীত হল না কেন; আরো কিছু অসম্পূর্ণতা বিষয়ে সম্পাদক স্বয়ংই যে সচেতন তা তাঁর ভূমিকা থেকেই স্পষ্ট। কিন্তু অসম্পূর্ণতার কথা থাক। আজকের এই অশুভ ছায়ায় অন্ধকার সময়ে, সারা পৃথিবী যখন সন্ত্রাস ও পাশবতার পায়ের কাছে শূলবিদ্ধ শূকরের মতো কাঁপছে, তখন এই বইটি অন্তত তাৎক্ষণিকভাবেও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এ জীবনে ক্ষুধা আর শ্রম ছাড়া আরো কিছু আছে, সর্বমানবের মুক্তির চিন্তা যতই অলীক হোক, অন্তত কবিদের স্বপ্নে আছে মুক্তির মুহূর্ত।

•

সমীর সেনগুপ্ত

জেলখানার কবিতা। সংকলক : সুবীর ভট্টাচার্য। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩। দাম-৩০ টাকা

শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক দল

দেশের মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ও শ্রম রাজনীতি প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের শেষ দশকে, ১৯৩৭–৪৭ এর দশক ছাড়া আর কখনো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কিম্বা অসহযোগে শ্রম রাজনীতি স্পর্শকের মতো মাঝে মাঝে সেই আন্দোলনকে ছুঁয়ে গেছে, কখনো তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় নি। আর ১৯৩৭–৪৭ কাল পর্বে শ্রম রাজনীতির সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সংযোগ স্থাপিত হয়ে ছিল রাজনৈতিক দল সমূহের সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগে শ্রমিক শ্রেণী, তাদের সংগঠন ও শ্রম রাজনীতির নিজস্ব তাগিদের কারণে নয়। নির্বান বসুর 'দি পোলিটিকাল পার্টিজ্ এ্যান্ড দি লেবার পলিটিকস ১৯৩৭–৪৭' শীর্ষক বিশিষ্ট গবেষণা গ্রন্থের এটাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

নির্বান সারা ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রম রাজনীতি তাঁর আলোচনার সামগ্রিক পটভূমি রূপে গ্রহণ করলেও, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্তস্থল হিসাবে গ্রহণ করেছেন অবিভক্ত বাংলার সেই অস্থির কাল পর্বকে যেখানে জাতীয় রাজনীতির নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের টানাপোড়ন চলেছিল মীমাংসার সূত্র খুঁজতে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন সেই সংঘাতে শ্রমিক শ্রেণীও নিজেকে সব সময়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় নি এবং পারেও নি, যদিও রাজনৈতিক বিষয়ের চেয়ে নিজেদের অর্থ-নৈতিক দাবি দাওয়া আদায়ে তাদের আন্দোলন ও লড়াই করার আগ্রহ ছিল বেশি। এই দৃষ্টিকোণ নির্বান খোলা মনে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই তুলে ধরেছেন, পূর্ব নির্দিষ্ট কোন ধারণার সমর্থনে তথ্য সংগ্রহের সূত্রে নয়। ফলে নির্বানের গবেষণায় এই দশ বছরের শ্রম রাজনীতির একটা বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যা আমাদের অনেক পরিচিত ধারণার সঙ্গে মেলে না।

ভারতে জাতীয় আন্দোলন আর শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ পর্ব প্রায় সম সাময়িক। জাতীয় আন্দোলন যেমন গোড়ায় চেয়েছিল শাসন সংস্কারের মাধ্যমে কিছু সুযোগ সুবিধা, শ্রমিকরাও তেমনই সচেষ্ট ছিল আন্দোলন ও ধর্মঘট করে নিজেদের আর্থিক কিছু দাবি আদায় করতে। ফলে এই দুটি আন্দোলনে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর কেবল লক্ষ্য পূরণের তাগিদে কাছাকাছি আসা কিম্বা এক হয়ে

যাওয়ার কোন তাগিদ ছিল না। বঙ্গভঙ্গে তার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটে নিতান্ত স্বল্প-কালের জন্যে। দেশের রাজনীতিতে তখন বাংলা ছিল মুখ্য দেশের রাজধানী রূপে, অর্থনীতিতেও বাংলা অগ্রগণ্য শিল্প বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে। তবু রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলন তখন যে মিশে যায় নি তার সম্ভাব্য কারণ হলো তৃণমূলে রাজনীতি নিয়ে যাওয়ার কোন মানসিকতা ছিল না। সেটা ছিল ইংরাজী শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে আবদ্ধ। আর শ্রমজীবীরা যে তৃণমূলের সঙ্গে জীবন যাপন প্রক্রিয়ার জন্য যুক্ত ছিল, সেখানে অর্থনৈতিক বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের বিশেষ কোন অভিঘাত ছিল না। রাজনীতি তাদের জীবনকে তখন স্পর্শ করে নি আদৌ।

তা ছাড়া যে বাংলাদেশকে নির্বান বিশ্লেষণ করেছেন সেই দেশে শ্রমিকরা ছিল মূলতঃ বহিরাগত, অবাঙালি। এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতির সঙ্গে তাদের কোন যোগ ছিল না। রোজগারের ধান্দায় কলকারখানায় কাজ করতে আসা এই অবাঙালি শ্রমিকদের প্রাণের টান থাকতো বিহার, ওড়িষ্যা ও যুক্ত প্রদেশের সেই সব অঞ্চলের সঙ্গে যেখানে তাদের পরিবার পরিজন বাস করে। বাংলার শ্রমজীবীরা মূলতঃ ছিল কৃষি ও নানা ধরণের বৃত্তিজীবী। জমি ও সামাজিক বাস্তবতা ও সংস্কার-সংস্কৃতির কারণে কল কারখানায় মজুর হয়ে থাকা তাদের কাছে জীবিকা অর্জনের একটা গ্রহণ যোগ্য বিকল্প বলে মনে হয় নি। তাই যে নাড়ীর টানে বাঙালি জীবনের সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে থেকেছে সেই একই ধরণের নাড়ীর টানে বাংলার শিল্পাঞ্চলে কর্মরত অবাঙালি শ্রমিক নিজের প্রাদেশিকতা বজায় রেখেছে, বাংলার আন্দোলন ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয় নি। বাংলার প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে রাজনৈতিক চেতনার মান নীচু থাকার জন্যে এখানে বসবাসকারী অবাঙালি শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অনীহা বজায় থেকেছে স্বাভাবিকভাবেই। পক্ষান্তরে যখনই কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে জনচিত্ত আলোড়িত হয়েছে তখনই এই অরাজনৈতিক শ্রমিক শ্রেণী সীমিতভাবে হলেও তাতে সাড়া না দিয়ে পারে নি।

প্রাসঙ্গিক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গোড়ার দিকে বেশ কয়েক দশক ধরে শ্রমিক আন্দোলন ছিল অসংগঠিত এবং নিয়মিত কার্যকর নেতৃত্বহীন। শ্রমিকরা নিজেদের তাগিদে আন্দোলন করতো এবং পরে মালিকদের সঙ্গে দর কষাকষির জন্যে বাইরে থেকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কারো সাহায্য নিত। এই ভাবেই শ্রমিকদের সঙ্গে আন্দোলন চলাকালে বহিরাগত কিছু ব্যক্তির যোগাযোগ

ঘটে যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের নিয়মিত নেতৃত্বের অংশ ছিলেন না। বাংলার রাজনৈতিক নেতারাও নিজের থেকে শ্রমিকদের আন্দোলনে যুক্ত হতে চাননি এবং পারেন ও নি। নির্বান এখানে পুনার শ্রমিকদের লোকমান্য তিলককে রাজশক্তি গ্রেপ্তার করার পর স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটের উল্লেখ করেছেন। সেই ধর্মঘট ছিল রাজনৈতিক। বাংলায় এই ধরনের কোন আন্দোলন সেই সময়ে বা তার পরেও বাঙালি কোন নেতার সমর্থনে ঘটে নি। নির্বানের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় পুনায় মরাঠি শ্রমিকদের মধ্যে তিলকের ব্যক্তিগত প্রভাব যথেষ্ট ছিল বলেই সেখানে শ্রমিক শ্রেণী প্রতিবাদী হয়েছিল। কিন্তু বাংলায় মূলতঃ অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে কোন বাঙালি নেতার অনুরূপ প্রভাব ও জনপ্রিয়তা না থাকায় অন্ততঃ এই প্রদেশে তেমন কোন রাজনৈতিক ধর্মঘট সম্ভব হয় নি।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে সংগঠিত শক্তি হিসাবে এ. আই. টি. ইউ সি র প্রতিষ্ঠা হয় কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের উদ্যোগে ১৯২০ সালে। দেশের সেটাই প্রথম শ্রমিক সংগঠন। বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে তার পরে বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে, মূলতঃ কমিউনিস্ট ও অন্যান্য কিছু বামপন্থী কংগ্রেস নেতার উদ্যোগে। এই ঘটনার একটা বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। শ্রমিকদের প্রথম সর্ব ভারতীয় সংগঠন গড়ে ওঠে জাতীয় নেতৃত্বের একাংশের চেষ্টায় অর্থাৎ তার তাগিদ আসে উপর থেকে। বিভিন্ন শিল্পে গঠিত শ্রমিক সংগঠনের সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আন্তর তাগিদে এই সর্ব ভারতীয় সংস্থা গড়ে ওঠে নি। এর থেকে অনুমান করা যায় ভারতে শ্রমিক শ্রেণী কেন আজও অসংঘঠিত তার সম্ভাব্য কারণ বোধহয় রয়েছে তাদের শ্রেণী সংগঠনের বিকাশের এই বিশিষ্ট গড়নের মধ্যে। কেন শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকায় দুর্বলতা ছিল এবং আজো আছে, কেন দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের হস্তক্ষেপ কোনদিনই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্ভব হয় নি, হয়তো তারও একটা ব্যাখ্যা এই সূত্রে মিলতে পারে।

বিশের দশক থেকেই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টি শ্রমিক আন্দোলনের উপর পড়লেও এবং কমিউনিস্টরা এ বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা নিলেও তিরিশের দশকের মাঝামাঝির আগে এই সংযোগ খুব নিয়মিত ছিল না। আলোচ্য কালপর্বে তাই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা তথা জাতীয় রাজনীতি ও শ্রম রাজনীতির অভিঘাত বস্তুতঃ একটা সাম্প্রতিক, সূচনা পর্ব কালীন অর্থাৎ প্রাথমিক পর্বের ঘটনা বলেই চিহ্নিত করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় দেশে জাতীয়

মুক্তি ও শোষণ মুক্তির সংগ্রাম যে সমমাত্রিক হয়ে উঠতে পারে নি তারও একটা ব্যাখ্যা হয়তো এই বিশ্লেষণ সূত্রে করা যেতে পারে। তবু একথাও সত্য যে আলোচ্য সময়ে এই দুটি আন্দোলন সমান্তরাল ভাবে গড়ে উঠে কিছুটা আন্তর তাগিদে এমন একটা পরিণতির স্তরে পৌঁছয়, যখন তাদের interaction এবং সীমিত ভাবে হলেও কিছু পরিমাণে পরস্পর নির্ভরতা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নির্বাণ তাঁর আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বিশেষ যত্নে আলোচনা করেছেন। জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য বামপন্থী দল যাদের তিনি সাধারণভাবে ননকনফর্মিস্ট বলে চিহ্নিত করেছেন, যদিও তার ব্যাখ্যা বিস্তারিত ভাবে দেওয়া দরকার ছিল, এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা দলগুলির কথা, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। বাংলার রাজনীতির প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক দলগুলির কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাদের বিভেদপন্থা যা দেশভাগে পরিণত হয়, সেটা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা তাগিদ থেকেই তারা শ্রম রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হয়। তার থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যায় ১৯৩৭–৪৭ কালপর্বে শ্রম রাজনীতি ক্রমেই কতোটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যাকে রাজনীতির একটা বিশেষ ফ্রন্ট হিসেবে সাম্প্রদায়িক শক্তিও ব্যবহার করা দরকার বলে মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা যায় কমিউনিস্ট, বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী দলগুলি সর্বস্তরের শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের কাছে সেদিন এবং আজো পৌঁছতে পারেনি বলেই দেশবিভাগ আটকানো যায়নি এবং শোষণমুক্তি সুদূরে পরাহত হয়ে রয়েছে।

আলোচনায় নির্বাণ শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রম রাজনীতির এই পর্বকালীন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন যা বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করে : প্রথমতঃ, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এই পর্বেই সাধারণ মানুষের মনে সংবেদনশীলতার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। যেমন কংগ্রেস বাংলায় অকংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করতে শ্রমিক আন্দোলনকে ব্যবহার করতে চায়, যদিও অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার থাকায় তাদের শ্রমিকবিরোধী ভূমিকা দেখেও কোন আন্দোলন করতে চায়নি। বরং কমিউনিস্টরা মতাদর্শগত কারণেই শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালনা করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ এই পর্বেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি আর ধর্মঘট পরিচালনার কমিটি না-

থেকে নিয়মিত সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন করলেও ধীরে ধীরে তার জঙ্গীরূপ গড়ে তোলে। তৃতীয়তঃ এই পর্বেই কলকাতা শহর ও শিল্পাঞ্চল ছাড়াও সুদূর উত্তর বাংলায় দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সের চা-বাগান এলাকায় সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ যেমন অধ্যাপক দণ্ডেকর দেখাতে চেয়েছেন শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের এই বিশেষরূপ আসলে শ্রমিক শ্রেণীর বদলে বুর্জোয়া মালিকদেরই জয় সূচিত করে। কিন্তু একটা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় শাসকদের অনিচ্ছুক হাত থেকে শ্রেণীস্বার্থে কিছু সুযোগ সুবিধা ছিনিয়ে আনার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর যে-সার্থক ভূমিকারও একটা দিক আছে, নির্বাণ তাঁর আলোচনায় সেটা দেখিয়ে দণ্ডেকরের বক্তব্য খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন।

নির্বাণ শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকাকে উদ্দেশ্যমূলক বলেই দুর্বলতা চিহ্ন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এইসব দল আন্দোলনের স্বার্থে আন্দোলন গড়তে বা তাতে নেতৃত্ব দিতে চায়নি। তারা রাজনৈতিক স্বার্থে এসেছিল বলেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা ব্যাহত হয়েছে বলে নির্বাণ মনে করেন। তাঁর এই মত বিতর্কিত হতে বাধ্য। তিনি এখানে সচেতন-ভাবেই শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার বদলে আন্দোলনের তথা শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব তাগিদের উপর জোর দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক রাজনীতির নিরিখে শ্রমিক আন্দোলনে মতাদর্শের ভূমিকা আলোচনার মধ্যে যে একপেশে মনোভাব দেখা দিতে পারে নির্বাণের সতর্কতা বোধহয় তার থেকেই এসেছে। ভারতে তথা বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের রাজনীতি যে মার্কসবাদী কিম্বা অ-মার্কসবাদী কোন মডেল সচেতনভাবে অনুসরণ করেনি, নির্বাণের বিশ্লেষণ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। হয়তো বা তার জন্যে শ্রমিকদের রাজনীতি চেতনার মান তার প্রত্যাশিত কিম্বা কাঙ্খিত স্তরে উপনীত হতে পারেনি। গ্রামশির ধারণা অনুসারে শ্রমিকদের রাজনীতি চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ততা ও সচেতন নেতৃত্বের প্রয়াস, এই দুয়ের ঘাত প্রতিঘাত কোথায় কিভাবে কতোটা কার্যকর হয়েছিল, সেই বিশ্লেষণের আলোয় শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতার প্রশ্নটি বিবেচ্য, নির্বাণের আলোচনা থেকে এইটাই বোঝা যায়।

নির্বাণের গবেষণা দেশের জাতীয় জীবন ও রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা। এই বিষয়গুলি বোঝার জন্য যে খোলা মনে সব

কিছু দেখা দরকার, কোন মডেলের কাঠামোর মধ্য সবটাকে ধরা যায় না, এই ধারণা দেওয়ার জন্যেই নির্বাণ সকলের প্রশংসা পাবেন। ইতিহাস চর্চায় নির্মোহ, যুক্তি নিষ্ঠ বস্তুভিত্তিক আলোচনায় নির্বাণের গ্রন্থ একটা বিশেষ সংযোজন বলেই আমরা মনে করি। সকলে একমত হওয়ার চেয়ে বহু মতের দ্বন্দ্বে কোন সহমতে পৌঁছানোর সুযোগ যে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রম রাজনীতির মধ্যে আছে এবং তা দরকার নির্বাণ সেই বিষয়ে সকলকে সজাগ করেছেন। আমরা তাঁর গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বাসব সর...

* দি পোলিটিকাল পার্টিজ্ এ্যান্ড দি লেবার পলিটিক্স ১৯৩৭-৪৭ : নির্বান বসু, মিনার্ভা এসোসিয়েট্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দাম ১৪৫ টাকা

'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ'

নাটক—পিরীতি পরমনিধি। প্রযোজক সংস্থা—বহুরূপী। মঞ্চ—অ্যাকাডেমি। ৫. ১১. ১৯৯৪। নির্দেশনা—কুমার রায়।

মনোবিশ্লেষণের এক অপরূপ নাট্যচিত্র বহুরূপী-র 'পিরীতি পরমনিধি'। (নাট্যকার ঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ) আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত এবং নিটোল জীবনকাহিনী নির্মাণ—নির্দেশক কুমার রায়ের উদ্দেশ্য নয় এ নাটকে। চরিত্রগুলির বহির্জীবন নয়, তাদের অন্তর্জীবনের রহস্য সন্ধান নাটকটির প্রতিপাদ্য। এই জটিল বিষয়টির সফল মঞ্চায়ণ সম্ভব হয়েছে নাট্য পরিচালকের প্রয়োগকর্মের মুন্সিয়ানায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি-গীতিকার ও সুরকার রামনিধি গুপ্ত নাটকটির কেন্দ্র-চরিত্র। নিধুবাবু বাণীপ্রধান, রাগাশ্রয়ী, লৌকিক প্রেম-বিরহের এক অপরূপ সংগীত সৃষ্টি করেছিলেন সেকালে। স্ত্রীপুত্রের বিয়োগ ব্যথাকে ভুলতে, চাকরিতে দেওয়ানি পদের লোভ পরিত্যাগ করে, শোরি মিয়াঁর টপ্পার এক সহজ, সরল বঙ্গীয় রূপ দানের সাধনায় তিনি মগ্ন ছিলেন। এই সময় ঘটনাচক্রে বারবণিতা কুষ্ণ-দাসীর অনূঢ়া কন্যা শ্রীমতীর ঘন সান্নিধ্যে আসেন তিনি। নিজ গৃহে রেখে শ্রীমতীকে সঙ্গীতশিক্ষা দেন নিধুবাবু। বেশ কিছুকাল,প্রণয়সংগীতে তন্ময় থেকে দুজনেই পরস্পরের প্রতি নিবিড় ভালবাসা অনুভব করেন। শ্রীমতীর নিরুচ্চার প্রেম সোচ্চার হয় একসময়। নিধুবাবুর জীবনসঙ্গিনী হওয়ার সুতীব্র বাসনা তার মনে। তার এই প্রস্তাবে নিধুবাবু সাড়া দেন না। কারণ নিধুবাবুর সংস্কার লালিত বিশ্বাস যে তাঁর প্রিয়জনদের মৃত্যুর জন্যে তাঁর অভিশপ্ত জীবনই দায়ী। এই জীবনের সঙ্গে শ্রীমতীর জীবনকে জড়ালে শ্রীমতীও বাঁচবে না। আবার নিধুবাবু তাকে গ্রহণ না করলে বারবণিতার মেয়ে শ্রীমতীকে স্বাভাবিক সামাজিক নিয়মে কোনো পুরুষের আশ্রয়ে রক্ষিতার জীবনই যাপন করতে হবে। নরকের সেই জীবনকে ঘৃণা করে ঐ নারী। সুস্থ সামাজিক জীবনে সে প্রতিষ্ঠা চায়। এইভাবে সমাজপতিতা রমনীর সমাজে পুনর্বাসনের সর্বকালের চিরন্তন

আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে এ-নাটকে। তাছাড়া নিধুবাবুও তো স্বপ্ন দেখেন যে উত্তরকালে তার সৃষ্ট সঙ্গীতের বিশুদ্ধ ধারাটিকে রক্ষা করবে তাঁর প্রতিভাময়ী শিষ্যা—সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী। অথচ রসজ্ঞানশূন্য, রুচিহীন মাতালদের মনোরঞ্জনে নিবেদিত সেই সঙ্গীতশিল্পকে শ্রীমতী কিভাবে রক্ষা করবে? নিধুর মনের দোলাচল ও অন্তর্দাহকে বাড়িয়ে তোলে এসব জিজ্ঞাসা। একসময় অতর্কিতে দুজনের সম্পর্কের এই টানাপোড়েন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নিধুর অন্তরঙ্গ বন্ধু মহারাজ মহানন্দর আবির্ভাবে।

মহারাজ নিধুর বাড়িতে শ্রীমতীর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে যান নিজের প্রাসাদে মা কৃষ্ণদাসীর পূর্ণ সম্মতিতে। বারবণিতার মেয়ে হয়ে যায় মহানন্দর রক্ষিতা। এরপর শুরু হয় নিধু-শ্রীমতী-মহানন্দর মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন ও মনস্তাত্ত্বিক জটিল দ্বন্দ্ব সংঘাত। মহানন্দ আবিস্কার করেন, শ্রীমতীর সমগ্র হৃদয় জুড়ে নিধুবাবু। সেখানে তাঁর কোনো জায়গা নেই। মনের অন্তর্দাহকে একসময় তিনি প্রশমিত করেন আদর্শায়িত এক নববোধ দিয়ে। শ্রীমতীকে তিনি যে ভালবাসেন। তাই তাকে সুখী করতে, তার বন্দিনী অন্তরাত্মাকে মুক্তি দিতে—প্রেমাস্পদের সঙ্গে তার মিলনের পথকে প্রশস্ত করে দেন মহানন্দ। মহারাজের একান্ত অনুরোধে নিধুবাবু প্রতিদিন বন্ধুর বাসভবনে শ্রীমতীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে শুরু করেন। নিধু-শ্রীমতীর দ্বৈত প্রণয়-সংগীত দুজনকে পৌঁছে দেয় অতীন্দ্রিয় প্রেমের এক মায়াময় জগতে।

তাপস সেন এ নাটকে অর্থবহ, ব্যঞ্জনাধর্মী মুড লাইট দিয়ে চরিত্রগুলির মনোজগতের ঘাত-প্রতিঘাত, আবেগ, রোমান্স ও বেদনাকে মূর্ত করে তোলেন। শ্রীমতী ও নিধুবাবু যখন গান করেন, তখন সেই গান অন্তর্লীন প্রেম-বিরহের ভাব-ভাবনা এবং মনোবিশ্লেষণের জটিল চিত্ররূপ প্রতিভাত হয় দূরে অকাশপটে আলোর বিচিত্র বর্ণ বিন্যাসে। নিধু-শ্রীমতী যখন গাইছেন 'কত ভালবাসি তারে সই কেমনে বোঝাব', তখন সাইক্লোরামায় গাঢ়, রঙীন আলোর বর্ণচ্ছটা। এবং শ্রীমতী ঘিরে কাটা-ছেঁড়া আলোকবিন্যাস। আলোর এই খণ্ড পরিকল্পনাটি দুটি মনের আবেগসমৃদ্ধ, বেদনাবিধুর অবস্থাটিকে চিত্রিত করেছে। 'পিরীতি পরমসুখ' গানটি যখন গাইছেন নিধুবাবু ও শ্রীমতী দ্বৈত কণ্ঠে, তখন বলয়পটে ঘনীভূত বর্ণময় আলোর ঝর্ণাধারা। সুশান্ত দাসের দক্ষ আলোক নিয়ন্ত্রণ সমগ্র আলোক প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব করেছে।

চমৎকার প্রতীকী, ইঙ্গিতধর্মী মঞ্চসজ্জা। নিধুবাবুর বাড়ির একাংশ বোঝাতে

মঞ্চের বাঁদিকে শুধুই একটি নিচু প্ল্যাটফর্ম—পেছনে পর্দায় তানপুরার ডিজাইন। এবং ডানদিকে আর একটি পাটাতনের সংস্থাপন।

মহানন্দর প্রাসাদের দৃশ্যসজ্জাটি কাব্যময়। দৃশ্য উপকরণ বলতে মঞ্চের দুপাশে উইংস ঘেঁষে দুটি ও মধ্যমঞ্চে একটি প্ল্যাটফর্মে বসার প্রশস্ত জায়গা, আপ স্টেজে ফ্ল্যাট দিয়ে দেওয়াল—পেছনে আকাশ। দুটি অনুচ্চ নক্সাদার স্তম্ভ। সামগ্রিকভাবে মঞ্চসজ্জাটি প্রাসাদ-উদ্যানকে আভাসিত করে। এরপর পেছনে বাঁদিকে ও ডানদিকে সিঁড়ি উঠে গেছে। এবং ওপরের রোস্ট্রামে দাঁড় করানো খিলানযুক্ত কাঠের ফ্রেম। এসব দিয়ে অন্দরমহলের বারান্দার প্রতিভাস। মঞ্চ-উপকরণগুলির সঙ্গে পরিমিত আলোর সুসমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মঞ্চসজ্জার কাব্য, ছন্দ। প্রাসাদের এই সেটডিজাইনে প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের পরিমণ্ডলটি চমৎকার ফুটেছে। এই সামগ্রিক মঞ্চনির্মাণে মনু দত্তর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য।

এ নাটকের মেজাজ ও ভাবের সঙ্গে আবহসংগীত (গৌতম ঘোষ) মিশে গিয়েছে। নানা সময় সরোদ-সারেঙ্গি-সেতারে রাগসংগীতের মূর্ছনা নানা মুহূর্ত ও বিষাদঘন পরিবেশ নির্মানে সহায়ক হয়েছে।

ধীরেন দাসের সুর ও সঙ্গীতশিক্ষায় রজত গঙ্গোপাধ্যায় (নিধুবাবু) ও গার্গী রায়চৌধুরী (শ্রীমতী) চমৎকার গান গেয়েছেন। দুজনের কণ্ঠস্বর উদাত্ত, সুরেশ্লিষ্ট। তবে রাগাশ্রয়ী টপ্পাগানের প্রথাসিদ্ধ গায়কী, তান ও অলংকরণের 'সূক্ষ্মতা' তেমন প্রকাশ পায়নি তাঁদের কন্ঠে ও গানে।

রজত গঙ্গোপাধ্যায় (নিধুবাবু)-এর কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, বাচনভঙ্গী তাঁর অভিনয়ের উৎকর্ষকে বাড়িয়েছে। তবে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, মুখমণ্ডলের নানা বিভাগে সূক্ষ্ম, জটিল ভাবভাবনা তেমন ফোটে না। গার্গী রায়চৌধুরীর (শ্রীমতী) অন্তর্মুখী অভিনয় খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীমতীর যন্ত্রণাবিদ্ধ মানসিকতাকে শিল্পী সুন্দর ফুটিয়েছেন। তাঁর বাচনভঙ্গীতে পরিশীলিত, মার্জিত ভাবটা কিছুটা কমানো দরকার। কারণ চরিত্রটি শিক্ষিত নয়। মহারাজ মহানন্দবেশী দেবেশ রায়চৌধুরী তাঁর প্রকাশক্ষম, ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বর দিয়ে চমৎকার অভিনয় করেন। জগন্মোহনের ভূমিকায় তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের কমেডি অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছন্দা করঞ্জি চট্টোপাধ্যায়-এর কুঞ্জদাসী উল্লেখের দাবী রাখে।

শক্তি সেন ও অতুল সাহার রূপসজ্জা অসাধারণ। চরিত্রগুলির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপের প্রকাশ ঘটেছে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদে ও অঙ্গরচনায়। নিধু,

শ্রীমতী ছাড়াও দেওয়ানের মেকআপ ও পরিচ্ছদ চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ করে তোলে। 'যদি সুখে থাকিবে হে' গানটি গাওয়ার সময় সালঙ্কারা শ্রীমতী—নিধু ও মহানন্দর রূপসজ্জা, তাদের পোষাকের বর্ণসমারোহ ও আলোর রঙের সুসমন্বয়ে এক দৃষ্টিনন্দন, কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অর্থবহ সুন্দর কম্পোজিশনগুলি নির্মিত হয়েছে কখনও জ্যামিতিক বিন্যাসে, কখনও সেই প্রথাসিদ্ধ ছককে ভেঙে। কুমার রায়ের নিপুণ প্রয়োগকর্মের নানা অনুপুঙ্খ প্রয়োজনাটির সর্বাঙ্গে। শ্রীমতী নিধুবাবুকে ছেড়ে মহানন্দের সঙ্গে চলে যাওয়ার মুহূর্তে, নিধুবাবু শ্রীমতীর দেওয়া ফুলের মালাটি মহানন্দর হাতে তুলে দেন। মহারাজ শ্রীমতীর গান শুনছেন। তখনও শ্রীমতীর বিদায়-সংবাদ কারোর জানা নেই। নেপথ্যে সীতাহরণ পালার কলরোল ভেসে আসে কাছাকাছি কোন অঞ্চল থেকে। সীতার মত হতভাগ্য মেয়েটির লুণ্ঠিত হওয়ার আগাম ইঙ্গিতময়তা এই দৃশ্যে।

'মহানন্দ তোমাকে ভালবাসে না?' নিধু যখন এই প্রশ্ন করেন তাঁর শিষ্যাকে মহারাজের বাড়িতে, তখন তানপুরার ঝংকারে মেয়েটির অন্তরের আর্তনাদ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। শ্রীমতী নিধুবাবুকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, শূন্য মঞ্চে তানপুরাটা পড়ে থাকে। সামনে শ্রীমতীর আনা ফুলের মালা ফুলদানিতে। মঞ্চের চারপাশে জমাট অন্ধকার। শুধু বাঁদিক থেকে সূক্ষ্ম একটি আলোর রেখা তানপুরাটাকে আলোকিত করেছে। নেপথ্যে গান ভেসে আসছে 'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ।' ব্যঞ্জনাময় এই দৃশ্যটির নির্মাণ-কল্পনা সাধুবাদযোগ্য।

এইভাবে বিষয় ও আঙ্গিকের সুসমন্বয়ে 'পিরীতি পরমনিধি' কুমার রায়ের এক স্মরণীয় শিল্পকীর্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

অনিল দাস

নেপালের নির্বাচন : একটি সম্ভাবনার জন্ম

অজেয়া সরকার

ভারতের অতি নিকট প্রতিবেশী দেশ নেপালে সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক পালা বদল ঘটে গেল। একটি বহুমুখী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনাইটেড মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট) সেদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। আটের দশক থেকে দুনিয়া জুড়ে কমিউনিস্টদের আপাত বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে এই ঘটনাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নেপালে কমিউনিস্টদের এই নির্বাচনী জয় কয়েকটি জরুরী প্রশ্নকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। প্রথমতঃ তাহলে, সামন্ত ভাবধারা প্রভাবিত বুর্জোয়া বিকাশের অতি নিম্ন স্তরে থাকা দেশে কমিউনিস্ট পরিচয়জ্ঞাপক একটি দল নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলটির শ্রেণীভিত্তি, বিকাশের ইতিহাস ও কর্মসূচী কি ধরণের? তৃতীয়তঃ নির্বাচনী সাফল্যের পিছনে কমিউনিস্টদের নিজস্ব দলীয় শক্তি ছাড়াও অন্য কোন উপাদান বা কারণ ছিল কিনা। চতুর্থতঃ নির্বাচনী জয়লাভ কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মপন্থাকে কতটা প্রভাবিত করবে? পঞ্চমতঃ নতুন সরকারের ভূমিকা, চরিত্র ও ভবিষ্যৎ কি?

এই পাঁচটি মৌলিক প্রশ্নকে সামনে রেখে আমরা নেপালে কমিউনিস্টদের নির্বাচনী জয়ের প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনাকে বোঝার চেষ্টা করব।

খৃষ্ট জন্মের আগেও নেপালে সভ্যতার অস্তিত্ব জানা গেছে। তবে বর্তমানে নেপাল বলতে যে ভৌগোলিক ভূখন্ডকে বোঝায়, তা একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক-সামাজিক বিবর্তনের ফল। রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্‌র রাজনৈতিক প্রয়াসের ফলাফলেই ১৭৬৮ খৃীষ্টাব্দে প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্বাধীন জনগোষ্ঠীর একত্রীভবন ঘটে, নেপালে শাহ্‌-রাজবংশের শাসন শুরু হয়। বর্তমান রাজা বীরেন্দ্র এই শাহ-রাজবংশের দশম প্রতিনিধি।

প্রায় ১৮ মিলিয়ন মানুষের দেশ নেপাল। বহু জাতি উপজাতিতে বিভক্ত, ধর্মের বৈচিত্রও আছে, যদিও হিন্দু ধর্মের প্রভাবই সবচেয়ে ব্যাপক। রাজধর্ম হিন্দু। তাই নেপালী সংস্কৃতিও মূলতঃ হিন্দু ধর্মানুসারী। যদিও এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের ফলে জনসংখ্যায় ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে নিতান্তই সব অর্থে সংখ্যালঘু।

গুরুং ও মগার উপজাতির মানুষ বাস করেন, মূলতঃ পশ্চিমাঞ্চলে এবং হিমালয়ের অন্নপূর্ণা-হিমলচুলী ও গণেশ হিমল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ ঢালে। রাই, লিম্বু ও সুনুওয়ার উপজাতির বাস মূলত পূর্বাঞ্চলের পর্বতঢাল ও উপত্যকায়। শেরপা প্রজাতির মানুষ ছড়িয়ে আছেন হিমালয়ের গায়ে উঁচু উঁচু ছোট্ট সব গ্রামে। তরাই অঞ্চলে আছেন থারু, যাদব, সাতার, রাজবংশী, ধিমল উপজাতির লোকজন। আর ব্রাহ্মণ, ছেত্রী ও ঠাকুর গোষ্ঠীর লোকেরা ছড়িয়ে আছেন নেপাল রাজ্যের বহু অঞ্চলেই। তবে এ যাবৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় মূলতঃ নেওয়ারীদের দাপট। এই বহু উপজাতি / প্রজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র নেপালে এলাকা ও জনগোষ্ঠী ভেদে বহু ডায়লেক্ট চালু থাকলেও সরকারী ভাষা দেবনাগরী হরফে লেখা নেপালী। এদেশে সাক্ষরের মোট সংখ্যা শতকরা ৩৯ ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে সাক্ষর হচ্ছেন মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ। রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, নেপাল হল পৃথিবীর দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ। এখানে জাতীয় বাজেটের ৭০ ভাগ টাকা আসে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। কৃষিভিত্তিক দেশ নেপাল। অথচ নেপালের মোট জমির মাত্র যে ১৮ শতাংশে চাষবাস হয়, তারাও প্রায় ৭০ ভাগই তরাই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। তদুপরি এখনও কৃষিকাজ মূলতঃ আবহাওয়া নির্ভর। রাজার শাসনে কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কোন প্রয়োগই হয় নি। বিপরীতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কৃষি উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশি বলে প্রতি আর্থিক বছরেই ঘাটতির কারণ বাড়ছে।

কৃষি ছাড়া নেপালী অর্থনীতির অন্য দুটি বিশিষ্ট আভ্যন্তরীণ উপাদান হলো কিছু কুটির শিল্পজাত ও চামড়া প্রভৃতি অরণ্যজাত জিনিসপত্রের রপ্তানী এবং পর্যটন শিল্প। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ এই দুটিই। কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলিতেও প্রতিবেশী ভারত ও চীনের সঙ্গে নেপালের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। ইদানীংকালে বৈদেশিক বাণিজ্যে কার্পেট চামড়া প্রভৃতি রপ্তানীর ক্ষেত্রে

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গেও নেপালকে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে। পরন্তু উত্তরে ও বাকি তিন দিকে ভারত-ঘেরা নেপালের বৈদেশিক বাণিজ্য অনেকাংশেই কলকাতা বন্দরের উপরে নির্ভরশীল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী ১০৪ বছর নেপালে যে রানাশাহী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল ১৯৫০-এর নভেম্বরে এক গণবিদ্রোহে তার পতন হয়। সেই বিদ্রোহ কিন্তু রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারে নি। বরং বলা ভালো, রাজ শক্তির একটা অংশ রানাশাহীর বিরুদ্ধে জনগণের এই বিক্ষোভকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করেছিল। পরিণামে রানাশাহীর চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত শাসনের জায়গায় তুলনায় সামান্য আধুনিক এক সংহত রাজতন্ত্রের সূচনা হল, যার আমলেই ১৯৫১ সালে নেপালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বহুদলীয় এই নির্বাচনে নেপালী কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেই সদ্যোজাত নেপালী কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করল।

নেপালে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম দিকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের একটা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। বস্তুত, এই কলকাতাতেই ১৯৪৯ সালে গোপনে নেপালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাছাড়া পরবর্তীকালে যারা নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন, যার অন্যতম বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন অধিকারী, তাঁরা অনেকেই ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫০ সালের রানাশাহীর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহে নেপালের কমিউনিস্টরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫১-র নির্বাচনে জিতেই নেপালী কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করল। যে সব কর্মীরা গ্রেপ্তার এড়াতে পারলেন, তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন গ্রামে গ্রামান্তরে। আত্ম-গোপন করে পার্টির কাজ শুরু হল। ১৯৫৭ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে নেপালে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি কাজ শুরু করে। ১৯৫৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টরা চারটি আসনে জয়ী হলেন আর ৭৪টি আসন জিতে নেপালী কংগ্রেস পার্লামেণ্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার সরকার গঠন করল। এবারে নেপালী কংগ্রেসের সরকার সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ না করে কৃষক-ছাত্র ও শ্রমিক ফ্রাণ্টে কাজ করা কমিউনিস্ট কর্মীদের উপরে নিদারুণ দমন নীতি চালানো শুরু করে। অবশ্য

এই সরকারী দমন নীতির আজ্ঞা থেকে সাধারণ মানুষও বাদ যান নি। কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে জনগণের এই ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতার সুযোগ গ্রহণ করে রাজতন্ত্র। রাজার মদতে নেপালে একটি 'ক্যু' হয়। নেপালী কংগ্রেসের সরকারের পতন ঘটে। পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে রাজা ১৯৬১ সালে দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করে। বলাবাহুল্য, আবার তখন বেআইনী হল নেপালী কমিউনিস্ট পার্টি গ্রেপ্তার হলেন বহু নেতা, কর্মীরা অনেকে আবার আত্মগোপন করলেন গ্রামে। এই আত্মগোপন পর্ব, আর গোপনে গ্রামে গ্রামে, শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ চলল ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত।

এই পর্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতভেদের কুফল নেপালের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও পড়েছে। বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে গেলেন নেপালের কমিউনিস্ট কর্মীরা। চীন-ও সোভিয়েতের দ্বন্দ্বে নেপালী কমিউনিস্টদের একটি বড় অংশই সোভিয়েত বিরোধী হয়ে ওঠেন। আভ্যন্তরীণ নানা ইস্যু নিয়েই মত পার্থক্য দেখা দিতে থাকে। কিন্তু রাজতন্ত্রের দমননীতি আর দেশের মানুষের ক্রমশ বেহাল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে, কমিউনিস্টরা উপলব্ধি করতে থাকেন যে, কোন একটি গোষ্ঠীর একক সামর্থে এর প্রতিরোধ সম্ভব নয়। ফলে এই বোধ জন্মায় যে, রাজার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন সার্থক করতে হলে প্রথমে কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বলাবাহুল্য, এই ঐক্যপ্রয়াস খুব সহজসাধ্য ছিল না। তথাপি প্রায় এক দশকের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯৮৯ তে বড়, মাঝারি, ছোট নানাধরণের প্রায় ১৪টি কমিউনিস্ট সংগঠন একত্র হয়ে গড়ে তুললেন নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনাইটেড মার্কসিস্ট–লেনিনিস্ট)। এই পার্টির নেতৃত্বেই একটি ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী মোর্চা রাজতন্ত্রী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগল।

পাশাপাশি নেপালী কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কিছু প্রাজ্ঞ নেতাও (যেমন, গণেশ মান সিং) ততদিনে বুঝতে পেরেছেন যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে না পেলে একক শক্তিতে নেপালী কংগ্রেস রাজার স্বৈরাচারকে আটকাতে পারবেন না। নেপালী কংগ্রেসের এই প্রগতিশীল অংশের দিকে কমিউনিস্টরা অতি দ্রুত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরিণামে ১৯৮৯ সালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে জাতীয় অভ্যুত্থান হল, সেই লড়াই-য়ে নেপালী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট কর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়লেন। স্বৈরতন্ত্রের অবসান হয়ে চালু হল বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র, আর রাজা রইলেন সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে নেপালী কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তভাবে লড়াই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নেপালী কংগ্রেস একক ভাবেই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয় ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু এই নির্বাচনে নেপালী কমিউনিস্ট পার্টি (ইউ এম এল)-ও যথেষ্ট সাফল্য পায়। ২০৫টি আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্টে তাঁরা ৬৮টি আসন দখল করে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পান। ৪টি আসনে জয়লাভ করে রাজতন্ত্রের সমর্থক রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রী দল এবং ৯টি আসন পান চরমপন্থী কমিউনিস্টরা।

নেপালের মানুষ যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ৯১-এর নির্বাচনে কংগ্রেসকে বিপুলে ভোটে জিতিয়েছিলেন, ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল জনগণের সেই আস্থা প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজন কংগ্রেসী সরকার বোধ করছেন না। নেপালী কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল বাজেটের ৭০ ভাগ তাঁরা গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য খরচ করবেন, নিরক্ষরতা দূর করবেন, বিশেষ করে মেয়েদের সম্মান রক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে। অথচ '৯১ সালে সরকার গঠনের পরে নেপালী কংগ্রেসী সরকার গ্রামের জন্য বাজেটের অতি নগণ্য অংশই বরাদ্দ করেছিলেন। নিরক্ষরতা দূরী-করণের কোন কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। এমনকি ১৯৯৩ সালে পার্লামেন্টে নেপালী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কমরেড সাহানা প্রধান নারী-ধর্ষণকারীর শাস্তির মেয়াদ কিছুটা বাড়ানোর জন্য খসড়া বিল উত্থাপন করলে, তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী কৈরালা বিরোধিতা করে বলেন যে, এত কঠোর আইনের এখনও সময় হয় নি। বিলটি সরকারি বিরোধিতায় শেষপর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই ঘটনাটি দলমত নির্বিশেষে নেপালী মহিলাদের নেপালী কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

এরপরে ১৯৯৪ র গোড়ার দিকে, পার্লামেন্টের সপ্তম অধিবেশনে নেপালী কংগ্রেসেরই বহু সাংসদ সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে কংগ্রেসী সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করলেন। মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘোষিত হল। অন্তবর্তী সরকারের দায়িত্বে থাকলেন প্রধানমন্ত্রী কৈরালা। নির্বাচন প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ বলেই দরিদ্র দেশ নেপালের জনগণ প্রথমে মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন। পরে তাঁরা নির্বাচন সমর্থন করেন।

এই সাম্প্রতিক নির্বাচনেই কমিউনিস্টরা (ইউ এম এল) ৮৮টি আসন জিতে দেশের একক বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছেন। আর বহু দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ মাথায় নিয়ে আজ নেপালী কংগ্রেস সে দেশের দ্বিতীয়

রাজনৈতিক শক্তি। কিন্তু লক্ষ্যনীয় শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির— ১৯৯১-এ পাওয়া ৪টি আসনের জায়গায় এবারে তাদের দখলে ২০টি আসন। আর নেপালের চরমপন্থী কমিউনিস্টদের দল ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি যারা আবার সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, একক ভাবে লড়ে সবকটি আসনেই তারা পরাস্ত হয়েছেন। শেষপর্যন্ত বহু টানাপোড়েনের পরে, মূলতঃ গণেশ মান সিং-এর চাপে নেপালী কংগ্রেস কমিউনিস্টদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে কংগ্রেসী সমর্থনে নেপালী কমিউনিস্ট পার্টি (ইউ এম এল) সরকার গঠন করেছে।

এই ঘটনা প্রবাহ নেপালী রাজনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রথমতঃ জন্মলগ্ন থেকেই নেপালে কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মকাণ্ডের ভিত্তি করেছিল গ্রামকে। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার রাজকীয় জাঁকজমকের আড়ালে পড়ে থাকা অতি দরিদ্র নেপালী গ্রামবাসী কমিউনিস্ট কর্মীদের পেয়েছে নিত্যসঙ্গী হিসেবে। পার্টি বেআইনী থাকাকালীনও কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্রামের মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। বরং গ্রামই তাদের আশ্রয় দিয়েছে। তাত্ত্বিক বিতর্কের জেরে পার্টি ভাগ হলেও, বিচক্ষণ নেতারা সবসময়েই স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যাকেই সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখেছেন। ৮০-র দশকের গোড়া থেকে বহুধা বিভক্ত নেপালের কমিউনিস্ট মহলে যে ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু হয়, সেখানেও লক্ষ্য হিসেবে সামনে ছিল রাজার স্বৈরতান্ত্রিক অনাচারের বিরুদ্ধে গণজাগরণ, কোন বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন নয়। একান্ত দেশজ বিষয়কেন্দ্রিক এই কর্ম-কাণ্ড নেপালী কমিউনিস্টদের মাটির কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, নেপালে ১৯৫৬ সালে যোজনা শুরু হলেও, বিগত ৩৭ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০ টি। ১৯৯১ সালে নেপালী কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করার পর বেসরকারীকরণ কিছুটা শুরু হয়েছে ব্যাঙ্ক শিল্পে, বিমান-পরিবহনে এবং বিদ্যুতের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবসায়। কিন্তু নেপালে জাতীয় বুর্জোয়ার পূর্ণ বিকাশ এখনও দূর অস্ত্। শ্রমিক শ্রেণীও স্বাভাবিক সংখ্যাগত দুর্বলতার কারনেই মূলতঃ খুব সচেতনও সংগঠিত নয়। তাই দেখা গেছে ১৯৫০ থেকেই নেপালে প্রতিটি রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে গ্রাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শুধু তাই নয়, ৫০-এর দশক থেকেই দেখা গেছে সদ্যোজাত জাতীয় বুর্জোয়ার একটি প্রগতিশীল অংশ, যারা নেপালী কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুযোগ খুঁজেছে

বারংবার, তারাই গ্রামকে সঙ্গে পাওয়ার আশায় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টদের সঙ্গী করেছে।

তৃতীয়তঃ, নেপালী কংগ্রেস কোন হোমোজেনাস সংগঠন নয়। জাতীয় বুর্জোয়ার একাংশ ছাড়াও শহুরে ব্যবসাদার ও সম্পন্ন কৃষকদের একাংশও নেপালী কংগ্রেসের সমর্থক। একশ্রেণীর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধা আছে। এদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই দরিদ্র গ্রামীণ জনগণের স্বার্থের কোন মিল নেই। নেপালী কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই গোষ্ঠী যখনই ক্ষমতা সংহত করেছে, তখনই কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিবাদ অনিবার্য হয়েছে। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট প্যার্টিকে বেআইনী ঘোষণা, ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসী সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পীড়ন এবং এই হালের নির্বাচনের মধ্যে দিয়েও নেপালী কংগ্রেসের একাংশের তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধিতা প্রমাণিত। আসলে একটি সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে নিজস্ব উদ্যোগে বুর্জোয়ার অনুকূলে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষমতাহীন নেপালী বুর্জোয়াশ্রেণী কখনও রাজতন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করে, কখনও বা গ্রামীণ জনগণের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার স্বাদ পেতে চেয়েছে।

চতুর্থতঃ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার রক্ষণশীল মার্কসীয় ধারণাকে নেপালের অভিজ্ঞতা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। মূলতঃ গ্রামভিত্তিক সংগঠন নিয়ে, কিছুটা শহুরের ছাত্রএবং অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সহায়তায় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ব্যবহার করেই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়, নেপালী কমিউনিস্টরা তা করে দেখিয়েছেন।

পঞ্চমতঃ এটা ঠিক যে, এই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ব্যবহার করতে গিয়ে নেপালী কমিউনিস্টরা এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট উদাসীনতা দেখিয়েছেন, যা মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে মেলে না। যেমন ধর্ম বিষয়ে এক্ষেত্রে নেপালী কমিউনিস্টদের মনোভাব একথাই বুঝিয়ে দেয় যে, গ্রামীণ জনতার অর্থনৈতিক ক্ষোভকেই তাঁরা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত।

ষষ্ঠতঃ এই নির্বাচনে কমিউনিস্টদের জয়ের পিছনে কংগ্রেসী সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্ত-ও যে পরিবর্তন চাইছিলেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কাঠমাণ্ডুতে কমিউনিস্টদের একচেটিয়া জয়। আবার পাশাপাশি নেপালী জনগণ যে কমিউনিস্টদের

একটি সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি হিসেবেই দেখতে চান, তার প্রমাণ মিলেছে চরমপন্থী ইউনাইটেড পিপল্‌স পার্টির নির্বাচনী পরাজয়ে। আর এটাও একটি সতর্কবাণী থাকছে যে, কমিউনিস্টদের আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগ নিতে পারে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। কারণ ইউনাইটেড পিপলস পার্টির শক্তিক্ষয়ের পাশাপাশি দেখা যায় রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির শক্তিবৃদ্ধি।

নেপাল আজ এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বৈদেশিক ঋণ এখন নেপালের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬৫ শতাংশেরও বেশি। জাতীয় আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিবেশি দেশগুলির কাছ থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কৃষির অবস্থাও যথেষ্ট অনুন্নত। নেপাল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, '৯৩-'৯৪ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় চলতি আর্থিক বর্ষে রপ্তানী কমেছে ১৬·২ শতাংশ অথচ আমদানি বেড়েছে ৩২ ২ শতাংশ। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি চরম এবং আরও একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য হল, চলতি ধারণার বিপরীতে একমাত্র ভারতের সঙ্গেই নেপালের বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমেছে।

এই পরিস্থিতিতে নেপালের কমিউনিস্ট সরকার এক অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি। রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করা আর একটি অতি দুর্বল আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে চাঙ্গা করা একই জিনিস নয়। কমিউনিস্ট নেতাদের ব্যক্তিগত সততা, জনগণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে থাকার ইতিহাস এবং তিনটি কংগ্রেসী সরকারের অপশাসন—এই হল সাধারণ ভাবে কমিউনিস্ট সরকারের মূলধন। পাশাপাশি দেশের আমলাতন্ত্র মনে মনে রাজতন্ত্রের সমর্থক, অভিজ্ঞ ও সুচতুর। কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্যের কোন কারণ নেই। নেপালী কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল একটি অংশ (যার নেতা কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টরাই) সুযোগ পেলেই মধ্যপন্থী কৈরালা কে নিয়ে কমিউনিস্ট সরকারকে বিপদে ফেলতে পারেন। পাশাপাশি এটাও দেখার যে, জাতীয় বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়ার প্রগতিশীল যে অংশটির প্রতিনিধিত্ব করেন, কংগ্রেস নেতা গণেশ মান সিং, তাঁরা দেশের প্রকৃত প্রয়োজনে রাজার স্বৈরতন্ত্রকে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন করতে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত ও গ্রামীণ দরিদ্র জনতার পাশে এসে দাঁড়ান কিনা।

অর্থাৎ নেপালে কমিউনিস্টদের কাঁধে এখন সেই দায়িত্ব চেপেছে, যা ক্ল্যাসিকাল অর্থে করার কথা ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের। রাজতন্ত্রকে চূড়ান্ত পরাভূত করার মত শ্রেণীগত ক্ষমতা মিশ্র প্রকৃতির নেপালী কংগ্রেসের থাকার কথা নয়, ছিলও না।

সমঝোতা করাই ছিল তার রাজনৈতিক অস্ত্র। নেপালী কমিউনিস্টদের মূল কৃতিত্ব এইখানে যে, তাঁরা নেপালী কংগ্রেসের সুযোগ সন্ধানী সমঝোতার রাজনীতির জালকে অনেকটাই ছিন্ন করতে পেরেছেন।

বিদেশী পুঁজি ও বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানাবার ফলে কমিউনিস্টদের যে সমালোচনা শুনতে হচ্ছে, তা অনেকটা বাস্তবতা বর্জিত। কারণ জাতীয় বুর্জোয়ার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাই এই মুহূর্তে কমিউনিস্টদের লক্ষ্য। এর সঙ্গে সঙ্গে ভূমি সংস্কার ঘটিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে এবং গ্রামীণ শ্রেণীদ্বন্দ্বকে কতটা মেহনতী মানুষের অনুকূলে তাঁরা আনতে পারেন, সেটাই দেখার। বস্তুত এখানেই নেপালে একটি সম্ভাবনার জন্ম হচ্ছে।

স্মরণে ও শ্রদ্ধায় ঃ বারীন্দ্র কুমার দত্ত

অচিন্ত্য গুপ্ত

পূর্বতন পূর্ব পাকিস্থান, বর্তমান বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ দিনের অন্যতম নেতা বারীন্দ্র কুমার দত্ত, আত্মগোপন করে থাকার সময়ে যিনি আবদুস সালাম নামে পরিচিত ছিলেন, এই বছরের গত ২০শে অক্টোবর, ৮৩ বছর বয়সে ঢাকায় প্রয়াত হন।

প্রয়াত বারীন্দ্র কুমার দত্ত আমার খুব নিকট সম্পর্কের মানুষ ছিলেন. তিনি ছিলেন আমার মামা। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সব কিছুকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার তেমন কিছু সুযোগ আমার হয় নি। আমি তখন ক্লাস এইট-নাইনে পড়ি, সম্ভবতঃ সেটা ৬০/৬১ সাল, সেই আমি প্রথম জানতে পারি আমার মামা একজন কমিউনিস্ট। তিনি তখন আত্মগোপন করে আছেন, থাকেন নারায়ণগঞ্জের কাছে ফতুল্লা নামে একটি গ্রামে। আমরা তখন থাকি ঢাকার গেণ্ডারিয়া পাড়ায়। মাঝে মাঝে সন্ধে বা রাতের দিকে মামা সাইকেল চালিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন। লক্ষ করেছি মামা বাড়িতে এলেই একটা চাপা আলোড়ন দেখা দিত বাড়ির বড়দের মধ্যে। দাদা দিদিরা জানালা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিত বাইরের লোক কেউ আশে পাশে আছে কি না। মামার পেছন পেছন সন্দেহ করার মতো কোনো লোক এল কি না।

বাবা মামাকে তাঁর ঘরে নিয়ে বাসিয়ে সন্তর্পণে কী সব আলোচনা করতেন। রান্নাঘর, খাবার ঘর আমাদের মূল বাড়ি থেকে সামান্য দূরে থাকায় মা মামার খাবার বাবার ঘরেই এনে দিতেন। কোনো কোনো দিন মামা থেকে যেতেন। তারপর সকালে উঠে আর তাঁকে দেখতে পেতাম না। শুনতাম খুব ভোরে তিনি চলে গেছেন। কোনো কোনো দিন আবার, কিছুক্ষণ থেকে পোষাক পাল্টে, মাওলানার মতো পোষাক পরে তিনি বেরিয়ে যেতেন। আমার খুব কৌতূহল হতো, আমি খুব আবাক হয়ে যেতাম। বেশ সু-পুরুষ আমার মামা, সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ, ফর্সা রং, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। বুঝতে পারতাম না মামা কেন গোপনে আসেন গোপনে যান! মামা কেন এমন রহস্যময়? প্রথম প্রথম মামার এই অন্ধকারে আসা আর অন্ধকারে যাওয়ায় আমি খুব আশ্চর্য হয়ে

যেতাম। জানতে খুব ইচ্ছে হতো। কিন্তু দাদা দিদিদের জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার কোনো উপায় ছিল না। তারা শুধু আমাকে বলে দিয়েছিল, পাড়ার কেউ মামা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি যেন বলি কিছুই জানি না। তারপর একদিন দু'দিন লুকিয়ে লুকিয়ে মামা আর বাবার কথাবার্তা শুনে ফেললাম।

রাশিয়ার বিপ্লব, লেনিন স্টালিন, চীন বিপ্লব, বিপ্লবের পর ঐ সব দেশের উন্নতির কথা মামা বাবাকে বোঝাতে চাইতেন। বাবা বলতেন, এ দেশটা অন্য রকম, এখানে বিপ্লব হবে না, এখানকার মানুষ খুব ধর্মভীরু, ওপথে পা বাড়াবে না। আমাদের কষ্টের জীবন শেষ হবে না, যে কোনো দিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে, জেলে পচতে হবে—দেশের কেউ আমাদের কথা ভাববেও না। আইউব খান ভয়ঙ্কর লোক, কমিউনিস্টদের শেষ করে ছাড়বে। বাবা তাই মামাকে এই সব ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বলতেন। আড়ি পেতে ঐ কথাবার্তা শোনার পরই জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম মামা কমিউনিস্ট।

মাঝে মাঝে দেখেছি বাবার চোখ এড়িয়ে আমার দুই দাদার সঙ্গে মামা আলোচনা করতেন। দাদারাও দেখেছি মামার মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে মামা যে রাজনীতি নিয়ে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়তেন সেই সময়েও লক্ষ করেছি মামা কখনই উত্তেজিত হতেন না। ধীর সুন্দর ভঙ্গীতে তিনি মামাকে বোঝাতে চাইতেন। বাবাকে যে তিনি শ্রদ্ধা করেন, সমীহ করেন সেটা বুঝতে পারতাম। আমার বাবা প্রয়াত অধ্যাপক শচীন্দ্র কুমার গুপ্ত ছিলেন সে সময় ঢাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। নানা বিষয়ে বাবার পড়াশুনা ছিল। দেখেছি মামা ধৈর্য সহকারে তাঁর কথা শুনতেন। মামা ছিলেন বিনয়ী। আমাদের সকলের প্রতি তাঁর স্নেহ প্রবল ছিল। তিনি আমাদের পড়াশুনায় খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁর প্রভাবে আমি তখন থেকেই কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। পরবর্তীকালে ঢাকার স্কুল জীবন শেষ করে কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়ে বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছি। নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সি পি. আই (এম-এল)-এ যোগ দিয়েছি। বাংলাদেশ হওয়ার পর অল্পদিনের জন্য ঢাকা গেলে রাজনীতির বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও মামা সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আমি মামার কাছে না গিয়ে অন্য জায়গায় উঠেছিলাম। আমার সঙ্কোচ ছিল, মামা কিন্তু জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মামার স্নেহ আমাকে বাধ্য করেছিল দিন কয়েকের জন্য সেখানে থাকতে। মামা আমাদের রাজনীতির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তাতে কোনো বিদ্বেষ ছিল না। ইতিহাস

তত্ত্ব এসবের অবতারণা করে আলোচনা করেছেন আমাকে জয় করে তাঁর দিকে নিয়ে যাবার জন্য, আবার অবাক্ বিস্ময়ে দেখেছি আমাদের উদ্যমকে অভিনন্দন জানাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা করেন নি।

বিপ্লবে জ্বল্ জ্বল্ করা দিনগুলিতে অনেক সময় মামাকে ভুল বুঝেছি। এই সব মানুষের বিনয়, উদারতা, স্নেহ প্রবণ মনের তখন যথাযথ মূল্য দিতে পারি নি। নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতায় আজ তাই বুঝতে পারি, এই সব মানুষের জীবন অনেক বড় ছিল, আমরা ঠিক এঁদের জীবনের, আত্মত্যাগের পরিমাপ করতে পারি না। এঁরা ব্যক্তিগত ভালোমন্দের দিকে কখনো তাকান নি, আত্মস্বার্থের কথা আদৌ চিন্তা করেন নি। 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই ভাবনাতেই এঁরা ভাবিত ছিলেন। কী পেলাম, কী পেলাম না, একবারো পিছন ফিরে এই হিসাব করতে বসেন নি। এঁদের তুলনা এঁরাই। মনে হয় মাও সে তুং এঁদেরই কথা ভেবে বলেছিলেন,—'কিছুদিনের জন্য নয়, সারা জীবন ধরেই এঁরা বিপ্লবী ছিলেন।'

সিলেটের এক জমিদার বংশে সোনা মামার জন্ম। রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র দত্ত ও মনোরমা দত্তের ছয় ছেলে ও দুই মেয়ে। সোনা মামা তৃতীয় সন্তান অর্থাৎ আমার মায়ের পরের ভাই। জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণই দাদুর আসল পেশা ছিল না। জাঁদরেল আইনজ্ঞ হিসাবেও তার খুবই সুনাম ছিল। কর্মক্ষেত্রের সাফল্য-মূল্য হিসাবে ইংরেজ সরকার দাদুকে রায়বাহাদুর খেতাব দেয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে দাদু অনেকটা বাগ্মী বিপিন পালের মতানুসারী ছিলেন অর্থাৎ তিনি গঠন তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য থাকাকালে তিনি সপ্রু জয়াকরের দলভুক্ত ছিলেন। আমাদের মতে দাদুর রাজনীতি প্রতি-ক্রিয়াশীল বলেই চিহ্নিত হবার, তবু মানুষ হিসাবে দাদু খুবই উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের সন্তানদের স্বাধীন চিন্তার ও কাজের ওপর কোনো দিনই হস্তক্ষেপ করেন নি। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন না, তবু ব্রাহ্মধর্মে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতেন। তখনকার দিনের এহেন এক নামী পরিবারে সোনা মামার জন্ম ১৯১১ সালে।

১৯২৪-২৫ সালে সারা দেশ জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছিল। এই সংগ্রাম খুবই ব্যাপকতা লাভ করেছিল। দেশের প্রায় প্রতি স্তরের মানুষ এই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ তো একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। দত্ত

পরিবারের তৃতীয় সন্তান বারীন দত্ত তখন স্কুলের গণ্ডিতে, সেই ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে প্রথম পা বাড়ালেন। সোনা মামা ছিলেন মেধাবী ছাত্র। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশনে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি অংশ নেন। এই অপরাধে কলেজ থেকে তিনি বিতাড়িত হন। এরপর যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। এবারো ছাত্র বিক্ষোভে থাকার দরুণ তিনি বিতাড়িত হলেন। এবার মামা দেশপ্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে এক সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেন। অবশ্য তিনি এই দলের সঙ্গে অল্প দিন যুক্ত ছিলেন। এক রাজনৈতিক ব্যাঙ্ক-ডাকাতির সঙ্গে এই সময় জড়িয়ে পড়ার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ৩ বছর হিজলী বন্দী শিবিরে আটক থাকেন। এই সময় জেলখানাতেই মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন। জেল থেকে বেরিয়ে একজন কমিউনিস্ট হিসাবে সিলেটের চা-বাগানে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দত্ত পরিবারের অন্যদের মধ্যেও তখন সাম্যবাদের প্রভাব পড়েছে। সোনা মামার অন্য ভাই-বোনেরাও কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। এ সময় সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটিতে সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব বৃদ্ধি করে বারীন দত্ত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস ত্রিপুরা অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনের পরই ১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪০ সালে সিলেট জেলা পার্টির কার্যকরী সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তিনি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। তিনি ঐ প্রাদেশিক কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন। সোনা মামার ছদ্মনাম আবদুস সালাম। ১৯৫১ সালে জেলা কমিটির দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ঢাকা চলে আসেন। সেই সময় থেকেই তিনি আবদুস সালাম নামে পরিচিত ছিলেন। পার্টির পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক মণি সিংহ গ্রেপ্তার হবার পর ১৯৬৭ সালে বারীন দত্ত কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৭৩ সালের ২য় কংগ্রেস পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় (১৯৭৩), তৃতীয় (১৯৮০) ও চতুর্থ (১৯৮৬) কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন।

মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা ছিল এবং এর বাস্তব প্রয়োগে, অনুশীলনে তিনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছেন। তার কর্তব্যবোধের, নিষ্ঠার অন্ততঃ কোনো অভাব ঘটে নি।

সোনা মামাদের কথা ভোলা যায় না, তাঁদের কথা বলতে বসে শেষ করা যায় না। ১৯৪২ সাল থেকে একটানা ২৯ বছর তিনি মাথার ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে আত্মগোপন করে কাটাল। অথচ পুরো সময়টা তিনি ব্যয় করেছেন পার্টি ও গণসংগঠনের কাজে। ছুটে বেরিয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ও আন্দোলন সংগঠনের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর কমিউনিস্ট গুণাবলীর সংমিশ্রণ তাঁকে জনগণ ও কর্মীদের আস্থাভাজন একজন আদর্শস্থানীয় নেতার আসনে উন্নীত করেছে। ওঁর চরিত্রের একটি প্রধান দিক হলো অসাধারণ ধৈর্য ও সংবেদনশীলতা; রাগ ও উত্তেজনা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। বিনয়, নম্র আচরণ ও গভীর মমত্ববোধ—তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁকে ব্যতিক্রমী মানুষে পরিণত করেছে। বলাই বাহুল্য, এ হেন মানুষের মৃত্যু যথার্থই গভীর শোকের।

সোনা মামার আর একটা গুণের কথা উল্লেখ না করে তাঁর সম্পর্কে লেখা শেষ করতে পারছি না। ইংরেজি বাংলা নানা পত্রিকায় তিনি অসংখ্য লেখা লিখেছেন। এগুলি ছাড়া তিনি লিখেছেন 'সংগ্রাম মুখর দিনগুলি' নামে স্মৃতিকথা মূলক একটি গ্রন্থ।

আমার মামিমা শান্তি দত্ত প্রগতিশীল মহিলা সংগঠনের দীর্ঘ দিনের সক্রিয় কর্মী। সোনা মামার একমাত্র ছেলে কিশোর পেশায় প্রযুক্তিবিদ, এবং একমাত্র মেয়ে লিলি পেশায় শিক্ষিকা।

এরা দু'জনেই বামপন্থী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক।

•

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি গিয়ানী জৈল সিং

নিশীথ রঞ্জন রায়

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

PARICHAY November-December 1994 Reg. No. 13273
WB/EC—265

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর ১০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম বারো টাকা